একশ' বছরের রাজনীতি

আবুল আসাদ

একশ' বছরের রাজনীতি

একশ' বছরের রাজনীতি

www.icsbook.info

একশ' বছরের রাজনীতি

আবুল আসাদ

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.icsbook.info

একশ' বছরের রাজনীতি

আবুল আসাদ

প্রকাশক
এস.এম. রইসউদ্দীন
পরিচালক (ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৯৪
চতুর্থ সংস্করণ ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী, ২০১০
পঞ্চম সংস্করণ ঃ অক্টোবর, ২০১১

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ঃ হামিদুল ইসলাম

মূল্য ঃ ২৫৫.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫১-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

Eksho Bachhorer Rajniti, Written by: Abul Asad, Published by: S.M. Raisuddin, Director (Incharge) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 255.00 US$: 6.00 ISBN.984-493-091

www.icsbook.info

উৎসর্গ

স্মৃতি মন্থন
করেও
যাঁকে আমি খুঁজে পাইনা
শিশু বয়সে
হারিয়ে যাওয়া
আমার সেই
মরহুমা আম্মা
মজিদা খাতুনকে

www.icsbook.info

মুখবন্ধ

বাংলা চৌদ্দ শতক জাতীয় উদযাপন পরিষদের প্রকাশনা কর্মসপচির অন্যতম বিষয় ছিল এই অঞ্চলের গত একশ' বছরের রাজনীতির ওপর একটি প্রামাণ্য ও তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রণয়ন করা। বিষয়টি নিঃসন্দেহে অতিশয় পরিশ্রমসাধ্য, দুরূহ কাজ। কারণ বর্তমান সময়ে ইতিহাসের উপাদান নিরাশঙ্কভাবে উত্থাপন করার যে ঝুঁকি রয়েছে তা অতিক্রম করতে সহজে কেউ সাহসী হয় না। তাছাড়া জাতীয় ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে রাজনৈতিক হস্পক্ষেপের ফলে সত্যের সপত্রসমপহেরও কমবেশী বিকৃতি ঘটেছে। বিকৃতি না হোক, সত্য আজ ধপলিধপসরিত। সেই আবিল অবস্থা থেকে প্রকৃত ঘটনাধারাকে আবিষ্কার করে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করাও একাম্প দরকার। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ সেই জাতীয় চাহিদা পপরণের জন্য বই পুনঃ মুদ্রণ দ্বিতীয় সংস্করণ করতে সচেষ্ট হয়েছে।

সেই প্রয়াসেরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে, "একশ' বছরের রাজনীতি" শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রন্থটি। গ্রন্থটি রচনা করেছেন দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক জনাব আবুল আসাদ। জনাব আসাদ বহুকাল যাবত সাংবাদিকতার সাথে জড়িত। তাছাড়া তিনি একজন সুলেখক এবং চিম্পাশীল বুদ্ধিজীবী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্থান পতনের প্রত্যক্ষ দর্শক এবং বিশে-ষক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। তাছাড়া দেশের দৈনন্দিন কর্মধারা পর্যবেক্ষণের জন্য যে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন তা তার আছে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

"একশ' বছরের রাজনীতি" গ্রন্থটি রচনার জন্য আমরা জনাব আবুল আসাদের কাছে কৃতজ্ঞ। এ বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ তার প্রতিশ্রুতির একটা বড় শর্ত পপরণ করেছে। পরে অন্যান্য বইগুলোও প্রকাশ পাবে বলে কমিটি দৃঢ় আশা পোষণ করে। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে একটা জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছে। বইটির চতুর্থ সংস্করণ শেষ হওয়ায় পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি পাঠকের চাহিদা পপরনে সক্ষম হবে ইনশাআল-াহ্।

এস. এম. রইস উদ্দিন
পরিচালক (ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.icsbook.info

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ইতিহাস এবং রাজনীতির ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইতিহাস বলতে তার মধ্যে রাজার ইতিহাস, প্রজার ইতিহাস, শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস, রাজনীতির ইতিহাস ইত্যাদি সবই আসে। সুতরাং রাজনীতির ইতিহাস ইতিহাসের একটা খন্ডিত চিত্র। বাংলা চতুর্দশ শতক অর্থাৎ ১৮৯৩ থেকে ১৯৯৩ পর্যন্ত একশ' বছরের যে সময়কাল তার এই খন্ডিত চিত্রই আমি এঁকেছি এ গ্রন্থে।

এই চিত্রে শুধু এসেছে উল্লেখিত একশ' বছরের প্রধান রাজনৈতিক গতিপ্রবাহ। দৃশ্যে এসেছেন এই প্রধান প্রবাহের নট-নটিরা। স্বীকার করি, শতাব্দীর প্রধান রাজনৈতিক প্রবাহের আড়ালে বা আশে-পাশে খুচরো অনেক প্রবাহ ছিল, কিন্তু সে সবের প্রতি আমি দৃষ্টিপাত করিনি এবং তা সংগত কারণেই। আমি চেয়েছি, সদ্য ফেলে আসা শতাব্দীর প্রধান রাজনৈতিক প্রবাহের ছবি আঁকতে, যা আসলে শতাব্দীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সবটাই জুড়ে আছে। এর বাইরে খুচরো যা কিছু ছিল, তার কোন ভূমিকা ছিল না শতাব্দীর রাজনৈতিক গতি নিয়ন্ত্রণে।

সন্দেহ নেই, সব শতাব্দীই শত-সহস্র ঘটনায় পূর্ণ। কিন্তু তার মধ্যে সদ্য ফেলে আসা শতাব্দীকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই শতাব্দীতে এই অঞ্চলের প্রধান দুই জাতি মুসলমান ও হিন্দুর বিস্ময়কর জাতিগত উত্থান ঘটে। আর এই উত্থানের রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যই ছিল মুখ্য এবং সে কারণেই এই দুই জাতির রাজনৈতিক সংঘাতই ছিল এই শতাব্দীর প্রধান বিষয়। শতাব্দীর এই রাজনৈতিক সংঘাতের রূপটা ছিল অনেকটাই নেকড়ে ও মেষ শাবকের কাহিনীর মত। এই কাহিনীতে দেখা যাবে নেকড়ের মেষ শাবকের উত্থান দৃশ্য, দেখা যাবে দুর্বল মেষ শাবক কি করে সিংহ শাবকে পরিণত হয়ে শুধু আত্মরক্ষা নয় স্বাধীন সার্বভৌম আবাসভূমিরও প্রতিষ্ঠা করলো। আরও দেখা যাবে, শতাব্দীর এই সংঘাত শতাব্দীর গন্ডী পেরিয়ে কোন পথে এগুচ্ছে। শতাব্দীর এই শত কাহিনী নিয়েই "একশ' বছরের রাজনীতি" গ্রন্থটি।

গ্রন্থটিতে আলোচ্য শতাব্দীর প্রথমার্ধ যত বিস্তৃত স্থান পেয়েছে, দ্বিতীয়ার্ধ ততটা পায়নি। এর কারণ, শতাব্দীর প্রথমার্ধটাই ছিল রাজনৈতিক সংঘাতের কাল। আর দ্বিতীয়ার্ধটা সেই রাজনীতির একটা নতুন যাত্রা পথ। দ্বিতীয়ার্ধের সবচেয়ে বড় ঘটনা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। কিন্তু এই ঘটনা মুসলিম রাজনৈতিক ধারার আভ্যন্তরীণ বিষয়, শতাব্দীর প্রধান রাজনৈতিক প্রবাহের কোন ঘটনা নয়।

এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা পেয়েছি বাংলা চৌদ্দ শতক জাতীয় উদযাপন পরিষদের কর্মসূচী থেকে। পরিষদের শতাব্দী উদযাপন কর্মসূচীর একটা অংশ হিসেবে শতাব্দীর রাজনীতির ওপর আমার এই আলেখ্য নির্মাণ।

ঢাকা, ৮ মে, ১৯৯৪ — আবুল আসাদ

www.icsbook.info

সূচী

পৃষ্ঠা

১। বিগত শতাব্দীর রাজনৈতিক পটভূমি ০৯
২। শতাব্দীর শুরু ঃ নির্যাতিতের উত্থান ৩৩
৩। সংখ্যাগুরুর সংহার মূর্তি ৫৬
৪। হিন্দু মুসলিম সহযোগিতার বিদ্যুৎচমক ৭৫
৫। সংহার মূর্তির আবার উত্থান ৯১
৬। নির্যাতিতের আত্মোপলব্ধি ১০৯
৭। ভূলুণ্ঠিত পতাকার উত্তোলন ১৬৭
৮। বিজয় এলো বাস্তবতার ১৮২
৯। বাংলার বিখণ্ডকরণ ২৬১
১০। পূর্ব পাকিস্তান হলো বাংলাদেশ ২৭৯
১১। স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতি ৩০৬
১২। পরিশিষ্ট ৩৩৬

www.icsbook.info

১
বিশ শতকের রাজনৈতিক পটভূমি

রাজনীতি বলি, ইতিহাস বলি, সবই মানুষকে নিয়ে। বাংলাদেশে মানুষের দু'টি প্রধান অংশ, মুসলমান ও হিন্দু। এদের রাজনৈতিক তৎপরতা তাই এখানকার রাজনীতির মৌল ধারা। এই ধারার জন্ম হাজার বছরেরও বেশী আগে যখন শাহ জালাল ও শাহ মখদুমের মত মুসলিম মিশনারীরা বাংলাদেশে এলেন মানুষকে মুক্তির দিশা দিতে। তারপর ১২০৩ খৃস্টাব্দ থেকে সাড়ে পাঁচশ বছর মুসলমানরা শাসন পরিচালনা করল বাংলাদেশে। এর আগে বাংলাদেশ হিন্দু সেন রাজাদের হাতে ছিল ১০৬ বছর। তারও আগে বৌদ্ধ পাল রাজারা বাংলাদেশ শাসন করেছে ৩৪৭ বছর। আর ১৭৫৭ সালে মুসলমানদের হাত থেকে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিল ইংরেজরা। ইংরেজ শাসনে হিন্দুরা হলো অনুগত প্রজা আর মুসলমানরা হলো বিদ্রোহী। এইভাবে শুরু হলো শাসিতের কাতারে দাঁড়ানো মুসলমান ও হিন্দুদের নতুন এক রাজনীতি। বাংলা চৌদ্দ শতক আর ইংরাজী বিশ শতকের রাজনৈতিক ঘটনাবলী এই রাজনীতিরই উত্তরাধিকার।*

এই রাজনীতির স্বরূপটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ১৭৫৭ সালে ইংরেজের হাতে মুসলমানরা শুধু তাদের রাজ্য হারালনা, হারাল তাদের সর্বস্ব। একদিন যাদের দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিল, সেই মুসলমানরা কাঠুরিয়া ও ভিস্তিওয়ালায় পরিণত হলো।[১] মুসলমানরা প্রত্যাখ্যান করল ইংরেজ শাসন এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ও হারানো সব অধিকার আদায়ের জন্যে তারা হাতে তুলে নিল অস্ত্র। শুরু করল তারা সশস্ত্র সংগ্রাম। মুসলমানদের এই প্রতিরোধ সংগ্রামকে ইংরেজরা ধ্বংস করল তাদের পশু শক্তি আর হৃদয় বিদারক অমানুষিকতার মাধ্যমে। অন্যদিকে হিন্দু অধিবাসীরা দু'হাত পেতে গ্রহণ করল ইংরেজের দেয়া সব অনুগ্রহ এবং সকল সুযোগ সুবিধা। তারা ইংরেজের ছত্রছায়ায় বসে জাতি গঠন ও জাতির সার্বিক বিকাশে মনোযোগ দিল। মুসলিম রাজত্বকালে মুসলমানরা হিন্দুদের জাতীয় অস্তিত্বের গায়ে হাত দেয়নি।[২] কিন্তু হিন্দুদের জাতীয় সত্তা ও শক্তির এই নতুন বিকাশ মুসলমানদের বৈরী হয়ে

---

* বাংলা চৌদ্দ শতক ইংরাজী ১৮৯৩-১৯৯৩।

১। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার।

২। (ক) "মুসলমানাধিকৃত ভারত এবং ইংরাজাধিকৃত ভারতের মধ্যে কত প্রভেদ। মুসলমানাধিকারে ভারতবর্ষ ভারতবাসীরই আয়ত্তাধীন ছিল, তখন বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে স্বীয় মনুষ্যত্বের অনুশীলন করিবার সম্পূর্ণ অধিকার প্রত্যক প্রজারই বিদ্যমান ছিল।....... অতীতকে হৃদয়ে ও দেহের রক্তে পাইয়াছি বলিয়াই আমরা নিশ্চয়ই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের

www.icsbook.info

উঠল এবং বাংলা তেরো শতক ও ইংরেজী উনিশ শতকের শেষ দিকে তা মুসলিম জাতিসত্তা বিনাশী রূপ পরিগ্রহ করল। উনিশ শতকের এই রাজনৈতিক পটভূমি সামনে না আনলে বিশ শতকের রাজনীতি বুঝা যাবে না।

পলাশীতে মুসলমানদের যেদিন পতন, তাদের প্রতিরোধ ও মুক্তি সংগ্রামের শুরু বলা যায় সেদিন থেকেই। ১৭৬৪ সালে বাংলার বিদ্রোহী নবাব মীর কাশেম স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন বক্সারের যুদ্ধে। কিন্তু তার আগেই জনতার কাতার থেকে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। ১৭৬৩ সালে ফকির বিদ্রোহীরা বাকেরগঞ্জে ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি আক্রমণ করলো। সেই যুগে পীর, ফকির, আলেমরা ছিল সমাজ-নেতা। ফকির বিদ্রোহ নামের এই বিদ্রোহটি তাদের দ্বারাই সংগঠিত হয়। নবাবের পরাজিত বাহিনীর অংশ বিশেষ ফকিরদের এই সংগ্রামে শামিল থাকতে পারে। ফকির সন্ন্যাসীরাও বিদ্রোহী নবাব মীর কাশিমের বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ফকির বিদ্রোহের নেতা ছিলেন মজনু শাহ। ১৮৮৭ সালে তার মৃত্যুর পর মুসা শাহ, চেরাগ আলী, সোবহান শাহ, মাদার বকশ, করিম শাহ, প্রমুখ ফকির নেতা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। এদের সংগ্রাম ছিল ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে। কোম্পানীর অনুগত ও অত্যাচারী জমিদার, মহাজন, এমনকি একশ্রেণীর সুদখোর সন্ন্যাসী নেতার বিরুদ্ধেও এরা সংগ্রাম করেছেন। ইংরেজ কোম্পানীর সৈন্যের সাথে ফকির বিদ্রোহীদের বহু সংঘর্ষ হয়েছে। গোটা উত্তর-বংগ সহ বাংলাদেশের বিশাল অঞ্চল জুড়ে ইংরেজ শাসনকে তারা ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের দিকে নানা কারণে ফকির বিদ্রোহ ঝিমিয়ে পড়ল, কিন্তু ১৮২৫ সালের দিকে পাগলাপন্থী নামে করিম শাহের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ সংঘটিত হতে দেখি, সেটাও আসলে ফকির বিদ্রোহেরই একটা অংশ।

ফকির বিদ্রোহ যখন ঝিমিয়ে পড়ছে, তখন আমাদের বাংলাদেশকে একটা মহা বিদ্রোহ, একটা মহা উত্থানের সাথে জড়িয়ে পড়তে দেখছি। এই মহা উত্থানের নায়ক ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ। তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে, অত্যাচারী শিখরাজার বিরুদ্ধে মুসলমানদের এক মহা বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। ইংরেজ অধিকৃত ভারত থেকে হিজরত করে আফগান সীমান্তে ঘাঁটি গেড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মুক্তির সংগ্রাম শুরু করলেন তিনি ১৮২৬ খৃস্টাব্দে ইংরেজ মিত্র শিখদের সাথে এক

অধিকারী হইব, নচেৎ ব্যবিলনবাসী, বা রেড ইন্ডিয়ান, প্রাচীন মিসরবাসীর মত আমাদেরও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলীন হইতে হইত।" (ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা শ্রী অরবিন্দ ও বাঙলায় বিপ্লববাদ'-উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ৬/১-এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা-১২৮)।

(খ) "মুসলিম শাসনে এদেশের হিন্দু অধিবাসীরা মুসলমানদের মতই সকল প্রকার রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। রাষ্ট্রের উচ্চতম পদ, সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব, প্রাদেশিক শাসন ক্ষমতা, সম্মানিত মন্ত্রীর আসন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে ধর্ম কিংবা জন্মস্থান কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়াতেনা। হিন্দুরা ভূমি মঞ্জুরী লাভ করত, খাজনা মওকুফ পেত এবং উচ্চ বেতন ছাড়াও অফিস সংলগ্ন ভূমি ব্যবস্থারের দেদার সুযোগ তাদের ছিল।" (Memorial to the Supreme Court in Calcutta, 1823, by Dwarkanath Thakur and Raja Rammohan Roy.

www.icsbook.info

যুদ্ধের মাধ্যমে। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরুর প্রস্তুতি তিনি শুরু করেছিলেন এর প্রায় এক দশক আগে। বাংলাদেশসহ গোটা ভারত সফর করে মুসলিম জনপদকে তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন এক মহাবিদ্রোহের জন্যে।

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার এই মহাবিদ্রোহকে 'ইতিহাসের এক বৃহত্তম ধর্মীয় পুনরুত্থান' বলে অভিহিত করেছেন। হান্টার ছিলেন একজন বৃটিশ রাজকর্মচারী এবং সব ইংরেজের মতই তিনি এই 'পুনরুত্থান' বা বিদ্রোহের ছিলেন ঘোর বিরোধী। কদর্থ করতে গিয়ে এই বিদ্রোহের তারা নাম দিয়েছিলেন ওহাবী আন্দোলন। হান্টারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এই আন্দোলন সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্যে। এই রিপোর্ট করতে গিয়ে আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন তিনি। স্বীকার করেছেন তিনি এই আন্দোলনের বিস্ময়কর শক্তি ও বিস্তৃতির কথা। তিনি লিখেছেন, "সারা ভারতে তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ইতিহাসের এক বৃহত্তম ধর্মীয় পুনরুত্থান সাধিত করল তারা। তাঁদের অসংখ্য ছোট ছোট মিশনারী দল ছিল। দক্ষ সংগঠনের মাধ্যমে তারা মুরিদগণের তাকিদে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই আস্তানা স্থাপন করতে পারত। .... প্রত্যক জেলাতেই একজন করে প্রচারক নিযুক্ত হয়। ভ্রাম্যমান মিশনারীরা মাঝে মাঝে এই সকল জেলা সফর করে সেখানকার স্থায়ী প্রচারকদের উদ্যমকে জাগ্রত রাখতে থাকে।.... এই সব প্রচারকদের অশুভ প্রভাব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।..... এরা এমন উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল যে, স্ত্রীলোকেরা তাদের গহনাপত্র স্বেচ্ছায় ধর্মান্ধদের তহবিলে দান করছিল ..... দলের পর দল সংগ্রহ করে ধর্মান্ধ শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছিল। দেশের সর্বত্র মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তারা গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।..... অজস্র রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য, পাটনায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রচার কেন্দ্র এবং সারা বাংলার আনাচে কানাচে প্রচারকদের আনাগোনা ছাড়াও জনগণের মধ্যে রাজদ্রোহমূলক কাজে উৎসাহ সৃষ্টির জন্যে ওহাবীরা একটি চতুর্থ সংগঠন গড়ে তুলেছে। .....এই ভাবে পল্লী বাংলার বিভিন্ন স্থানে এক ধরনের বিদ্রোহী কলোনী গড়ে উঠেছে। ..... অর্থ সংগ্রহ ব্যবস্থাটা সহজ ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। গ্রাম গুলোকে বিভিন্ন অর্থিক এলাকায় বিভক্ত করে প্রত্যেক এলাকার জন্যে একজন করে প্রধান ট্যাক্স আদায়কারী নিয়োগ করা হয়। যে গ্রামের জনসংখ্যা খুব বেশী সেখানে একাধিক আদায়কারী নিয়োগ করা হয় এবং তার মধ্যে একজন মৌলবী থাকতেন যিনি সমাজে এমামতি করতেন ...... একজন জেনারেল ম্যানেজার রাখা হয় যিনি মুসলমানদের দুনিয়াবী কাজের তদারক করতেন। এ ছাড়াও একজন অফিসার থাকতেন তার কাজ ছিল বিপদজনক চিঠিপত্র বিলি বন্টন ও রাজদ্রোহ মূলক খবরাখবর আদান-প্রদান করা।..........[৩]"

৩। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, খোশরোজ কিতাব মহল, নতুন সংস্করণ, পৃষ্ঠা ঃ ৩৮, ৬৫, ৬৬, ৬৮।

www.icsbook.info

মহাবিদ্রোহের এই বিস্ময়কর সংগঠন ১৮২৬ সাল থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত ইংরেজের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা করে। পশু শক্তি ইংরেজের হাতে এ সংগ্রাম বার বার মার খেয়েছে, কিন্তু সংগ্রাম তবু শেষ হয়নি। হান্টার সাহেব লিখছেন, "আমাদের সীমান্ত অঞ্চলে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সর্বশেষ অভিযান পর্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করলাম। ওহাবীদের যুদ্ধাত্মক তৎপরতা ভারতের সর্বত্র যে বিস্তার লাভ করেছিল তার ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে এই গ্রন্থের কলেবর বিরাট আকার ধারণ করবে। ধর্মান্ধদের দ্বারা সীমান্তে বিরামহীন অশান্তি বিরাজমান রাখা ছাড়াও তিনবার বৃহদাকার ঐক্যজোট সংগঠিত হয়েছে এবং প্রত্যেকবারই বৃটিশ ভারতকে একেকটি যুদ্ধের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করতে হয়েছে।..... কিন্তু এদের নির্মূল করার জন্যে আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ধর্মান্ধদের ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত যে ভেঙ্গে পড়েছে তার নিদর্শন তাদের নিজেদের অবস্থা থেকেই বুঝা যাচ্ছে। তাদের প্রধান নেতারা ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার হয়েছে এবং অবশিষ্টরাও বুঝতে পেরেছে যে সক্রিয় হলে তাদেরও একই পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু সীমান্তের সশস্ত্র শিবিরগুলো এখনও টিকে আছে এবং সময়মত সেগুলো হয়তো বিরাট ধর্মীয় মহা সম্মিলনের রূপ গ্রহণ করবে। আজ সকালেই (১৪ জুন, ১৮৭১) আমি এই পরিচ্ছেদ রচনার কাজ শেষ করার সময় জানতে পারলাম যে, ব্লাক মাউন্টেনের উপর বিদ্রোহী শিবির থেকে আরেকটি আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে।"[৪] বস্তুত এই মহাবিদ্রোহ এই উপমহাদেশের আজাদী পাগল মুসলমানদের মুক্তি সংগ্রামের এক মহাকাহিনী। এই কাহিনীতে জড়িয়ে আছে শত ফাঁসির মঞ্চ, হাজারো নির্বাসন আর লাখো মানুষের অশ্রুর ইতিহাস।

এই মহা বিদ্রোহে বাংলার ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৮৩১ সালে এই বিদ্রোহের নায়ক সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী বালাকোটের রণাঙ্গনে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে তাঁর শীর্ষ সাথীগণসহ শাহাদাত বরণ করেন। এই বিপর্যয়কর রণাঙ্গনে যারা শহীদ হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে নয়জন বাংলাদেশীর নাম পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে ছিলেন আরও চল্লিশজন।[৫]

অবশ্য এই সংখ্যা দিয়ে এই মহাবিদ্রোহে বাংলার মুসলমানদের ভূমিকার মূল্যায়ন করা যাবে না। উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়, "বাঙ্গালীদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার ফলেই ধর্মান্ধদের আন্দোলন এরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।"[৬] কিন্তু এটাও ঠিক নয় যে, এই মহাবিদ্রোহে বাংলার মুসলমানরা শুধু মাথাই খরচ করেছে, আর কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে গোটা বাংলা ছিল এই মহাবিদ্রোহের বারুদাগার। জীবন ও অর্থ দুই-ই

৪। 'দি ইন্ডিয়া মুসলমানস', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, খোশরোজ কিতাব মহল, নতুন সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯০, ৯১।
৫। 'জিহাদ আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা', মওলানা মুহিউদ্দিন খান, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃষ্ঠা ঃ ১০৩।

www.icsbook.info

অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছে বাংলার মানুষ এই মহাবিদ্রোহকে সফল করে তোলার জন্যে। উইলিয়াম হান্টার তার গ্রন্থের শুরুতেই লিখেছেন, "বাংলার মুসলমানরা আবার এক বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। তারা একেক দল ধর্মান্ধকে পাঠিয়েছে, যারা শিবির আক্রমণ করেছে, গ্রাম পুড়িয়েছে, আমাদের প্রজাদের হত্যা করেছে এবং আমাদের সেনা বাহিনীকে তিন-তিনটি ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত করেছে। আমাদের সীমান্তের ওপারে মাসের পর মাস ধরে গড়ে উঠা শত্রু বসতির লোক নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের অভ্যন্তর থেকে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক মোকদ্দমার বিচার থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের প্রদেশসমূহের সর্বত্র বিস্তারিত হয়েছে এক ষড়যন্ত্রের জাল। পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত জনহীন পর্বতরাজির সঙ্গে উষ্ণ মন্ডলীয় গঙ্গা অববাহিকার জলাভূমি অঞ্চলের (বাংলার) যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে রাজদ্রোহীদের নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশের মাধ্যমে। সুসংগঠিত প্রচেষ্টায় তারা ব-দ্বীপ অঞ্চল (বাংলা) থেকে অর্থ ও লোক সংগ্রহ করে এবং দুই হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিদ্রোহী শিবিরে তা চালান করে দেয়।...... বাংলার এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানকার মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ সাহেবের সংস্কারের বাণী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেনি। প্রতিটি ধার্মিক পরিবারের যুবকরা সীমান্তে গিয়ে জিহাদ করার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত। বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দার চোখ ফাঁকি দিয়ে একদিন তারা হঠাৎ করে সীমান্তের মুজাহিদ কাফেলায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ত। জমির খাজনা পরিশোধ করতে অসমর্থ কৃষকরাও জিহাদের জন্য নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে কুণ্ঠিত হতো না।"[৭]

ইংরেজী উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত বাংলার মুসলমানরা ইংরেজের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ তৎপরাতায় ব্যাপৃত ছিল। বৃটিশ ভারতের পশ্চিম সীমান্ত ভিত্তিক এই বিদ্রোহ প্রচেষ্টা ছাড়াও স্থানীয়ভাবে তারা তিনটি বড় বড় বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় শামিল হয়। একটি হাজী নিসার আলী ওরফে তিতুমীর পরিচালিত মুক্তি সংগ্রাম, দ্বিতীয়টি হাজী শরিয়তুল্লার মুক্তি আন্দোলন এবং তৃতীয়টি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

তিতুমীরের মুক্তি সংগ্রামের সময়কাল উনিশ শতকের তৃতীয় দশক। ১৮৩১ সালে নারকেল বাড়িয়ার রণাঙ্গনে তিতুমীরের পরাজয় ও শাহাদাত লাভ হলো। আর হাজি শরীয়তুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলনের সময়কাল ১৮১৯ খৃস্টাব্দে থেকে ১৮৬২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এই দুইটি আন্দোলন প্রকৃতিগত দিক থেকে ইংরেজ কথিত ওহাবী আন্দোলন অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের পশ্চিম সীমান্ত ভিত্তিক মহাবিদ্রোহেরই অংশ। ওহাবী আন্দোলন বা সৈয়দ আহমদ শহীদ সৃষ্ট মহাবিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের

৬। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯।
৭। ' দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, পৃষ্ঠা ঃ ১।

www.icsbook.info

আল-কুরআন ও হাদিসের শিক্ষায় পূর্ণভাবে ফিরিয়ে আনা এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের ন্যায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য ছিল তিতুমীর ও ফারায়েজী আন্দোলনেরও। ইংরেজ আমলা মিঃ আই, আর কোলভিন নারকেল বাড়িয়ার ঘটনা ও যুদ্ধ সম্পর্কিত রিপোর্টে তিতুমীরের আন্দোলন সম্পর্কে লিখছেন, "ঐ লোকদের আদর্শ ছিল প্রায় সার্বিকভাবেই সারা ভারতব্যাপী প্রচারিত সৈয়দ আহমদের আদর্শেরই অনুরূপ। এরা পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার পরিত্যাগ করে মৌল ও নিখাদ মোহাম্মদী ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চায়।"[৮]

ফারায়েজীদের সম্পর্কেও একই ধরনের মন্তব্য করেছেন ডঃ মুইন-উদ-দিন আহমদ খান। তিনি লিখছেন, "সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ফারায়েজী, তরিকায়ে মহাম্মাদীয়া এবং ওহাবীদের তাওহীদ সম্পর্কিত তত্ত্বের উৎস একই।"[৯]

উইলিয়াম হান্টারও ফারায়েজীদের সম্পর্কে অনুরূপ কথাই লিখেছেন। তার ভাষায়, "গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার ধর্মান্ধ মুসলমানরা নিজেদেরকে ওয়াহাবী না বলে ফারায়েজী অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের অনাবশ্যকীয় আচারানুষ্ঠানাদি বর্জনকারী হিসেবে পরিচিত করে। .... কলকাতার পুর্ব দিকের জেলা সমূহে এদের সংখ্যা বিপুল ভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৮৪৩ সালে এই সম্প্রদায়টি এতদূর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে যে, তাদের সম্পর্কে তদন্তের জন্যে সরকারকে বিশেষ তথ্যানুসন্ধান কমিশন নিয়োগ করতে হয়। বাংলার পুলিশ প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, মাত্র একজন প্রচারক প্রায় আশি হাজার অনুগামীর এক বিরাট দল গড়ে তুলেছে এবং তারা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বার্থকে গোটা সম্প্রদায়ের স্বার্থ বলে বিবেচনা করে থাকে।...... পরবর্তী খলিফারা, বিশেষতঃ ইয়াহিয়া আলী, পূর্ববঙ্গের ফরায়েজীদের ওহাবীদের সাথে একত্রীভূত করে। গত তের বছর ধরে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহতদের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মামলায় আটক বন্দীদের মধ্যেও উভয় সংস্থার লোকদেরকে পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা গেছে।"[১০]

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ তৎপরতায় মুসলমানদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। কিন্তু এ সংগ্রাম বাংলাদেশে গণরূপ পাবার আগেই শেষ হয়ে যায়। তবু ঢাকার লালবাগ দুর্গে কমপক্ষে ৪০ জন বাঙালী বিদ্রোহী সৈনিক জীবন দেয়, ফাঁসিতে জীবন দেয় আরও বহু। এঁদেরই পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত আজকের বাহাদুর শাহ পার্ক।[১১]

এই ভাবে ১৭৫৭ খ্রস্টাব্দে পলাশীতে পরাজয়ের পর রাজ্যহারা মুসলমানদের যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হলো, তা চললো, উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়, ১৮৬৮ খৃস্টাব্দ

৮। 'Titumir And His Followers in British Indian Record; by Dr Muin-ud-din Ahmad Khan, Page 41

৯। 'History of the Fara'idi Movement', by Dr. Muin-ud-din Ahmad Khan, Page 52, 53.

১০। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান', ডব্লিউ উব্লিউ হান্টার, পৃষ্ঠা ৮৪, ৮৫।

১১। "বর্তমানে শহীদ বাহাদুর শাহ পার্ক" নামে পরিচিত ঢাকার ভিক্টোরিয়া পার্কে একযোগে ষাটজন মুসলমানকে

www.icsbook.info

পর্যন্ত। একথা হয়তো ঠিক ১৮৬৮ খৃস্টাব্দের পর সশস্ত্র সংঘাতে ভাটা পড়ে, কিন্তু মুসলমানদের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব শেষ হয়ে যায়নি। এর প্রকাশ নানাভাবে ইংরেজের সাথে অসহযোগিতা ও ইংরেজের সব কিছু বর্জন করার মধ্যে দিয়ে ঘটেছে।

ইংরেজ বিরোধী এই অব্যাহত বিদ্রোহাত্মক তৎপরতার কারণে মুসলমানদেরকে বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। অনেকে ফাঁসিতে জীবন দিয়েছে, আন্দামানের নির্বাসনে গিয়ে হারিয়ে গেছে শত শত মানুষ, ইংরেজের জেলে ধুকে ধুকে মরেছে হাজার হাজার মুক্তি সংগ্রামী, আর ইংরেজের বিদ্বেষ ও বৈষম্য নীতির শিকার হয়ে গোটা মুসলিম জাতির জীবন কাঠামো সব দিক থেকে ধ্বংস হয়ে যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশের মুসলমানদের করুণ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে স্বয়ং উইলিয়াম হান্টার একথা স্বীকার করেছেন। তিনি লিখছেন, "মহামান্য রানীর মুসলমান প্রজাদের প্রতি আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছি। ভারতীয় জনসমষ্টির একটা বিরাট অংশ, যাদের সংখ্যা তিনি কোটির মত হবে, বৃটিশ শাসনে নিজেদের ধ্বংস দেখতে পাচ্ছে। মাত্র গতকালই যে দেশে তারা ছিল বিজেতা ও শাসক, আজ সে দেশেই ভরণ পোষণের যাবতীয় সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। ..... তাদের প্রতি আমাদের উপেক্ষা এবং আমাদের রাজনৈতিক অজ্ঞতাই এর কারণ। এ দেশে শাসন কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হবার আগে মুসলমানরা এখনকার মত একই ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করেছে, একই খাদ্য খেয়েছে এবং মূলতঃ একই ভাবে জীবন যাপন করেছে। আজ অবধি কিছুদিন পরপরই তারা পুরানো জাতীয় চেতনার অভিব্যক্তি ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। কিন্তু বৃটিশ শাসনে আর সব ব্যাপারেই তারা জাতি হিসেবে ধ্বংস হয়ে গেছে।'[১২]

উইলিয়াম হান্টারের এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে মুসলমানদের জাতীয় চেতনার শক্তি ছাড়া এই সময় মুসলিম জাতি রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, চাকুরী-সব দিক থেকেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

এই যখন মুসলমানদের অবস্থা, তখন মুসলমানদের প্রতিবেশী হিন্দু জনগণ ইংরেজ শাসকদের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধি ও জাতি গঠনের দিকে প্রচন্ডভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী কোন সংগ্রামকেই তারা সহযোগিতা দান করা দুরে থাক, সুনজরেই দেখেনি। বৃটিশ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ভিত্তিক মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা সুযোগ পেলেই বিদ্রুপ করেছে। কংগ্রেসে যোগ দানে অনিচ্ছুক মুসলমানদের বিদ্রুপ করতে গিয়ে বঙ্কিম চন্দ্র 'প্রচারে' লিখেছিলেন, "এক্ষণে শুনিতেছি, চাচাদিগের কোন দোষ নাই। তাহারা পূর্ণ স্বাধীন নহেন। বালক কলের পুতুল লইয়া খেলা করে দেখিয়াছি। সেগুলির কল টিপিলেই

ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় এবং তাদের লাশ মাসের পর মাস বৃক্ষ শাখায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। (History of Indian Mutiny by Kaye & Malleson-Quated by Abul Hashim in 'Integration of Pakistan'

www.icsbook.info

দাড়ি নাড়ে শুনিয়াছি। পাহাড়ে বসিয়া বড় বড় লোকে নাকি কল টিপিতেছে, তাই ইহারা দাড়ি নাড়িতেছেন।"[১৩] এখানে বঙ্কিম চন্দ্র পাহাড়ে বসা লোক বলতে সীমান্তের মুসলিম যুদ্ধ শিবিরের লোকদের বুঝিয়েছেন। বস্তুত হিন্দুরা ইংরেজ প্রেমে এতটাই অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, বালাকোট ও নারকেল বাড়িয়ায় ভারতের মুসলমানরা যখন ইংরেজের হাতে জীবন দিচ্ছে, তখন তারা বলছে, "আমাদের যদি বলা হয় বৃটিশ কিংবা কার শাসন তোমরা চাও। উত্তরে আমরা একবাক্যেই বলিব-বৃটিশ শাসন। এমনকি হিন্দু শাসনও নয়।"[১৪]

এমনকি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রামকেও বাংলার হিন্দুরা বিশেষ করে হিন্দুদের সচেতন শ্রেণী সমর্থন করেনি। তাই তো দেখি, ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরেজের কামানের গোলায় মানুষ যখন জীবন দিচ্ছিল, তখন হিন্দু পত্রিকা 'সংবাদ ভাস্কর' লিখছে, "আমরা পরমেশ্বরের সমীপে সর্বদা প্রার্থনা করি, পুরুষানুক্রমে যেন ইংরেজাধিকারে থাকিতে পারি, ভারত ভূমি কত পূণ্য করিয়াছিলেন এই কারণ ইংরেজ স্বামী পাইয়াছেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত যেন ইংরেজ ভূপালদিগের মুখের পান হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করে।"[১৫]

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তারা কি দৃষ্টিতে দেখেছে, বন্দী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি কি নিষ্ঠুর মনোভাব প্রকাশ করেছে, তার কিঞ্চিত দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরা যায়। ঐ 'সংবাদ ভাস্করই' লিখছে, "আগ্রা, দিল্লী, কানপুর, অযোধ্যা, লাহোর প্রদেশীয় ভাস্কর পাঠক মহাশয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগ করিবেন এবং পাঠ করিয়া বিদ্রোহীদের আড্ডায় ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিবেন, সিপাহীরা জানুক বৃটিশ গভর্নমেন্ট সিপাহী ধরা আরম্ভ করিয়াছেন, আর বিদ্রোহী সিপাহী সকল শোন শোন, তোদের সর্বনাশ উপস্থিত হইল, যদি কল্যাণ চাহিস তবে এখনও বৃটিশ পদানত হইয়া প্রার্থনা কর, ক্ষমা করুন। ...... গত বুধবার বেলা দুই প্রহর দুই ঘন্টাকালে সৈন্য পরিপূর্ণ এক জাহাজ উত্তর দিক হইতে আসিয়া কলিকাতা দুর্গের দক্ষিণাংশে লাগিল। সে সময় উক্ত জাহাজ অতি সুদৃশ্য দৃষ্ট হইল, গোরা সৈন্যরা পাঁচশ সিপাহীকে হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি দিয়া লইয়া আসিয়াছে, গভর্নমেন্ট সিপাহীদের যে ক্রোধ করিয়া রহিয়াছেন, তাহাতে বলিদান দিবেন ইহাই জ্ঞানগ্রাহ্য হইতেছে। কালিঘাটে বহুকাল নরবলি হয় নাই। আমাদিগের রাজেশ্বর যদি হিন্দু হইতেন, তবে এই সকল নরবলি দ্বারা জগদম্বার তৃপ্তি করিতেন।"[১৬]

সাধারণভাবে হিন্দুদের এ মনোভাব বৃটিশ সরকারও জানতেন। তাই সিপাহী বিদ্রোহের সব দায় এসে মুসলমানদের ঘাড়েই বর্তেছিল। ১৮৫৭ সালের সিপাহী

১২। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান স', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, পৃষ্ঠা ১৩১।
১৩। 'দৈনিক বসুমতি', ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪১।
১৪। 'Daily Reference of the Hon'ble, Prosonno Kumar Tagor, July-1831.
১৫। 'সংবাদ ভাস্কর', ২০ শে জুন, ১৮৫৭।

www.icsbook.info

বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হবার পর যে প্রচন্ড হত্যালীলা শু
রু হয় তার প্রাথমিক শিকার হন ওহাবী আন্দোলন চিহ্নিত আলেম সমাজ। তাই বিপ্লব পরবর্তীকালে শহীদ হলেন শত শত আলেম। সাত'শ আলেম ফাঁসিতেই জীবন দিলেন। আন্দামানে নির্বাসনে গেলেন মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী, মওলানা ইয়াহিয়া আলী, মওলানা আবু জাফর থানেশ্বরী, মওলানা মুফতি এনায়েত আলীর মত শত শত বরেণ্য আলেম। এক কথায় মুসলিম জাতীয় শক্তিকে একদম নির্মূল করার প্রয়াস চলে। সেদিনের দিল্লীর বিবরণ দিতে গিয়ে কবি গালিব লিখেছেন, "মুসলমানদের অবস্থা দেখে কাঁদবে এমন একজন মুসলমানও দিল্লীতে অবশিষ্ট ছিল না।" আর আন্দামানে বন্দী দশায় মৃত মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী তাঁর আত্মকথায় লিখেন যে, "স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছে একথা প্রমাণ হলেই শুধু কোন হিন্দুকে ধরা হতো, কিন্তু পালাতে পারেনি এমন কোন মুসলমান সেদিন বাঁচেনি।[১৭] মওলানা ফজলে হক 'আসসাওরা তুল হিন্দিয়া' বা 'বাগী হিন্দুস্তান' শীর্ষক তাঁর আত্ম কাহিনীতে তাঁর দেখা অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে হিন্দুদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বীর নায়ক ছিলেন আহমুদুল্লাহ শাহ। আহমদুল্লাহ শা'র বাহিনী যখন সামনে দাঁড়ানো ইংরেজ বাহিনীকে মোকাবিলায় রত, তখন সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দানকারী দেশীয় হিন্দু রাজা বলদেও সিং বিশ্বাসঘাতকতা করে পেছন থেকে আহমদুল্লাহ শাহকে আক্রমণ করায় তিনি পরাজিত ও শহীদ হন।[১৮] ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে দিল্লী রক্ষার যে দীর্ঘ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী বর্ণিত তার একটা দৃশ্য এই রকম : "অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মোজাহেদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করিয়াই নাসারা ইংরেজ বাহিনী পর্যুদস্ত হইবার উপক্রম হইল। তাহারা তখন পূর্ব দেশীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। হিন্দুরা অতি দ্রুততার সহিত তাহাদিগকে উপর্যুপরি সৈন্য ও অস্ত্র সাহায্য পাঠাইতে লাগিলেন। এই নতুন সাহায্যে বলীয়ান হইয়া নাসারা বাহিনী পুনরায় তীব্র আক্রমণ আরম্ভ করিল। অল্প দিনের মধ্যে পর্বতোপরিস্থিত খৃস্টান শিবিরে প্রচুর অস্ত্র, রসদ এবং সৈন্য আসিয়া সমবেত হইল। তাহাদের মধ্যে লালমুখো ইংরেজ হইতে শুরু করিয়া নিকৃষ্ট ও নীচ শ্রেণীর হিন্দু ভাড়াটিয়া সৈন্য পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর মানুষই দৃষ্টিগোচর হইত।"[১৯]

বস্তুত দেশের হিন্দু অধিবাসীরা সাধারণভাবে সব সময় ইংরেজদের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করেছে, অন্তত বিশ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সহযোগিতাকালীন সময়ে হিন্দুরা ইংরেজের শিক্ষা, ইংরেজের চাকুরী, ইংরেজের

১৭। 'আযাদী সংগ্রাম' ১৮৫৭, অনুবাদ : মওলানা মুহিউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা ১৭।
১৮। 'আযাদী সংগ্রাম' ১৮৫৭, মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদী, অনুবাদ: মওলানা মুহিউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা ২৯।
১৯। আযাদী সংগ্রাম ১৮৫৭, মওলানা ফজলে হক খয়রাবাদ, অনুবাদ: মওলানা মহিউদিদ্ন খান, পৃষ্ঠা ৯।

www.icsbook.info

অধীন ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা গ্রহণ করে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রায় সব জমিদারি তারা পেয়ে যাওয়ায় শিক্ষা, অর্থ, রাজনীতি সব ক্ষেত্রে হিন্দুরা জাতি হিসেবে শক্তিশালী ও সচেতন হয়ে ওঠে। এই সচেতনতার একটা বড় কারণ ছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি। "প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী শহর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এ ভাবে উদ্রিক্ত হয়। প্রবলভাবেই হয় কলিকাতায়, সেখানে 'ইয়ং বেঙ্গলী গোষ্ঠি' হিন্দু ধর্মের সব কিছুই দোষণীয় ভাবতে থাকে এবং প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করা বীরত্ব ও গর্বের বিষয় বিবেচনা করতে থাকে ---- তারা প্রকাশ্যে গৃহে, বাহিরে সর্বত্র দল বেঁধে গরুর গোশত ভক্ষণ ও মদ্যপান করতো। ------ ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ও নানা ভাবে ইংরেজের সাথে মেলা-মেশা, পাশ্চাত্য ভাবধারা বিশেষত মিল, বেন্থামের শিক্ষার প্রভাবে ------ এ অবস্থার উদ্ভব ঘটে।"[২০] উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে হিন্দু ধর্মের সংস্কার এবং হিন্দু জাতীয়তার উত্থান ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। হিন্দু ধর্মে ভাঙ্গনের এ জোয়ার রোধ করতে এগিয়ে আসেন শীর্ষ হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা। রাজা রামমোহন রায় এঁদের পথ প্রদর্শক। তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করলেন। রাজা রামমোহন রায় 'হিন্দুধর্মের গন্ডির মধ্যেই আত্মরক্ষা করে ভাঙনের গতিরোধ করলেন ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তন করে। নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা করাই এ মতের সারমর্ম।'[২১] ব্রাহ্মমতের এ বৈশিষ্টের কারণে অনেকে মনে করেন 'ব্রাহ্মসভা' বা ' ব্রাহ্মমত' হিন্দু ধর্ম থেকে পৃথক। একথা মোটেই ঠিক নয়। ব্রাহ্মমত পোষণের জন্যে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করতে হয় না। শুধু অমানবিক ও অসামাজিক প্রথা ও আচারগুলো (যেমন সতীদাহ) পরিত্যাগ করে সাধারণ মন্দিরে পরম ব্রহ্মের উপাসনা করতে হয় আদি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে। 'রাজা রামমোহন নিজে একজন ধার্মিক হিন্দু ছিলেন এবং সেই সঙ্গে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও।'[২২] ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার রামমোহন সম্পর্কে এই সাক্ষ্যই দিয়েছেন। লিখছেন তিনি, "একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত, রামমোহন কখনও নিজেকে হিন্দু ব্যতীত অন্য ভাবেননি এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে যারা তাঁকে নতুন ধর্মের প্রবর্তক বলেছে। তার আয়োজিত সাপ্তাহিক ব্রাহ্মসভার অধিবেশনে গোঁড়া ব্রাহ্মণ দ্বারা বেদপাঠ করানো হতো এবং কোন অব্রাহ্মণের সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার ছিলনা। রাজা রামমোহন মৃত্যুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মনের উপবীত ধারণ করেছেন।"[২৩] বলা যায়, রামমোহনের এই সংস্কার আন্দোলন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখকে নিষ্ঠাবান হিন্দু হতে সাহায্য করেছিল। রামমোহন রায়ের পর হিন্দুধর্মের আরেক অকুতোভয় সংস্কারক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২০। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ১১৩।
২১। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ১১৪।
২২। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি', মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৭
২৩। `An Advanced history of India` by Dr. R.C. Mazumdar, Page. 877.

www.icsbook.info

রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হিন্দু ধর্মের সংস্কার হিন্দুদের জাতীয় চেতনায় যে আঘাত হানে, তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং পরে বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা হংসরাজ, লালা লাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, বিপিন চন্দ্রপাল, প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম 'বিরোধী আগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করে। এ আন্দোলনের স্বরূপ আলোচনার আগে এ আগ্রাসী উত্থানের উৎস নিয়ে আরেকটু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ইংরেজী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঝড়ের বেগ নিয়ে হিন্দু জাতীয়তার যে রাজনৈতিক উত্থান আমরা লক্ষ্য করি, তার ভিত্তিভূমি রচনা করে তাদের উনিশ শতকের সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক উত্থান। হিন্দুদের এই সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক উত্থান শুরু হলো ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালুর মধ্যে দিয়ে। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়াম কেরী। আর এ বিভাগে পন্ডিত হিসেবে নেয়া হলো মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দ চন্দ্র, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চুড়ামনি ও রামরাম বসুকে।

এই পন্ডিতরা দু'টি কাজ করলেন। এক, মুসলিম আমলের বাংলা গদ্যের ধারা বাদ দিয়ে তারা সংস্কৃত শব্দ ভারাক্রান্ত নতুন বাংলা গদ্যের উদ্ভব ঘটালেন। দুই, বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে হিন্দু ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে সামনে আনলেন। রাম রাম বসু লিখলেন 'প্রতাপাদিত্য', মৃত্যুঞ্জয় লিখলেন 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'রাজাবলী', রাজীব লোচন লিখলেন 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র'। এসব গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে প্রতাপাদিত্য, রূপ সনাতন ও বীরবল প্রভৃতি যেসব চরিত্র সামনে এল সেগুলো হিন্দু ইতিহাসের উপজীব্য চরিত্র। মৃত্যুঞ্জয়ের 'রাজাবলী' হলো চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ-সন্তান বিচিত্রবীর্য থেকে বাংলাদেশে কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস। এ ইতিহাসে মুসলিম শাসন আমলকে বিদ্বেষদুষ্ট ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। 'এই ভাবেই ভাষা ও বিষয় বস্তুর দিক দিয়ে পন্ডিতদের সাধনায় সংস্কৃত ও হিন্দুদের মাহাত্ম প্রতিষ্ঠায় ইংরেজের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্টি হয়েছিল প্রশস্ত ক্ষেত্র।'[২৪]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের এ পন্ডিতগণ ছাড়াও ঈশ্বরগুপ্ত, রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার চন্দ্র, প্যারিচাদ মিত্র, রামনারায়ন তর্করত্ন, প্রমুখ হিন্দু লেখকের গ্রন্থরাজী হিন্দুধর্মের উত্থান ও হিন্দুদের চেতনা বিকাশে সাহায্য করে এবং নতুন ভাবে সংস্কৃতি চর্চার এক বুনিয়াদ গড়ে তোলে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা চালু এবং ছাপাখানা বিস্তার লাভের পর হিন্দুদের দ্বারা একের পর এক পত্রিকা প্রকাশ পেতে শুরু করে। এসব পত্রিকার মধ্যে রয়েছে দিগদর্শন (এপ্রিল ১৮১৮), সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পন' (মে ১৮১৮), সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পন' (মে ১৮১৮), সাপ্তাহিক 'বাঙ্গাল গেজেটি' (জুন, ১৮১৮), 'ব্রাহ্মণ সেবধি'

২৩। `An Advanced history of India' by Dr. R.C. Mazumdar, Page. 877.

www.icsbook.info

(সেপ্টেম্বর ১৮২১), সম্বাদ কৌমুদী (ডিসে, ১৮২১), 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), ইত্যাদি। এসব পত্রিকার সবগুলোই হিন্দুদের। মুসলমানরা সংবাদ পত্র জগতে প্রবেশ করে আরও প্রায় একশ' বছর পরে। হিন্দুদের এসব পত্রিকা হিন্দুধর্ম ও জাতিসত্তার বিকাশে অমূল্য ভূমিকা পালন করে। পত্রিকাগুলো অব্যাহত ধারায় তৈরী করে চলে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যুগান্তকারী যে হিন্দু লেখকদের আমরা দেখি, তা এ পত্রিকাগুলোর হাতে গড়া। ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এর ভূমিকা সম্পর্কে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলছেন, "এই পত্রিকাটি বাংলায় সর্বোচ্চ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ঈশ্বর চন্দ্রের প্রতিভা গদ্য, পদ্য ও ব্যঙ্গাত্মক লেখার মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে অব্যাহত ধারায় মানুষের তৃষ্ণা মোচন করেছে। বঙ্কিম চন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্রের মত বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভার বেশ কয়েকজন এ পত্রিকায় শিশু কলামে লিখার মাধ্যমে তাদের সাহিত্য জীবন শুরু করেন। সাহিত্য প্রতিভার সন্ধানে এবং তরুণ লেখকদের উৎসাহ দানে ঈশ্বরগুপ্ত নিরলস ছিলেন।"[২৫] রাম রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য' (১৮০১) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'রাজাবলী (১৮০৮), ইত্যাদির মাধ্যমে হিন্দু জাতির যে ঐতিহ্য সন্ধান শুরু হয়, তা উনিশ শতকের চতুর্থ কোয়ার্টারে এসে বংঙ্কিম সাহিত্যে চরম অসহনশীল ও বিনাশী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। অবশ্য বঙ্কিমের আগে ভূদের মুখোপাধ্যায়-এর 'অঙ্গুরী বিনিময়' (১৮৫৭) উপন্যাসে মুসলিম ইতিহাসের বিকৃতি ও মুসলিম বিদ্বেষের নগ্ন প্রকাশ আমরা দেখি। তথাকথিত এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে শিবাজীর সাথে মোগল শাহজাদী রওশনারার প্রেম দেখানো হয়। এইভাবে সাহিত্যে শিবাজীকে প্রথমবারের মত হিন্দুদের জাতীয় বীর ও হিন্দু উত্থান ও অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়।

বঙ্কিম তার সাহিত্যে শিবাজীর এই রূপকে ষোল কলায় পূর্ণ করলেন এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার নামে মুসলিম ইতিহাস-বিকৃতির বন্যা বইয়ে দিলেন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর আকর হয়ে দাঁড়াল তার সাহিত্য।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'রাজসিংহ' ও 'আনন্দ মঠ'ই সবচেয়ে বিপজ্জনক। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিতে এ দু'টি উপন্যাস অনন্য। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। 'আনন্দ মঠ'ও প্রকাশ করা হয়েছে এই একই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে।[২৬] 'রাজ সিংহ' রচিত হয় মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে নিয়ে। এতে আওরঙ্গজেবকে বিকৃত চরিত্র, ইসলাম ও মুসলমানদের কদর্য রূপ এবং হিন্দু রাজপুতদের সাহসিকতা, সংগ্রাম ও ঔদার্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসের টার্গেট ছিল মুসলমানকে হীন ও ম্লেচ্ছ করে দেখানো এবং হিন্দুদের আদর্শ ও উত্থানকে আকাশস্পর্শী করে চিত্রিত করা। 'আনন্দ

২৪। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ৩৩৪।
২৫। Dr. Donesh chandra sen, ' Bengali Language & Literature', Page 762.

www.icsbook.info

মঠে' ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলছে, "সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঝি-বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই, পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষনা-বেক্ষণের সম্বন্ধ, আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই। ধর্ম গেল, এখন প্রাণ যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর হিন্দুর হিন্দুয়ানি থাকে না।"[২৭] উল্লেখ্য, বাংলায় মুসলিম শাসন শেষ হবার প্রায় এক'শ ২৫ বছর পর বঙ্কিম এসব কথা লিখছেন। অথচ যে বৃটিশ শাসন ও শোষণের মধ্যে বসে তিনি লিখছেন, সেই বৃটিশের বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ নেই। যেমন, 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসে ক্যাপ্টেন টমাসকে ভবানন্দ বলছেন, "কাপ্তান সাহেব, তোমায় মারিবনা, ইংরাজ আমাদের শত্রু নহে। কেন মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? ---- ইংরাজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।"[২৮]

বঙ্কিম মুসলমানদের তাড়াতে চান, মুসলমানদের দেশ ছাড়া করতে চান। তাঁরলক্ষ্য কি? বিভিন্নভাবে ব্রাহ্মণরাই বঙ্কিম উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আনন্দ মঠ উপন্যাসেও সর্বময় কর্তা একজন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে যিনি দেবী চৌধুরানীকে দীক্ষা দিলেন তিনিও ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী। 'মৃণালিনী' উপন্যাসেও তাই। এখানেও আনন্দ মঠের মতই ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য রূপে হেমচন্দ্রকে ডেকে বলছেন, "তুমি দেবকার্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবন নিপাত তোমার একমাত্র ধ্যান হওয়া উচিত।"[২৯] এই ব্রাহ্মণদের 'ব্রাহ্মণ্য শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠাই যে বঙ্কিমের আদর্শ, ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ব্রাহ্মণ বঙ্কিম চন্দ্রের রচনায় নিরপেক্ষ ভাবে সৎ। তাহার শাসনের প্রতিষ্ঠা হইলেই শ্রেষ্ঠ শাসনের প্রতিষ্ঠা হইবে। তাহার চরিত্র, বুদ্ধি ও নৈতিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কখনো উঠে নাই। দেবী চৌধুরাণী, ভবানন্দ, চন্দ্রশেখর, হেমচন্দ্র আর যত রাজা ও সামন্ত ইহারা সকলেই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের আজ্ঞাবহ-কর্মী। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের কোন পরামর্শ-সভা নেই, মানুষের কোন পরামর্শ তাহাকে চালিত করেনা। তিনি ধ্যানস্থ হইলে যোগের মহিমায় আপ্তবাক্য শুনিতে পান, তাহাই জীবানন্দ, ভবানন্দ ও হেমচন্দ্রের জন্য আইন।"[৩০]

ব্রাহ্মণ্যবাদী উত্থানের এই লক্ষ্যের কারণে বঙ্কিম "রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ-মনের প্রতিভূ হিসাবে এবং হিন্দু জাতীয়তা মন্ত্রের উদ্‌গতা ঋষি হিসাবে বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হলেন। এবং এভাবে তীব্র সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবহ্নি তিনি ছড়িয়েছিলেন লেখনি মুখে, জগতের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় নজীর নেই। ..... অস্ত্রের মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় কালের প্রলেপে সে ক্ষত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু লেখনির মুখে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার নিঃশেষ নেই, নিরাময় নেই---- যুগ থেকে যুগান্তরে সেক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ

২৬। 'বঙ্কিম রচনাবলীঃ উপন্যাস সমগ্র', ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২৭। 'বঙ্কিম রচনাবলীঃ উপন্যাস সমগ্র', ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
২৮। 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস', নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, পৃষ্ঠা ৪৯১।
২৯। 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস', নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, পৃষ্ঠা ২৯।

www.icsbook.info

হতে থাকে। ----- তিনি মুসলমান বিদ্বেষের যে বিষবহ্নির উদ্‌গীরণ করেছেন, সে বিষ জ্বালায় এই বিরাট উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল, তা নিঃশেষে শুষ্ক ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।"[৩১]

হিন্দুদের "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক সাম্প্রদায়িকতার যে কদর্য পংকিল ঘূর্ণাবর্ত সৃস্টি হলো, অতঃপর তার পদাংক অনুসরণ করে পন্ডিত অপন্ডিত ও সাহিত্যিক অসাহিত্যিক বর্ণহিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় সে আবর্তে পরমানন্দে অবগাহন করে আসছেন লেখনি চালনা করে।"[৩২] সবচেয়ে দুঃখের বিষয় "মানবতাবাদী'র পোশাক পরা রবীন্দ্রনাথ এ হিন্দু মানসিক গন্ডির বাইরে যেতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের যে রূপ আমরা দেখি তার সাথে বঙ্কিমের চেহারার কোন পার্থক্য নেই। 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের মত 'ধর্মরাজ্য'-এর স্বপ্ন দেখেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলছেনঃ

"সেদিন শুনিনি কথা,
আজি মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব,
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে
ভারতে মিলিবে সর্বশেষ ধ্যানমন্ত্র তব।
ধবজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দারিদ্রের বল।
এক ধর্ম রাজ্য হবে এ ভারতে
এ মহাবচন
করিব সম্বল।"*

এই 'শিবাজী উৎসব' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ শিবাজীকে জাতীয় বীর, জাতীয় নেতা, জাতির পথিকৃৎ হিসেবে ধরে শিবাজীর স্বপ্ন ভারতে 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে একমাত্র সম্বল বানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত কাজী আব্দুল ওদুদ সম্ভবত মুখ রক্ষার জন্যে বলেছিলেন যে, 'শিবাজী উৎসব' উপলক্ষে লিখিত এ কবিতা রবীন্দ্রনাথ পরে বর্জন করেছিলেন। কিন্তু এটা ডাহা মিথ্যা কথা। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই পশ্চিম বাংলার সরকারী ও শান্তি নিকেতনী সংস্করণে এ 'শিবাজী উৎসব' কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পেও বঙ্কিম মানসিকতার সাক্ষাত মিলে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ যখন উগ্র, তীব্র হয়ে উঠছে সেই সময় ১৩০৫ সালে অর্থাৎ ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ এ গল্প লেখেন। এ গল্পে তিনি দেখান, বাদাউনের কুমারী নবাবজাদী

৩০। 'বাংলা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস', নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, পৃষ্ঠা ৪৯৫, ৪৯৬।
৩১। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ৩৩৯
৩২। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ৩৪০

www.icsbook.info

ব্রাহ্মণ সেনাপতি কেশরলালের প্রেমে অন্ধ হয়ে পড়েন, কিন্তু তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন। অতপর নবাবজাদী সারাজীবন ব্যাপী সাধনা করেছেন ব্রাহ্মণ হবার জন্যে। এই গল্প পড়ে সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হক বেদনাহত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বঙ্গের প্রিয় কবির তো এই কীর্তি!'[৩৩] বঙ্কিম সাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসে, কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে যে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ'কে দেখি, তার সাথে রবীন্দ্রনাথের গোরা' উপন্যাশের 'গোরা' চরিত্রের কি কোন মৌলিক পার্থক্য রয়েছে? নাই। স্বয়ং কাজী আব্দুল ওদুদ তার বাংলার জাগরণ গ্রন্থে লিখছেন, "বঙ্গভংগের একটা বিশিষ্ট যুগসন্ধিক্ষণে লিখিত 'গোরা' উপন্যাস (১৯০৯) খানিতে রবীন্দ্রনাথ দেশপ্রীতি ও গভীর ভাবপ্রবণতার অঞ্জন চোখে মাখিয়া হিন্দু ধর্মের বিকার গুলিকেও রমণীয় করিয়া দেখিয়াছেন। --- তাহার সমস্ত কবি কল্পনা, সমস্ত গভীর সমবেদনা, সমস্ত পরিতাপ, তীব্র আবেগ হিন্দু ধর্ম নামে অভিহিত যে অতীত গৌরবে লুপ্ত প্রায় ভগ্নাবশেষ, তাহার দিকে অনিবার্য ভাবে ধাবিত হইয়াছে।"[৩৪]

রবীন্দ্রনাথ তার বিশাল সাহিত্যে মুসলিম জাতির জন্যে কিছু করেননি।[৩৫] কিন্তু সুযোগ পাওয়ার পর মুসলিম জাতিকে আঘাত দিতে তিনি ছাড়েননি। কথা কাব্যের 'বিচার' কবিতায় তিনি 'মৈশুরপতি হৈদারালীর' 'দর্প ধ্বংস' করেছেন এবং 'জোগাতে যমের খাদ্য' 'যবন নিপাত' করতে চলেছেন।[৩৬] রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খন্ডের 'মাসী', 'বন্দী বীর', 'হোলি খেলা', প্রভৃতি কবিতায়ও তার এই মানসিকতার সাক্ষাত মিলে। গল্পগুচ্ছর 'রীতিমত নভেল' গল্পে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত সবচেয়ে নগ্নভাবে ধরা পড়েছেন। তিনি লিখছেন, "আল্লাহু আকবর' শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লক্ষ যবন সেনা, অন্যদিকে সহস্র আর্য সৈন্য।-----"হর হর বোম মোম!' পাঠক বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশ জনমাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহনে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কর নিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রু সৈন্যের উপর আসিয়া পতিত হইল? বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবন সৈন্য প্রচন্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্দ্ধ হইয়া উঠিল? কাহার বজ্রমন্দ্রিত 'হর হর বোম বোম" শব্দে তিন লক্ষ ম্লেচ্ছ কণ্ঠের 'আল্লাহু আকবর" ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল? কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষ যুথের ন্যায় শত্রু সৈন্য মুহূর্তের মধ্যে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হইল? ইনি সেই ললিত সিংহ।"[৩৭] এখানে রবীন্দ্রনাথ বংকিমের মত শুধুই মুসলিম বিদ্বেষ নয়, মুসলিম বৈরিতায়ও অবতীর্ণ। বর্ণনা, শব্দচয়ন

---

* 'শিবাজী উৎসব' কবিতাটির সম্পূর্ণাংশ এই বইয়ের পরিশিষ্ট-১ এ দেখুন।

৩৩। কাজী ইমদাদুলহক গ্রন্থাবলী (বাঃ উঃ বোর্ড, সহ) ১ম খন্ড, ৪৪-এ, ৪৫।

৩৪। কাজী আব্দুল ওদুদ-এর 'বাংলার জাগরণ'-এ উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৫৮ (রবীন্দ্র জীবনী দ্রষ্টব্য)।

৩৫। "মুসলমান বিদ্বেষ বলিয়া আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য বিসর্জন দিতে পারিনা। মুসলমানদের উচিত নিজেদের জাতীয় সাহিত্য নিজেদেরই সৃষ্টি করা।" (নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব একটি ভাষণে মুসলমান বিদ্বেষ পুর্ণ সাহিত্য বন্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে 'ভারতী, পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেন)।

৩৬। 'রবীন্দ্র রচনাবলী', সপ্তম খন্ড. পৃষ্ঠা ৮৩. ৮৪, ৮৫।

www.icsbook.info

কোন ক্ষেত্রেই এখানে বঙ্কিমের সাথে রবীন্দ্রনাথের কোন পার্থক্য নেই।

সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি, সাহিত্য সমাজ-মনের রূপকার। এ কারণেই বঙ্কিম সাহিত্যে উনিশ শতকের চতুর্থ কোয়ার্টারে মুসলিম বিনাশী যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম, তার প্রকাশ এ সময় রাজনৈতিক ও সমাজিক ক্ষেত্রেও দেখা গেল। এই ক্ষেত্রে মুসলিম বিনাশী আন্দোলনের প্রথম ধবজা উড়ালেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৯৩)। তিনি ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'আর্য সমাজ'। এরপর 'গো-রক্ষা-সমিতি'। এইভাবে স্বামী দয়ানন্দ সনাতন হিন্দুত্বের মাহিমায় অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দু কালচারের অন্ধ ভক্ত হয়ে ওঠেন এবং উপমহাদেশে আরও দু'টি ধর্ম ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্মকে অস্বীকার করে এক হিন্দু ভারতীয় কালচারের প্রচার করেন।[৩৮] "হিন্দু পুনরুত্থান আন্দোলন তখন আর নির্দোষ ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে নিবদ্ধ রহিল না। এখন হইতে এই আন্দোলন খোলাখুলি মুসলিম বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হইল।"[৩৯] 'দয়ানন্দের আর্যসমাজ হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধটা যতো বিচ্ছিন্ন করেছে, যতো সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে এদেশে শান্তি শৃংখলা নষ্ট করেছে, আর কোনও হিন্দু 'ধর্ম-সমাজ' তার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। আর্য সমাজের 'শুদ্ধি করণ' 'গোরক্ষিণী' এবং 'হিন্দুর ভারত হিন্দুর হবে' আন্দোলন যে তীব্র বিষক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, আজও তার গলিত পুঁজ-রক্তে হিন্দুমন বিষাক্ত হয়ে আছে।'[৪০] আর্য সমাজ ও তার উত্থানবাদী প্রচার সে সময় কি সমাজ-পরিবেশের সৃষ্টি করল, তার একটা সুন্দর বিবরণ পাওয়া গেছে সে সময়কার একজন অধ্যাপকের জবানীতে: 'সঠিক কাজ করতে কোনও দেরী সমীচীন নয়। হিন্দুদের কোনও প্রতিনিধিত্ব মূলক সংস্থা-যেমন হিন্দু মহাসভা কিংবা এ উদ্দেশ্যে আহূত সর্বভারতীয় হিন্দু সম্মেলন-অবিলম্বে একটি সুপ্রীম কাউন্সিল গঠন করুক এদেশে সব বিদেশী ধর্মকে 'হিন্দু' রূপদান করতে। এই কাউন্সিলের কাজ হবে, চারটি বিদেশাগত ধর্মকে 'হিন্দু' করতে সঠিক নামকরণ করার। আমাদের প্রস্তাব, ইসলামকে 'নিরাকার সমাজ', খ্রীষ্টধর্মকে 'ইঙ্গ পুজক সমাজ", ও ইহুদি ধর্মকে 'পবিত্র সমাজ' নাম দেয়া যেতে পারে।---- হিন্দু নেতারা যদি এসব ধর্মকে এদেশে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'হিন্দু' করে ফেলতেন, তাহলে এসব ধর্মানুসারীরা হিন্দু আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করে হিন্দুত্বে বিলীন হয়ে যেতো এবং 'হিন্দু জাতির' অন্তর্গত হতো।"[৪১]

স্বামী দয়ানন্দ মারা গেলেন ১৮৮৩ সালে। কিন্তু তাঁর 'আর্য সমাজ' এর মিশন শেষ হয়ে গেলনা। 'দয়ানন্দের মতবাদ ও কার্যক্রম পরবর্তীযুগে কংগ্রেস কর্মী গঙ্গাধর তিলক, লালা হংসরাজ, লালা লাজপত রায় ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ গোঁড়া হিন্দুরা

৩৭। 'গল্পগুচ্ছ', অখন্ড, পৃষ্ঠা ৯৯।
৩৮। 'Misra', পৃষ্ঠা ৩৮২, ৩৮৩ (আব্দুল মওদুদ কর্তৃক তার গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৮৭)।
৩৯। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি',-মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১১৭।
৪০। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর', আব্দুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ২৮৭

www.icsbook.info

আরও ব্যাপকভাবে চালাইয়া যাইতে থাকে। বস্তুত, স্বামী দয়ানন্দের অপেক্ষাও তাহারা অধিক কার্যক্ষম ছিলেন। কেননা, কংগ্রেসের মত এক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান তাঁহাদের কুক্ষিগত ছিল।'[৪২]

ঠিক এই সময় আরেকটি হিন্দু চরমপন্থী সংস্থার উদ্ভব ঘটে। স্বামী বিবেকানন্দ এ সময় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব (মৃত্যু ১৮৮৬)-এর নামানুসারে 'রাম কৃষ্ণ মিশন' গড়েছিলেন। তিনি এই মিশনকে এক চরমপন্থী হিন্দু সংস্কার-সংস্থায় রূপান্তরিত করলেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার ছিল, হিন্দু কৃষ্টি ও সভ্যতা দুনিয়ার সেরা এবং প্রাচ্য প্রতীচ্যের সকল ঐশ্বর্যের মূলে রয়েছে হিন্দু ধর্ম। ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সমাজ নামে কোন কিছু যে তার চার পাশে আছে, তাকে তিনি ভ্রুক্ষেপই করতেন না।

রামকৃষ্ণপরমহংস দেবের মৃত্যুর এক বছর আগে ১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হলো। লর্ড ডাফরিন এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের সাহায্যে ভারতে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় করার উদ্যোগ নেন। এরই অংশ হিসেবে এদেশের মানুষের মন-মানসিকতা আঁচ করা এবং কি করে তাদের অভাব আভিযোগের প্রতিবিধান করা যায়, তারই পথ বাতলানোর জন্যে লর্ড ডাফরিন এ্যালেন অক্টিভিয়ান হিউমের মাধ্যমে ৫০ জন সদস্য নিয়ে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' গঠন করলেন। বস্তুত এই কংগ্রেস ছিল অসন্তোষ নিরসনের একটা 'বক-চোষক' গদি।[৪৩] ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বোম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনেই কংগ্রেসের মনোভাব সুস্পষ্ট করে তোলা হলো। অধিবেশনের সভাপতি বাংগালী খৃষ্টান উমেশ চন্দ্র ব্যানার্জী তার সভাপতির ভাষণের উপসংহারে বললেন, "কংগ্রেসের একান্ত কামনা ভারতে বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী হোক এবং কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রশাসনিক বিষয়ে অংশীদারিত্ব।"[৪৪] আরেকজন বাঙালী হিন্দু, হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী পুনরুত্থানের নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠিত ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের কোলকাতা সম্মেলনের সভাপতি দাদাভাই নওরোজী বললেন, "এমনকি কংগ্রেস সদস্যদের অস্থি মজ্জা পর্যন্ত বৃটিশের প্রতি অনুগত। হিন্দু রাজত্বের গৌরবময় যুগেও কি কেউ কল্পনা করতে পারতো যে, ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে আগত প্রতিনিধিদের নিয়ে কংগ্রেসের মত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা সম্ভব? এটা শুধু বৃটিশ ভারতে বৃটিশ শাসনেই সম্ভব হয়েছে।"[৪৫] ১৮৯৫ সালে কংগ্রেসের পুর্ণ সম্মেলনে বাংগালী নেতা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোধা বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সভাপতির ভাষণে বললেন, "ইংলন্ডের নিকট আমরা

৪১। 'The Hindu Muslim Riots' By Ratish Mohan

৪২। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি', মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১১৮।

৪৩। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবর রহমান, পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৩৪।

৪৪। 'Moderates and Extremist in National Congress', by Daniel Agrov.

www.icsbook.info

উৎসাহ ও সহানুভূতি কামনা করি। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংলন্ড আমাদের পথ প্রদর্শক। আদর্শের ক্ষেত্রে ইংলন্ড আমাদের গুরু।"[৪৬]

হিন্দুজাতির উত্থানবাদী শিক্ষিত হিন্দুরা এইভাবে ইংরেজদের সাথে আপোশ করে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে একক টার্গেটে পরিণত করল। সচেতন অনেক মুসলমান এটা সেই সময়েই বুঝতে পেরেছিল। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে যখন কংগ্রেস অধিবশেন চলছিল, সেই সময় বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের নেতা এবং আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সৈয়দ আহমদ লাক্ষ্মৌতে বললেন, "যদি কেউ ভবিষ্যতে হিন্দু শাসনের জোয়ালে আবদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন কংগ্রেসে যোগ দেয়।"[৪৭]

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় ছত্রছায়ায় বালগঙ্গাধর তিলকের মত কংগ্রেস কর্মীরা উনিশ শতকের শেষ লগ্ন ও বিশ শতকের সূচনা লগ্নে আরেক মুসলিম বিনাশী আন্দোলনকে আরও তীব্র ও স্পষ্টতর করে তুললো। "১৮৯৮ সালে কেশরী পত্রিকায় তিলক গো-হত্যা নিবারণী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া মুসলমানদের খোলাখুলি এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহব্বান করেন এবং বৃটিশ সরকারকে মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধের আইন প্রত্যাহার করতে বললেন। তিনি গীতা হইতে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে, মহাভারতের দৃষ্টিতে আত্মীয় স্বজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কর্তব্য বিশেষ। অতএব যে সব পরদেশী (মুসলমান) এই দেশে বাস করিতেছেন তাহাদের এই দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া কিংবা হত্যা করা দোষের নয়।"[৪৮] এর আগে ১৮৯৫ সালে রায়গড়ের এক জনসভায় এর চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় বাল গঙ্গাধর তিলক বলেন, "আমাদিগকেও শিবাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। ঢাল-তরোয়াল লইয়া অসংখ্য মুসলমান বহিরাগতকে হত্যা করিতে হইবে। যদিও এইরূপ যুদ্ধে আমাদেরও কিছু হইবে, তাহা হইলেও এইরূপ স্বার্থ-ত্যাগের প্রয়োজন আছে।"[৪৯]

আর এর এক বছর পর ১৮৯৬ সালে বাল গঙ্গাধর তিলক আয়োজন করলেন 'শিবাজী উৎসবের'। মারাঠা নেতা শিবাজীর মৃত্যুর ২১৬ বছর পর এই প্রথম শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হলো ভারতে। সুতরাং ভারত ইতিহাসের শুধু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই এটা নয়, ইতিহাসের দিক-নির্দেশক একটি মাইল ফলকও। আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়, এই শিবাজী উৎসব আয়োজনে যিনি নেতৃত্ব দিলেন, সেই বাল গঙ্গাধর তিলক সামানা কেউ নন। তিনি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর আদর্শের উত্তরসূরী, তিনি একজন প্রভাবশালী কংগ্রেস- নেতা। ভারতীয় হিন্দুদের জাতীয় আন্দোলনের

৪৫। 'Moderates and Extremists in Indian National congress', dy Daniel Agrov.
৪৬। 'Moderates and Extremists in Indian National congress', dy Daniel Agrov.
৪৭। 'Indian National Congress and the Muslim since 1928', by Dr. Padma Shaha.
৪৮। 'Statesman of India,' by Robert Biron (E উপমহাদেশের রাজনীতিতে সম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ৬০)।

www.icsbook.info

পথিকৃত', 'রাষ্ট্রগুরু' রূপে সম্মানিত এবং 'সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বাংগালী' বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর চোখে এই তিলক 'দাক্ষিনাত্যের একজন মুকুটহীন সম্রাট। মিঃ ব্যানার্জীর ভাষায়, 'পেশোয়া'-এর দায়িত্ব পালনের জন্যে তাঁর (তিলকের) আবির্ভাব।'[৫০] কেউ কেউ তিলককে বলেছেন 'রাজাধিরাজ ছত্রপতি তিলক মহারাজ'। আর কেউ ঘোষণা করেছেন, 'তিলক লোকমান্যই আমাদের শিবাজী।' এহেন বাল গঙ্গাধর তিলকই নেতৃত্ব দেন শিবাজী উৎসবের। শিবাজী উৎসবের সাথে বাঙ্গালী হিন্দুদের মন ও মেধাও এক হয়ে যায়। যে মা 'কালী' বাংগালীদের ভাগ্য বিধাতা, তিনি ছিলেন শিবাজীরও রক্ষাকর্তা। ভবানী ব্যতীত শিবাজীকে কল্পনা করা যায় না।'[৫১] শিবাজী আপন খড়্গকে আপনার অধিক সম্মান করিতেন, কারণ এই খড়্গই তাহাকে ভবানীর নিকট প্রিয় করিয়া দিয়াছিল।'[৫২] এই ভবানী-প্রীতি ও ভবানী প্রেমের দিক থেকে শিবাজী ও বঙ্কিম একাত্ম। তাই শিবাজী উৎসবে এসে বন্দেমাতরম ও শিবাজী অচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। রত্মগিরির শিবাজী মন্দিরে বন্দে মাতরম শব্দগুলো শিলাবক্ষে খোদিত হয়ে আছে। শিবাজী উৎসবে এসে একাত্ম হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথও। শুধু একজন যোগদানকারী হিসেবে নয়, শিবাজী উসেবকে তিনি তাৎপর্যমন্ডিত ও স্বরূপে রূপায়িত করেছিলেন 'শিবাজী উৎসব' কবিতা লিখে। যাতে তিনি বলেছিলেন 'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহাবচন করিব সম্বল'। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসব উপলক্ষে 'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে'-এ মহাবচন স্মরণ করেছেন শুধু নয়, একে সম্বল করার অংগীকার করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো ভারতে এক ধর্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং শিবাজী-এ দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক কি? এ বিষয়টি পরিস্কার হলে 'শিবাজী উৎসব'-এর তাৎপর্য এবং শিবাজীর মৃত্যুর ২১৬ বছর পর 'শিবাজী উসেব' উদযাপনের অবস্থা ও সময়গত গুরুত্বের দিকটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ বিষয়ে কিঞ্চিত আলোচনার প্রয়োজন।

উনবিংশ শতকে মুসলিম রাজত্ব ও মুসলিম প্রভাব-প্রতিপত্তির শ্মশানভূমির উপর হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী জাগরণ ছিল সর্বাত্মকভাবে ধর্মীয়। এই জাগরণ অবশেষে হয়ে ওঠে শক্তিকামী, সামরিক। তারা ভাবতে থাকে তাদের দুর্বলতার কারণেই তাদের ধর্ম যুগের অবসান ঘটেছে, বিপর্যয় ঘটেছে, বিপর্যয় ঘটেছে তাদের জাতীয় জীবনে এবং পতন ঘটেছে তাদের। তাদের এ চিন্তার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত তাদের 'ধর্ম ও স্বাধীনতা' শীর্ষক এক নিবন্ধে। বলা হয়েছেঃ

"যেদিন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভারতের ক্ষাত্রতেজ নির্বাপিত প্রায়, সেইদিনই এই

৪৯। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান' ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ৬০।

৫০। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৬২। শিবাজীর পরে মহারাষ্ট্রে তার পক্ষ থেকে ভারতে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যারা চালাতেন তাঁরা পেশায়া বলে অভিহিত হতেন।

৫১। শিবাজী উৎসবের দশম বার্ষিক উপলক্ষ্যে তিলক বাংলায় এলে (১৯০৬) যে সম্বর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, সে সভায় তিলক এই মন্তব্য করেন।

৫২। 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বংলায় বিপ্লববাদ', উমা মুখোপাধ্যায়

www.icsbook.info

দেশে কলির প্রথম প্রবেশ। পরীক্ষিতের কোষ মধ্যে অসির ঝংকার ধ্বনি শুনিয়া কলি আরও কিছুদিন চুপ করিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষিতের তক্ষক দংশনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের সূত্রপাত। ---- ভাবপ্রবণ বৌদ্ধ আচার্যগণ সকলের জন্যেই ত্যাগ মার্গের ব্যবস্থা করিলেন। ----- ফলে ভারতও নির্বীয হইয়া পড়িল। আত্মরক্ষায় অশক্ত হইয়া দাঁড়াইল। শক, হুন, প্রভৃতি বহুবিধ জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে রাজ্য পাতিয়া বসিল। ------ পৌরাণিক যুগে আবার ক্ষত্রিয় জাতি জাগিয়া উঠিয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। 'গান্ধার অবধি সীমা' আবার নবজীবন সঞ্চারে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু হায়! সেই সৌভাগ্য গর্বের মধ্যেই আমাদের পতনের বীজ নিহিত ছিল। নতুন করিয়া সমাজ গঠন করিবার সময় আমরা যাহাদিগকে হীন জাতি ভাবিয়া সমাজের একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম তাহারা কেহ স্বদেশ প্রেমে সঞ্জীবিত হয় নাই। দেশ যেন কেবল ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের। অন্য জাতি যেন কেহই নহে। তাহারও ফল ফলিল। রাজপুতদিগের প্রতাপ যখন গৃহকলহে ব্যয়িত হইতে লাগিল, যুদ্ধ যে কেবল সমর কৌশল দেখাইবার জন্য নহে, স্বদেশ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য-এ কথা যখন রাজপুতরা ভুলিয়া গেল, তখন পশ্চিম হইতে ঝঞ্ঝাবায়ুর মত আসিয়া তুর্কিরা দেশ আধিকার করিয়া ফেলিল। অনাদরে অব্যবহারে ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্ষাত্রবীর্ষ নিষ্প্রভ হইতে লাগিল।"[৫৩]

পতনের এই কারণ চিহ্নিত হবার পর উনবিংশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদী জাগরণ আন্দোলনে ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্ষত্রিয়তেজ এই দুইয়েরই সংযোগ ঘটনোর চেষ্টা করা হোল। তারা অনুভব করল তাদের প্রয়োজন ধর্মরাজ্য। আর এ ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্যে প্রয়োজন ক্ষাত্র-তেজ। যে ধর্মরাজ্য তারা প্রতিষ্ঠা করতে চাইল তার জন্যে তাদের প্রয়োজন ঐতিহ্যিক প্রেরণা। এই প্রেরণার সন্ধান করতে গিয়ে তারা যা পেল সংক্ষেপে তা এইঃ

"প্রাচীন ভারাতের ইতিহাস পুরানাদি আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, প্রাচীন আর্য সভ্যতায়, ধর্মরাজ্য স্থাপন রূপ একটি আদর্শ সুব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাভারতে বর্ণিত প্রসঙ্গের চরম পরিণতি এই ধর্মরাজ্য স্থাপন রূপ আদর্শের প্রতিষ্ঠায় এবং সেই বিচিত্র ঘটনা চিত্রে কেন্দ্র স্থানীয় ঐশ্বর্যশালী বসুদেব তনয়ের সকল চেষ্টা ও প্রারোচনার মূলে এই ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠারূপ উদ্দেশ্য যে নিহিত ছিল তাহাও বিবেচনার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। ------- এই ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একান্ত চেষ্টার বিষয় মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মরাজ্য স্থাপন দ্বারা তিনি একদিকে যেমন ভারতে স্বধর্ম পালনের সুব্যবস্থা করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন, অপরদিকে মোক্ষতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি ধর্মকে মোক্ষের সহিত

ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩০।

৫৩। 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রকাশক, ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ৬/১-এ বাঞ্ছারাম আক্রুর লেন, কলিকাতা,

www.icsbook.info

সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বধর্ম পালনের জন্য যেমন একদিকে অর্জুনকে বলিতেছেন 'তস্মাত্বমুক্তিষ্ঠ যশোলভস্ব', অপরদিকে মোক্ষের প্রতি অনুরাগী করিবার জন্যে তাহাকেই বলিতেছেন 'নিস্ত্রৈগুন্যো ভবার্জুন।' আর্যসভ্যতা বা আর্য সভ্যতার দুইটা মূল তত্ব স্বধর্ম ও মোক্ষ গীতাতে পরিকীর্তিত হইয়াছে। প্রাচীন কাল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতে মুসলমান বিজয়ের পর একমাত্র শিবাজীকেই ভারতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে ব্রত গ্রহণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শিবাজী ধর্মরাজ্য সংস্থাপন কার্যে যখন প্রথম উদ্যোগী হন, তখন রামদাস স্বামী তাহাকে একখানি পত্রে লেখেনঃ 'আমাদের তীর্থ সকল বিধস্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের আবাস ভূমি সমূহ অপরিবিত্রীকৃত হইয়াছে, সমগ্র পৃথিবী বিপ্লব পূর্ণা হইয়াছে, ধর্ম বিলুপ্ত হইয়াছে। এই কারণে আমাদের ধর্মের, দেবমূর্তি সমূহের ও গোব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য নারায়ণ আপনার হৃদয়াস্থ হইয়া প্রেরণ করিয়াছেন।' বাস্তবিকই ধর্ম বিলুপ্ত হইবার আশংকা হইতেই মহারাষ্ট্র দেশে সপ্তদশ শতাব্দীর অদ্ভুত বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল।"[৫৪]

ভাগ্যই বলতে হবে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের। ধর্মরাজ্য ও শিবাজী এক হয়ে তাদের সামনে এসেছে। মুসলিম বিজয়ের পর ভারতে একবারই মাত্র হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে এবং সে কাজে ব্রতী হয়েছিলেন শিবাজী। সুতরাং বাঞ্ছিত ক্ষাত্রতেজও শিবাজীর মধ্যে মূর্ত। মুসলিম শাসন-কালে অনেক হিন্দু নৃপতি ও নেতা মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, সেটা তারা করেছে রাজ্য রক্ষা বা রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে, ধর্মরাজ্যের জন্যে নয়। শিবাজীই একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি রাজ্য রাজত্বের জন্যে নয়, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই লড়াই করেছেন সারাজীবন। ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিবাজীর পূর্ণতা লাভেরই এটা প্রমাণ। এইভাবে বিস্ময়কর শিবাজী চরিত্রে ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্ষাত্রতেজ উভয়ই বিস্ময়কর ভাবে সমশক্তিতে বিদ্যমান। হিন্দু ইতিহাসের এই বিস্ময়কর শিবাজী চরিত্রের স্রষ্টা উপরে উল্লেখিত রামদাস স্বামী স্বয়ং। রামদাসের এই সৃষ্টি কিভাবে ও কেন এবং কোন মিশন রামদাস শিবাজীকে দিয়েছিলেন তা না জানলে 'শিবাজীর সংগ্রাম'-এর মর্ম বুঝা এবং শিবাজীর মৃত্যুর ২১৬ বছর পর ১৮৯৬ সালে ইতিহাসের এক ক্রান্তি লগ্নে 'শিবাজী উৎসব'-এর তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা পূর্ণতা লাভ করবেনা। রামদাসের সে সৃষ্টি কাহিনীটি এইঃ

"------- শিবাজী মোক্ষ সাধনের নিমিত্ত সদ্‌গুরুর সন্ধান করিতে করিতে 'মহাসমর্থ' রামদাস স্বামীর বিষয় সম্যক অবগত হন। তারপর তার দর্শন লাভ করিবার জন্য তিনি প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে সহসা এক পর্বতে স্বামীর সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎকার ঘটে। তিনি সমর্থের চরণ বন্দনা করিয়া তাহার নিকট মন্ত্রোপদেশ গ্রহণের ও তাহার সেবার অধিকারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বামী বলিলেন, 'তুমি প্রাসাদ বিহারী রাজপুত্র,

পৃষ্ঠা ১৬৮, ১৬৯।

৫৪। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৮২, ১৮৫, ১৮৬।

www.icsbook.info

আমরা অরণ্যচর সন্যাসী, ধর্মসাধনও সহজসাধ্য নহে। অতএব তুমি এ বিষদৃশ অভিলাষ পরিত্যাগ কর। অকারণ 'ভেকধারণ' করিয়া জগৎকে প্রতারিত করায় ফল কি?' এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র বাস্পাকুল লোচনে বলিলেন, 'রাজ্য-ধন সমস্তই আপনার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। এই দাসকে দীনহীন জানিয়া অনুগ্রহ প্রকাশে সনাথ করিবার আদেশ হউক।' শিবাজীর সংকল্প অটল দেখিয়া রামদাস তার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। শিবাজী স্নানাদি সমাপন করিয়া ভক্তিপুত হৃদয়ে যথারীতি স্বামীর নিকট পরমার্থতত্ব সম্বন্ধে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। ঘটনা ১৫৭১ শকাব্দের বৈশাখ শুক্লা নবমী বৃহস্পতিবার দিবসে শিবাজীর দ্বাবিংশ বয়ঃক্রম কালে সংঘটিত। স্বামীর উপদেশে 'আত্মজ্ঞান' লাভ করিয়া সংকল্প বিকল্পাত্মক সংসারের প্রতি শিবাজীর বিরাগ জন্মিল। রামদাস তাহাকে গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে তিনি বলিলেন, 'রাজ্য বৈভব ইতঃপূর্বেই শ্রীচরণে অপর্ণ করিয়াছি। আর এই 'দুনিয়ার মায়াবিভ্রমে' মুগ্ধ না হইয়া গুরুদেবের চরণ সেবায় জীবনপাতপূর্বক পরমার্থ সাধন করিব।' ইহা শুনিয়া রামদাস শিবাজীর সংশয় ভঞ্জনের জন্য তাহাকে গীতোক্ত কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করিলেন। সমস্ত কর্মফল ইশ্বরে সমর্পণ পূর্বক অনাসক্তভাবে ধর্ম পালন করিয়া জনক, হরিশচন্দ্র, অম্বরীশ প্রভৃতি ভাগবত ধর্মপরায়ণ রাজর্ষিগণ যেরূপ মোক্ষপদবী লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি শিবাজীর নিকট বিবৃত করিলেন। এই প্রসঙ্গে দেশের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিযা শিবাজীকে তৎপ্রতিকারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা 'শিব দিগ্বিজয়' নামক গ্রন্থ হইতে এস্থলে অবিকল অনুদিত হইল:

যবনগণ বহুদিবস হইতে যথেচ্ছাচার করিতেছে, তাহাদিগকে শাস্তি দিতে পারে, হিন্দুগণের মধ্যে এরূপ পরাক্রমশালী পুরুষ কেহ নাই। দুষ্টগণের অত্যাচারে দেব-ব্রাহ্মণদের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে, সমস্ত ধর্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে, নাম সংকীর্তন বিলুপ্ত হইয়াছে, পাপীগণের বল বৃদ্ধি হওয়ায় ধার্মিকগণ দুর্বল হইয়াছে, এই সংকটকালে সকলের সুখ সম্মান লোপ পাইয়াছে। বিপদাগমন হেতু এই পাপকালের আবির্ভাব হইয়াছে, দেবতাগণ (দেবমূর্তি সমূহ) অত্যাচার ভয়ে লুক্কায়িত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ তিলকমালা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া যবনদিগের অনুকারী হইয়াছে। ---- রঘুপতি এই সকল সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া যবনদিগের বিরুদ্ধে তোমার যোজনা করিয়াছেন। তুমি ঈশ্বর সম্ভুত পুরুষ ------ এক্ষণে সময়ের অনুরূপ ধর্ম স্থাপন করা তোমার কর্তব্য। ধর্মের জন্যে জীবন বিসর্জন কর; নিজের প্রাণ পণ করিয়াও শত্রুদিগের সকলকে বিনাশ কর। তাহাদিগকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে আপনার রাজ্য প্রতিগ্রহণ কর। ধর্মনীতির উপর রাজ্যের স্থায়িত্ব নিভর করে। ধর্মনীতি পালন না করিলে সকলই মিথ্যা।----- আপনার মান রক্ষার জন্য অসি গ্রহণ করিয়া যিনি বৈরীকুল সংহার করেন, জগতে তাহার বাহুকীর্তি প্রচারিত হয়। ---- সহকারে উপার্জন করিবে।----- এ সময়ে শৌর্য প্রকাশ করিয়া ভগবৎ কৃপা লাভ কর। বাহুবলে

www.icsbook.info

ধর্ম স্থাপন কর। এ বিষয়ে আলস্য করিওনা। কাপুরুষতা ও ভীরুতা পরিত্যাগ কর। বিপদকে যিনি ভয় করেন, সৌভাগ্য তাহাকে পরিত্যাগ করে।'

রামদাস স্বামীর কর্মযোগমূলক এই উপদেশবাক্যে শিবাজীর হৃদয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপনের সংকল্প বিপুল উৎসাহ সহকারে আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল। তিনি গুরুদেবের আদেশ মত আবার লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেই দিন হইতে সুমহৎ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।"[৫৫]

'শিবাজী উৎসব'-এর মাধ্যমে ১৮৯৬ সালে শুধু এই শিবাজীকে স্মরণ করা নয়, শিবাজীর সংগ্রাম সাধনার উদ্বোধন করা হলো। এর মাধ্যমে উনবিংশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 'ধর্মরাজ্য' 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করল। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে যে 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও 'ক্ষাত্র তেজ'-এর প্রয়োজন তার 'মডেল' বা 'প্রেরণা' হিসেবে সামনে এনে বসানো হলো শিবাজীকে। এ 'শিবাজী-বিগ্রহ' সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর মত কবি, মানবতাবাদী কবি, আধুনিক কবিও করজোড়ে গাইলেনঃ "সেদিন শুনিনি কথা, আজ মোরা তোমার আদেশ শির পাতি লব, কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বশেষ ধ্যানমন্ত্রতব।------ এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে এ মহামবচন করিব সম্বল"। শুধু তাই নয়, তিনি মারাঠি শিবাজীর সাথে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে একাত্ম করে শিবাজী উৎসব কবিতায় বললেন,

"মারাঠির সাথে আজি হে বাঙ্গালি, এক কণ্ঠে বল
'জয়তু শিবাজী'।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, একসঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পুরব
দক্ষিণ ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্য নামে।"

বস্তুত শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শিবাজীর 'ধ্যানমন্ত্র ধর্মরাজ্য'কে শির পেতে গ্রহণ করল আনুষ্ঠানিকভাবে এবং সেই সাথে হাত পেতে গ্রহণ করল শিবাজীর ক্ষাত্র-তেজ খড়্গকে, যে খড়্গকে শিবাজী প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন, যার কারণে 'মা ভবানী ভালবাসতেন শিবাজীকে'।

উনবিংশ শতকের হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শতাব্দী শেষে যে উপসংহারে পৌছল, সেই উপসংহার হলো শিবাজী উৎসব। এই উপসংহার অনুসারেই হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চরম মুসলিম বিনাশী রূপ পরিগ্রহ করল। হিন্দু সাপ্তাহিক যুগান্তরের পাতায় ২১৬ বছর আগের শিবাজী ও রামদাস যেন কথা বলে উঠল।

৫৫। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লব বাদ', উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮।

www.icsbook.info

যবন (মুসলমান) নিধনের জন্য রামদাস যা বলেছে, শিবাজী যা করেছে, 'যুগান্তর' তাই ঘোষণা করলঃ

"ধর্ম সাধনের জন্য আত্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্যে যে পশুবলেরও আবশ্যক একথা ভুলিয়া আমরা সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছি। ---- যে দুর্বল, পরপদানত, সে কখনও আত্ম-শক্তির পূর্ণ বিকাশ না দেখিয়া মুক্তি লাভের অধিকারী হইতে পারেনা। যে পরাধীন, তাহার পক্ষে কখনও ধার্মিক হওয়া সম্ভবপর নহে। গুরুর আর এখন ইহা ভিন্ন অন্য কিছু শিখাইবার নাই, ছাত্রেরও আর শিখিবার অন্য কিছু নাই। ইহাই এখন যুগ ধর্ম।

নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, এই আকাঙ্খা জাগাইয়া দাও। এবং যখন ইহা প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন ম্লেচ্ছ-নিবহ নিধন করিবার জন্যে, সাধুগণের পরিত্রাণের জন্যে, ধর্ম রাজ্য সংস্থাপনের জন্যে, যিনি অবতীর্ণ হইবেন এস আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া তাহার পাদানুসরণের জন্য প্রস্তুত হই।"[৫৬]

"ভারতবাসী, তুমি কি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতে পার যে, 'বন্দেমাতরম' সেই ধর্মরাজ্য স্থাপনের আহুতিমন্ত্র। তুমি কি এই মহামন্ত্রের অপূর্ব মাহাত্ম আজও বুঝিয়াছ? তুমি কি বুঝিয়াছ এই মন্ত্রসহযোগে যশ, মান, ধন, গ্রাস ধর্মরাজ্য স্থাপন রূপ যজ্ঞে আহুতি দিতে পারিলে যজ্ঞ সুসিদ্ধ হইবেই হইবে? তুমি কি অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছ যে আজ সেই মহাযজ্ঞে সফল আহুতি দান করিবার জন্য ভারতের প্রাচীন ধর্মরাজ সংস্থাপকগণ অন্তরীক্ষে উপস্থিত আছেন? তবে, এস ভাই, আজ এই নব্যকুরুক্ষেত্রে ভগবান বাসুদেবকে চিরসারথিত্বে বরণ করিয়া ভবানীপুত্র অমর শিবাজীকে অগ্রগামী জানিয়া 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ধর্মরাজ্য স্থাপন-যজ্ঞে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া অনন্তকালের জন্যে ধন্য হইয়া যাই।'[৫৭]

এই নব্য কুরুক্ষেত্রের ধর্মরাজ্য স্থাপন যজ্ঞে হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের প্রতিপক্ষ হিসেবে মুসলমানদের এনে দাঁড় করানো হলো। অথচ মুসলমানরা তখন ইংরেজদের প্রায় দেড় শতাব্দীর হত্যা-জেল-জুলুম নিপীড়ন-নির্যাতনে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, অসহায়, অরক্ষিত। এই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজের অনুগ্রহ ও সাহায্য পুষ্ট, অর্থ-বিত্তে বলীয়ান, রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালী হিন্দুদের এই চ্যালেঞ্জ মুসলমানদের জন্যে সেদিন অস্তিত্ববিনাশী এক মহাঅসম যুদ্ধের আহ্বান ছাড়া আর কিছু ছিলনা।

এ পটভুমিতেই বিদায় নিল উনবিংশ শতক (বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দী) এবং আগমন ঘটল বিশ শতকের (বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর)।

৫৬। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লব বাদ', উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬৮, ১৭০, ১৭১।

৫৭। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লব বাদ', উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩২।

www.icsbook.info

২
শতাব্দীর শুরুঃ নির্যাতিতের উত্থান

বাংলা চৌদ্দ শতকের যখন শুরু হলো ইংরেজী ১৮৯৩ সালে, ইংরাজী উনবিংশ শতকের তখনও সাত বছর বাকি। উনিশ শতকের হিন্দু-জাগরণ-যাত্রা এ সময় এক সিদ্ধান্তকর পর্যায়ে উপনীত। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত তাদের বিচরণ তখন রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বত্র। সর্বাধিক সুযোগ সুবিধার পশরা তখন তাদের পায়ে আছড়ে পড়ছে। অন্যদিক পলাশীর পরাজয়ের পর মুসলমানদের পতনের যে যাত্রা শুরু, বালাকোটের বিপর্যয় ও ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর নিঃসীম অন্ধকার যে কাল রাতের যাত্রা শুরু, ইংরেজের জাতি বিধ্বংসী শতমুখী নির্যাতন-নিস্পেষণে মুসলমানরা পিষ্ট হবার পর তা এ সময় জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল। উনিশ শতকের এ দুর্ভাগ্য দশা বিশ শতকের শুরুতে বঙ্গ-ভঙ্গের শক ট্রিটমেন্ট ও মুসলিম লীগের পত্তন পর্যন্ত পূর্ণ অবয়বে টিকে ছিল।

এ সত্বেও ভূ-লুন্ঠিত জাতি-সত্তাকে হিন্দু জাতিদেহে লীন করার চেষ্টা সফল হয়নি। তথাকথিত মানবতার নামে, মনুষ্যত্বের নামে, সমন্বয়ের নামে যে ষড়যন্ত্র মুসলিম জাতিকে হিন্দু জাতিদেহে লীন করার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিল, সে ষড়যন্ত্র মুসলিম জাতিদেহের অভেদ্য বর্ম ভেদ করতে পারেনি। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম ধর্ম একজন মুসলমানকেও তার সাথে শামিল করতে সমর্থ হয়নি। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সমন্বয় চিন্তার দিকে মুসলমানরা চোখ তুলেও তাকায়নি। মুসলমানরা জাগতিক সব কিছুই হারিয়েছিল, কিন্তু হারায়নি চেতনা নামক মহামূল্যবান বস্তুটি।

দিন কার সমান যায় না। মুসলমানদেরও গেল না। মুসলমানদের পতনের কবর-গাহে অবশেষে জীবনের চারাগাছ গজাতে শুরু করল। যদিও তা আগের থেকে ভিন্ন প্রকৃতিতে, কিন্তু একই লক্ষ্যেঃ মুসলিম জাতির আবার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। পতনের কবর-গাহে গজিয়ে উঠা উত্থানের নতুন চারাগাছের প্রকৃতিতে যে ভিন্নতা এল তা মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের অবিশ্বাস, অনাস্থা দূর এবং মুসলমানদের জন্যে সুযোগ-সুবিধা আদায় করার প্রয়োজনেই।

সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র ছয় বছর পর ১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল নওয়াব

www.icsbook.info

আব্দুল লতিফ কোলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'মোহামেডান লিটারি সোসাইটি'। সশস্ত্র সংগ্রামোত্তর মুসলিম জাতীয় জীবনে এ ধরনের সংস্থা, সমিতি গঠন এই প্রথম। সমিতির প্রথম বৈঠকে অনুষ্ঠিত হয় কোলকাতায় নওয়াব আব্দুল লতিফের ১৬ নং তালতলা লেনস্থ বাড়ীতে ২রা এপ্রিল তারিখে। প্রথম এ বৈঠকে প্রথম যে প্রবন্ধ পাঠ করলেন অধ্যাপক মৌলবী ওয়াজীর, তাতে ওয়াহাবী আন্দোলনের তীব্র সমালোচনা করা হলো। এ বিষয়টির দিকে অংগুলী সংকেত করে অনেকে বলেন, নওয়াব আব্দুল লতিফ ও মোহমেডান লিটারারি সোসাইটির কাজ ছিল বৃটিশ তোষণ। এই অভিযোগকে অসত্য বলা যাবে না, কিন্তু এটাই ছিল তখনকার বাস্তবতা। ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি যখন গঠিত হচ্ছে, তখন সারা দেশ জুড়ে 'ওহাবী'দের ধর পাকড় হচ্ছে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ এবং সীমান্ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অপরাধ। হাজারে হাজারে মুসলমান যাচ্ছে জেলে অথবা আন্দামানের নির্বাসনে। বৃটিশের সকল ক্রোধ, আক্রোশ ও সন্দেহ মুসলমানদের উপর নিপতিত। এই অবস্থায় মুসলমানদের বাঁচানো এবং বেঁচে থাকার মত অধিকার আদায় ছিল আশু প্রয়োজনীয়। নওয়াব আব্দুল লতিফ মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি গড়ে এই কাজেই হাত দিলেন। সোসাইটির মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি, মুসলমানদের প্রতি শাসকদের অবিশ্বাস দূর, মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটানো, সমকালিন চিন্তাধারার সপক্ষে মুসলিম জনমত গড়ে তোলা, ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করেন। বস্তুত মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির মধ্যে দিয়ে মুসলিম রাজনীতির এক অধ্যায়ের সমাপ্তি, অন্য অধ্যায়ের সূচনা ঘটল। সংগ্রাম ও অসহযোগের পথ পরিহার করে আপোশ ও সুবিধাবাদের পথ অনুসরণ করা হলো। জাতির আদর্শের প্রশ্ন পেছনে রেখে জাতির ভৌত স্বার্থকে প্রধান বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত করা হলো।

এই বিচ্যুতি সত্বেও মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি বিরাট এক দুঃসময়ে মুসলিম জাতি স্বার্থকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করল। ভারতীয় স্বার্থের সাইন বোর্ডে হিন্দুরা যখন সব অধিকার একাই কুক্ষিগত করছিল, তখন মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি প্রথম বারের মত মুসলিম স্বার্থের প্রয়োজন আলাদাভাবে তুলে ধরে। মোহসীন ফান্ডের টাকা লুটে-পুটে খাওয়া হচ্ছিল। যাদের জন্যে এই টাকা এবং যাদের জন্যে এটা বেশী প্রয়োজন, সেই মুসলমানরা মোহসীন ফান্ডের টাকা পাচ্ছিল না। নওয়াব আব্দুল লতিফ তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা গভর্ণর স্যার ক্যাম্পবলকে বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, মহসীন ফান্ডের টাকা দাতার ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহৃত হচ্ছে না। ফল

www.icsbook.info

স্বরূপ বাংলাদেশের বৃটিশ প্রশাসন ১৮৭৩ সালের ২৯ জুলাই গৃহীত এক প্রস্তাব অনুসারে মোহসীন ফান্ডের টাকা শুধু মুসলমানদের জন্যে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তখন থেকে হুগলী কলেজ সরকারী হয়ে গেল এবং মোহ-সীন ফান্ডের টাকা মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োজিত হলো। এই টাকায় হুগলী ও কোলকাতা মাদ্রাসার উন্নতি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা স্থাপন এবং মুসলিম ছাত্রদের জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হলো। সরকার ৯টি জিলা স্কুলে আরবী ও ফার্সির শিক্ষক রাখার নির্দেশ দিলেন।[১] এত বড় কাজ সম্ভব হয়েছিল বৃটিশ প্রশাসনের সাথে নওয়াব আব্দুল লতিফের সুসম্পর্কের ফলেই। উল্লেখ্য, মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির দ্বিতীয় আলোচনা সভাতেই নওয়াব আব্দুল লতিফ গভর্ণর জেনারেল স্যার লরেন্সকে প্রধান অতিথি করে আনতে সমর্থ হন। এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৬ সালের ৬ই মার্চ।

মোহামেডান লিটারারি সোসাইটির মাধ্যমে নওয়াব আব্দুল লতিফের চেষ্টায় জাতি হিসেবে মুসলমানরা উনিশ শতকের সত্তরের দশকেই আরও কিছু সুবিধা অর্জনে সমর্থ হলো। ১৮৭১ সালের ৭ই আগস্ট ভারতের বৃটিশ সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলোকে নির্দেশ দিল যে, (ক) সকল সরকারী বিদ্যালয় ও কলেজে মুসলমানদের ধর্মীয় ও মাতৃভাষা শিখবার উৎসাহ দিতে হবে, (খ) মুসলিম অধ্যুসিত জিলা সমুহে স্থাপিত ইংরাজী বিদ্যালয়গুলোতে অধিকতর যোগ্য মুসলমান ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে, (গ) নিজেদের মাতৃভাষা শিক্ষা-বিদ্যালয় ও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য মুসলমানদের অধিকতর অর্থ সাহায্য দিতে হবে, (ঘ) নিজেদের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনার জন্যে মুসলমানদের অধিকতর উৎসাহ দিতে হবে।[২]

আজকের বিচারে এই পাওয়াগুলো হয়তো খুব বড় নয় কিংবা এর অন্য রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও হতে পারে। কিন্তু যখন বৃটিশ শাসন বিদ্রোহী জাতি মুসলমানদের পিষে ফেলতে ব্যস্ত এবং হিন্দুরা যখন জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মুছে ফেলতে মরিয়া, তখনকার সেই ঘোর অমানিশনার দিনগুলোতে জাতি হিসেবে মুসলমানদের এই আলাদা প্রাপ্তি মোটেই ছোট ঘটনা ছিল না। এই সিদ্ধান্তগুলোর মাধ্যমে অন্তত শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের আলাদা জাতীয় স্বীকৃতি ও স্বার্থ চিহ্নিত হয়েছিল। জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থানের ক্ষেত্রে এ ছিল এক পাতার এমন একটা চারাগাছ যা ক্রমে বহু পত্র, বহু শাখায় শোভিত হয়ে তার গর্বোন্নত মাথা উর্ধে বিস্তার করেছিল ১৯০৬ সালে ঢাকার শাহবাগে।

১। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমীন আহমদ, পৃষ্ঠা ৭৬, ৭৭।
২। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমীন আহমদ, পৃষ্ঠা ৭৭।

www.icsbook.info

এ সময় মুসলমানদের জন্যে আনন্দের আরেকটা ঘটনা ঘটল। নওয়াব আব্দুল লতিফ রোপিত উত্থানের চারাগাছটিতে সুবাতাস এসে লাগল। দৃশ্যপটে এলেন সৈয়দ আমীর আলী। তিনি ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন রাজনৈতিক সংগঠন 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন'। সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর দু'বছর আগে ১৮৭৬ সালে ভারতের জাতীয়তাবাদী জাগরণের নেতা বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি 'ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করলেন আনন্দ মোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী প্রমুখকে সাথে নিয়ে। এই ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে যোগদানের জন্য সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ আমন্ত্রণ জানালেন সৈয়দ আমীর আলীকে। কিন্তু দূরদর্শী আমীর আলী পদদলিত ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের জন্যে পৃথক সংগঠনের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে যোগদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে প্রতিষ্ঠা করলেন এই ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন। মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি থেকে এর প্রকৃতি ভিন্নতর হলো। সোসাইটি যেখানে বৃটিশের গায়ে হাত বুলিয়ে মুসলমানদের অধিকার আদায় করছিল, সেখানে ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন দাবি আদায়ের প্রেসার গ্রুপ হিসেবে রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। বলা যায় নওয়াব আব্দুল লতিফের জাতীয় উত্থানের চারা গাছটি সৈয়দ আমির আলীর হাতে এসে আরও শক্তি অর্জন করলো।

এ্যাসোসিয়েশনের সামনে আশু লক্ষ্য হয়ে উঠলো মুসলমানদের জন্য চাকরীর একটা অংশ সংরক্ষণ, চাকুরীর শর্ত হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উপর কম গুরুত্ব প্রদান, কভেনেনটেড সার্ভিসের পরীক্ষা একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত না করা, যে সব চাকুরী কনভেনেনটেড নয় সেগুলোর জন্যে কোন পরীক্ষা না নেওয়া এবং মুসলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি।[৩] এ্যাসোসিয়েশনের এ দাবীগুলো ক্রমশঃ সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮৪ সালের মার্চে ভাইসরয়ের সেক্রেটারীর কাছে লিখলেন, "সব থেকে বড় প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অসম বন্টন। এটা সব থেকে বেশী অসন্তোষ ও তিক্ততার জন্ম দিয়েছে এবং এই অবস্থা চলতে থাকবে যে পর্যন্ত না সরকার জোরের সঙ্গে এই নীতি নির্ধারণ করবেন যে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় চাকুরীর অন্তত এক তৃতীয়াংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।"[৪]

এই দাবী সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দেবার জন্যে সৈয়দ আমির আলী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করলেন এবং এ্যাসোসিয়েশনকে সর্বভারতীয় রূপ দেবার জন্যে এর নাম রাখলেন 'সেন্ট্রাল মোহামেডান ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন'।

৩। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ৫৫।

৪। 'The Emergence of Indian Nationalism', Anil Seal, Page 28 ('ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ৫৫)।

www.icsbook.info

১৮৮৮ সালের দিকে বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে এ্যাসোসিয়েশনের ৫৩টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হলো।

১৮৮০ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত অনেকগুলো ঘটনা সংঘটিত হলো। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরা মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে পৃথক প্রতিনিধিত্বের অধিকার পেল। এখন হয়তো একে খুব ঘটনা বলে মনে হবে না। কিন্তু সে সময় এটা ছিল পদদলিত ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের জন্যে একটা বড় রাজনৈতিক বিজয়। এ ছিল মুসলমানদের জাতি স্বাতন্ত্রের রাজনৈতিক স্বীকৃতি। হিন্দুরা এটা খুব ভালো করেই বুঝেছিল। ১৮৮৫ সালে গঠিত হলো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। যদিও বলা হতো, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমান সকলের, তবু কংগ্রেস নির্লজ্জভাবে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করল এবং যুক্ত নির্বাচন দাবী করল। অর্থাৎ কংগ্রেস পদদলিত ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের সমস্যার কোন আমল দিতে চাইল না। কংগ্রেসের এ ভূমিকা সম্পর্কে কলকতার 'মহামেডান অবজারভার' পত্রিকা ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে লিখল, "সরকারী চাকুরীতে নিযুক্তির জন্যে খোলাখুলিভাবে প্রতিযোগিতাকে নির্বাচনের একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণের উপর জোর দেওয়ার অর্থ সরকারী চাকুরী থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ বহিস্কার। --- সংখ্যালঘুদের অধিকার আছে তাদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখার। এবং আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই বলি যে, আমাদের লোকরা যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষা ও রাজনৈতিক বুদ্ধির দিক দিয়ে হিন্দুদের সমকক্ষ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের যথেষ্ট রক্ষাকবচ ব্যতীত সংখ্যাগুরুকে বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান সংখ্যালঘুর ধ্বংসই ডেকে আনবে।"[৫] স্যার সৈয়দ আহমদ 'মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' ডাকলেন ১৮৮৬ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর। এই সম্মেলনে তিনি মুসলমানদের জন্যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের মতই স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্যার সৈয়দ তার বিখ্যাত লাক্ষ্ণৌ বক্তৃতায় হিন্দুদের যুক্ত নির্বাচন দাবীর তীব্র বিরোধিতা করলেন। এ সময় কংগ্রেস উৎকট মুসলিম বিরোধিতা ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লে বিপদের আশংকায় স্যার সৈয়দ ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'মুসলিম প্রতিরক্ষা সমিতি' গঠন করলেন।

কিন্তু মুসলমানদের প্রতিবাদ, বিরোধিতা, ইত্যাদি কোন কাজেই এল না। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস গঠনের পর আবহাওয়া যেন পাল্টে গেল। কংগ্রেস গঠন ও হিন্দুদের জংগী উত্থানে বৃটিশ প্রশাসন যেন হিন্দুদের মন রক্ষায় পাগল হয়ে উঠল। ১৮৯২ সালে 'ইন্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট' পাশ হলো। আইন পরিষদ ও

৫। 'The Emergence of Indian Nationalism', Anil Seal, Page 321 ('ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', পৃষ্ঠা ৬৬)।

www.icsbook.info

ষ্ট্যাটিউটরী বডিতে পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বের নীতি ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হলো।

হিন্দু জাতীয় উত্থানের গতিতে ঝড়ের বেগ সঞ্চারিত হলো। ১৮৯৬ সালে শিবাজী উৎসব হিন্দু উত্থানকে মারমুখো এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত করল। ঠিক এই সময় ১৮৯৩ সালে মারা গেলেন নওয়াব আব্দুল লতিফ এবং ১৮৯৮ সালে মারা গেলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। আর এ সময় সৈয়দ আমীর আলীও বিলেত মুখো হলেন। ১৯০৪ সালে তিনি বসতি স্থাপন করলেন বিলাতে।

সবদিক থেকে ঘোর অন্ধকারে ডুবে গেল মুসলমানরা। মুসলমানদের জাতীয় উত্থানের যে চারাগাছটা গজিয়েছিল তা পড়ে গেল প্রচন্ড ঝড়ের কবলে। এই দুঃসহ অমানিশার মধ্যে একবছর, দুবছর করে দশটি বছর কাটিয়ে মুসলমানরা উপনীত হলো বিশ শতকের তৃতীয় বর্ষে। এই ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষিত হলো, যা আহত ব্যাঘ্রের মত জাগ্রত ও হিংস্র করে তুলল হিন্দুদের। এই মারমুখো উত্থান মুসলমানদের জন্যে শক-ট্রিটমেন্টের কাজ করল। মুসলমানরা আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করল। এই প্রয়োজন থেকে গড়ে উঠল তাঁদের এক ঐতিহাসিক দুর্গ। বাংলা চৌদ্দ শতকের শুরুতে সংঘঠিত এই ঘটনা বাংলা চৌদ্দ শতককে দান করল সুস্পষ্ট এক চরিত্র, নতুন এক গতি এবং অনন্য এক ইতিহাস। কি ছিল ইতিহাস সৃষ্টিকারী এই বঙ্গভঙ্গের ঘটনা?

বঙ্গভঙ্গ আসলে নিছক কোন বঙ্গ-ভঙ্গ ছিল না। প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে লর্ড কার্জন তৎকালীন বিশাল বাংলা প্রদেশকে দু'টি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। একেই খারাপ অর্থে চিত্রিত করার জন্যে হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ আখ্যায়িত করেছিল।

বঙ্গভঙ্গ বা এই প্রদেশ বিভাগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম ঘোষিত হলো ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর। সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনে ঘোষিত এ পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট এলাকাসহ সম্বলপুর, গাঞ্জাম ও ভিজাগাপত্তম এজেন্সী বাংলা প্রদেশের সাথে, অন্যদিকে বাংলার চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাকে আসাম প্রদেশের সাথে এবং ছোট নাগপুরকে মধ্য প্রদেশের সাথে যুক্ত করার কথা বলা হলো।

প্রদেশ বিভাগের এই পরিকল্পনা পরে আরও সংশোধিত ও পরিবর্তিত হলো। ১৯০৪ সালের এপ্রিলে লর্ড কার্জন যখন লন্ডন যান, তখনই তিনি বিষয়টির পুনর্বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলে গেলেন। কার্জন লন্ডন গেলে গভর্ণর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহন করলেন অ্যাম্পটহিল। তার সময়েই বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করল। ১৯০৪ সালের ৬ই ডিসেম্বর বঙ্গ বিভাগের নতুন পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত করা হলো। এই ডিসেম্বরেই কার্জন ফিরে এলেন লন্ডন থেকে। তিনি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং ১৯০৫ সারে ফেব্রুয়ারী মাসে

www.icsbook.info

তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে ভারত সচিবের কাছে প্রেরন করলেন। ইংলন্ডে একটি বিশেষ কমিটি প্রস্তাবটি পরীক্ষা করে দেখার পর ১৯০৫ সালের ৯ই জুন বাংলা বিভাগকে অনুমোদন দান করলো। অনুমোদিত এ পরিকল্পনা অনুসারে বাংলার রাজশাহী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মালদহকে চীফ কমিশনার শাসিত আসামের সাথে যুক্ত করে নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হলো। আর বাংলার অবশিষ্ট এলাকার সাথে সম্বলপুর ও উড়িষ্যার পাঁচটি এলাকা যুক্ত করে গঠিত হলো বালা প্রদেশ। হিন্দী ভাষা-ভাষী পাঁচটি এলাকা বাংলা প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্ত হলো গিয়ে মধ্যপ্রদেশের সাথে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে নতুন প্রদেশ বিভাগকে কার্যকরী করা হলো।

প্রদেশ পুনর্গঠনের পর পূর্ব বংগ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হলো ঢাকা। এই নতুন প্রদেশের লোক সংখ্যা দাঁড়ালো ৩ কোটি ১০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ালো ১ কোটি ৮০ লাখ, হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ২০ রাখ। অন্যদিকে বাংলা প্রদেশের লোক সংখ্যা দাঁড়ালো ৫ কোটি ৪০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৯০ লাখে, আর হিন্দুর সংখ্যা হলো ৪ কোটি ২০ লাখ। কোলকাতা হলো বাংলা প্রদেশের রাজধানী। এই প্রদেশ বিভাগের ফলে জাতি হিসেবে মুসলমানরা লাভবান হলো। একদিকে ঢাকাকে তারা রাজধানী হিসেবে পেল, অন্যদিকে ১৮৬৫৪০ বর্গমাইল বিশিষ্ট বিশাল প্রদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুর্শিদকুলিখান ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে সরিয়ে নেবার পর পূর্ব বাংলার প্রতি যে অবহেলা শুরু হয়েছিল এবং বৃটিশ আমলে কোলকাতা কেন্দ্রীক শাসনে পূর্ব বাংলার উপর দে দুর্দিন চেপে বসেছিল, তার প্রতিকারের একটা পথ হলো নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে। সচেতন সবার কাছেই পরিস্কার ছিল, রাজধানী থেকে বহুদূরের পূর্ব-বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল দুর্বল অদক্ষ এবং স্বাবাবিকভাবেই কার্যকর ও সক্রিয় ছিল না। জনকল্যাণ ও অগ্রগতির জন্যে যে অর্থ এ এলাকায় ব্যয় করা হতো তা ছিল বাস্তব প্রয়োজন অপেক্ষা নিতান্তই অপ্রতুল। এমনকি এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান সমস্যাকেও উপেক্ষা করা হতো। শিক্ষা ছিল অবহেলিত, যোগাযোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। কৃষকরা সাধারণত কলকাতায় বসবাসকারী জমিদারদের এজেন্ট ও কর্মচারীদের হাতে অত্যাচারিত হতো। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিক থেকেও এ অঞ্চল দারুণভাবে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম বন্দরের কোন উন্নতি না হওয়ার ফলে পূর্ব বাংলার বড় বড় নদী অঞ্চলকে ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের জন্য যথাযথ ব্যবহার করা হয়নি।'[৬] বঙ্গ বিভাগের মূলে পূর্ব বাংলার এ দুর্দশা দূরীকরণ চিন্তা যতটাই থাক, মূলত প্রশাসনিক সুবিধার

৬। 'বঙ্গ ভঙ্গ', মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২, ৩।

www.icsbook.info

জন্যে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়েছিল। লর্ড কার্জন এক চিঠিতে বলেছিলেন, "যে কোন ব্যক্তির (প্রশাসকের) পক্ষে বাংলার প্রশাসন পরিচালনা এক অসম্ভব ব্যাপার। "এ অবস্থায় প্রশাসন যে অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার তা অনুধাবনের জন্য শুধু তাকে জেলায় যেতে হবে।"[৭] সন্দেহ নেই, প্রশাসনিক সুবিধার দিকটা সামনে রেখেই সব বিরুদ্ধতাকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। বিভিন্ন স্তরে ভঙ্গ ভংগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যখন চরম পর্যায়ে ওঠে, তখনও উপদেষ্টারা লর্ড কার্জনকে পরামর্শ দেন যে, 'বিভিন্ন সংস্থা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা প্রশাসনিক স্বার্থ অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।'[৮] ইবেৎসন কার্জনকে বলেন, "বাংলার (প্রশাসনিক) স্বার্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর আসামের জন্যে তা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হয়, প্রশাসনিক প্রয়োজনে (সকল স্তরের) বিরোধিতা সত্বেও এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া উচিত।'[৯] কিন্তু কার্জন প্রশাসন তার সিদ্ধান্তের পক্ষে এ ধরনের যত যুক্তিই দিন, একটি মহল আজও বলছে লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তখনও বলা হয়েছিল, এখনও বলা হচ্ছে যে, একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করে ক্রমবর্ধমান হিন্দু প্রভাব ক্ষুন্ন করার মনোভাবই এর পেছনে কাজ করেছে। এই যুক্তির পক্ষে হিন্দু প্রভাব বৃদ্ধি সম্পর্কে বৃটিশ-ভীতির দৃষ্টান্তও তারা তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে তাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলো কার্জনের কাছে ভারত সচিব হ্যামিল্টনের একটি চিঠি। এ চিঠিতে হ্যামিল্টন লেখেন, "আমার মনে হয় আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর ভারতে আমাদের শাসনের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হয়ে যা দেখা দেবে, তা হলো পাশ্চাত্যের ঢং এ আন্দোলন সংগঠনের পর্যায়ক্রমিক অথবা ব্যাপক বিস্তার। আমরা যদি শিক্ষিত হিন্দুদের ভিন্নমুখী ভাবধারায় দুটি দলে বিভক্ত করতে পারি তবে উত্তরোত্তর বিস্তারের ফলে আমাদের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যে সূক্ষ্ম আক্রমণ আসছে তা প্রতিহত করতে পারব।"[১০] আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে উদ্বৃত করা হচ্ছে 'ভ্যালেন্টিন চিরোল'-এর রিপোর্টকে, যা তিনি লর্ড মিন্টোর কাছে পেশ করেছিলেন। ভ্যালেন্টিন চিরোল তার এ রিপোর্টে বলছে, "এটা নিসন্দেহ যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে 'অসন্তোষ' দানা বেধেছে তা প্রধানত কৃত্রিম, কিন্তু যা মূলত আমাদের ভীত সন্ত্রস্ত করে আর যা আমার নিকট অত্যন্ত অশুভ মনে হয় তা হলো পাশ্চাত্যের প্রভাব প্রতিপত্তি, বিশেষ করে এর আত্মিক ও নৈতিক, পার্থিব ও রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও সর্বাত্মক

৭। Curzon to Zroderiek, Feb, 17, 1904('বঙ্গ ভঙ্গ', মুনতাসির মামুন, পৃষ্ঠা ১৯)।

৮। 'Ibetson', Note, Feb 7, 1904 (Public A Proceedings's C.P. Vol-47, Para, 1-3 ('বঙ্গ ভঙ্গ', মুনতাসির মামুন, পৃষ্ঠা ১৩, ১৯)

৯। 'Ibetson', Note, Feb 7, 1904 (Public-Proceeding's, C.P. Vol-47, Para 7 ('বঙ্গ ভঙ্গ' মুনতাসির মামুন, পৃষ্ঠা ১৩, ১৯)।

১০। 'Hamilton to curzon', september 20, 1899 (Curzon papers, Vol-1)

www.icsbook.info

বিপ্লবের আন্দোলন। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী বিজয় নিঃসন্দেহে এ আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু এর মূল প্রোথিত আরও গভীরে। এ আন্দোলন এশিয়াব্যাপী প্রাচ্যের সব জাগরণের কোন ভারতীয় অভিব্যক্তি নয়, বরং এ আন্দোলন হলো প্রধানত হিন্দু (পুনর্জাগরণের) আন্দোলন। ত্রিশ বছর পূর্বে যখন আমি ভারতে এসেছিলাম তখন লক্ষ্য করেছিলাম, নতুন আশায় উদ্বেল নতুন ভারত বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে হতে চেয়েছিল ইংরেজদের চেয়েও ইংরেজ মনোভাবাপন্ন। পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও নীতি শাস্ত্র তথা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও শাসন ব্যবস্থাকে তখন বিনা দ্বিধায় শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো হয়েছিল। স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের আগ্রহ কমে আসায় আটের দশকে ঘড়ির দোলক যেন পেছনে ফিরেছে আর নয়ের দশকে তা হিন্দু পুনর্জাগরণের এক আন্দোলনে রূপ লাভ করেছে যার ফলে বেদ অনুশীলন, বাণী পুজা, গণপতিমেলা অনুষ্ঠান ও শিবাজী মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে আমরা বাংলা, দক্ষিণাত্যে ও পাঞ্জাবের মত তিনটি ঝটিকা কেন্দ্রে এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি।"[১১-ক] উপরোক্ত দু'টি উদ্ধৃতিতে ইংরেজদের যে উদ্বেগ-অনুভূতি, তার প্রত্যেকটি কথাই সত্য। হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মারমুখো রূপ নিয়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্য। যদিও এ আন্দোলনের টার্গেট ছিল মুসলমানরা তবে তা প্রয়োজনে বৃটিশ বিরোধীও হয়ে উঠতে পারে, একথা না বোঝার মত নাবালক ইংরেজরা ছিল না। বরং দুরদর্শী ইংরেজরা পঞ্চাশ বছর পরে কি হতে পারে সেটা সঠিকভাবেই অনুমান করেছিল। এ অনুমান যারা করতে পারেন, তারা বাংলা ভাগ করে এই পরিণতি ঠেকাতে চেষ্টা করবেন এ কথা বিশ্বাস করতে বলা কিন্তু একটা বালখিল্যতা ছাড়া আর কিছু নয়। বাংলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদী যে জাগরণ, তার স্রষ্টা কি শুধু বাংলাদেশের হিন্দুরা? তা যে নয় ইতিহাস এর সাক্ষী। হিন্দুবাদী জাগরণের যিনি জনক সেই স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বাংলা দেশের লোক নয়। দয়ানন্দ সরস্বতীর পর হিন্দুদের মারমুখো জাগরণের পতাকা যারা বহন করেন, সেই বাল গঙ্গাধর তিলক, লাল লাজপত রায়, প্রমুখের কেউই বাংলাদেশের নন,।[১১-খ] তারা দূরবর্তী প্রদেশ পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, প্রভৃতি থেকে এসে যদি বাংলার হিন্দু মনে জাগরণের আগুণ লাগিয়ে থাকেন, স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলন সৃষ্টি করতে পেরে থাকেন, তাহলে বাংলা ভাগ হলেই হিন্দু জাগরণ বন্ধ হয়ে যাবে- যারা এ ধরনের অবস্থা চিন্তা করেন, তাদের এ চিন্তাই প্রকৃতপক্ষে

১১-ক। Valentine Chirol to Minto, May23, 1910 (MTP Correspondence, Vol-11, no. 175).

১১-খ। বাংলার হিন্দু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতা শ্রী অরবিন্দ বাঙ্গালী হলেও তার প্রেরণা বাংলাদেশ থেকে নয়। শ্রী অরবিন্দ 'পশ্চিম ভারতীয় এক ঠাকুরের নিকট সন্ত্রাসবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তা বাংলায় চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।' ('অখন্ড বাংলার স্বপ্ন' আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৭৮) শ্রী অরবিন্দ বরোদা কলেজের অধ্যাপক থাকাকালে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গীত প্রাণ এবং মারাঠা দেশে এই আন্দোলনের নেতা দামোদর হরি চাপেকার ও বিষ্ণুহরি চাপেকার এর কাছে বিপ্লবের দীক্ষা নেন। (স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম, পুর্নেন্দ দস্তিদার, পৃষ্ঠা ৫৬)।

www.icsbook.info

উদ্দেশ্য প্রণোদিত। হিন্দু বাবু বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিই এরা চোখ বন্ধ করে উদগীরণ করতে চান।

লর্ড কাজনের কয়েকটি উক্তিকেও দলিল হিসেবে সামনে এনে বলা হয় যে, বঙ্গ-ভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এ ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের যে উক্তিটিকে সবচেয়ে বড় দলিল হিসেবে উদ্বৃত করা হয়, তাতে তিনি বলেন, "যারা নিজেদের একটি জাতি ভাবছে এবং স্বপ্ন দেখছে যে, ইংরেজরা বিতাড়িত হলেই কলকাতার গভর্ণমেন্ট হাউজে একজন বাঙ্গালী বাবুকে বসানো হবে, সেই বাঙ্গালীরা তাদের এ স্বপ্নের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে এমন কোন কিছুই বরদাশত করবে না। আজ আমরা যদি তাদের হৈ চৈ প্রতিরোধে দুর্বলতা প্রদর্শন করি, তাহলে বংগ বিভাগ আর কোন দিনই সম্ভব হবে না এবং এর দ্বারা তাদের এমন একটা সংহত ও শক্তিশালী করা হবে যারা ভবিষ্যতের জন্যে ক্রমবর্ধমান বিপদের উৎস হয়ে উঠছে আমাদের পূর্বাঞ্চলে।"[১২] প্রথমত কার্জনের এই কথাগুলো একটা জবাবী বক্তব্য। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষণার ২ মাস ৬ দিন পর লর্ড কার্জন এই কথাগুলো বলছেন। বলেছেন এমন সময় যখন তিনি তার পরিকল্পনার সপক্ষে জনমত তৈরীর জন্যে প্রচারে বেরিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষণার পর তিনি হিন্দু জমিদার ও বুদ্ধিজীবীদের যে আক্রমণের শিকার হয়েছেন, তার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছেন তিনি এখানে। তাঁর উপর যেমন রাজনৈতিক আক্রমণ হয়েছে, তিনি তেমনি তার রাজনৈতিক জবাব দিয়েছেন। এ যুক্তিগুলো প্রকৃতপক্ষে বিরোধীপক্ষকে ঘায়েল করার যুক্তি, বঙ্গভঙ্গের যুক্তি নয়। উপরের উক্তিটিতে কার্জন মূলত দুইটি কথা বলেছেন। এক, বাঙ্গালী বাবুদের টার্গেট কলকাতার গভর্ণর হাউজ অর্থাৎ বাংলার কর্তৃত্ব দখল করা এবং তাদের এ স্বপ্নকে তারা কোনভাবে খন্ডিত হতে দিতে রাজী নয়। দুই, তাদের দাবীর কাছে যদি নতি স্বীকার করা হয়, তাহলে তারা আরও সংহত ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। প্রথম উক্তির মধ্যে দিয়ে লর্ড কার্জন প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালী বাবুদের বাংলার রাজা হওয়ার স্বপ্নকে বিদ্রুপ করেছেন, বাংলা ভাগ করে তাদের উদ্দেশ্যকে বানচাল করা যাবে একথা তিনি বলেননি। এমন অযৌক্তিক কথা তিনি বলতেও পারেন না। কারণ বাংলা ভাগ হলেও কোলকাতার বাবুদের কোলকাতার গভর্ণমেন্ট হাউজে বাস অর্থাৎ ঐ বাংলার কর্তৃত্ব দখলে তাদের কোন অসুবিধা হতে পারে না। অতএব বাংলা ভাগ করে বাঙ্গালী বাবুদের উদ্দেশ্য বানচাল করতে পারছেন কই? লর্ড কার্জন তাঁর উক্তির দ্বিতীয় অংশে যে কথা বলছেন তার সারকথা এই যে, বাঙ্গালী বাবুদের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করে তাদেরকে আরও সংহত ও শক্তিশালী

১২। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী কার্জন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা যাওয়ার ফেরত ট্রেনে ভারত-সচিব ব্রোডরিককে এক কথাগুলো লিখেছিলেন।

www.icsbook.info

করা উচিত হবে না। বঙ্গ বিভাগের মাধ্যমে তাদের দুর্বল করা যাবে এ কথা তিনি এখানে বলেননি। বলা কোন দিক দিয়ে যুক্তিসংগত নয়। পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, যুক্তপ্রদেশ, বাংলা প্রভৃতি প্রদেশের হিন্দুরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে, তাহলে বাংলা ভাগ হলেই বাংলার হিন্দুরা দুর্বল হয়ে পড়বে কেন? ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর থেকে ১৯১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলা বিভক্ত ছিল। এই বিভক্তি হিন্দুদের ঐক্য ও আন্দোলনে কোনই বাধার সৃষ্টি করেনি, সামান্য দুর্বলও তাদের করেনি। তাদের শক্তি ও সন্ত্রাসের কাছে ইংরেজরা নতি স্বীকার করে এবং বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করে। সুতরাং হিন্দুদের জাতীয় জাগরণ ও উত্থান দমন করার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই বঙ্গ বিভাগ হয়েছিল এটা একটা গাঁজাখুরি যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

আসল কথা হলো, বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গ বিভাগ ছিল এখানকার বৃটিশ শাসকদের দীর্ঘ দিনের প্রশাসনিক চিন্তা-ভাবনার ফল। যা কার্যত শুরু ১৯৫৪ সালে। এ বছর বাংলার গভর্ণরের (লেটেন্যান্ট গভর্ণর) পদ সৃষ্টি করার সময় এ আশা পোষণ করা হয় যে, এর ফলে বাংলার প্রশাসন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। ১৮৬৭ সালে উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষের পর প্রণীত তদন্ত রিপোর্টে বাংলার আয়তন-জনিত প্রশাসনিক দুর্বলতাকে দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১৩] বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার উইলিয়াম গ্রে লরেন্সের নিকট লিখিত এক পত্রে বললেন, "বর্তমান বাংলা সরকারের মত এমন অস্বাভাবিক ব্যবস্থা ভারতে আর আছে বলে আমি জানি না। ভারতে আয়তনের দিক থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্তা আর গুরুত্বের দিক থেকে সর্বপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সরকারের কর্মক্ষমতা বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার অপেক্ষা অনেক কম ও শ্লথ।"[১৪] এই ভাবেই বঙ্গবিভাগের সুস্পষ্ট চিন্তা দানা বেধে উঠতে থাকে। উল্লেখ্য, এ সময় হিন্দুদের জাতীয়তাবাদী উত্থানের প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়নি। লেফটেন্যান্ট গর্ভনর গ্রে যখন এ চিঠি লেখেন, তারও নয় বছর পর ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, প্রমুখ হিন্দু নেতারা ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এরও নয় বছর পর ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেস। সুতরাং হিন্দুদের উত্থান প্রতিরোধ করার জন্যে বঙ্গবিভাগ চিন্তার উদ্ভব হয়নি। এছাড়া লর্ড কার্জন গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসার ২বছর আগে ১৮৯৬ সালে বঙ্গ বিভাগের সুস্পষ্ট প্রস্তাব প্রণীত হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ওল্ডহ্যাম ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুপারিশ করলেন যে, আসাম সহ চট্টগ্রাম ও ঢাকা

১৩। 'Yule's Minute, July 18, 1867, No. 1. Paras 11 and 11. Feres Munute. December ('বঙ্গভঙ্গ মুসনতাসির মামুন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৪, ১৫)।

১৪। 'Grey to Lawrence', July 1867 (John Lawrence Collection, Vol-46213)

www.icsbook.info

বিভাগের অংশবিশেষ নিয়ে পূর্ব বাংলা নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হওয়া দরকার।[১৫] চট্টগ্রাম অথবা ঢাকাকে তিনি এ নতুন নামে নতুন প্রদেশের রাজধানী করার কথা বললেন। এ বছরই নভেম্বর মাসে আসামের চীফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড আসামের সাথে চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সংযুক্তি করণের প্রস্তাব দিলেন।[১৬] উল্লেখ্য, এর আগে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লুসাই অধিবেশনের সুপারিশক্রমে চট্টগ্রাম জিলাসহ লুসাই অঞ্চলকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা অবশ্য তখন কার্যকরী হয়নি।[১৭] সুতরাং ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো, গভর্ণর জেনারেল হিসেবে লর্ড কার্জন আসার আগেই বঙ্গ বিভাগ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল। লর্ড কার্জন এই চিন্তা, প্রস্তাবকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন মাত্র। অতএব লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ তার রাজনৈতিক পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত একথা কোন দিক দিয়েই ধোপে টেকে না।

একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, অবহেলিত পূর্ব বংগের স্বার্থ সামনে রেখে প্রশাসনিক প্রয়োজনেই যদি বঙ্গভঙ্গ হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানরাও এর প্রতিবাদ করেছিল কেন, এ প্রশ্ন তোলার অবকাশ অবশ্যই আছে। বঙ্গভংগ পরিকল্পনা ঘোষিত হবার পর পূর্ব বাংলা থেকে প্রতিবাদ উঠেছিল। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পূর্ববঙ্গ থেকে উত্থিত মুসলিম নামীয় প্রতিবাদগুলোর সব ক'টিই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ঘোষণা (১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর) থেকে চূড়ান্ত বঙ্গ বিভাগ ঘোষণার (১৯০৫ সালের ১৬ ই অক্টোবর) মধ্যবর্তী সময়ের। চূড়ান্ত বঙ্গবিভাগ ঘোষণার পর এর বিরুদ্ধে কার্যত কোন মুসলিম প্রতিবাদ আমরা দেখি না। লক্ষ্য করার বিষয়, ১৯০৩ সালের বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনা এবং ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ এক জিনিস ছিল না। ১৯০৩ সালের ১২ ই ডিসেম্বর পরিকল্পনার মধ্যে মুসলিম আপত্তির কিছু কারণ ছিল।

১৯০৩ সালের পরিকল্পনায় আসামের সাথে চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে পূর্ববাংলা প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। যার ফলে ঢাকা বিভাগের একটা অংশ এবং গোটা রাজশালী বিভাগ পূর্ববঙ্গ প্রদেশ থেকে বাদ পড়েছিল। অর্থাৎ পূর্ববঙ্গও বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। পূর্ব থেকে উত্থিত আপত্তির কারণ ছিল এটা। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর চূড়ান্ত বঙ্গ বিভাগের

১৫। Commissioner of Chittagong, Division to Government of Bengal, Feb 7, 1896, No 722 P.L 1897 Vol. 24.

১৬। Chief Commissioner of Assm to Government of India, Nov, 25. 1896, No. 583, Page 17-19

১৭। The Proceedings of Government of India of the Foreign Departent 1883-E of July, 25. 1892, See also Lansdowne to cross. Janu. 6, 1892 (Teh Coross Collection, Eur. E, 243 Vol. 32-1.o.L.).

www.icsbook.info

এ আপত্তি দূর হয়ে যায়, গোটা ঢাকা ও রাজশালী বিভাগ পূর্ববঙ্গ প্রদেশের শামিল হয়ে যায়। মুসলমানরা এই চূড়ান্ত বঙ্গ বিভাগে খুশী হয় এবং একে স্বাগত জানায়।

সবচেয়ে বড় কথা হলো বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পূর্ব বঙ্গ থেকে যে সব প্রতিবাদ উত্থিত হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার উদ্যোক্তা মুসলমানরা ছিল না। 'পূর্ববঙ্গের প্রধান হিন্দু জমিদার ও 'ভদ্র লোক' নেতারাই এখানেকার প্রতিবাদ সভাগুলির আয়োজন করেছিলেন এবং কৌশলগত কারণে অনেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের সভাপতি করেছেন।'[১৮] বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঢাকায় প্রথম সে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তার সভাপতি ছিলেন ধানকোরার জমিদার হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী। এ সভায় বক্তৃতা করেন কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এবং উকিল আনন্দচন্দ্র রায়। পরে ঢাকায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জারী রাখার লক্ষ্যে গঠিত হয় 'জনসাধারণ সভা"। এ 'জনসাধারণ সভা' গঠনের প্রেরণা ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর 'ভারত সভা'। প্রধানত হিন্দু উকিলরা ছিলেন এর উদ্যোক্তা। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের প্রতিক্রিয়া নিয়ে সবচেয়ে উৎসাহী ভূমিকা পালন করে ঢাকার সংবাদ পত্র 'ঢাকা প্রকাশ।' 'তিল'কে সে 'তাল' করে প্রচার করত। পত্রিকাটি ছিল হিন্দু মালিকানাধীন এবং হিন্দু উত্থানবাদীদের আড্ডা। ১৯০৩ সালে বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা ঘোষনার পরপরই 'ঢাকা প্রকাশ' লিখল, "ভাই বঙ্গবাসী, এই বিষম বিপ্লব কর প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে, বাঙ্গালী জাতির কি সর্বনাশ সংঘটিত হইবে একবার তাহা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? ---- অতএব স্বদেশের জন্যে, স্বদেশীদের জন্যে, যে কোন বঙ্গ সন্তানের শ্রদ্ধা আছে তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য, এই প্রলংকর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জাতীয় অসন্তোষ চিহ্ন ভারত গভর্নমেন্টের নিকট স্থাপন করুন।"[১৯] এক সপ্তাহ পরেই পত্রিকাটি আবার লিখল, "রাজ পুরুষের কুটিল কটাক্ষ দেখিয়া ভীত হইওনা। পুরুষ পরম্পরাগত পৈত্রিক সম্পত্তি 'বাঙ্গালী' আখ্যা রক্ষার নিমিত্ত যদি আত্মোৎর্গে বিমুখ হও, তবে ধরা পৃষ্ঠা হইতে যত শীঘ্র তোমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, ততই মঙ্গল।'[২০]

'ঢাকা প্রকাশ'এর এই কণ্ঠ পূর্ববঙ্গের কণ্ঠ নয়, পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কণ্ঠ তো নয়ই। 'ঢাকা প্রকাশ' -এর কণ্ঠে ঢাকার কণ্ঠ নয়, কোলকাতার বাবু কণ্ঠ শ্রুত হয়েছে, শ্রুত হয়েছে সুরেন্দনাথ, অরবিন্দ প্রমুখের কণ্ঠ। সুতরাং 'ঢাকা প্রকাশ' ও তার মত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কণ্ঠ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কোন দিক দিয়েই পূর্ববঙ্গের সাথে যুক্ত হবার উপযুক্ত নয়।

১৮। 'বঙ্গভঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে প্রতিক্রিয়া', মুনতাসির মামুন (দ্রষ্টব্য 'বঙ্গভঙ্গ', পৃষ্ঠা ৭২)।
১৯। 'ঢাকা প্রকাশ' ডিসেম্বর ২০, ১৯০৩ (দ্রষ্টব্য 'বঙ্গভঙ্গ', পৃষ্ঠা ৬২, ৬৩)।
২০। 'ঢাকা প্রকাশ' ডিসেম্বর ২৭, ১৯০৩ (দ্রষ্টব্য 'বঙ্গভঙ্গ', পৃষ্ঠা, ৬৩)।

www.icsbook.info

বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মাধ্যমে হিন্দু মনোভাব এক যুগান্তকরী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। বাংলাদেশের হিন্দু উত্থান রোধের লক্ষ্য নিয়ে বঙ্গবিভাগ হয়নি এটা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু হিন্দুরা তাদের শোষণ ক্ষেত্র পূর্ববঙ্গ হারানো, পূর্ববঙ্গে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ ও সমৃদ্ধির সম্ভাবনা, কোলকাতার পশ্চাৎভূমি থেকে পূর্ববঙ্গের খসে পড়া এবং রাজধানী ঢাকা ও বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামের বিকাশ লাভকে বরদাশত করতে পারেনি। পারেনি বলেই হিন্দুরা একবাক্যে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরোধিতায় নেমে এল!

প্রথমেই মাঠে নামলেন 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক' বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। উল্লেখ্য, কোলকাতা কেন্দ্রীক ভদ্রলোক (বাবুশ্রেণী) ও বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে কোন মুসলমান ছিল না) জনমত গঠন ও তাদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মকান্ড সংগঠিত করার প্রধান দায়িত্ব ও নেতৃত্ব সুরেন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন।[২১] ১৯০৩ সালের ১২ ডিসেম্বর ভারত সরকারের সচিব রিজলীর বঙ্গবিভাগ সংক্রান্ত চিঠি প্রকাশ হবার সাথে সাথেই সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী তার কাগজ 'দি বেঙ্গলী'তে লিখলেন, "বাংলাকে খন্ডিত করণের প্রস্তাবের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি এবং আমরা নিশ্চিত যে গোটা দেশ একটা দেহের মত এর বিরুদ্ধে দাঁড়বে।"[২২] বাংলার জমিদার শ্রেণীর সংগঠন 'বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিবাদ সভা করল ১৯০৪ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে। এ প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করলেন উত্তর পাড়ার জমিদার, বেঙ্গল ও ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য প্যারীমোহন মুখার্জী। সভায় উপস্থিত ছিলেন নাটোরের জমিদারসহ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, সীতানাথ রায়, অম্বিকাচারণ মজুমদার, লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, প্রমুখ শীর্ষ হিন্দু ব্যক্তিত্ব। সভায় বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করে ভারত-সচিবের কাছে প্রেরিত স্মারক পত্রে বলা হলো,"বাঙ্গালী জাতিকে আলাদা আলাদা অংশে বিভক্তি করণ এবং তাদের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভাষাগত বন্ধনে ভাঙ্গন সৃষ্টি অঞ্চলের মানুষের সামাজিক বুদ্ধিবৃত্তিক ও বস্তুগত উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করবে।"[২৩] ১৯০৪ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বেঙ্গল চেম্বারস অব কমার্সের অনারারী সেক্রেটারী সীতানাথ রায় বাহাদুর এবং ১৯ শে মার্চ এই সংগঠনের সেক্রেটারী ডাব্লিউ পার্সন আর তাদের সংগে বৃটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের অনারারী সেক্রেটারী মহারাজ প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর ১৯ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে স্মারক লিপি পাঠান। এদের সাথে ভারতের শ্বেতাংগ চা ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী সংগঠন 'ইন্ডিয়ান টি

২১। সুরেন্দ্র নাথ সম্পর্কে দেখুন তার নিজের লেখাঃ A Nation in the Making, Calcutta, 1925.
২২। 'The Bengalee', December 13, 1903.
২৩। Papers Relating to the Reconstitution of Bengal and Assam, London, 190.

www.icsbook.info

এ্যাসোসিয়েশন', 'ক্যালকাটা বেলড জুট এ্যাসোসিয়েশন', এবং 'ইন্ডিয়ান মাইনিং এ্যাসোসিয়েশন' এর এ্যাসিষ্টেন্ট সেক্রেটারীদের চিঠিও শামিল ছিল। এভাবে কোলকাতা ভিত্তিক জমিদার, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী অর্থ্যাৎ 'পাওয়ার এলিট'দের সকলে একজোট হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করল। এর সাথে এসে যুক্ত হলো প্রবল রাজনৈতিক বিরোধিতাও। ১৯০৫ সালের ১০ই জানুয়ারী কোলকাতা টাউন হলে এক সম্মেলনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করল। এরপর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কোলকাতা টাউন হলের জনসভায় বৃটিশ পণ্য বয়কটের প্রস্তাব পর্যন্ত গ্রহণ করা হলো। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম' বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের রণহুংকারে পরিণত হলো। ১৯০৫ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন কালিঘাটের বিখ্যাত কালি মন্দিরে পুজা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৃটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নেয়া হলো।[২৪]এর দু'দিন আগে ২৪ ও ২৭ শে সেপ্টেম্বরের দু'টি জনসভায় সভাপতির ভাষণে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ হিসেবে বঙ্গবিভাগ বাস্তবায়নের দিন ১৬ই অক্টোবর 'রাখীবন্ধন' দিবস ঘোষণা করলেন।[২৫]

অন্যদিকে মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে আনন্দ ও উৎসবের মধ্য দিয়ে পালন করল। উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিভ্রান্তির পর মুসলমানরা বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনাকে জাতির জন্যে এক মহাসুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। বৃটিশ পার্লামেন্টের নেতা কেয়ার হার্ডিকে লেখা নবাব সলিমুল্লার এক চিঠির ভাষায় মুসরমানদের মনোভাব সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। ঐ চিঠিতে সলিমুল্লাহ লিখেছিলেন, "আমরা বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করছি। এটা আমাদের উপকারে আসবে। এ ব্যাপারে সামান্য কোন সন্দেহও নেই। বঙ্গবিভাগ মুসলমানদেরকে সংঘবদ্ধ করেছে এবং ফল স্বরূপ এখানে তারা গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের স্বার্থকে এখানে যত্নের সাথে দেখা হবে। পুনর্গঠিত জেলা প্রশাসনের অধীনে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি উৎসাহ লাভ করছে। আগের ব্যবস্থায় এটা সম্ভব ছিল না। কারণ প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুসারে যে মনোযোগ লাভের প্রয়োজন ছিল, তা আগের ব্যবস্থা দিতে পারেনি।"[২৬]

পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মুখপাত্র তখন ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ। বঙ্গভঙ্গের পক্ষ-বিপক্ষ আন্দোলনের কঠিন দিনে তিনি জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বঙ্গবিভাগের প্রথম বার্ষিকী হিন্দুরা উদযাপন করল 'জাতীয় শোক দিবস'

২৪। 'বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসিরমামুন সম্পাদি, পৃষ্ঠা ৫৬।
২৫। 'বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসিরমামুন সম্পাদি, পৃষ্ঠা ৫৬।
২৬। 'Keir Hardie and the first partition of Bengal' M.K.U Mollah. Appendix B. Rajshahi University Studies, Vol-iii,Januray, 1970, 1970, Page 18.

www.icsbook.info

পালনের মাধ্যমে। মুসলমানরা এদিন আনন্দ উৎসব করল বটে, কিন্তু তাদের কণ্ঠ ছিল দুর্বল। এই সময় একটা বড় ঘটনা ঘটল। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সবচেয়ে সোচ্চার কণ্ঠ মিঃ ফুলার পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। "ফুলার হিন্দু নেতাদের তীব্রতম আক্রমণের শিকার ছিলেন। সরকারী সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রমাণে তাঁর দৃঢ় প্রচেষ্টার জন্যে তিনি তাঁদের চক্ষুশূলে পরিণত হন। আন্দোলনের সংকট-মুহূর্তে তার পদত্যাগের অর্থ ছিল আন্দোলনকারীদের জয় এবং সরকারের নতি স্বীকার। ফুলারের পদত্যাগের সরকারী সিদ্ধান্তে মুসলমানরা বিস্মিত হলো এবং একে রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব প্রসূত বলে অভিহিত করল। ফুলারের পদত্যাগ এবং হিন্দুদের ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে মুসলমানরা সতর্ক হলো এবং বাংলা বিভাগের প্রতি কংগ্রেসের হুমকি মোকাবিলার জন্য ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকায় একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন।'[২৭] নবাব সলিমুল্লার এ সম্মেলন আহ্বান ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই তিনি এ সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল একটি 'সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ' (The Mohamedan All India confederacy) প্রতিষ্ঠা। এই মুসলিম সংঘ প্রতিষ্ঠার পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিলঃ এক, তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিহত করা। দুই, মুসলমানদের উপযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না থাকায় যে সব মুসলিম যুবক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে, পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান গঠিত হলে তারা রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতা ও সামর্থের পরিচয় দেবার সুযোগ পাবে। সলিমুল্লাহর এ পরিকল্পনা তার শত্রুরা যথাসময়েই জানতে পারল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা 'দি বেঙ্গলী' সলিমুল্লার পরিকল্পিত মুসলিম সংঘকে বিদ্রুপ করে লিখল, "মুসলমানদের সর্বভারতীয় সংঘের পরিকল্পনা আমাদেরকে পূর্বের মারাঠা সংঘ ও বালমা সংঘের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যখন তোষামোদের দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন এই প্রতিষ্ঠানের মূলমন্ত্র, তখন নবাব কি জন্যে এর এরূপ যুদ্ধংদেহী নাম রেখেছেন?"[২৯]

দি বেঙ্গলী নবাব সলিমুল্লাহ পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানকে বিদ্রুপ করলেও এই বিদ্রুপের মধ্যে তাদের ভয়ের ভাবটাই মুখ্য। তাদের এই ভীতিই নবাব সলিমুল্লার উদ্যোগের সঠিকতা প্রমাণ করেছিল।

নবাব সলিমুল্লাহ ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান গঠনের দিকে এগুচ্ছিলেন। এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের ব্যাপারে রাজশাহীর মোহাম্মদ ইউসুফ, কুমিল্লার নওয়াব আলী চৌধুরী, সিলেটের মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, ময়মনসিংহের আব্দুল হাই আখতার, বগুড়ার খন্দকার হাফিজ উদ্দীন, ধনবাড়ীর

২৭। 'বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসির মামুন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১০।

২৮। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', (নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ' অংশ) ইয়াসমিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৬৬, ১৬৭।

২৯। 'The Bengalee', December 16, 1906 ঐ।

www.icsbook.info

নওয়াব আলী চৌধুরী এবং বরিশালের এ, কে, ফজলুল হক প্রমুখ পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ নওয়াব সলিমুল্লাহকে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা দান করেন। এরাঁ সকলেই সলিমুল্লার রাজনৈতিক জীবনের সহচর ছিলেন। এছাড়া ভারতের সব মুসলিম নেতৃবৃন্দকে নওয়াব সলিমুল্লাহ তার পরিকল্পনার খসড়া পাঠিয়েছিলেন।

১৯০৬ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর ঢাকায় সম্মেলন বসল। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো নবাব সলিমুল্লাহর শাহবাগস্থ সুরম্য উদ্যানে। ভারতের সকল প্রদেশ ছাড়াও দেশের বাইরে থেকে প্রতিনিধি এ সম্মেলনে আসেন। প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি এসেছিলেন সম্মেলনে। প্রতিনিধিদের মধ্যে নবাব ভিখারুল মুলক, পাতিয়ালার খলিফা মুহাম্মদ হোসেন, হাকিম আজমল খান, লাক্ষ্ণৌর রাজা নওশাত আলী খান, খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, মওলানা শওকত আলী, ভূপালের মৌলবী নিযামউদ্দীন, নবাব মুহসিনুল মুলক, ডঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ, অমৃতসরের রাজা মুহাম্মদ ইউসুফ শাহ প্রমুখ শীর্ষ মুসলিম নেতৃবৃন্দ ছিলেন।

২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩০ শে ডিসেম্বরের সকাল পর্যন্ত শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। শিক্ষা সম্মেলনের সমাপ্তি অভিবেশনে ঘোষণা করা হলো, মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশন শেষে এক বিশেষ সম্মেলনে মিলিত হবেন।

সে অনুযায়ী শাহবাগের সে বাগানেই বিশেষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হলো। নবাব সলিমুল্লার প্রস্তাবক্রমে নবাব ভিখারুল মুলক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। সলিমুল্লার 'সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ' পরিকল্পনাকে ভিত্তি করেই আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। শুরুতেই সম্মেলনের সভাপতি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বললেন, "মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে।" উদ্বোধনী বক্তব্য শেষে নবাব ভিখারুল মুলক স্যার সলিমুল্লাকে তাঁর পরিকল্পনা পেশ করতে বললেন। নবাব সলিমুল্লাহ তার পরিকল্পনা পেশ করতে উঠে দেশের পরিস্থিতি, মুসলমানদের জাগরণ এবং বর্তমান প্রয়োজন বিষয়ে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। তিনি তার ঐতিহাসিক বক্তব্যের একাংশে বললেন,

"আপনার বহু অসুবিধা সত্ত্বেও দেশের দূর অঞ্চল থেকে এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে মিলিত হয়েছেন। এ মুহূর্তে আমাদের জন্য অধিকতর রাজনৈতিক তৎপরতার যে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে আমার বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যক নেই। দেশ ও সম্প্রদায়ের সাথে যাদের সম্পর্ক আছে তারা অবশ্যই অনুভব করেছেন যে, আমাদের জাতীয় জীবনে নবজীবনের স্পন্দর দেখা দিয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে এবং যে মুসলমানদের জীবন স্পন্দন এতদিন রুদ্ধ ছিল তাদের মধ্যেও

www.icsbook.info

আজ জাগরণের সাড়া পড়েছে। ---- বিলাতের দলীয় সরকার ভারতে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। এই কারণে যারা বেশী চিৎকার করতে পারে, তাদের কথাই শোনে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করে চলেছে। মুসলমানরা শান্ত-শিষ্ট থেকে কিছুই পায়নি। তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ------ প্রায় দশ বছর আগে স্যার সৈয়দ আহমদ যে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, পূর্ব বাংলার মুসলমানদেরবর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতিতে সেরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আজকের পরিস্থিতিতে তাদের সামনে চারটি পথ খোলা আছেঃ (ক) রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার কাজ সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া, (খ) রাজনীতিতে নেমে হিন্দুদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করা, (গ) হিন্দুদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়া এবং তাদের কার্যকলাপে নিজেদের শরিক করা, এবং (ঘ) মুসলমানদের নিজেদের জন্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করা।

মুসলমানরা তৃতীয় পথ অনুসরণ করতে পারে না, কারণ ১৮৮৭ সাল থেকে তারা কংগ্রেস তেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মুসলমানরা দ্বিতীয় পথও অনুসরণ করেনি। মুসলমানদের পরম শত্রুও বলতে পারবে না যে, মুসলমানরা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। ১৮৮৭ সাল থেকে মুসলমানরা প্রথম পথ অনুসরণ করে দেখেছে। কিন্তু রাজনীতিতে নিস্ক্রিয় থাকায় তাদেরকে খুব অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে।-- যুগধর্মের প্রেরণায় মুসলমানরা এক রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। বর্তমানে মুসলমানদের জন্যে সক্রিয় প্রচারণা, তাদের দাবী দাওয়া ও তাদের আশা-আকাঙ্খার অভিব্যক্তি ঘটানো এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব মুলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে। মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণই তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হবে। এতে বৃটিশ সরকারের প্রতি মুসলমানদের রাজভক্তি এবং প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের সদ্ভাব ব্যাহত হবে না। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানরা প্রয়োজনমত তাদের দাবী-দাওয়া সরকারের নিকট উত্থাপন করবে। ----- ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কোন স্বার্থের ব্যাপারে কোন রূপ সংঘাতের সম্ভাবনা নেই, কিন্তু তাদের মুখ্য স্বার্থের ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। মুসলমানদের পৃথক প্রতিষ্ঠান না থাকলে তাদের পক্ষে ন্যায্য অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে না।"[৩০]

এরপর নবাব সলিমুল্লাহ তার প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। হাকিম আজমল

৩০। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৬৯, ১৭০, ১৭১।

www.icsbook.info

খান, জাফর আলী সহ আরও কয়েকজন প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ

"ঢাকায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক এই সভায় 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করা যাচ্ছে। নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধন করা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ হবেঃ

(১) ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি রাজভক্তি উদ্রেক করা এবং সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হলে তা দূর করা।

(২) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার, স্বার্থ রক্ষা ও উন্নতির ব্যবস্থা করা।

(৩) সংস্থার উপরোক্ত উদ্দেশ্যাবলী অব্যাহত রাখা এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের মধ্যে যাতে বিদ্বেষ সঞ্চার না হয় তার ব্যবস্থা করা।"[৩১]

ঢাকার এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হলো।

নবাব ভিখারুল মুলক ও নবাব মুহসিনুল মুলক অল ইন্ডিয়া মুসলীম লীগের যুগ্ম-কর্ম সচিব নির্বাচিত হলেন। গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য গঠিত হলো ৬০ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রোভিশনাল কমিটি।

সম্মেলন শেষ হলো এবং সেই সাথে শুরু হলো মুসলমানদের এক ঐতিহাসিক যাত্রার। ১৮৬৩ সালে নওয়াব আব্দুল লতিফের হাতে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির মাধ্যমে নব পর্যায়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থাপনের যে চারাগাছ জন্ম লাভ করেছিল, সে গাছটি ১৮৭৮ সালে সৈয়দ আমির আলীর হাতে 'ন্যাশানাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশনের' মাধ্যমে মাটিতে শেকড় প্রোথিত করে, সেই চারা গাছটিই ঢাকার শাহবাগ উদ্যানে 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' এর মাধ্যমে মহীরুহের প্রকৃতি নিয়ে আকাশে মাথা তুলল। কংগ্রেসের মাধ্যমে এবং কংগ্রেসের আড়ালে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা যে ভয়াবহ ঝড় সৃষ্টি করেছিল, তা থেকে মুসলমানদের বাঁচার জন্যে এমন একটি মহীরুহের প্রয়োজন ছিল। মুসলিম লীগ গঠন হিন্দুদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। কুৎসতি ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল তারা। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত 'দি বেঙ্গলী' মুসলিম লীগকে 'সলিমুল্লাহ লীগ এবং 'সরকারের ভাতাভোগী ও তাবেদারদের সমিতি' বলে কটাক্ষ করল।[৩২]

বলাবাহুল্য মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থানের প্রত্যেকটি পদক্ষেপই এদের দ্বারা নানা রকম কটাক্ষ ও প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছিল। ১৮৬৩ সালের

৩১। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৬৯, ১৭০, ১৭১।
৩২। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমিন আহমেদ, পৃষ্ঠা ১৭২।

www.icsbook.info

'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' গঠন তাদের পছন্দ হয়নি। ১৯৭৮ সালের 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' গঠনকে তারা সাংঘাতিক বক্র দৃষ্টিতে দেখেছে। ১৮৮২ এর ইন্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট- এ মুসলমানরা মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের যে অধিকার লাভ করল তা তাদের মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়েছিল এবং তারা কংগ্রেসের মাধ্যমে আন্দোলন করে ১৮৯২ সালে তা বাতিল করিয়ে ছেড়েছিল। মুসলিম লীগ গঠনের তিন মাস আগে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগাখানের নেতৃত্বে নওয়াব মুহিসিনুল মুলক, বিলগ্রামী, নওয়াব আলী চৌধুরী, এ, কে ফজলুল হক সহ ভারতের ৩৫ জন মুসলিম নেতা সিমলায় ভাইসরয় মিন্টোর সাথে দেখা করে মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট দাবী পেশ করেছিলেন।[৩৩] এ দাবীগুলোর মধ্যে ছিল "(ক) সামরিক, বেসামরিক এবং হাইকোর্টে মুসলমানদের যথেষ্ট সংখ্যায় নিয়োগ, উচ্চ পদগুলোতে প্রতিযোগিতামুলক পরীক্ষা ব্যতীতই নিয়োগের ব্যবস্থা, (খ) মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিশ্চয়তা প্রদান, (গ) জনসংখ্যার অনুপাতে নয়, তাদের রাজনৈতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক কাউন্সিলে মুসলমানদের নির্বাচন, (খ) মুসলমানরা যাতে অগুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘুতে পরিণত না হয়, তার জন্য পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমানের ইম্পিরিয়াল লেজিস-লেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচন করা, এবং (ঙ) একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করা, যা হবে মসুলিম ধর্মীয় এবং বুদ্ধিগত জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ।"[৩৪] মুসলমানদের এই দাবী-দাওয়া পেশকে সাংঘাতিক বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। একে 'সাম্প্রদায়িক শো' নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এর সংগঠক নাকি ছিল বৃটিশ ভারতীয় সরকার।[৩৫] এমন কি কংগ্রেস কর্মী শিবলী নোমানী পর্যন্ত বলেছিলেন, "আমরা সিমলা ডেপুটেশনের কোন অর্থ বুঝি না। সাম্প্রদায়িক মঞ্চে ছিল এটা সর্ববৃহৎ শো।"[৩৬] অথচ সিমলা ডেপুটেশন ইতিবাচক ফল ডেকে এনেছিল মুসলমানদের জন্যে। সিমলা ডেপুটেশনের কাছে লর্ড মিন্টো মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের দাবী মেনে নেয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। এই আশ্বাস কার্যকরী হয়েছিল ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে। এই সংস্কারে মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেয়া হয়। মুসলমানদের এই সুবিধা লাভও হিন্দুদের

৩৩। বঙ্গ-ভঙ্গের প্রশ্নটি সিমলা সম্মেলনে তোলা না তোলা নিয়ে মতান্তর হওয়ায় নওয়াব সলিমুল্লাহ সিমলা প্রতিনিধি দলে শামিল হননি। তবে সব দাবী দাওয়ার সাথে তিনি একমত ছিলেন এবং প্রতিনিধিদল লর্ড মিন্টোর জন্যে নওয়াব সলিমুল্লার এক দীর্ঘ চিঠি নিয়ে যায়।

৩৪।, 'History of the Freedom Movement in india', By Trarachand, Page 394 (বদরুদ্দীন ওমরের 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন'- এ উদ্বৃত, পৃষ্ঠা ৮৬, ৮৭)।

৩৫। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন ওমর, পৃষ্ঠা ৮৮।

৩৬। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন ওমর, পৃষ্ঠা ৮৮।

www.icsbook.info

প্রবল বৈরিতার সম্মুখীন হয়। ১৯০৯ সালেই কংগ্রেস তার এক প্রস্তাবে 'মহামান্য বৃটিশ সম্রাটের ভারতীয় প্রজাদের মুসলিম ও অমুসলিম সংজ্ঞায় বিভক্ত করাকে অন্যায়, বিদ্বেষপ্রসূত ও অপমানকর বলে অভিহিত করে।'[৩৭] অর্থাৎ কংগ্রেস মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থান তো দূরে থাক, জাতি হিসেবে মুসলমানদের নাম পর্যন্ত বরদাশত করতে রাজী ছিল না। কারণ এই যে, জাতি হিসেবে মুসলমানদের নাম উচ্চারিত হলে, তাদের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি দিতে হয়। কংগ্রেস তা দিতে রাজী ছিল না। সে চাইছিল, মুসলামানরা তাদের স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় অর্থাৎ বৃহত্তর হিন্দু জাতি দেহে লীন হয়ে যাক। বিস্ময়ের ব্যাপার, এ সময় কংগ্রেসী মুসলমানরাও হিন্দুদের এ চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল। তারা হিন্দুদের মতই বিরোধিতা করছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থান প্রচেষ্টার। কংগ্রেস নেতা হিসেবে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার মত লোকও মর্লি-মিন্টো সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু বিরোধিতা নয়, ১৯১০ সালে কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে মর্লি-মিন্টো সংস্কারের উল্লেখিত পৃথক নির্বাচন ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থার বিরোধিতা করে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তার উত্থাপক ছিলেন কায়েদে আযম এবং জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে যিনি এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন তিনি একজন মুসলিম, বিহারের জননেতা মৌলভী মজহারুল হক।[৩৮] অবশ্য কংগ্রেসের স্বরূপ ধরতে এবং নিজেদের ভুল বুঝতে এই সব মুসলমানের খুব বেশী দেরী হয়নি। যে জিন্নাহ মুসলমানদের স্বতন্ত্র অধিকার অর্জনের নিন্দা করে কংগ্রেস সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, সেই জিন্নাহই মাত্র কয়েক বছর পর কংগ্রেস নেতাদের মুখের উপর 'আপনারা কি চান না যে, মুসলিম ভারত আপনাদের সাথে এগিয়ে যাক, সংখ্যালঘুদের কি সংখ্যাগুরুদের দেবার মত কিছুই নেই?' বলে অশ্রুসজল চোখে কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।[৩৮-ক]

মুসলমানদের স্বতন্ত্র উত্থানের যাত্রা ছিল সেদিন অত্যন্ত কঠিন। একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রচন্ড বিরোধিতা, অন্য দিকে কংগ্রেসী কিছু মুসলমানদের বাধা। এই দুয়ের মোকাবিলা করে সামনে এগুতে হয়েছিল উত্থানবাদী মুসলমানদের। মুসলিম লীগ গঠিত না হলে মুসলমানদের পক্ষে এই এগুনো সম্ভব হতো না। মুসলিম লীগ সে সময় যুদ্ধক্ষেত্রের পতাকার মত মুসলমানদের অস্তিত্ব, উপস্থিতি ও উত্থানের কথা ঘোষণা করছিল। নির্যাতিত মুসলমানরা জেগে উঠেছিল' সমবেত হয়েছিল একে কেন্দ্র করেই। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অশ্রু সজল চোখে কংগ্রেস থেকে বিদায় নিয়ে শক্তিশালী করেছিলেন মুসলিম লীগকেই। সবচেয়ে বড় কথা, মুসলিম লীগ গঠনের মাধ্যমে মুসলমানরা

৩৭। 'ইতিহাস অভিধান', (ভারত), যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৬৩।
৩৮। 'নেহেরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা ৪৩ ('স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৪)।
৩৮-ক। 'নেহেরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা ৪৩ ('স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১০৩, ১০৪)

www.icsbook.info

একথা সোচ্চার কণ্ঠে বলে দিয়েছিল, ভারতে মুসলমান নামে একটা জাতি আছে যাদের অস্তিত্ব ও দাবী অস্বীকার করা যাবে না।

মুসলিম লীগের প্রাথমিক বছরগুলো সংগ্রামের চেয়ে আত্মগঠনের সময় হিসেবে ব্যয়িত হলো। মুসলিম লীগের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো করাচীতে ১৯০৭ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর। সভাপতিত্বে করলেন বোম্বাই এর স্যার আদমজী। এ সম্মেলনে গঠনতন্ত্র চূড়ান্ত করা হলো। এই ১৯০৭ সালেই নবাব মুহসিনুল মুলক মারা গেলেন এবং নবাব ভিখারুল মুলক আলীগড় কলেজের কর্ম-সচিব নিযুক্ত হওয়ায় মুসলিম লীগের কর্ম-সচিবের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলেন। ১৯০৮ সালের ১৮ই মার্চে আলিগড় কলেজে মুসলিম লীগের একটি বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এ সম্মেলনে আগাখান লীগের স্থায়ী সভাপতি এবং সৈয়দ হোসেন বিলগ্রামী মুসলিম লীগের কর্ম সচিব নির্বাচিত হলেন। সৈয়দ আমীর আলী ১৯০৮ সালের ৬ই মে লন্ডনে মুসলিম লীগের শাখা প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯০৮ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অমৃতসরে অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতিত্ব করলেন সৈয়দ আলী ইমাম। এ সম্মেলন লর্ড মর্লির প্রস্তাবিত সংস্কার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা হল যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব ও সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। মুসলিম লীগের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হলো দিল্লীতে ১৯১০ সালের ২৯ শে জানুয়ারী সভাপতিত্বে করলেন আর্কটের যুবরাজ স্যার গোলাম মাহমুদ আলী খান। সৈয়দ মাহমুদ হোসেন বিলগ্রামী ভারত সচিবের পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় এ সম্মেলন লীগের মহাসচিব নির্বাচিত করলো মৌলবী মুহাম্মদ আজিজ মির্যাকে। লীগের সদর দফতর আলিগড় থেকে লাক্ষ্মৌতে স্থানান্তরিত হলো। মুসলিম লীগের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন সৈয়দ নাজিবুল্লার সভাপতিত্বে ১৯১১ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর নাগপুরে অনুষ্ঠিত হলো। লীগের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ১৯১২ সালের ৩রা মার্চ কোলকাতায় বঙ্গভঙ্গ রদের বিষাদময় পরিবেশ। এতে সভাপতিত্ব করলেন ভগ্নহৃদয় ও ভগ্নস্বাস্থ্য নবাব সলিমুল্লাহ। তিনি তার ভাষণে বেদনার সাথে পুনরুক্তি করলেন, 'বঙ্গভঙ্গ রদ পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মনে দারুন আঘাত করেছে এবং তাদের ঘরে ঘরে করেছে বিষাদের সঞ্চার।' এই সাথে নবাব সলিমুল্লাহ ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সরকারী ঘোষণায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন।[৩৯] এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হিন্দুদের বিরোধিতার তিনি তীব্র নিন্দা করলেন। নবাব সলিমুল্লাহ তার ভাষণে

৩৯। বঙ্গভঙ্গ রদের পর ১৯১২ সালের ৩১ শে জানুয়ারী বড়লাট মুসলমানদের সান্ত্বনা দেবার জন্যে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেন এবং ২রা ফেব্রুয়ারী সরকারী এক ইশতিহারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন।

www.icsbook.info

মুসলমানদের শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ, বিশেষ সুবিধা এবং ব্যবস্থাপক সভা ও স্থানীয় স্বায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দাবী করলেন। নবাব সলিমুল্লার ভগ্ন হৃদয়-উত্থিত এই কথাগুলোকে বিদায়কালীন বেদনাময় এক আর্তির মত শোনাল। বঙ্গভঙ্গ রদে আহত নবাব সত্যিই বিদায় নিলেন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে। ভগ্নস্বাস্থ্য সলিমুল্লাহ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন। জীবনের অবসরও তার ঘনিয়ে এল। ১৯১৫ সালে ১৬ই জানুয়ারী তিনি ইন্তেকাল করলেন। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু নির্যাতিত জাতিকে জাগিয়ে গেলেন।

অনেকে মুসলিম লীগের এই প্রথম পর্যায়কে ইংরেজ অনুগত অভিজাত ও জমিদার -নবাব অধ্যুসিত বলে কটাক্ষ করেন।[৪০] কিন্তু ইতিহাস বলে, এর চেয়ে হাজারগুণ বেশী আনুগত্য নিয়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ হয়েছিল। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব ইংরেজের প্রতি যে আনুগত্য দেখিয়েছিল, সেটা ছিল সেই সময়ের বাস্তবতা। এই বাস্তবতা অস্বীকার করে হিন্দুদের মোকাবিলায় মুসলমানদের সামনে এগুনো সম্ভব ছিল না। যারা সেই সময়ের মুসলিম অভিজাতও নবাব-জমিদারদের নেতৃত্বকে কটাক্ষ করেন, তারা হয় অজ্ঞ, নয়তো এক শ্রেণীর হিন্দুর মত বিদ্বেষ দৃষ্টিতে মুসলিম উত্থানের ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করেন। বাস্তবতা হলো, মুসলিম অভিজাত, নবাব জমিদাররাই তখন ছিলেন মুসলিম জনগণের নেতা এবং মুসলিম জনতার কণ্ঠ। তাদের নেতৃত্ব ছিল স্বাভাবিক ও সময়ের দাবী। এ দাবী পুরণ করে তারা জাতিকে ধন্য করেছেন। আজকের পর্যালোচনায় দোষ-ত্রুটি হয়তো আমরা খুঁজে পাব, কিন্তু তাঁরা এগিয়ে না এলে মুসলিম লীগের মত সংস্থা গঠন, মুসলমানদের জাতীয় উত্থান কিছুতেই সম্ভব হতো না, কিছুতেই হয়তো সম্ভব হতো না বাংলাদেশের মত মুসলিম আবাস ভুমির প্রতিষ্ঠা।

৪০। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ৯৭।

www.icsbook.info

৩

সংখ্যাগুরুর সংহার মূর্তি

বিশ শতকের শুরুতেই হিন্দুদের জাতীয় আন্দোলন সশস্ত্র বিপ্লবী রূপ নিল। ১৯০২ সালেই যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কোলকাতায় সার্কুলার রোডে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলো। আমরা ১৮৯৬ সালে শিবাজী উৎসবের মধ্যে হিন্দু-উত্থানের যে মারমুখো প্রবণতা দেখেছি এবং বালগঙ্গাধর তিলকের ঘোষণায় হিন্দুদের হিংসাত্মক উত্থানের যে ইংগিত পেয়েছি, তারই আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো 'গুপ্ত সমিতি'র মাধ্যমে। কংগ্রেসের ছায়াতেই এই আন্দোলন চলল। কংগ্রেসের জনশক্তি এবং কংগ্রেসের অনেক নেতা-কর্মী অব্যাহত ভাবে এ আন্দোলনে শক্তি-সঞ্চার করেছে।

বিপ্লবী এ গুপ্ত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী অরবিন্দ। শ্রী অরবিন্দ তাঁর কর্মস্থল বরোদা থেকে বাংলাদেশে বিপ্লবী কর্মতৎপরতা পরিচালনার জন্যে ১৯০১ সালে পাঠান যতীন্দ্রনাথ বন্দোপ্যাধ্যায়কে এবং এর কিছু পরে পাঠান তার ভাই বারীন ঘোষকে।

১৯০২ সালে কোলকাতার সার্কুলার রোডে যে গুপ্ত সমিতি গঠিত হলো, তার পরিচালনার জন্যে ছিল পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি। কমিটির সভাপতি ছিলেন ব্যারিষ্টার প্রমথ নাথ মিত্র, সহসভাপতি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস, আর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথের) পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১] কোলকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবার পর ধীরে ধীরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও অনুরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো। সমিতির কেন্দ্রগুলোতে শরীর চর্চার সাথে সাথে রাজনৈতিক পাঠও নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। 'এই বিপ্লবী দলের একটা প্রতিজ্ঞাপত্র ছিল এবং তা ছিল সংস্কৃতি ভাষায়। সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করতে হলে প্রত্যেককে উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতে হতো। শর্ত ছিল- "ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে।'[২] প্রতিজ্ঞার এই শর্ত থেকে পরিস্কার, এই বিপ্লবী গুপ্ত

১। 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর পত্রিকার দান', উমা মুখোপাধ্যায়, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০।
২। 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর পত্রিকার দান', উমা মুখোপাধ্যায়, হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১১।

www.icsbook.info

আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। এখানে উল্লেখ্য, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত এই বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলন অতীতের হিন্দু রাজনীতিরই এক ধারাবাহিকতা। উনবিংশ শতকেও হিন্দুদের এই ধরনের আন্দোলনের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। ১৮৭৯ সালে পূনার চিত পাবন ব্রাহ্মণদের একজন শ্রী বাসুদেও বলবন্ত নিজেকে দ্বিতীয় শিবাজীর মন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করলেন এবং ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহারাষ্ট্রের পাহাড়িয়া এলাকায় গিয়ে এক সৈন্য বাহিনী গড়ে তুললেন। দীর্ঘ চার বছর ধরে তিনি ইংরেজদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালালেন। কিন্তু হিন্দুরাজ কায়েম হলো না। ব্যর্থ হলেন তিনি। ব্যর্থ হলেন বটে, কিন্তু হিন্দু মানসে তিনি সৃষ্টি করলেন এক বুক ভরা আশা এবং প্রেরণা। সেই প্রেরণায় জেগে উঠেছিলেন বিষ্ণুহরি চাপেকার নামে এক যুবক কবি। তিনিও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন হিন্দুরাজ কায়েমের। তার শিক্ষা, তাঁর দেশ প্রেমমূলক কবিতা মানুষের মধ্যে চেতনার জোয়ার সৃষ্টি করেছিল। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, বাল গঙ্গাধর তিলক, প্রমুখ এই ধারারই দিকপাল। সবাই শিবাজীর একনিষ্ঠ উত্তরসূরী। গান্ধী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীরা এই ধারারই ছদ্মবেশী নট। কিন্তু শ্রী অরবিন্দরা এলেন শিবাজীর কোষমুক্ত কৃপাণ হয়ে।

কিন্তু ১৯০২ সালে বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি বাংলাদেশে তার যাত্রা শুরু করলেও খুব বেশী এগুতে পারল না, গণমানুষের কাতারে এসে দাঁড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। বংগ ভঙ্গ পরিকল্পনা ঘোষণার পর এই সুযোগ তাদের এল। নতুন ভাবে গা ঝাড়া দিল গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি। গঠিত হলো নতুন প্রয়োজন পূরণের জন্যে নতুন সমিতি। বংকিমী আদর্শের অনুকরণে তার নাম দেয়া হলো 'অনুশীলন সমিতি।'[৩] গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির ব্যারিষ্টার পি, মিত্র হলেন এরও সভাপতি। এইভাবে কার্যত এক হয়ে গেল বিপ্লবী সমিতি ও অনুশীলন সমিতি। বঙ্গভঙ্গ রদে বৃটিশকে বাধ্য করার জন্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ১৯০৫ সালের আগস্টে 'বৃটিশ পণ্য বর্জন' করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাধ্যমে প্রবল 'স্বদেশী আন্দোলন' এ রূপ নিল। এই 'স্বদেশী আন্দোলন এর অস্ত্রে পরিণত হলো গুপ্ত সমিতি বা অনুশীলন সমিতি। এ অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ল সবখানে। 'বাংলার শহরে মফঃস্বলে প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন নতুন আখড়া, ব্যায়ামাগার ও সমিতি এবং যুবকের দল দেশোদ্ধারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রহণ করলো এর সভ্যপদ। ১৯০৫ সনের নভেম্বরে পি. মিত্রের উৎসাহে পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে গুপ্ত সমিতির যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হলো সেখানেও মুষ্টি যুদ্ধ, ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, ব্যায়াম, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার দেয়া প্রভৃতি শিক্ষা দেয়া হতো। কলিকাতা অনুশীলন সমিতি ও ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভাপতি ছিলেন ব্যরিষ্টার পি, মিত্র। রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্রুত গতির সাথে তাল রেখে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় ক্লাব ও

৩। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃষ্ঠা ১২।

www.icsbook.info

আখড়া প্রতিষ্ঠিত হলো। সেগুলিও ছিল কলকাতাস্থ অনুশীলন সমিতির অন্তর্ভূক্ত। সতীশ বসু (কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সেক্রেটারী) ও পুলিন দাস (ঢাকা অনুশীলন সমিতির সেক্রেটারী) উভয়কেই বলা হয় বৈপ্লবিক দলের প্রথম ধারার প্রতিনিধি। এই দুই নেতার নেতৃত্বে বাংলায় হাজার হাজার যুবক তৎকালে শক্তিযোগের সাধনায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। শক্তিযোগী বাংগালীর নতুন চরিত্র ও মেজাজ লক্ষ্য করে সেদিন সারা ভারতবর্ষের লোকেরা বিস্ময়াভিভুত হয়েছিল।[৪]

বলা যায়, "১৯০৫ এর আগস্ট মাসে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে বাংলার মরা গাঙ্গে নতুন ভাব, আবেগ ও কর্মের জোয়ার এলো। এই জোয়ারে তরী ভাসালেন রবীন্দ্রনাথও। রবিকণ্ঠ থেকে বের হলো 'জয় মা বলে ভাসা তরী'। প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় সরকার বলেছেন, 'শব্দই হোক আর বস্তুই হোক -দুইয়েই ছিল লাখ লাখ মানুষের স্বার্থ আকাঙ্খা, স্বপ্ন, ভাবুকতা আর কৃতিত্ব, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবত্তা ও স্বার্থত্যাগ মাখানো। অসংখ্য বাঙ্গালীর সুরও বদলে গেল। মেজাজ বদলে গেল। বাঙ্গালী সেদিন ভারতের জন্য স্বরাজ চাইলো, কারণ স্বরাজের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীদের জীবনে ঘটবে পুনরুজ্জীবন। এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে বাঙ্গালী সেদিন নতুন তেজ ও নতুন সংকল্প নিয়ে স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হলো।[৫] "স্বদেশী আধুনিক বাঙলার ইতিহাসের প্রথম ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন যা বাঙলার সমাজ কাঠামোকে দীর্ণ করেছিল বিপুল ঘটনা বিস্তার ও অর্ভতপূর্ব হিংস্রতা ও স্ববিরোধী চরিত্র প্রকাশ করেছে। বাঙলাদেশে পরবর্তীকালের সব রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্বসূরী ও পথিকৃত ছিল স্বদেশী। বাঙালী জাতির ভবিষ্যতও নির্ধারণ করেছিল বহুজাত স্বদেশী আন্দোলন। এ যুগে ভদ্রলোক শ্রেণীর নতুন নেতা হলেন 'র‍্যাডিকাল বিপিন' বিপিন চন্দ্র পাল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ ও বিখ্যাত চিত্তরঞ্জন দাস। গুপ্ত সমিতি, রাজনৈতিক হত্যা ও সন্ত্রাবাদ, ব্যক্তিগত বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মোসর্গ, অসহযোগ, সত্যাগ্রহ, ধর্মঘট, বন্ধ, পিকেটিং, অনশন, প্রভৃতি রাজনৈতিক কলা কৌশল স্বদেশী যুগেরই অবদান। স্বদেশীর প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বাংলায় জন্ম হয়েছিল মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা।"[৬] স্বদেশী আন্দোলনের এ ঢেউ সেদিন আরও অনেকেরই মুখোশ খুলে দিয়েছিল। 'মহান জাতীয় নেতা' বলে কথিত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর আচরণেও 'স্বদেশী'র হিন্দু চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর কলিঘাটের বিখ্যাত কালিমন্দিরে পুজা

৪। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃষ্ঠা ১৩, ১৪।

৫। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃষ্ঠা ১২, ১৩।

৬। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃষ্ঠা ৫৫, ৫৬।(আর দ্রষ্টব্যঃ 'The Swadeshi Movement of Bengal 1903-1904, Sumit Sarker এবং 'Elite Conflict in plural society'-J.H. Broomfield. এছাড়া 'স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী বাংলায় সমাজতন্ত্র', Chapter.VII).

www.icsbook.info

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বদেশীরা আন্দোলনের শপথ গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে বৈদ্যবাটির কালিমন্দিরেও স্বদেশীরা শপথ নেয়। মন্দিরে এই শপথ নেয়ার উদ্যোক্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখছেন, "আমি কথা বলছিলাম যখন, আমার চোখ মন্দির এবং প্রতিমার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। পারিপার্শ্বিকতা আমার হৃদয়কে আবেগে পূর্ণ করে তুলেছিল। হঠাৎ আমি আবেদন জানালাম জনতার প্রতি, আপনারা উঠুন, চলুন, আমরা আমাদের পূণ্য দেবতার কাছে গিয়ে শপথ গ্রহণ করি। মন্দিরে শপথ বাক্য আমিই পাঠ করিয়েছিলাম। আমি শপথ বাক্য বলছিলাম, আর জনতা দাঁড়িয়ে আমার কথার পুনরাবৃত্তি করছিল।"[৭]

স্বদেশীদের এই চরিত্র স্পষ্ট হবার পরও প্রশ্ন থেকে যায়, 'বাঙালীর' শক্তিযোগী বা সামরিক এই উত্থানের লক্ষ্য কি? স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন কি ছিল? স্বদেশীদের যে স্বপ্ন 'স্বরাজের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীদের জীবনে ঘটবে পুনরুজ্জীবন' সেই জীবনের স্বরূপটা কি?

এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আন্দোলনের নেতা শ্রী অরবিন্দ ঘোষ। এ জবাব দিয়েছেন তিনি তাঁর লিখিত "ভবানী মন্দির' শীর্ষক পুস্তিকায়। 'অরবিন্দ চাইলেন ভারতের কোনও এক পর্বত শীর্ষে আরাধ্য দেবী ভবানীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। বহু দিনের পরাধীনতার পরিণামে যে ক্লৈব্য ও তামসিকতা ভারতবাসীর মানসকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তার কবল থেকে জনমানসকে মুক্ত করে অরবিন্দ সেখানে ক্ষাত্রতেজের বহ্নিশিখা প্রজ্জলিত করতে চাইলেন। তাই তিনি সেদিন শান্তির ললিত বাণি উচ্চারণ না করে জাতির নয়ন সম্মুখে তুলে ধরলেন শক্তি রূপা ভবানীর মূর্তি।[৮] এই ভবানী শিবাজীরও আরাধ্য। শিবাজীর হাতের খড়্গ ছিল ভবানীর প্রিয় এবং খড়্গের কারণে শিবাজীও ছিলেন ভবানীর প্রিয়।[৯] খড়্গ-হস্ত শিবাজীকে রঘুপতি যোজনা করেছিল যবনদিগের বিরুদ্ধে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে।[১০] শ্রী অরবিন্দও শিবাজীর এ খড়্গ তুলে দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের হাতে, স্বদেশীদের হাতে। লক্ষ্য ঐ একই, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা।[১১] বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা এবং স্বদেশী আন্দোলন ছিল এই লক্ষ্য অর্জনের উপলক্ষ। এই কথাটা 'যুগান্তর' পত্রিকার 'ধর্ম্মরাজ্য ও মহারাজা শিবাজী' নিবন্ধে সুন্দরভাবে স্বীকার করা হয়েছে এইভাবে, "ধর্ম রাজ্যের আদর্শের দ্বারা সর্বসাধারণকে অনুপ্রাণিত করা সম্ভবপর নহে। তাহাদের নিকট ধর্মরাজ্য স্থাপন রূপ আদর্শকে ব্যক্ত না করিয়া স্বদেশ

৭। 'Surendranath Banerjee', ' পৃষ্ঠা ২২৮-২২৯ (দ্রষ্টব্য 'বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসির মামুন, পৃষ্ঠা ৫৯)।
৮। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃষ্ঠা ১৭।
৯। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃষ্ঠা ১৩০।
১০। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃষ্ঠা ১৮৭।
১১। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃষ্ঠা ১১।

www.icsbook.info

প্রতিষ্ঠারূপ আদর্শকেই স্পষ্ট করিয়া প্রচার করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মস্থাপন রূপ আদর্শকে সহজেই অবলম্বন করিতে পারিবেন এবং উহারই একমাত্র উপায়স্বরূপ স্বদেশ প্রতিষ্ঠানকে ধ্রুবলক্ষ বলিয়া ধারণ করিয়া জীবন উৎসর্গ করিতে করিতে নবজীবন লাভের জন্যে অগ্রসর হইতে হইবে। এই স্বদেশ বা নেশনের প্রতিষ্ঠাই ধর্মরাজ্য স্থাপনের মুল ভিত্তি, অভূতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব বিপদরাশির মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া ভারতর্ষ এই মূল ভিত্তির সন্ধান পাইয়াছে। সমগ্র ভারতকে এ রাজচক্রবর্তিতে সম্মিলিত করিয়া ধর্মরাজ্য স্থাপনরূপ মহাব্রতে ব্রতী হইয়া ভগবান বাসুদেব মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস অভিনিবিষ্ট হইয়া পাঠকর, দেখিবে এই যজ্ঞে সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষ সহস্রবর্ষ ধরিয়া আহুতি মন্ত্রের অনুসন্ধান করিতেছে। -----ভারতের দুঃখ তমিস্ররাশির মধ্যে বিদুৎপ্রভায় স্বদেশ বা নেশন প্রতিষ্ঠারূপ আদর্শের প্রকাশ হইয়া সেই মন্ত্রের সন্ধান বলিয়া দিয়াছে। ভারতবাসী, তুমি কি আজ হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতে পার যে, 'বন্দেমাতরমই' সেই ধর্মরাজ্য স্থাপনের আহুতি মন্ত্র?"[১২]

হিন্দুভারত যুগান্তরের এই সব কথা সবই বিশ্বাস করেছিল। এই সংগে চেয়েছিল যে, সমগ্র ভারতকে এক রাজচক্রে সম্মিলিত করে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য ভারতবর্ষ সহস্র বছর ধরে যে আহুতি মন্ত্রের সন্ধান করছে, 'বন্দেমাতরম' কে সেই আহুতি মন্ত্র হিসেবে প্রত্যেক হিন্দুই সমস্ত আবেগ দিয়ে গ্রহণ করুক। এই চাওয়ার বিশ্বস্ত বাস্তবায়ন হিসাবে সর্বভারতীয় কংগ্রেসও একে গ্রহণ করল। গ্রহণ করল একে আধুনিক ভারত রাষ্ট্র তার প্রিয় সংগীত হিসেবে।

ভারতে ধর্মরাজ্য স্থাপনের সহস্র বর্ষের সাধনায় আবিস্কৃত আহুতি মন্ত্র 'বন্দেমাতরম' অথার্ৎ উৎকট ন্যাশনালিজমকে"মানবতাবাদী", উদারপন্থী' বলে কথিতরাও অন্য সকলের মত করেই হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ 'বন্দেমাতরম' এর 'ন্যাশনালিজম'কে শুধু সর্বান্তকরণে গ্রহণ করা নয়, 'বন্দেমাতরম' গানে তিনি সুরারোপ করেন।[১৩] অথচ এই রবীন্দ্রনাথ এই নেশনবাদের বিরুদ্ধে কত শত ভাষায়ই না কথা বলেছিলেন, লিখেছিলেন। যেমনঃ "এই আমাদের ভারতবর্ষ যা অন্ততঃ পঞ্চত্রশ শতাব্দী তো হবেই শান্তির জীবন যাপন করতে চেয়েছিল এবং চিন্তার গভীরতার মগ্ন ছিল। এই সেই ভারত, সকল প্রকার রাজনীতি বর্জিত এবং নেশনবদের সাথে সম্পর্কহীন, যার একমাত্র আকাঙ্খা ছিল এই জগতকে আত্মার জগত বলে উপলব্ধি করা, তার সঙ্গে এক অনন্ত এবং অন্তরতম যোগসূত্রের উৎফুল্ল চেতনায় জীবনকে অতিবাহিত করা।

১২। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান বা শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ' উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩১, ১৩২।

১৩। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৭৭।

www.icsbook.info

ব্যবহারে শিশুসুলভ এবং অতীতের জ্ঞান বৃদ্ধ মনুষ্য জাতির এই একান্ত অংশটির উপর পশ্চিমের নেশনবাদ বিস্ফোরিত হলো। আমরা মোগল এবং পাঠানকে দলে দলে আসতে দেখেছিলাম। কিন্তু তাদের আমরা মনুষ্য জাতির অংশ হিসাবেই চিনে নিয়েছি --- চিনেছি তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক প্রথাগুলোকে এবং তাদের আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণাকে। কিন্তু তাদের আমরা কখনও নেশন হিসেবে চিনতে শিখিনি। ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তাদের ভালোবেসেছি অথবা ঘৃণাও করেছি। আমরা তাদের পক্ষে অথবা বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছি। যে ভাষায় তাদের সাথে কথা বলেছি তা একদিকে তাদেরও ছিল, অন্যদিকে আমাদেরও এবং এইভাবে এই সাম্রাজ্যের ভাগ্যকে পরিচালিত করেছি যাতে আমরা কার্যকরী ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এবার আমাদের কার্যাবলীর সম্বন্ধ হচ্ছে কোন বস্তুর সঙ্গে নয়, কোন মনুষ্য জাতির সঙ্গে নয় পরন্তু একক নেশনের সঙ্গে.....।"[১৪]

এই 'নেশন' বা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই কণ্ঠকে আরও তীব্রভাবে উচ্চারিত হতে দেখি আমরা তার জাপান সম্পর্কিত লেখায়। জাপানের জাতীয়তাবাদী উত্থানকে তীব্র আক্রমণ করে তিনি বললেন, "জাপানের পক্ষে যা বিপদজনক তা পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক অবয়বের অনুকরণ নয়, পরন্তু পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের গতি শক্তিকে নিজেদের বলে গ্রহণ করা। তার সামাজিক আদর্শগুলিতে রাজনীতির নিকট পরাস্ত হবার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আমি দেখতে পাচ্ছি তার আপ্ত বাক্য হচ্ছে বিজ্ঞান থেকে বের করা, 'যোগ্যতমই বিদ্যমান থাকবে', যে আপ্ত বাক্যের আসল অর্থ হচ্ছে 'নিজেরটা গুছিয়ে নাও এবং তাতে অপরের কোন ক্ষতি হলে গ্রাহ্য করো না।' ---- যে আপ্ত বাক্য শুধু অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সাজে যে স্পর্শের দ্বারা যা কিছু জানতে পারে শুধু তাতেই বিশ্বাস করে কারণ সে চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পায় না। ------ কিন্তু এখন যখন পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের আদর্শের প্রাধান্য রয়েছে সমগ্র মানবসমাজে তখন শিশু কাল থেকে সকল রকম উপায়ে শিক্ষা দেয়া হয় যাতে তারা ঘৃণা ও লোভকে পোষণ করতে পারে এবং তা করা হয় ইতিহাসের অর্ধসত্য ও অসত্য প্রচারের মাধ্যমে, করা হয় অপর জাতিগুলি সম্বন্ধে তথ্যবিকৃতি দ্বারা, করা হয় সেই সকল ঘটনার স্মৃতি-স্তম্ভ রচনা করে যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মিথ্যা, শুধু মাত্র অন্য জাতি সম্পর্কে অপ্রীতিকর মানসিকতা তৈরী করার জন্যে যেগুলি মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্যে যত শীঘ্র সম্ভব বিস্তৃত হওয়া উচিত, এই ভাবে জাতি ও দেশগুলির প্রতি এক দুষ্ট অসহিষ্ণুতাকে নিয়ত উৎপন্ন করে। এইভাবে সমগ্র মানব জাতির উৎস সূত্রটিকে বিভক্ত করে তোলা হচ্ছে।"[১৫]

১৪। ন্যাশনালিজম', ম্যাকমিলান। (বিমলানন্দ শাসনামল লিখিত 'স্বাধীনতার ফাঁকি', (আল-ইত্তেহাদ পাবলিকেশন্স (প্রাইঃ) লিমিটেড, ১৮৩ লেনিন সরণী, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত) শীর্ষক গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৩৭, ১৩৮)।

১৫। 'ন্যাশনালিজম', ম্যাকমিলান, পৃষ্ঠা ৭৭-৭৯ (বিমলানন্দ শাসনামলের 'স্বাধীনতার ফাঁকি' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১৩৯, ১৪০)।

www.icsbook.info

রবীন্দ্রনাথের মত এত তীব্র, এত শক্ত ও এত সুন্দর ভাবে জাতীয়তাবাদকে বাংলাভাষায় আর কেউ আক্রমণ করেছে বলে আমি জানি না। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার, যে জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের খেলাফ বললেন, যে জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসন বললেন, যে জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ আত্মস্বার্থের পুজা, লোভ ও ঘৃণার উৎস বললেন এবং যে জাতীয়তাবাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রতিবেশী জাতি সম্পর্কে অন্তহীন তথ্যবিকৃতি ও মিথ্যা কাহিনীর জন্মদাতা হিসেবে চিহ্নিত, সেই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে, আয়োজনকে এবং সে জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন, তার সাথে একাত্ম হয়েছেন, এমনকি সে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার হিংস্রতার সাথেও তিনি নিজেকে শামিল করেছেন। কারও অজানা নয়, বঙ্কিম সাহিত্য হিন্দুদের হিংস্র জাতীয়তাবাদ এবং খুনে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মূল উৎস।[১৬] বঙ্কিম "রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ মনের প্রতিভূ হিসাবে এবং হিন্দু জাতীয়তা মন্ত্রের উদগাতা ঋষি হিসাবে বাংলার সাহিত্যাকাশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তীব্র সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবহ্নি তিনি ছড়িয়েছিলেন লেখনি মুখে, জগতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নজীর নেই। তিনি মানবতার যে অকল্যাণ ও অসম্মান করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তারও তুলনা নেই। 'রাজ সিংহ' ও 'আনন্দ মঠ' উপন্যাস দুটিতে তিনি মুসলিম বিদ্বেষের যে বিষবহ্নি উদ্গীরণ করেছেন, সে বিষ জ্বালায় এই বিরাট উপমহাদেশের দু'টি বৃহৎ বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে যেটুকু সম্প্রীতির ফল্গুধারা প্রবাহিত ছিল, তা নিঃশেষে শুষ্ক ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করে তাদের বিতাড়িত করে সদাশয় বৃটিশ জাতির আবাহনে ও প্রতিষ্ঠায় বার বার মুখর হয়ে উঠেছিলেন।"[১৭] বঙ্কিমের এই সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং একে 'জাতীয় সাহিত্য' বলে অভিহিত করে মুসলমানদের সমালোচনার জবাবে তিনি বলেছিলেন, "মুসলমান বিদ্বেষ বলিয়া আমরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য বিসর্জন দিতে পারি না। মুসলমানদের উচিত নিজেদের জাতীয় সাহিত্য নিজেরাই সৃষ্টি করা।"[১৮] মুসলমানদের সংহারকামী হিংস্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের জনক "শিবাজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আরও দুঃখজনক। বাংলাদেশের জন-মানুষের কাছে শিবাজী এবং শিবাজী বাহিনী 'বর্গীদুস্যু' হিসাবে পরিচিত। যেহেতু 'শিবাজী মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তাই শিবাজীবাদের প্রবক্তরা লুণ্ঠনকারী এক

১৬। অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন লিখিত 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডের ভূমিকার 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৭। 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ' সংস্কৃতির রূপান্তর', আবদুল মওদুদ, পৃষ্ঠা ৩৩৯।

১৮। 'মুসলিম জননেতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী একটি বক্তৃতায় মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ সাহিত্য বন্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, "ভারতী পত্রিকা'য় রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেন।

www.icsbook.info

দস্যুকে জাতীয় বীর হিসাবে চিত্রিত করার উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে বিকৃত করেছিলেন।"[১৯] ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারও এই কথাই বলেছেন। তাঁর মতে "সেকালে বাংলায় আমাদের মহৎ বীরদের সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় রাজপুত, মারাঠা ও শিখ বীরদের জীবনী আমদানি করতে হয়েছে। জাতীয়তাবাদী নেতাগণ রাজনৈতিক গরজে সামগ্রিকভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করে জনমনকে বিভ্রান্ত করতেন। এমনকি 'শিবাজী উৎসবে' মুসলমানকে টেনে আনার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করে ইতিহাসের ভুল উপস্থাপনা করতেন ও ব্যাখ্যা দিতেন।"[২০] ইতিহাসের এই ভুল উপস্থাপনা এবং ইতিহাসকে বিকৃত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও করেছেন। শিবাজীর স্তুতিগান করে তিনি লিখেছেন,

" হে রাজা শিবাজী
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি----
এক ধর্ম রাজ্য পাশে খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতে
বেঁধে দিব আমি।
তারপর একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্র শিখা
আঁকি দিল দিগ্-দিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুত বহ্নিতে
মহামন্ত্র লিখা।
মোগল উষ্ণীষ শীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয় প্রদোষে
পুষ্প পত্র যথা
সেদিনও শোনেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা।,"[২১]

শিবাজীর শুধু স্তুতি নয়, ইতিহাস বিকৃতির পক্ষ নিয়ে শিবাজীর পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত ইতিহাসকারদের বিদ্রুপ করেছেন। তিনি লিখছেন,

"বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলে করে পরিহাস
অট্টহাস্য রবে--
তব পূণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিস্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে।
অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন-'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।

১৯। 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ, সিদ্দিকী বার এট ল, পৃষ্ঠা ৯৩ (উদ্বৃতি)।
২০। 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ সিদ্দিকী বার এট ল, পৃষ্ঠা ৯৩ উদ্বৃতি।
২১। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', (আহসানুল্লাহ লিখিত) গ্রন্থে উদ্বৃত, পৃষ্ঠা ৭৬।

www.icsbook.info

যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গ বাণী
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।"[২২]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের উৎকট ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তার প্রকাশ ঘটেছিল। স্বদেশ-জাতীয়তাকে আরাধ্য দেবীতে পরিণত করা হয়েছিল এবং এই আরাধ্য দেবীর জন্য প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসার সব পণ করা হয়েছিল। যুগান্তর পত্রিকায় বলা হলো, "হে বাঙ্গালী, তুমি কি নর-কীট হতে জন্মেছিলে?---- যখন বাঙ্গালাদেশ দু'ভাগ হল দেখে সাত কোটি বাঙ্গালী মর্মাহত হয়ে পড়লো, সেদিনকার কথা আজ একবার ভাব। সেদিন স্বদেশের জন্য কোটি কোটি হৃদয়ের ব্যথ্যা যেমনি এক হল, অমনি মাতৃরূপিনী স্বদেশ শক্তি পলকের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র আপনাকে প্রকাশ করিলেন, বাঙ্গালীও সর্বত্র আচম্বিত 'বন্দেমাতরম' বলিয়া উচ্চঃস্বরে মাকে আহ্বান করিল। --- সেদিন যেন এক নিমিষের জন্যে বাঙ্গালীর কাছে মা আমার প্রকাশিত হয়েছিলেন, সেদিন যে বাঙ্গালী বড়ই ব্যথ্যা পেয়েছিল, ভেবেছিল মা বুঝি দ্বিখন্ড হয়েছে, তাই মা আত্মপ্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমি দ্বিখন্ড হই নাই, তোদের একত্র রেখে সহজেই শক্তিদান কর্তুম, আজ সেই বাঁধা ঘর শত্রুরা ভেঙ্গে দিলে মাত্র; যেদিন আমার জন্যে স্বার্থ ও সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রাণ দিতে অগ্রসর হবি, সেদিন আবার সেই শক্তি তরংগ মাঝে আমার দেখা পাবি, আমি মরি নাই। ---- এস বাঙ্গালী আজ মার সন্ধানে বেরুতে হবে। সে বার মা আপনি এসে দেখা দিয়েছিলেন, এবার মার জন্য লক্ষ রুধিরাক্ত হৃদয়ের মহাপীঠ প্রস্তুত করে রেখে মাকে খুঁজে খুঁজে কারামুক্ত করে নিয়ে আসব। একবার সকলে বুকে হাত দিয়ে হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর দেখি, প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসার, সমস্ত পণ করে আজ মার সন্ধানে বেরুতে পারবে কিনা? --- বাঙ্গালীকে 'বন্দেমাতরম' মাতৃমন্ত্র শিখাইতে হইবে। .... সর্বাগ্রে মাকে সাক্ষাৎ বন্দনা কর, মাকে তাঁর উপযুক্ত আসনে অধিষ্ঠিত করিলে বিদ্যা, অর্থ, মোক্ষ, ইত্যাদি সবই ক্রমশ আসিয়া পড়িবে।"[২৩]

এই হিন্দু-জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার সাথে রবীন্দ্রনাথও পুরাপুরি একাত্ম হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী দুটি সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং বঙ্গ-ভঙ্গ বাস্তবায়নের দিনকে তিনি 'রাখি বন্ধন' দিবস ঘোষণা করেন। 'রাখি বন্ধন' এর দিন সকালে গঙ্গাস্নানের মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই গঙ্গাস্নান

২২। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', (আহসানুল্লাহ লিখিত) গ্রন্থে উদ্বৃত, পৃষ্ঠা ৭৭।
২৩। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর' পত্রিকার দান বা শ্রী অরবিন্দ ও বাংলায় বিপ্লববাদ', পৃষ্ঠা ১৪২, ১৪৬ (যুগান্তর পত্রিকার 'যোগ ক্ষ্যাপার চিঠি' নামক এই নিবন্ধের রচয়িতা ছিলেন, দেবব্রত বসু, ঐ পৃষ্ঠা ১৬)।

www.icsbook.info

অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ একটা প্রার্থনা সংগীত গাইলেন। সে প্রার্থনা সংগীতে তিনি বললেন---

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার হাওয়া বাংলার ফল
পূণ্য হউক পূণ্য হউক।
পূণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূণ্য হউক পূণ্য হউক
পূণ্য হউক হে ভগবান।
বাংগালীর পণ বাংগালীর আশা
বাংগালীর কাজ বাংগালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাংগালীর প্রাণ বাংগালীর মন
বাংগালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

এক সংগীত শেষে বীডন উদ্যানে ও অন্যান্য জায়গায় রাখিবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পার্শী বাগান মাঠে অখন্ড বাংলার 'বঙ্গভবন' স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ভাবে 'ফেডারেশন হলের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে উল্লেখ করেন, "যেহেতু বাঙ্গালী জাতির সার্বজনীন প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া পার্লামেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছেন সেহেতু আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল নাশ করিতে এবং বাঙ্গালী জাতির একতা সংরক্ষণ করিতে আমরা সমস্ত বাঙ্গালী আমাদের শক্তিতে যাহা কিছু সম্ভব তাহার সকলই প্রয়োগ করিব।" ('অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৮২, ৮৩) রবীন্দ্রনাথের এ কথা মিথ্যা হয়নি। 'বন্দেমাতরম' এর খন্ডিত মা'কে অখন্ড করার জন্যে 'প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, মন, সংসার'কে পণ করে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয়, তার সাথেও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল। "১৯০২ সালে তিনি (শ্রী অরবিন্দ) মারাঠী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তার ছোট ভাই শ্রী যতীন মুখার্জীকে কলকাতায় পাঠান। এ সময়ে যোগেন্দ্র বিদ্যাভুষণ, জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শিবনাথ শাস্ত্রী বাংলার বিপ্লবী দলের

www.icsbook.info

সাথে সম্পর্ক যুক্ত হন।"[২৪] রবীন্দ্রনাথ নিজেও একথা বলেছেন, "আমাদের দেশে যখন স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল, তখন আমি তার মধ্যে ছিলাম। মুসলমানরা তখন তাতে যোগ দেয়নি, বিরুদ্ধে ছিল।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৪শ খন্ড, পৃষ্ঠা -৩৩) গুপ্তবিপ্লবী বা স্বদেশী বা সন্ত্রাসবাদী এই দল কতকটা বাম ঘেষা ছিল।[২৫] তাই বলে ভাববার কোন কারণ নেই যে, এদের শরীরে কোনরূপ অসাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধ ছিল। এদের লক্ষ্য যেমন ছিল ধর্মরাজ্য, তেমনি এরা কট্টর ধর্মনীতি অনুসরণ করতো। শ্রী নলিনী কিশোর গুহ তার 'বাংলায় বিপ্লববাদ' (চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৭৬ বাংলা, প্রকাক এ, মুখার্জি এন্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-২) বইয়ে বিপ্লবী দলের নতুন রিক্রুটদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের যে রীতি-নীতির বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে প্রমাণ হয় বিপ্লবী-স্বদেশীরা পুরোপুরি হিন্দু রীতি-আদর্শের দ্বারা পরিচালিত ছিল। শ্রী গুহ'র বর্ণনাঃ "বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠে যে জমকালো প্রতিজ্ঞার নমুনা দেখাইয়াছেন, বিপ্লববাদীরাও সে প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে তাহারই অনুকরণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নেই। এখানে অনুশীলনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণের নমুনা দিতেছি। এখানে পুলিন বাবু স্বীয় দীক্ষা বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের বর্ণনা করিতেছেন, "পি. মিত্রের আদেশ মতে একদিন (কলিকাতায়) একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া পি, মিত্রের বাড়ীতে তাহার নিকট হইতে দীক্ষা লইলাম। ধূপ দীপ নৈবেদ্য পুষ্প চন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্যোপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি. মিত্র যজ্ঞ করিলেন, পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম, আমার মস্তকে গীতা স্থাপিত হইল, তদুপরি অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি. মিত্র আমার দক্ষিনে দন্ডায়মান হইলেন, উভয় হস্তে ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নির নমস্কার করিলাম। ------পি. মিত্র যে পদ্ধতিতে আমাকে দীক্ষা দিয়াছেন গুপ্তচক্রের মধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্বে আমিও অনুরূপ পদ্ধতিতে আমার বাসায় দীক্ষা দিতাম। এক সঙ্গে দীক্ষা দিতে হইলে ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে পুরাতন ও নির্জন 'সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে' যাইয়া একটু জাঁক-জমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। অর্থাৎ সংযম হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতাম' --------- পুলিন বাবু দীক্ষান্তে প্রত্যেক সভ্যকে পর্যাপ্তরূপে বিশুদ্ধ ঘৃত ও চিনিযুক্ত কাঁচা দুগ্ধসেবন করিতে দিতেন। এই সকল প্রতিজ্ঞা বা দীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে বঙ্কিমের আনন্দমঠের অনুকরণ লক্ষ্য করিবার।'[২৬-ক]

স্বদেশী বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধর্মমত সম্পর্কে সুন্দর কথা বলেছেন,

---

২৪। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', পুর্নেন্দু দস্তিদার।

২৫। 'বিপ্লবী দলের কাজকর্ম ইতালীর কার্বোনারী ও রাশিয়ার গুপ্ত সমিতি গুলোর দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল।' ('স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান', পৃষ্ঠা ১১)।

২৬-ক। 'বাংলায় বিপ্লববাদ', শ্রী নলিনী কিশোর গুহ, পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৮।

www.icsbook.info

সাহিত্যিক গিরিজাশংকর রায় চৌধুরী। তিনি লিখছেন, "আমরা দেখিয়াছি, দেখিতেছি অরবিন্দ বঙ্কিম প্রদর্শিত জাতীয়তাকেই সজ্ঞানে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতেই অনুসরণ করিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের বা মুসলমানদের ধার তিনি ধারেন না। তিনি একপায়ে দাঁড়াইয়া বগলামন্ত্র জপ ও বগলা মূর্তি পূজা শেষ করিয়া আসিয়াছেন। ------ গুপ্ত সমিতিতে মা কালীও আছেন এবং শ্রী গীতাও আছে। এতে মুসলমান ভ্রাতাগণ যদি বলেন যে 'এ ব্যবস্থায় দেশ উদ্ধারের জন্য আমরা যা-ই বা কি করিয়া, আর থাকিই বা কোন মুখে?"[২৬-খ]

স্বদেশী আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে এর চেয়েও সুন্দর ও স্পষ্ট কথা বলেছেন ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজাফফর আহমদ তার 'কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং আমার জীবন' বইতে। তাঁর কথা, "বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী দল 'অনুশীলন'-লিখিত ঘোষণা পত্রে সমিতির একটি উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের পদানত করে রাখা এবং প্রত্যেক সন্ত্রাসবাদী দলের শর্ত ছিল, অহিন্দুদের প্রবেশ' নিষেধ।"[২৬-গ]

রবীন্দ্রনাথের মত কথিত 'মানবতাবাদী' ব্যক্তিরা হিংস্র, উগ্র হিন্দু জাতীয় উত্থানের সাথে জেনে-শুনেই নিজেদের শামিল করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যে 'জাতীয়তাবাদ' বিরোধীতা, সেটা হতে পারে কোন কাব্যিক সৌখিনত্ব।

১৯০৫ সালের আগষ্টে মূখ্যত বঙ্গভঙ্গ রদের জন্যে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলো, তার দুইটি রূপ। একটি প্রকাশ্য, অন্যটি গোপন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে চলল স্বদেশী নামের রাজনৈতিক আন্দোলন। অন্যদিকে গুপ্ত সমিতি অনুশীলন সমিতির মাধ্যমে চলল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। বালগঙ্গার তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, লাল লাজপাত রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মদনমোহন মালব্য, প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছিলেন।

১৯০৭ সালের শেষের দিক থেকে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা জোরদার হয়ে উঠল। বাংলার বড়লাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের বিশেষ রেলগাড়ির উপর কয়েকবার হামলা হলো। চন্দননগরের কাছে পরপর দু'বার এবং নারায়ণ গড়ে আরেকবার। হামলার কাজে ডিনামাইট ব্যবহার করা হয়েছিল। সময়টা ছিল ১৯০৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর। বারিন ঘোষের দল এই তৎপরতা চালায়। টার্গেটদের হত্যার জন্যে পার্সেল বোমাও ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের একটা বোমা বুক-পার্সেল আকারে পাঠানো হয়েছিল কিংসফোর্ডের কাছে। ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে চন্দননগরের মেয়রের উপর বোমা হামলা চালানো হলো। ঠিক এই সময়েই বোমা হামলার শিকার হলো কিংসফোর্ডের গাড়ী। কিন্তু বোমাটি কিংসফোর্ডের গাড়ীতে না লেগে আঘাত করল অন্য একটি গাড়ীকে। এ গাড়ীতে আরোহী

২৬-খ। 'শ্রী অরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশী যুগ', গীরিজা শংকর রায় চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৪৫২, ৪৫৩।
২৬-গ। 'ভারত কি করে ভাগ হলো' গ্রন্থে উদ্ধৃত, বিমলানন্দ শাসনামল, পৃষ্ঠা ১০৬।

www.icsbook.info

ছিলেন দু'জন শ্বেতাংগ মহিলা। দু'জনেই নিহত হলো। ঘটনাটা ঘটেছিল মোজাফফপুর নামক স্থানে। প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন এই হামলার নায়ক। ক্ষুদিরাম বসু ধরা পড়লেন, কিন্তু প্রফুল্ল চাকি ধরা পড়ার আগেই নিজের গুলীতে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বিচার হলো ক্ষুদিরামের। বিচারে তার ফাঁসি হলো।

মোজাফফপুরের ঘটনা ইংরেজ সরকারকে দারুণভাবে বিচলিত করেছিল। গুপ্ত আন্দোলনের লোকদের ধরার জন্যে সরকারের পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ হন্যে হয়ে উঠল। ঘটনার ২দিন পরেই (২রা মে ১৯০৮) সুপরিকল্পিত ভাবে পুলিশের আটটি দল গুপ্ত সমিতির আটটি ঘাটিতে হানা দিল। ধরা পড়ল গুপ্ত সমিতির সদস্যদের ২৫ জন।[২৭] এদের সাথে অবরিন্দ ঘোষও ধরা পড়লেন। সর্বমোট ৩৬ জনের বিরুদ্ধে আলীপুর কোর্টে মামলা দায়ের হলো। ১২৬ দিন শুনানির পর ১৯০৯ সালের ১৪ই এপ্রিল রায় হলো। ফাঁসির আদেশ হলো বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের।[২৮] কয়েকজনের হলো যাবজ্জীবন কারাদন্ড। অবশিষ্টরা বেরিয়ে এলেন দোষ প্রমাণ না হওয়ায়। ইংরেজ সরকার যাকে ধরা ও শাস্তি দেয়ার জন্য সবচেয়ে উদগ্রীব ছিল, সেই অরবিন্দ ঘোষও এদের মধ্যে শামিল ছিল। শ্রী অরবিন্দের পক্ষে চিত্তরঞ্জনদাস যে আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে মামলা পরিচালনা করেছিলেন, তা ছিল এক অনন্য ঘটনা। অরবিন্দ সম্পর্কে বিচারক বিচক্রফটকে সি, আর, দাস অত্যন্ত আবেগ ভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, "যখন সমস্ত তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটবে, যখন উত্তেজনা ও আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং যখন তিনি আর এই মাটির পৃথিবীতে বেঁচে থাকবেন না, তারও বহু পরে মানষ বলবে তিনি ছিলেন স্বদেশ প্রেমের কবি, জাতীয়তাবাদের কবি এবং মানবতার পূজারী। তার দেহাবসানের বহু পরে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সুদূর সাগর পারের নানা দেশেও তার বাণী ধ্বণিত ও প্রতিধ্বনিত হবে।"[২৯] শিবাজীর চিন্তা, চেতনা ও সংগ্রামের উত্তরসূরী শ্রী অরবিন্দ ঘোষ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন দাসের এই ধারণা ও মন্তব্য লক্ষ্য করবার মত।

গুপ্ত সমিতির ঐ বিপ্লবীরা ধরা পড়ার পর সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা ঝিমিয়ে পড়ল। শ্রী অরবিন্দ জেল থেকে বেরিয়ে দেখলেন, 'স্বাধীনতার গতিবেগ স্তব্ধ

২৭। ধৃতব্যক্তিরাঃ বারীন্দ্র কুমার ঘোষ, শিশির কুমার ঘোষ, বিভূতিভূষন সরকার, নলিনীকান্ত গুপ্ত, বিজয় কুমার নাগ, উল্লাসকর দত্ত, ইন্দুভূষন রায়, পরেশচন্দ্র মল্লিক, শচীন্দ্র কুমার সেন, কুঞ্জলাল সাহা, উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণ চন্দ্রসেন, নরেন্দ্রনাথ বক্সী, হেমেন্দ্র কুমার ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ধরণী নাথ গুপ্ত, অশোক চন্দ্র নন্দী, বিজয় রত্ন সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু, অরবিন্দু ঘোষ, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র দাস, কানাইলাল দত্ত এবং নিরাপদ রায়। এ ছাড়া নরেন্দ্র নাথ গোঁসাই, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল সহ আরও ৯ জন ধরা পড়ল পরে। ('স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর' পত্রিকার দান', পৃষ্ঠা ৩৫)।

২৮। পরে হাইকোর্টের রায়ে ফাঁসির আদেশ বাতিল হয়।

২৯। 'Sir Aurobindo's Political Thought', Uma Mukhapadhay & Haridas Mukhopadhay, Page 17.

www.icsbook.info

করার জন্য ইংরেজ সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। সভাসমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছে, জাতীয় শক্তির কেন্দ্রগুলো একে একে আক্রান্ত ও বিচূর্ণ, জনপ্রিয় নেতারা কারারুদ্ধ বা বহিস্কৃত এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কন্টকিত ও বিঘ্নিত। কলিকাতা ও ঢাকার অনুশীলন সমিতি, বাকেরগঞ্জের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতি সমিতি', ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি' ও 'সাধনা সমাজ' সরকারী আদেশে বন্ধ ঘোষিত। অরবিন্দ জেলে যাবার পূর্বে, ১৯০৮ সনে বাংলার আকাশে-বাতাসে শুনতে পেয়েছিলেন 'বন্দেমাতরমের জয়ধ্বনি, কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে, ১৯০৯ সনে, তিনি লক্ষ্য করলেন সেই মাতৃমন্ত্র ক্ষীণ।[৩০]

এভাবেই স্বদেশী আন্দোলনের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার একটি পর্যায় স্তিমিত হয়ে পড়ল। এই তৎপরতা কি ব্যর্থ হয়েছিল? না ব্যর্থ হয়নি। এই আন্দোলনের ফলে ইংরেজ সরকার হিন্দুদের মনোভাব টের পেয়েছিল। ইংরেজ সরকার ভীতও হয়েছিল। ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের যে সিদ্ধান্ত নেয়, তার পিছনে এর ব্যাপক প্রভাব ছিল।[৩১]

সন্ত্রাসী তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়লেও সন্ত্রাসী আন্দোলনের নেতারা বিশেষ করে শ্রী অরবিন্দ তার তৎপরতা বন্ধ করেননি। স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক প্ল্যাটফরমে তিনি সরব থাকলেন। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর 'দি বেঙ্গলী,' কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' এবং কুমুদিনী মিত্রের 'সুপ্রভাত' প্রভৃতি কাগজে শ্রী অরবিন্দ লিখে চললেন। বক্তৃতা করতে থাকলেন, 'গো রক্ষিণী' ও 'স্বদেশী সভা'য়। ১৯০৯ সালে ৩০শে মে 'গো রক্ষিণী সভা'র এক বক্তৃতায় তিনি বাল গঙ্গাধর তিলকের সহযোগী বাংলার কংগ্রেস নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে অভিহিত করলেন One of the mightiest prophets of Nationalism', অর্থাৎ সন্ত্রাসী আন্দোলনের নেতারা ইংরেজ সরকারের তাড়া খেয়ে এবার তাদের কাজ কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাঁধে তুলে দিতে এগিয়ে এলেন।

কংগ্রেস নেতারাও এগিয়ে গেলেন। এ সময় হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণের বিশেষ উদ্দেশ্য গঠিত হলো হিন্দু মহাসভা। 'অনেক কংগ্রেস নেতাও হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা সমর্থন করেন। কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃস্থানে অবস্থান করেও যারা হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলতেন এই সমর্থন তারাই জ্ঞাপন করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মদনমোহন মালব্য, লালা লাজপতরায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমুখ।[৩২] দুইটি বিষয় এই হিন্দু মহসভা গঠনের কাজকে ত্বরান্বিত করেছিল।

৩০। 'স্বাধীনতা আন্দোলনে 'যুগান্তর পত্রিকার দান', পৃষ্ঠা ৪০।

৩১। 'একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের তৎপরতা এবং অপরদিকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, বিপিন চন্দ্র পাল, আশ্বীনীকুমার দত্ত প্রভৃতির নেতৃত্বাধীন গণ-আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ সংগ্রাম এক উচ্চতর রাজনৈতিক পর্যায়ে উপনীত হয়।" ('ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন,' বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ৯৫)।

৩২। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ৮৯।

www.icsbook.info

একটি ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারে মুসলমানদেরকে পৃথক নির্বাচন ও স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের সুবিধা দান। দ্বিতীয়টি হলো গুপ্ত সন্ত্রাসী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়া। হিন্দু ও কংগ্রেস নেতাগণ চেয়েছিলেন হিন্দু মহাসভার মত উগ্র ও সোচ্চার হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংস্থা গঠনের মাধ্যমে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি, অনুশীলন সমিতি অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অনুপস্থিতি জনিত শূন্যতা পূরণ করা এবং মর্লি-মিন্টোর সংস্কারকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিরোধী আন্দোলন জোরদার করা যা কংগ্রেসকে সাহায্য করবে।

কংগ্রেস এ সাহায্য পেয়েছিল। স্বদেশীদের সাহায্য পুষ্ট হয়ে হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল। এই চাপই ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করল বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। স্বয়ং বৃটিশ সম্রাট পঞ্চম জর্জের বক্তব্যেই এর নিশ্চিত প্রমাণ মিলে। সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতের ভাইসরয়, লর্ড হার্ডিঞ্জকে লিখেন, "আমি আশা করি আপনি ভারতের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে সম্রাটের প্রথম ভারত সফরকে কিভাবে অবিস্মরণীয় করে রাখা যায় সে সর্বাত্মক কর্মসূচী প্রণয়ন ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে যত্নবান হবেন। বাঙালীদের (বাংগালী হিন্দু) সন্তুষ্ট করার জন্যে বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেডিন্সীর মত উভয় বাংলাকে একত্র করা যায় কিনা সে বিষয়েও বিচার বিবেচনা করবেন। ------ বাংলায় বিরাজমান অসন্তোষ, রাষ্ট্রবিরোধী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ উপশম এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার লাঘবে এই পদক্ষেপ একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।"[৩৩]

হিন্দুদের চাপই অবশেষে কার্যকরী হয়েছিল। সম্রাট যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ভাইসরয়-এর কাছে, তা-ই তিনি কার্যকরী করেছিলেন ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তাঁর দিল্লী দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দানের মাধ্যমে। বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষেত্রে হিন্দুদের চাপ ও অসন্তোষের কথা বিবেচনা করা হলো, কিন্তু মুসলমানদের হৃদয় যে ভেংগে গেল তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হলো না। এইভাবে হিন্দুদের হিংসারই জয় হলো।[৩৪] কিন্তু এই হিংসা দুই জাতিকে দুই প্রান্তে ঠেলে দিল।'১৯০৫ -এর বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতবর্ষে সৃষ্টি করলো দুটি জাতীয়তাবাদ-একটি হিন্দু, অপরটি মুসলমান।'[৩৫] শুধু তাই নয় ডঃ আম্বেদকরের মতে বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করে এবং সেই সঙ্গে স্বরাজলাভের দাবী করে তারা (হিন্দুরা) একদিন মুসলমানদের পূর্ব ও পশ্চিম

৩৩। ভাইসরয়ের প্রতি সম্রাট, ডিসেম্বর ১৬, ১৯১০, HP. ১০৪ ('বঙ্গভঙ্গ', মুনতাসির মামুন, পৃষ্ঠা ৭৭, ৭৮)।

৩৪। 'বাঙালী হিন্দুদের বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করার প্রধান কারণ ছিল, পূর্ব বঙ্গে বাঙালী মুসলমানরা যাতে যোগ্য স্থান না পেতে পারে, সেই আকাঙ্খার বাস্তবায়ন।', (পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া', আম্বেদকর, পৃষ্ঠা ১১০)।

৩৫। 'ভারত কি করে ভাগ হলো', বিমলানন্দ শাসমল, হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৪।

www.icsbook.info

উত্তর ভারতের শাসক করে তুলবেন।[৩৬] ডঃ আম্বেদকরের এই উক্তির অর্ধেকটা সত্যে পরিণত হয়েছে ইতিমধ্যেই।

সংখ্যাগুরু হিন্দুদের হিংসা এবং মুসলমানদের সর্বনাশ দেখার জেদ বঙ্গভঙ্গ রদ করেই শেষ হয়ে গেলনা এবং মর্লি-মিন্টো সংস্কারের পৃথক নির্বাচন ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্ব-সুযোগের বিরোধিতা অব্যাহত রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলোনা, মুসলিম বিরোধী তাদের সহিংস মন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তও মেনে নিতে পারলো না। উল্লেখ্য, বঙ্গভঙ্গ রদের পর মুসলমানদের স্বান্তনা দেবার জন্যে ঢাকায় একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ভারত সরকার ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করেন।

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়ল হিন্দুরা। ১৯১২ সালের ২৮শে মার্চ কলকাতায় গড়ের মাঠে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে তারা সভা করল। এই সভায় সভাপতিত্ব করলেন স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ।[৩৭] বিস্ময়ের ব্যাপার, পূর্ববঙ্গে যে রবীন্দ্রনাথের বিশাল জমিদারি ছিল, সে রবীন্দ্রনাথও তার মুসলিম প্রজারা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে শিক্ষিত হোক তা চাননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেদিন একাট্টা হয়ে প্রচারে নেমেছিল হিন্দু সংবাদপত্রগুলো। হিন্দু বুদ্ধিজীবি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন শহরে মিটিং করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে পাঠাতে লাগলেন বৃটিশ সরকারের কাছে।[৩৮] 'এভাবে বাবু গিরীশচন্দ্র ব্যানার্জী, ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলার এলিটগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারক লিপি সহকারে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। ডঃ স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু প্রতিনিধিগণ বড় লাটের কাছে এই বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েল বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ অধিকাংশই কৃষক। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তাদের কোন উপকার হবে না[৩৯] বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় মুসলিম স্বার্থের বিরুদ্ধে সব হিন্দু যেমন এক হয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার ক্ষেত্রেও তাই হলো। পূর্ববঙ্গের, এমনকি ঢাকার হিন্দুরাও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে বাধা দেবার জন্যে এগিয়ে এল। A History of Freedom Movement' গ্রন্থে বলা হয়েছে' The Controversy that started on the proposal for

---

৩৬। 'পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, 'ডঃ আম্বেদকর, পৃষ্ঠা ১১০। সিলেবাস বিতর্ক এবং অতীত ষড়যন্ত্রের কাহিনী' শীর্ষক নিবন্ধে উদ্ধৃত করেছেন। তার নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় দৈনিক সংগ্রামের ২৬শে এপ্রিল, ১৯৯৩ সংখ্যায়।

৩৭। এই তথ্যটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জনাব আব্দুন নুর তাঁর 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি

৩৮। দ্রষ্টব্য ঃ Calcutta University Commission report. Vol. IV পৃষ্ঠা ১১২, ১৫১।

৩৯। দ্রষ্টব্য ঃ Calcutta University Commission report. Vol. IV পৃষ্ঠা ১১৩।

www.icsbook.info

founding a university at Dacca, throws interesting light on the attitude of the Hindus and Muslims. About two hundred prominenet Hindus of East Bengal, headed by Babu Ananda chandra Ray, the leading pleader of Dacca, submitted a memorial to the Viceroy vehemently against the establishment of a University at Dacca For a long time afterwards. They tauntingly termed this University as 'Mecca University',[৪০] অর্থাৎ 'ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যে বিতর্কের সৃষ্টি করল তাতে হিন্দু ও মুসলমানের ভূমিকা সম্পর্কে মজার তথ্য প্রকাশ পেল। পূর্ব বাংলার প্রায় দুই'শ গণ্যমান্য হিন্দু ঢাকার প্রখ্যাত উকিল বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের তীব্র বিরোধীতা করে ভাইসরয়কে একটি স্মারক লিপি দিয়েছিল। পরে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে বিদ্রুপ করা হতো।'

হিন্দুদের এই সর্বাত্মক বিরোধিতা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের বিরোধীতা ও ঘৃনা তারা অব্যাহতই রাখল। এর একটা সুন্দর প্রমাণ পাই আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীণ ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতিক অধ্যাপক শ্রী দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর' এর বক্তব্যে। শ্রীভান্ডারকর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া তার এক বক্তৃতায় বলেন, "কলিযুগে বৃদ্ধগঙ্গা নদীর তীরে হরতগ নামক একজন অসুর জন্ম গ্রহণ করবে। মূল গঙ্গার তীরে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। সেখানে অনেক মুনি-ঋষি এবং তাদের শিষ্যগণ বাস করেন। এই অসুর সেই আশ্রমটি নষ্ট করার জন্যে নান রকম প্রলোভন দেখিয়ে একে একে অনেক শিষ্যকে নিজ আশ্রমে নিয়ে যাবে। যারা অর্থ লোভে পূর্বের আশ্রম ত্যাগ করে এই অসুরের আকর্ষণে বৃদ্ধ গঙ্গার তীরে যাবে, তারাও ক্রমে অসুরত্ব প্রাপ্ত হবে এবং তারা অশেষ দুর্দশাগ্রস্ত হবে।"[৪১] পরিস্কার যে, শ্রী ভান্ডারকর এই বক্তব্যে 'হরতগ' বলতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েল প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর মিঃ ফিলিপ হরতগ' কে বুঝিয়েছেন। মিঃ হরতগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২৫ বছর ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। শ্রী ভান্ডারকরের বক্তব্যে হরতগ-এর 'আশ্রম' বলতে বুঝানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। আমাদের 'বুড়িগঙ্গা' হয়েছে শ্রী ভান্ডারকরের বক্তব্যে 'বৃদ্ধাগঙ্গা'। আর মূল গঙ্গা-তীরের 'পবিত্র আশ্রম' বলতে শ্রী ভান্ডারকর

৪০। 'A History of the Freedom Movement', গ্রন্থের চতুর্থ খন্ডের Dacca University; Its role in Freedom Movement' শীর্ষক অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০ (Published in 1970).

৪১। শ্রী ভান্ডারকরের এই উক্তিটি ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তার স্মৃতিকথা 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে' উল্লেখ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সভায় শ্রী ভান্ডারকরের এ উক্তি করেন, সে সভায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।

www.icsbook.info

বুঝিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। শ্রী ভান্ডারকরের কথায় ঢাকা অর্থাৎ পূর্ববাংলা অসুরদের স্থান। পবিত্র স্থান কলকাতা থেকে যেসব ঋষি শিষ্য ঢাকায় চাকুরী করতে আসবেন তারাও অসুর হয়ে যাবে। এ থেকেই বুঝা যায়, মুসলমানদের প্রতি শ্রী ভান্ডারকরদের বৈরিতা কত তীব্র, ঘৃণা কত গভীর।

তাদের এ বৈরিতার কারণে উপযুক্ত বরাদ্দের অভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ভীষন অর্থকষ্ঠ ভোগ করতে হয় এবং অঙ্গহানিও হয়েছিল। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার-এর ভাষায় "(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়) মুসলমানরা খুবই খুশী হলেন বটে, কিন্তু হিন্দুদের মনে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। তারা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলেন। সাধারণত যারা রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকতেন, তারাও এবার এই প্রতিবাদ আন্দোলনে যোগ দিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাস বিহারী ঘোষ ও গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়। তাদের প্রধান যুক্তি হলো এই যে, প্রশাসন ক্ষেত্রে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার বদলে এখন একটি সাংস্কৃতিক বিভাগ করা হচ্ছে। ফলে, এতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ক্রমে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ হিন্দুদের এই বলে আশ্বাস দিলেন যে, তাদের এমন আশংকার কোন কারণ নেই। ঢাকায় যে বিশ্ববিদ্যালয় হবে তার ক্ষমতা ও অধিকার ঢাকা শহরের দশ মাইল পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে "[৪২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এই ভাবে হিন্দুরা একে 'ঠুটো জগন্নাথে' পরিণত করে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সিন্ডিকেটে হিন্দু যারা নির্বাচিত হয়ে আসতেন তারাও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৈরিতা ত্যাগ করতেন না, তাদের ভোট বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করারই চেষ্টা করত। ডক্টর রমেশচন্দ্র লিখছেন, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের (সিনেটর) সদস্যদের মধ্যে অর্ধেক ছিলো মুসলমান এবং অর্ধেক ছিলেন হিন্দু। প্রফেসররা কোর্টের সদস্য ছিলেন। বার লাইব্রেরীর অনেক উকিল রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েটদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে এর সভ্য হতেন। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে হিন্দুরা ভাল চোখে দেখেনি, একথা পূর্বেই বলেছি। কারণ হিন্দুদের বিশ্বাস ছিল বঙ্গভঙ্গ রহিত করায় মুসলমানদের যে ক্ষতি হয়েছে, অনেকটা তা পূরণ করার জন্যই এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রীতির চোখে দেখেননি। বাইরে এ বিষয়ে যে আলোচনা হত কোর্টের সভায় হিন্দু সভ্যদের বক্তৃতায় তা প্রতিফলিত হত। অবশ্য ভোটের সময় জয়লাভের ব্যাপারে আমরা অনেকটা নিশ্চিত ছিলাম। মুসলমান সদস্য এবং হিন্দু শিক্ষক সদস্যরা একত্রে হিন্দু সদস্যদের চেয়ে অনেক বেশি ছিলেন।"[৪৩]

৪২। 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে', ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।
৪৩। 'জীবনের স্মৃতিদ্বীপে', ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার।

www.icsbook.info

সংখ্যাগুরু হিন্দুরা মুসলমানদের কোন ভালই সহ্য করতে পারেনি। মুসলিম লীগ গঠন তাদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিল, মর্লি-মিন্টোর শাসন-সংস্কারে মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের সুযোগ তারা বরদাশত করেনি, বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমানদের যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে তারা সহ্য করতে পারেনি এবং ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের সহ্য হলোনা। ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের প্রতি হিন্দু মনোভাব সবচেয়ে নগ্নভাবে ফুঠে উঠেছে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে 'গুরুতর বিপদ' অবলোকন করেছে। এই 'গুরুতর বিপদ'টা কি? সেটা মুসলমানদের উন্নতি ও উত্থান। অর্থাৎ হিন্দুরা হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের অস্তিত্বের বিরোধী, যা মাথা তুলেছিল শিবাজী, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রী অরবিন্দের আন্দোলনে। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের উত্থিত এই সংহার মূর্তিই সেদিন মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাদের আত্মরক্ষার সংগ্রামকেই অপরিহার্য করে তুলেছিল।

www.icsbook.info

হিন্দু মুসলিম সহযোগিতার বিদ্যুৎ চমক

হিন্দুদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছির ১৯০৯ সালের মধ্যেই, যদিও এর স্মৃতি ইংরেজদের তাড়া করে ফিরেছিল অনেকদিন, যার একটি ফল বঙ্গভঙ্গ রদ। তবু স্বদেশীরা সন্ত্রাসের মাধ্যমে স্বরাজ আনতে পারে না, একথা ভালোভাবেই তখন বুঝা গিয়েছিল। কংগ্রেসের মাধ্যমে স্বদেশীদের রাজনৈতিক উন্মাদনা সৃষ্টিও বন্ধ হয়ে গেল বঙ্গভঙ্গের পর।[১] তাদের 'বন্দে মাতরম' বঙ্গভঙ্গ রদ করাল বটে, কিন্তু তাদের স্বরাজ চিন্তার চাকাকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে নিতে পারল না। উপরন্তু মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে মুসলমানরা পৃথক নির্বাচন ও স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের অধিকার পেয়ে গেল, যা প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস-স্বদেশীর জন্যে বঙ্গভঙ্গের চেয়ে ছোট আঘাত ছিল না। যে মুসলমানদের অস্তিত্বই তারা মিটিয়ে দিতে চায়, তারা পেয়ে গেল জাতি-স্বাতন্ত্রের বড় ধরনের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি। এতে কংগ্রেস স্বদেশীরা ভীষণ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু করার কিছুই ছিল না। ঠান্ডা মাথার হিন্দু নেতৃত্ব মনে করল, তাদের এই বিক্ষোভ, এই ক্রোধ মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে আরও পরিস্ফুট, আরও চিহ্নিত করবে। মুসলমানদের কাছে নিয়ে আসা, হাতের মুঠোয় নিয়ে আসাকে তারা সমাধান ভাবল। তারা ভাবল, মুসলমানদের বাইরে কিংবা প্রতিপক্ষ রেখে তাদের স্বরাজ চিন্তা খন্ডিতই থেকে যাবে। গোপাল কৃষ্ণ গোখলে-এর মত নেতা স্পষ্টতই বললেন, মুসলমানদের সহযোগিতা ও সমর্থন ব্যতীত কংগ্রেসের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী সরকারের নিকট কোনরূপ গুরুত্ব লাভ করবে না।[২] এইভাবে অনেক হিন্দু নেতা মুসলমানদের সাথে সমঝোতায় পৌছার জন্য উদগ্রীব হলেন।[৩]

অন্যদিকে মুসলিম লীগও কংগ্রেসের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে চাইল। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে কিছুটা পরিবর্তন এর একটা কারণ। মুসলিম স্বার্থের আপোশহীন নেতা নবাব সলিমুল্লাহ রাজনীতি থেকে অবসর নিলেন। নবাব মুহসিনুল মুলক মারা গেলেন। নবাব ভিখারুল মুলক এবং সৈয়দ আহমদ বিলগ্রামীকে অন্য দায়িত্বের কারণে মুসলিম নেতৃত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হলো। তারপর ১৯১৩ সালে সৈয়দ আমীর আলী ও মওলানা মোহাম্মদ আলীর অনুরোধে

১। ১৯০৮ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বিপর্যয় নামার পর কংগ্রেসের উগ্রপন্থীদের সুর একটু নরম হয়ে গেল এবং কংগ্রেসের সাথে তাদের অবস্থানও কিছুটা আলগা হয়ে গেল। (দ্রষ্টব্যঃ 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৯৮)।

২। 'বাংলাদেশের ইতিহাস', নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৪০।

৩। 'বাংলাদেশের ইতিহাস', নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৩৯।

www.icsbook.info

কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগদান করলেন, কিন্তু কংগ্রেস থেকে তিনি পদত্যাগ করলেন না। অর্থাৎ তিনি মুসলিম লীগ করতে লাগলেন, কিন্তু কংগ্রেসেও রয়ে গেলেন। কায়েদে আযম মুসলিম লীগে প্রবেশের সময় পরিস্কার শর্ত দিলেন, মুসলিম লীগ ও মুসলিম স্বার্থের প্রতি তাঁর আনুগত্য বৃহত্তর জাতীয় কার্যক্রমের অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রতি তাঁর আনুগত্য কিছুমাত্র ব্যাহত করবেনা।[৪] এছাড়া বাংলার মুসলিম লীগের রাজনীতিতে নবাব সলিমুল্লার পর এ. কে ফজলুল হকই প্রধান হয়ে উঠলেন। ১৯১২ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে তিনি সামনে এসে গেলেন এবং নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর মত নেতা পেছনে পড়ে গেলেন। মুসলিম লীগ নেতৃত্বের এই পরিবর্তন মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের নিকটবর্তী করল। মুসলিম জনমত ও মুসলিম লীগের নীতিতেও এই সময় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। বঙ্গভঙ্গ রদ এবং ঢাকা ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গড়িমসি এবং বলকান যুদ্ধে তুরস্কের প্রতি বৃটিশ আচরণ মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। এর সাথে যোগ হল আরো একটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো। তুরস্কের খলিফা বৃটিশের বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে যোগ দিলেন। ভারতের মুসলমানরা বিপদে পড়ে গেল। একদিকে তাদের শাসক বৃটিশকে সমর্থন করার বাস্তবতা, অন্যদিকে ইসলামী বিশ্বের খলিফাকে সমর্থন করার নৈতিক বাধ্যবাধকতা। অবশেষে মুসলমানদের রায় বৃটিশের বিপক্ষেই গেল। অবশ্য এ ব্যাপারে কায়েদে আযম নিরব থাকার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলিম নেতৃত্ব এটা মেনে নিলেন না। মুসলিম পত্রিকাগুলো বৃটিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল এবং আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে গ্রেপ্তার হলেন মাওলানা শওকত আলী, মওলানা মহম্মদ আলী, মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা জাফর আলী খান, মওলানা আকরম খান ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ এবং বন্ধ করে দেয়া হলো মুসলিম সংবাদপত্রগুলো। ইংরেজ সরকারের এই পদক্ষেপ মুসলমানদের আরও ইংরেজ বিদ্বেষী করে তুলল। এই অবস্থায় মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ স্বাভাবিক ভাবেই বৃটিশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সাথে এক সমাঝোতা গড়ে তোলার জন্যে আরও বেশি তাগিদ অনুভব করলেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ছিলেন কায়েদে আযম। তাঁর সামনে স্থির দু'টি লক্ষ্য ছিল- এক, স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার তথা স্বাধীনতা অর্জন। দুই, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সাধন।[৫] তাঁর বক্তব্য ছিল- হিন্দু মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে এবং সর্বপ্রকার শাসনতন্ত্র সম্মত ও বৈধ পন্থায় যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর

৪। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমিন আহমদ পৃষ্ঠা ২০০। 'মুহাম্মদ আলী জিন্নাহঃ এমবেসেডর অব হিন্দু-মুসলিম ইউনিটি', সরোজিনী নাইডু (উদ্ধৃত 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়' গ্রন্থে, পৃষ্ঠা ১৬৭)।
৫। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', (কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ', অধ্যায় দ্রষ্টব্য) পৃষ্ঠা ১৯৯।

www.icsbook.info

করার ব্যবস্থা করতে হবে। ত্রিশ কোটি লোকের ঐক্যবদ্ধ দাবী এমন একটা শক্তি সৃষ্টি করবে যা পৃথিবীর কোন শক্তি প্রতিরোধ করতে পারবে না।

এইভাবে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস একে অপরের দিকে এগিয়ে আসার ফলে একটা ঐতিহাসিক সমঝোতা সৃষ্টি হলো। এরপর মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের সম্মেলন একই শহরে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হতে লাগল এবং নেতারা একে অপরের সম্মেলনে যোগ দিতে লাগলেন। এ ধরনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো বোম্বাইয়ে ১৯১৫ সালে। উল্লেখ করার মত বিষয় হলো, সরোজিনী নাইডু এবং রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকামী চরম হিন্দুবাদী নেতা মদনমোহন মালব্য মুসলিম লীগের সম্মেলনে গিয়েছিলেন। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বোম্বাই সম্মেলনে কায়েদে আযম সাংবিধানিক সংস্কারের জন্যে একটা যৌথ পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। সাংবিধানিক সংস্কারের এ প্রস্তাব উভয় দল কর্তৃক গ্রহীত হলো, যার ফল ছিল লাক্ষ্ণৌ প্যাক্ট। ১৯১৬ সালে লাক্ষ্ণৌতে একই সময়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। কংগ্রেস অধিবেশনে অম্বিকাচরণ এবং মুসলিম লীগ অধিবেশনে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ সভাপতিত্ব করলেন। এই অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাক্ষ্ণৌ প্যাক্ট সম্পাদিত হলো মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে। এই চুক্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, কংগ্রেস প্রত্যেক প্রদেশে মুসলিম লীগের পৃথক নির্বাচন ও পৃথক পৃতিনিধিত্বের দাবী স্বীকার করে নিল। এর মাধ্যমে ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টোর শাসন সংস্কারে মুসলমানদের পৃথক প্রতিনিধিত্ব ও প্রথক নির্বাচনের দাবী কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করল। অর্থাৎ জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অধিকারের দাবী কংগ্রেসের কর্তৃক স্বীকৃত হলো। অন্যদিকে মুসলিম লীগ তাদের বিশেষ দাবীর ক্ষেত্রে নমনীয়তা প্রদর্শন করল। বাংলায় ৪০ শতাংশ এবং পাঞ্জাবে ৫০ শতাংশ মুসলিম প্রতিনিধিত্বের বিষয় মুসলিম লীগ স্বীকার করে নিল এবং সংখ্যা ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবী পরিত্যাগ করল। মুসলমানদের ধর্ম-সংস্কৃতির উপর সংখ্যাগুরুদের হস্তক্ষেপ হতে পারে, এ ভয় মুসলমানদের ছিল। এ ভয় দূরীকরণের জন্যে ঠিক হলো যে, 'কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে কোন প্রস্তাব সেই সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ সদস্যের বিরোধিতা থাকলে গৃহীত হবে না।'[৭] লাক্ষ্ণৌ চুক্তিকে অনেক ঐতিহাসিক মুসলমানদের জন্যে কুটনৈতিক বিজয়,[৮] বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বাংলার মুসলমানরা এই চুক্তিতে খুব সন্তুষ্ট হয়নি। বাংলায় মুসলমানরা ছিল সংখ্যায় শতকরা ৫৪ ভাগ। কিন্তু চুক্তি অনুসারে আইন পরিষদের তারা আসন পেল শতকরা ৪০ ভাগ। নওয়াব আলী চৌধুরীর মত মুসলিম নেতারা এ চুক্তির সমালোচনা করলেন। বাংলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং

৬। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব', পৃষ্ঠা ২০০।
৭। 'History of Freedom Movement in India', Tarachand, Vol-iii Page 414.
৮। 'বাংলাদেশের ইতিহাস', নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫৪০।

www.icsbook.info

লেখাতেও এর সমালোচনা করা হলো। বলা হলো, "ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মোসলেম নিতান্ত কম বিধায় সেই সব প্রদেশের হিন্দুগণ প্রতিবেশী মোসলেমকে রাজকীয় অধিকার কিঞ্চিত বাড়াইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য উৎকোচ অথবা ঘুষের স্বরুপ বঙ্গীয় হিন্দুগণ বঙ্গীয় মোসলেমের জন্মগত অধিকার শতকরা ৫৪ অংশ হইতে ১৪ অংশ গ্রহণ পূর্ব বঙ্গীয় মোসলেমের মাথা কাটিয়া মাত্র শতকরা ৪০ অংশে আনয়ন করিয়াছেন। এটা মোসলেমের প্রতি ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে। হইতে পারে এই ব্যাপারে বাঙ্গালার পক্ষের মোসলেম নামধারী লোকও ছিলেন। জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি কখনও গরীবের ধার ধারেন? সেরূপ মনে হয়না। এতিম অর্থাৎ অভিভাবক হীন বঙ্গীয় গরীব মোসলেমের সম্পত্তি এরূপভাবে কেহ হস্তান্তর করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না।"[৯] আরও বলা হলো, "বঙ্গীয় মোসলেম হিন্দুর থেকে নিতান্তই হীনবল, সাধারণ কোন অধিকারও তাহারা হিন্দুর নিকট হইতে প্রতিযোগিতা করিয়া লইত পারেন না। কতবার কংগ্রেস হইল, কত লীগ বসিল আবার বঙ্গ সরকার রাজ্যের উন্নতিকল্পে কত রকমে কত মাথা খাটাইলেন, কিন্তু কিছুতেই বঙ্গীয় মোসলেমের সম্বন্ধে কোন সৎ সিদ্ধান্ত হইল না। অধিকন্তু ১৯১৬ সনে লাক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেস ও লীগ মিতালী করিয়া কংগ্রেসকে পূর্ণ ক্ষমতা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হতভাগ্য বাঙ্গালী মোসলেমের জাতীয় স্বার্থ শতকরা ৫৪ অংশ হইতে একেবারে ৪০ অংশে নামাইয়া দেয়া হইল। তাই বলি, যে দেশের মোসলেম বহু পূর্ব হইতে প্রতিযোগিতা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটেও যাইতে পারে নাই, যে দেশে তাহারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং বৈদিশিক শিল্পকলা প্রভৃতিতে কেবল মাতৃগর্ভস্থ ভ্রুনের ন্যায় মাত্র ধক ধক করিতেছেন, যে দেশের শাসন ও বিচার বিভাগে তাহারা নিতান্ত এতিম শিশুটির ন্যায় কালযাপন করিতেছেন, যে দেশের রাজকীয় সকল বিভাগেই হিন্দুগণ একচ্ছত্র রাজ প্রতিনিধি, সেই দেশেই হীনবল মোসলেমের শতকরা ৫৪ অংশ হইতে ১৪ অংশ বলপূর্বক কাড়িয়া নিয়া প্রবল হিন্দু সমাজ আরও প্রতিপত্তি লাভ করিল।"[১০] এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের ক্ষোভ ও মর্মবেদনার প্রকাশ ঘটেছে। এ মর্মবেদনা ঠিক, কিন্তু মুসলিম নেতৃবৃন্দ ভুল করেছিলেন এটা ঠিক নয়। বাংলার জননেতা, এ. কে ফজলুল হক, মওলানা আজাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 'হিন্দু-মুসলিম মিলন ও দেশের ভবিষ্যৎ ও সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং দীর্ঘদিন এই সম্প্রীতির প্রবাহকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করেন।"[১১]

৯। 'পথিক' পত্রিকা, আষাড়-শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৩২ সাল প্রবন্ধের নাম ছিল 'অকর্ত্তব্য' লেখক সাঈদ উদ্দীন আহমদ। পরে প্রবন্ধটি লেখকের 'রাজমুকুট' গ্রন্থে সংকলিত হয়, পৃষ্ঠা ৩০, ৩১। 'রাজমুকুট', প্রকাশিত হয় ২২শে জুলাই, ১৯২৫।

১০। 'রাজমুকুট', সমীচীন শীর্ষক পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা ৯১, ৯২, ৯৩ লেখক সাঈদ উদ্দীন আহমদ, প্রকাশ ১৯২৫।

১১। 'বাংলাদেশের ইতিহাস', নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃষ্ঠা ৫৪১।

www.icsbook.info

লাক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদনের পূর্ব মুহূর্তে কায়েদে আযম মুসলিম লীগ সম্মেলনে বলেছিলেন, "হিন্দুদের প্রতি আমাদের শুভেচ্ছামূলক এবং ভ্রাতৃভাবাপন্ন আচরণ হতে হবে। দু'টি সহোদর প্রতীম সম্প্রদায়ের সমঝোতার মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সম্ভব।"[১২]

পরবর্তী বড় ঘটনা হলো প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ শেষ হওয়া এবং খেলাফত আন্দোলন শুরু হওয়া। পরে খেলাফতের সাথে স্বরাজ যুক্ত হলো এবং তারপর স্বরাজটাই মূখ্য হয়ে উঠল। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলো। যুদ্ধে জার্মানী পক্ষের হার হলো। পরাজিত তুরস্ককে খন্ড-বিখন্ড করার জন্যে বৃটেন এগিয়ে এল। এই ঘটনা মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করল। অথচ বৃটেন ভারতের মুসলমানদের প্রকাশ্যে এবং সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যুদ্ধ শেষে বৃটেন তুরস্কের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করবে না। কিন্তু যুদ্ধ শেষে উল্টো ব্যবহার করলো বৃটেন। বলকান অঞ্চল আগেই কেড়ে নেয়া হয়েছিল। বৃটেনের কথায় বিশ্বাস করে ভারতের মুসলমানেরা যুদ্ধে বৃটেনকে সবদিক থেকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। এই মুসলমানরা এখন ইংরেজদের ব্যবহারে প্রতারিত বোধ করল। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল মুসলমানরা। খেলাফত আন্দোলন আবার শুরু হলো।

১৯১৮ সালে দিল্লীতে মুসলিম লীগের সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হলো। সভাপতিত্ব করলেন এ,কে ফজলুল হক। এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন মওলানা আব্দুল বারী, মওলানা আজাদ সুবহানী, মওলানা ইব্রাহিম শিয়ালকোটি, মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসারী, মওলানা আহমেদ সাঈদ, মওলানা কিফায়েতুল্লাহ, মওলানা আব্দুল লতিফ প্রমুখ আলেম বৃন্দ। এঁরা অনেকেই কংগ্রেসপন্থী এবং মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে এতদিন দূরে ছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের স্বার্থেই এঁরা মুসলিম লীগ সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। লক্ষ্য ছিল, মুসলিম লীগকে খেলাফত আন্দোলনে নিয়ে আসা। তারা সফল হয়েছিলেন। কায়েদে আযম খেলাফত আন্দোলন নিয়ে বাড়াবাড়ির পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত ছিল খেলাফত আন্দোলনের জন্য কমূসূচী ঘোষণার পক্ষে। সভাপতির ভাষনে এ, কে, ফজলুল হক জোরালো কণ্ঠে বললেন, "আমার কাছে ভারতে ইসলামের ভবিষ্যত মনে হয় হতাশা এবং উদ্বেগাচ্ছন্ন। দুনিয়াতে মুসলিম শক্তির পতনের যে কোন উদাহরণ ভারতে আমাদের সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক গুরত্বের ওপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য।"[১৩]

খেলাফত আন্দোলনের জন্যে কর্মসূচীর প্রস্তাব মুসলিম লীগ গ্রহণ করলেও মুসলিম লীগকে এ নিয়ে বেশি দূর এগুতে হলো না। খেলাফত আন্দোলন পরিচালনার জন্যে আলাদা কমিটি গঠিত হলো। কংগ্রেসভুক্ত মুসলিম নেতৃবৃন্দই[১৪]

১২। 'জিন্নাহ', লেখক হেক্টর বালিথো।
১৩। 'History of the Freedom Movement in India', by Tarachand, Page 416.

www.icsbook.info

এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন। হাকীম আজমল খান ও ডক্টর আনসারী প্রমুখ নেতারাই ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে সর্বভারতীয় খেলাফত কমিটি গঠন করলেন। ১৯১৯ সালের ১৭ই অক্টোবর গোটা ভারত ব্যাপী 'খেলাফত দিবস' পালিত হলো। সাড়া পড়ে গেল গোটা ভারতবর্ষে। বাংলায় এ, কে, ফজলুল হক ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন গড়ে উঠল। খেলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদেরকে দারুণ উৎসাহী দেখা গেল। প্রথম খেলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ১৯১৯ সালের ২৩শে নভেম্বর দিল্লীতে। এতে সভাপতিত্ব করলেন শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক। এই সম্মেলনে গান্ধী ও মতিলাল নেহেরুর মত শীর্ষ কংগ্রেস নেতাই নয়, ভারতে রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকামী কট্টর কংগ্রেস নেতা মদন মোহন মালব্যও যোগদান করেছিলেন। খেলাফত সম্মেলন দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হলো। প্রথম দিন সভাপতিত্ব করলেন এ, কে, ফজলুল হক এবং দ্বিতীয় দিন সভাপতিত্ব কররেন মিঃ গান্ধী।

খেলাফত আন্দোলনের সাথে মিঃ গান্ধীর এই সংশ্লিষ্টতা খেলাফত আন্দোলনের গুণগত পরিবর্তন সাধন করল। খিলাফতের অধিকার সংক্রান্ত দাবী দাওয়া এবং তা বাস্তবায়নের চাপ ও চেষ্টার চাইতে খেলাফত আন্দোলন রাজনৈতিক চরিত্রের দিকেই ঝুঁকে পড়ল বেশি। দিল্লীর খেলাফত সম্মেলনে সভাপতির ভাষনে গান্ধী বললেন, 'মুসলমানদের অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যে বয়কট নয়, প্রয়োজন অসহযোগিতা।'[১৫]

মিঃ গান্ধীর এই 'অসহযোগিতা' বা 'অসহযোগ' মোটেই অপরিচিত নয়। ১৯১৯ সালের মার্চে কালাকানুন 'রাওলাত আইন'[১৬] পাশ হলে গান্ধী এই অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছিলেন। ৬ই এপ্রিল ঘোষিত হয়েছিল সত্যাগ্রহ দিবস। বিভিন্ন শহরে সভা, সমিতি, মিছিল শুরু হয়েছিল। ৬ই এপ্রিল গোটা ভারতে হরতাল, বিক্ষোভ হলো। গোলমালও হলো অনেক জায়গায়। সবচেয়ে বড় গোলমাল হলো পাঞ্জাবের অমৃতসর শহরে। সংঘটিত হয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড। রাওলাত আইন বিরোধী প্রতিবাদ সমাবেশের উপর ইংরেজ সৈন্যের গুলিতে ৪শ' জন নিহত এবং আহত হয়েছিল ১২ শ' জনের অধিক। গান্ধী সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, যদিও ভারতব্যাপী জনগণ এই হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভমুখর হয়ে উঠেছিল। গান্ধী খেলাফত আন্দোলনের সুযোগে তার পরিত্যাক্ত সেই অসহযোগ আন্দোলনকেই পুনরুজ্জীবিত এবং দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে

১৪। 'কায়েদে আযম যেমন মুসলিম লীগের নেতা হয়েও কংগ্রেসে ছিলেন, তেমনি তখনও বড় বড় মুসলিম নেতা কংগ্রেসযুক্ত ছিলেন।

১৫। 'History of the Freedom Movement in India', by Tarachand, Page 417.

১৬। 'রাওলাত আইন' -এর বলে বিনা বিচারে যে কোন লোককে আটক রাখার অধিকার সরকার পায়।

www.icsbook.info

খেলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করে ফেলতে চাইলেন। এই চাওয়াটা আরও পরিপূর্ণতা লাভ করে কংগ্রেসের ১৯২০ সালের মে' মাসের কলকাতা সম্মেলনে।

ইতিমধ্যে আরও বেশ কিছু ঘটনা ঘটল। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অমৃতসরে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন হলো। সদ্য গঠিত 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ'কেও আহবান জানানো হয়েছিল সম্মেলনে। তারাও তাদের আনুষ্ঠানিক সম্মেলন এ সময় অমৃতসরে করল। মওলানা শওকত আলী এ সময় কারামুক্ত হলেন। তাঁর সভাপতিত্বে খেলাফত সম্মেলনও অমৃতসরে আহুত হলো। এই জমজমাট অমৃতসরে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা ঘটল। কায়েদে আযম মুসলিম লীগের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হলেন। মুসলিম লীগ সম্মেলনে তুরস্ক ও ভারতের প্রতি বৃটিশ নীতির তীব্র সমালোচনা করা হলো। অন্যদিকে খেলাফত আন্দোলনের উপর কংগ্রেসের প্রভাব আরও মজবুত হলো। অমৃতসরের খেলাফত সম্মেলনে দু'টি প্রধান সিদ্ধান্ত হলো। এক, সারা দেশব্যাপী খেলাফত আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গৃহীত হলো এবং দুই, সিদ্ধান্ত হলো মিঃ গান্ধী এই খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করবেন।[১৭] ভাইসরয় ও ইংল্যান্ডে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে খেলাফত আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত অমৃতসর সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বড় লাটের সাথে দেখা করলেন। তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করা হলো তুর্কি সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং খলিফা হিসেবে তুর্কি সুলতানের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার যৌক্তিকতা। কিন্তু ফল কিছু হলো না। এ বছরই মার্চ মাসে মওলানা মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধিদল গেলেন বৃটেনে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের সাথে দেখা করার জন্যে। সেখান থেকেও কোন রেজাল্ট পাওয়া গেলনা।

বৃটিশ সরকারকে এইভাবে বুঝাবার প্রচেষ্টার পাশাপাশি চলছিল আন্দোলনের প্রস্তুতি। ১৯২০ সালের জানুয়ারীতেই মীরাটে অনুষ্ঠিত হলো খেলাফত কনফারেন্স। খেলাফত কমিটিতে গান্ধীর যে অসহযোগ পাশ হয়েছিল এই খেলাফত কনফারেন্সে তা অনুমোদিত হলো। এ ছাড়া মিঃ গান্ধী এ বছরেরই মে মাসে কলকাতার কংগ্রেস সম্মেলনে খেলাফত আন্দোলনের সাথে 'স্বরাজ' দাবী যুক্ত করে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে দিলেন। খেলাফত আন্দোলনের সাথে 'স্বরাজের' এই সংযোগ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর পর আন্দোলনের গুরুত্ব খেলাফত সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকে স্বরাজ বা স্বদেশ সংক্রান্ত বিষয়ের দিকেই ঘুরে গেল। এই মে মাসেই বোম্বাইতে খেলাফত কমিটির যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, 'তাতে অসহযোগ কর্মসূচীর ঘোষণা দেয়া হলো। বলা হলো, দেশবাসী সরকার প্রদত্ত সম্মান সূচক পদ ও পদবী প্রত্যাখ্যান করবে,

১৭। 'পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টি', মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪০।

www.icsbook.info

আইন সভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করবে, সরকারের সামরিক ও বেসামরিক পদ থেকে ইস্তফা দেবে, এমনকি প্রয়োজনে কর প্রদান হতেও বিরত থাকবে।'[১৮] নিখিল ভারত কংগ্রেসও এ সময় তার প্ল্যাটফরম থেকে খেলাফত কমিটির সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে তুরস্কের প্রতি নির্মম ব্যবহারের জন্য বৃটেনের তীব্র নিন্দা করল। জুন মাসে আবার খেলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সবাই এলাহাবাদে একত্রিত হলো এবং বড়লাটকে চরমপত্র প্রদান করল। বলা হলো খেলাফত আন্দোলনের দাবী মেনে না নিলে ১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে। জুলাই মাসে সিন্ধুতে অনুষ্ঠিত খেলাফত সম্মেলন থেকে মিঃ গান্ধী খেলাফত আন্দোলনকে সহযোগিতার জন্যে ভারতের ২৩ কোটি হিন্দুর প্রতি আহ্বান জানালেন। রামরাজ্যবাদী হিন্দুনেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ১লা আগষ্ট থেকে ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানালেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, অসহযোগের প্রস্তাব ঘোষণা হলো খেলাফত আন্দোলনের প্ল্যাটফরম থেকে, নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্মেলনেও একে অনুমোদিত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মুসলিম লীগ প্ল্যাটফরম এ ব্যাপারে নিরব। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কায়েদে আযম মিঃ গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেননি।

ইতিমধ্যে মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব ১৯১৯ সালে ২৩ শে ডিসেম্বর আইনে পরিণত হয়েছিল। এই আইন অনুসারে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সেচ, বিচার, স্বায়ত্ব শাসন, প্রভৃতি দপ্তরগুলি ভারতীয়দের হাতে দেখা হয়, অন্যদিকে অর্থ, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, প্রতৃতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো শ্বেতাংগ সদস্যদের হাতে রাখা হয়। এছাড়া সিদ্ধান্ত হয় নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা মনোনীতদের চেয়ে বেশি হবে। ভারতীয় সদস্যদের হাতে দপ্তরগুলোর ব্যয় বরাদ্দের দাবী আইন সভায় অনুমোদন সাপেক্ষ হবে। কিন্তু ভাইসরয় ও গভর্ণর আইন সভার যে কোন প্রস্তাব বাতিল করতে পারে। অর্থাৎ প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রে ভাইসরয় এবং প্রদেশের গভর্ণরের হাতেই ন্যস্ত থাকল। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার শাসন ব্যবস্থাকে ভারতীয় করণের পথে একটা বড় অগ্রগতি। জিন্নাহ বললেন, আমরা মন্টেগু সংস্কার সাময়িকভাবে গ্রহণ করতে রাজি আছি। গান্ধীও অমৃতসরের কংগ্রেস সম্মেলনে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ সংস্কার গ্রহণ করার আহবান জানিয়েছিলেন।[১৯] কিন্তু পরে গান্ধী তাঁর এই নীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

১৯২০ সালের পয়লা আগষ্ট থেকে অসহযোগ শুরু হয়ে গেল। গোটা ভারতে পূর্ণ হরতাল পালিত হলো। গান্ধী তাঁর সকল পদক সরকারকে ফিরিয়ে দিলেন। কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও তাঁর সাথী আলেমবৃন্দ ফতোয়া

১৮। 'পাকিস্তান ঃ দেশ ও কৃষ্টি', মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪১।
১৯। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দেজ পাবলিশিং, কোলকাতা, পৃষ্ঠা ৮৮, ৮৯।

www.icsbook.info

দিলেন, বৃটিশ শাসিত ভারত 'দারুল হরব'। তারা নির্দেশ দিলেন যে, এদেশ ছেড়ে মুসলমানদের চলে যাওয়া উচিত।[২০] জিন্নাহ্ অসহযোগ কর্মসূচীর সাথে একমত ছিলেন না, কিন্তু সরকার সম্পর্কে তার মত প্রকাশ করে বললেন, "এ সরকারকে আর বরদাশত করব না, একটি পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার চাই।"[২১] অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কায় অচিরেই গোটা দেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ার এক মাস পর কোলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসল। ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল গান্ধীর প্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগের যে প্রস্তাব এসেছিল তা হোল (১) বৃটিশ সরকারকে প্রদত্ত উপাধি ও অনারারী পদত্যাগ করা (২) সরকারী দরবার ও আনুষ্ঠান বর্জন করা (৩) পর্যায়ক্রমে সরকারী স্কুল কলেজ বা সরকার নিয়ন্ত্রিত স্কুল-কলেজ হতে শিক্ষার্থীদের বের করে আনা (৪) আইনজীবী ও বিচার প্রার্থীদের বৃটিশ কোর্ট বর্জন করা, (৫) কেরানী, শ্রমিক, সৈনিক হিসাবে মেসোপটেমিয়া যেতে অস্বীকৃতি জানানো এবং (৬) মন্টেগু চেমস ফোর্ড আইন অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা।[২২] গান্ধীর এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, মতিলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ। 'তারা গান্ধীর এই প্রস্তাবকে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে রাজী হলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দল থেকে মতিলাল নেহেরু চলে গিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে যোগ দিলেন এবং গান্ধীর হাতকে শক্তিশালী করলেন।[২৩] অবশেষে ভোট যুদ্ধে হেরে গেলেন মিঃ জিন্নারা।[২৪] গান্ধীর পক্ষে পড়ল ১৮০৬ ভোট, আর জিন্নাহদের পক্ষে পড়ল ৮৮৪ ভোট। ভোটে গান্ধীর এই বিজয়ের রহস্য হলো, গান্ধী পক্ষ 'দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক ভাড়া করে এনে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে জড়ো করেছিলেন এবং এঁরা গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন।'[২৫] এ প্রসংগে ডঃ বি, আর, আম্বেদকরও বলেন, "মিঃ ডায়ারস পরবর্তীকালে আমাকে একদিন বলেছিলেন, কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানকারী অধিকাংশ প্রতিনিধিই ছিল কলকাতার ট্যাক্সিচালক এবং অর্থের বিনিময়ে তারা গান্ধীর কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।"[২৬] কোলকাতা কংগ্রেস সম্মেলনে এ নাটকীয় সিদ্ধান্তের পর তিন মাসের মাথায় ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের আরেকটি সম্মেলন বসল। এখানেও

২০। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি', মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪১।
২১। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি', মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৪১।
২২। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুব রহমান, পৃষ্ঠা ১৭১, ১৭২।
২৩। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ৯০।
২৪। মিঃ জিন্নাহ মুসলিম লীগের সভাপতি হলেও যেহেতু তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেননি, তাই কংগ্রেস সম্মেলনে এসেছিলেন।
২৫। 'জিন্নাহ অব পাকিস্তান' ষ্ট্যানলী ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা ৬৯ ('স্বাধীনতার অজানা কথা', পৃষ্ঠা ৯০, ৯১)।
২৬। 'Pakistan in the Formative stage', by Khalid bin Saeed (মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়, পৃষ্ঠা ১৭২)।

www.icsbook.info

আলোচ্য বিষয় ছিল গান্ধীর অসহযোগ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সম্মেলনে এবং সম্মেলনের বাইরে গান্ধীকে অনেক বুঝালেন অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে। কিন্তু গান্ধী কোন কথার প্রতিই কর্ণপাত করলেন না। আর মিঃ জিন্নাহকে সম্মেলনে কথাই বলতে দেয়া হলোনা। জিন্নাহ দাঁড়িয়ে যেই বললেন, 'মিঃ গান্ধী------', অমনি চারদিক থেকে চিৎকার করে বলা হলো, 'মিস্টার গান্ধী নয়, মহাত্মা গান্ধী বলুন।'[২৭] জিন্নাহ মহাত্মা গান্ধী বললেন না। তাঁর বক্তব্য তিনি পেশ করতে পারলেন না। এই নাগপুর সম্মেলনেই জিন্নাহ কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন। গান্ধী তার অসহযোগে অটল থাকলেন। কংগ্রেসের নাগপুর সম্মেলনে ঠিক হলো, 'স্বরাজ' হবে কংগ্রেসের সংগ্রামের লক্ষ্য বস্তু। [২৮ক] গান্ধীর এই অস্পষ্ট স্বরাজ নিয়েও ছিল মিঃ জিন্নার প্রবল আপত্তি। গান্ধী তার স্বরাজের ব্যাখ্যা দিতে রাজী ছিলেন না। [২৮খ] গান্ধী খেলাফত, অসহযোগ, স্বরাজ, প্রভৃতির মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন। কোনও পথই সামনে পরিস্কার ছিলন। জিন্নাহ স্পষ্টই বললেন, গান্ধীজির এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্যর্থ হবে।[২৯] কিন্তু গান্ধী তার আধ্যাত্মিক শক্তির বরাত দিয়ে ঘোষণা করলেন, 'তাঁর অসহযোগ কর্মসূচী গ্রহণ করলে ১৯২১ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে।'[৩০] নাগপুরে সম্মেলনের আগেই জিন্নাহ গান্ধীকে তার অসহযোগ কর্মসূচী সম্পর্কে লিখিত এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "আমি আপনার কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারবোনা। আজ দেশবাসী বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন মতে বিভক্ত --------- আপনার কর্মসূচী দেশের প্রতিষ্ঠানকে বিভক্ত করেছে। আপনি শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেননি, আপনি হিন্দু-হিন্দুর মধ্যে, মুসলমান-মুসলমানের মধ্যে, এমনকি বাপ-ছেলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। ---------- আজ দেশবাশী হতাশ হয়ে পড়েছে -------- আপনার কর্মসূচী শুধু অনভিজ্ঞ, নিরক্ষর এবং অশিক্ষিত যুবকদের আকৃষ্ট করেছে ------- এর পরিণাম যে কি হবে আমি কল্পনা করতে চাইনে ------ আমি জানি যে, বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে সরকার দায়ী। আমরা যদি মূল কারণের সমাধান না করতে পারি তাহলে এর ফলভোগ আমাদেরই করতে হবে। আমি চাইনা আমার দেশবাসী ধ্বংসের পথে যাক -------।"[৩১]

২৭। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ৯১।

২৮ক। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯১ (লক্ষণীয়, কংগ্রেসের লক্ষ বস্তু হলো 'স্বরাজ' 'খেলাফত', এর নামগন্ধ তাদের কথায় নেই)।

২৮খ। "তাঁর (গান্ধীর) সত্যিকার প্রত্যাশা কি ছিল সেটা আমি উপলব্ধি করতে পারিনি। হয় তিনি তার গোপনীয় ব্যাপার অসময়ে প্রকাশ করতে চাননি, নতুবা সরকারকে বাধ্য করার মতো কোন কৌশলের স্পষ্ট ধারণা তার ছিলনা।" Subash Bose: The Indian Struggle 1920-1934 "স্বরাজ বিষয়ে গান্ধীজি ছিলেন হাস্যকরভাবে অস্পষ্ট এবং এ বিষয়ে স্পষ্ট চিন্তাকে তিনি উৎসাহিত করতেন না।" (Jawaharlal Neheru Autobiography'. Page 76.)

২৯। ঐ ।৩০। 'Jinnah' Hectar Balithe', (মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়, পৃষ্ঠা ১৭২)।

৩১। 'জিন্নাহ অব পাকিস্তান', ষ্ট্যানলী ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা, ৭০।

www.icsbook.info

এসব বাদানুবাদের অনেক আগেই ১৯২০ সালের ১লা আগস্ট অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ডাক চারদিকে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করল। ভারতকে দারুল হরব-ঘোষণা করে কংগ্রেস নেতা মওলানা আজাদ প্রমুখ মুসলমানদের যখন দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিলেন, দেশ ত্যাগ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে সিন্ধু এলাকা থেকে, তারপর গোটা দেশ থেকে। হাজার হাজার মুসলমান আফগানিস্তানে হিজরত শুরু করল। অসহযোগ আন্দোলন শুরুর প্রথম মাসেই প্রায় ১৮ হাজার মুসলমান দেশান্তরিত হলো। হাজার হাজার লোকের আগমনে ভীত হয়ে আফগানিস্তান তার সীমান্ত বন্ধ করে দিল। চরম হতাশগ্রস্ত হলো হিজরত করা হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ। অনেক জীবন নাশ্ ও অপরিমেয় সম্পদ হানির পর দারুল হরব এর ঘোষণা প্রত্যাহার করা হলো এবং হিজরত বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

দেশত্যাগের ফলে যা ঘটেছিল, শিক্ষা, চাকুরী ও বিভিন্ন পেশার ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। প্রখ্যাত আইনজীবী চিত্তরঞ্জন দাশ তার আইন ব্যবসা ত্যাগ করলেন। উভয় সম্প্রদায়ের অসংখ্য আইনজীবী ও সরকারী চাকুরে একই পথ অনুসরণ করলেন। সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে সুভাষ বসু আন্দোলনে অংশ নিলেন। হাজার হাজার ছাত্র স্কুল কলেজ ত্যাগ করল। বাংলার জননেতা এ, কে, ফজলুল হক স্বরাজ সমর্থন করলেন, কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে অসহযোগকে মেনে নিলেন না। কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্বেও তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদে যোগ দিলেন।[৩২] আরেকটি ব্যতিক্রম ছিল, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী 'অনুদান প্রত্যাখ্যানে সম্মত হলোনা। এ ধরনের কিছু ব্যতিক্রম ছিল বটে, কিন্তু দেশ ভেসে গেল অসহযোগের বন্যায়। মওলানা শওকত আলী ও মওলানা মোহাম্মদ আলীকে দু'বছরের কারাদন্ড দেয়া হলো। দেশ আরও ফুঁসে উঠল। গান্ধী অবিলম্বে সকলকে সামরিক ও বেসামরিক চাকুরী ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ পালনের ফল যাই হোক, ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করার মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলনে রূপ নিল। উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরীচৌবাতে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা থানা আক্রমণ করে ২২ জন পুলিশকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারল। এই ঘটনার পর গান্ধী খেলাফত কমিটির সাথে কোন পরামর্শ না করেই 'পর্বত প্রমাণ ভুল হয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করে' অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন। কংগ্রেসও ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে অসহযোগ প্রত্যাহার করল। কংগ্রেসও এ ব্যাপারে খেলাফত কমিটির সাথে যোগাযোগের কোন প্রয়োজন বোধ করেনি। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গান্ধী ও কংগ্রেস উভয়েই খেলাফত আন্দোলনকে পরিত্যাগ করল। খেলাফত আন্দোলনের

৩২। 'উপমহাদেশের রাজনীতি এবং স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব', ইয়াসমিন আহমদ, পৃষ্ঠা ২৩৬ এবং 'বাংলাদেশের ইতিহাস', নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃষ্ঠা ৫৪৪, ৫৪৫।

www.icsbook.info

সকল নেতাই আকস্মিকভাবে গান্ধী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন।[৩৩]

গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে খেলাফত আন্দোলনের কোনই উপকার করেনি। অসহযোগের ঝড় খেলাফতের দাবী দাওয়াকে পেছনে ঠেলে দেয়। গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দেয়ার নামে তার স্বরাজ আন্দোলনে মুসলমানদের সমর্থন আদায় করা। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হঠাৎ করে মুসলমানদের ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেয়ার মধ্যেও ষড়যন্ত্র ছিল বলে মনে করা হয়। এ সম্পর্কে এ, বি, রাজপুতের মন্তব্য, "এটা ছিল ঋষির দেশ ম্লেছ শূন্য করার জন্যে মিঃ গান্ধীর পাতা একটি ফাঁদ। গান্ধীর কার্যক্রমের এটাই ছিল লক্ষ্য। এতে তিনি নিঃসন্দেহে আনন্দিত হয়েছিলেন।"[৩৪] জেড, এ, সুলেরী বলেন, "যা কিছু মুসলমানের সর্বনাশের কারণ হতে পারে, তার প্রতিই মহাত্মার মহৎ আশীর্বাদ বর্ষিত হতো।"[৩৫] গান্ধীর এই রূপ অনেকের কাছেই পরিস্কার ছিল। তাই দেখা যায়, অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ বাংলাকে সয়লাব করলেও সচেতন মহলে প্রশ্ন ছিলই। ১৯২১ সালে লিখিত ও ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'রাজমুকুট'-এ বলা হচ্ছে, "বঙ্গের প্রাচীন নেতা নওয়াব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব আজীবন বাঙ্গালীর হিতসাধন করিয়া আসিয়াছেন। লাক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় অধিকার শতকরা ৪০ অংশে আদায় করায় তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়া কংগ্রেস, ও মোশ্লেম লীগ ত্যাগ করিয়াছেন। অধিকন্তু এই অবস্থায় স্বরাজ হইলে বাঙ্গালী মুসলমানেরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন মনে করিয়াই তিনি কাউন্সিলে প্রবেশ পূর্বক মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। নওয়াব বাহাদুর বিশ্বাস করেন যে, স্বরাজ হইলে মুসলমানেরা হিন্দুর নিকট প্রতারিত হইবে। ---ভারতের উজ্জ্বল নক্ষত্রতুল্য, অতুলনীয় সাহসী এবং অসীম ধী সম্পন্ন নেতা মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবও নীরবে সরকার পক্ষ অবলম্বন পূর্বক কাউন্সিলে প্রবেশ করিলেন। ---- তিনি কাউন্সিলে প্রবেশের পূর্বে যদি বঙ্গীয় হিন্দু ভাইদিগকে উচ্চ কণ্ঠে বলিতেন যে, আমাদের জাতীয় অধিকার প্রত্যেক বিষয়ে শতকরা ৫৪ অংশ হিসাবে প্রদান না করিলে আমরা আবশ্যই উপায়ন্তর অবলম্বন করতে বাধ্য হইব তাহা হইলে তিনি বাস্তবিকই সর্বসাধারণের নিকট প্রশংসা ভাজন হইতেন ---- এবং বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ স্বকীয় কৃতকার্যের ফলে জগতের সম্মুখে অত্যন্ত লজ্জিত হইতেন। যাহা হউক স্থুল কথা এই যে, এখন যদি আমাদের অংশ বুঝিয়া না পাই, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইলে আমরা আর উহার নিকটেও দাঁড়াইতে পারিবনা।"[৩৬] সে সময় মুসলমানদের এ সন্দেহ করার আরও কারণ হলো, স্বরাজ ও অসহযোগ

৩৩। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ১০১।

৩৪। 'Pakistan in the Formative stage', by Khalid bin Syeed (মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', গ্রন্থে উদ্বৃত, পৃষ্ঠা ১৭৩)।

৩৫। 'Pakistan in the Formative stage', ('মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', গ্রন্থে উদ্বৃত, পৃষ্ঠা ১৭৩)।

৩৬। 'রাজমুকুট', সাইদ উদ্দীন আহমদ (প্রকাশ, কলকাতা, জুলাই ২২, ১৯২৫), পৃষ্ঠা ১১০, ১১১, ১১২।

www.icsbook.info

আন্দোলনেও মুসলমানদের শ্রমিকের মত ব্যবহার করা হতো এবং সর্ব পর্যায়ের নেতৃত্ব ছিল হিন্দুদের কুক্ষিগত। এ বিষয়টি মুসলমানদের আশংকিত করেছে, তারা এটা মেনে নিতে পারেনি। ১৯২১ সালের 'রাজমুকুট' বলছে, "বঙ্গ দেশে হিন্দু প্রবল, মোশ্লেম নিতান্ত দুর্বল। স্বরাজের সভাসমিতিতে, শালিশী আদালতে, কংগ্রেস কমিটিতে এবং পূর্ব হইতে সরকারী কাজকর্মে শতকরা ৯৫ জনেরও উপর হিন্দু প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছেন। মোশ্লেম তথায় ১০ জনও যাইতে পারিতেছেনা। নানা কারণে জাতীয়তা বিনষ্ট হওয়ায় অবোধ মোশ্লেমের ভোট মোশ্লেমও পাইতেছেনা। সভাপতি হিন্দু, সম্পাদক হিন্দু, প্রচারক হিন্দু, মোশ্লেম ভলান্টিয়ার। ---- তজ্জন্য অবোধ মোশ্লেম ক্রন্দন করিতেছে। স্বরাজের কার্য্যও বিন্দুমাত্র করিতেছে না।---- আমাদের উপযুক্ত লোক নাই, আমি তাহা স্বীকার করিনা। আমি বলি সকল দিকেই আমাদের যথেষ্ট লোক আছে। ------- পেটি আমলাগিরীর জন্য এখনও শত শত আই, এ, বি, এ মোশ্লেম প্রার্থী সরকারের অবহেলায় বার বার বিফল মনোরথ হইয়া ক্ষুন্ন মনে বেকার বসিয়া আছেন। --- অপর দিকে স্বরাজের কাজের জন্য বেশী বি,এ এম, এ, পাশ দরকার হয়না।"[৩৭]

খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে খেলাফত আন্দোলন করা গান্ধীর লক্ষ্য ছিলনা, একথা গান্ধীর কথা থেকেই প্রমাণ হয়। তিনি বলেছেন, "খেলাফত আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আমি ও মুহাম্মদ আলী ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। মুহাম্মদ আলীর নিকট খেলাফত ছিল একটি ধর্মীয় ব্যাপার। আর গোমাতার নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমি খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তত ছিলাম। কারণ মুসলমানদের ছুরির তলা থেকে গোমাতাকে রক্ষা করা আমার ধর্মীয় কর্তব্য।"[৩৮] গান্ধীর উদ্দেশ্য সাময়িক ভাবে হলেও সফল হয়েছিল। ১৯২১ সালে ঈদুল আযহায় কোন গরু কুরবানী হয়নি। [৩৯ক] তবে গান্ধী যে 'ধর্মীয় কর্তব্য' পালনের জন্য খেলাফত আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন, তা শুধু ঐ কুরবানী বন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা, এ কথা ইতিপূর্বে এ,বি, রাজপুত ও জেড, এ সুলেরীর, কথায় কিছুটা পরিস্কার হয়েছে।

মিঃ গান্ধীর এ 'ধর্মীয় কর্তব্য' পালন শ্লোগানের মূলে রাজনীতি ছিল এবং এ রাজনীতিটাই মূখ্য ছিল। কোলকাতা 'মডার্ণ রিভিউ' এর সম্পাদক বিখ্যাত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেন, "মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও মাহাত্মা গান্ধী - এই দু'জনের বক্তৃতা খুটিয়ে পড়লে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, তাঁদের একজনের কাছে সুদূর তুরস্কে খিলাফতের দুরবস্থার কথাই প্রধান বিবেচ্য, কিন্তু অন্যজনের পক্ষে ভারতের স্বরাজ লাভই প্রধান লক্ষ্য।' [৩৯খ]

৩৭। 'রাজমুকুট', সাইদ উদ্দীন আহমদ পৃষ্ঠা ৩১, ৬৬ ('রাজমুকুট' গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন 'সাম্যবাদী'র সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক আলী আহমদ ওলী ইছলামাবাদী। 'রাজমুকুট-এর অনেক অংশ 'সোলতান'সহ বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়)।
৩৮। 'Pakistan in the Formative stage', by Khalid bin Sayeed 'Young India', ২০-১০-১৯২০
৩৯। ক) 'Pakistan in the Formative stage', by Khalid bin Sayeed 'Young India', ২০-১০-১৯ ২০।
৩৯। খ) 'ভারত কি করে ভাগ হলো' বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা- ২৮।

www.icsbook.info

গান্ধীর স্বরাজ ও অসহযোগ আন্দোলন মুসলমানদের ক্ষতিগ্রস্ত করে বেশী। ইংরেজের বিরুদ্ধে মুসলমানরা এক'শ বছরেরও বেশী সময় সশস্ত্র সংগ্রাম করেছে। এই সংগ্রামের আগুন তাদের অন্তরে ধিকি ধিকি জ্বলছিলই। সুতরাং স্বরাজ ও অসহযোগের যখন ডাক এল, তখন মুসলমানদের সাধারণ ও সংগ্রামী অংশ (আলেম সমাজ) এতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের তুলনায় আধুনিক শিক্ষিতরা অংশ গ্রহণ করেছে কম, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কম। আবার শিক্ষিতদের মধ্যে সাধারণ ভাবে মুসলিমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশী। সমকালীন পত্র পত্রিকা থেকে এর সুন্দর প্রমাণ মিলে। 'ছোলতান' পত্রিকায় 'দেশের কথা' কলামে জনৈক আবুল কাশেম লিখছেন, "খেলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনে বাঙ্গালা ও আসামের অন্ততঃ ১০০ আলেম কারাদন্ড ভোগ করিয়াছেন, উচ্চশিক্ষিত ইংরেজী নবীশদের মধ্যে ৩/৪ জনের বেশী নহে। --- উত্তর বঙ্গের ৭টি জেলায় শতাধিক উচ্চশিক্ষিত মোসলমান উকিলের মধ্যে একজন মাত্র মাতিয়াছিলেন। আবার তিনি বৎসরাধিক কাল হইতে ঘরে ফিরিয়াছেন। --- আলেমগণের মধ্যে একমাত্র রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ৫০ জনের নাম করিতে পারা যায়, যাহারা ধর্মের নামে, মুক্তির নামে ত্যাগের পরিচয় দিতে এবং লাঞ্ছনা ভোগ করিতে এবং অনেকে কারাক্লেশ ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। পূর্ববঙ্গ বিশেষত চট্টগ্রাম বিভাগ ও শ্রীহট্ট জেলার তো কথাই নাই। সেখানে শতাধিক আলেম দেশ ও সমাজের জন্য কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং এখনও কয়েকজন কারাগারে আছেন। আমি বলিব জাতীয়তা, ধর্মানুরাগ, জাতীয় সহানুভূতি ও দেশাত্মবোধ জ্ঞান যদি বর্তমানে কোন দলে থাকে তবে তাহা সেই পুরাতন ধরনের লোকদের মধ্যেই আছে।"[৪০] একথা সত্য গান্ধীর স্বরাজ ও অসহযোগ, আন্দোলন বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের উচ্চ শিক্ষিত মুসলিম শ্রেণীর সক্রিয় সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়েছে। 'ছোলতান' এর 'উচ্চশিক্ষার ফল' শীর্ষক কলামে বলা হচ্ছে "যে চট্টগ্রাম খেলাফৎ ও স্বরাজ আন্দোলনে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল সেখানে পূর্ণ আন্দোলনের যুগে উক্ত জিলার প্রায় ২০ জন মোছলমান বি,এল, এর মধ্যে একটি প্রাণীও আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। --- ঢাকাতে কোন উচ্চ শিক্ষিত লোককে আমরা খেলাফত ও স্বরাজ আন্দোলনে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ----- রাজশাহী বিভাগের সাতটি জেলার মধ্যে উকিল ও গ্রাজুয়েটদের সংখ্যা দুই শতের কম হইবেনা, তাঁহাদের মধ্যে একজন উকিল কয়েক মাসের জন্যে মাতিয়াছিলেন।"[৪১] এর কারণ বোধ হয় এই যে, নওয়াব আলী চৌধুরী, এ, কে, ফজলুল হক, মিঃ জিন্নাহ এর মত মুসলিম নেতাগণ স্বরাজ ও অসহযোগ সমর্থন করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে এঁরাই ছিলেন আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর আদর্শ। তাছাড়া মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে হিন্দুদের যতটা চিনেছিল, গান্ধীর স্বরাজ ও

৪০। 'ছোলতান', ৮ম বর্ষ, ২১ শ সংখ্যা, ১৮ই আশ্বিন, ১৩৩০ (৫ই অক্টোবর, ১৯২৩)।
৪১। 'ছোলতান', ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ৭ই আষাঢ় (২২ শে জুন, ১৯২৩)।

www.icsbook.info

অসহযোগকে তারা যেভাবে বুঝেছিল, অন্যরা সেভাবে বুঝেনি। খেলাফত আন্দোলনের স্বার্থে মুসলমানদের সাধারণ অংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও আলেম সমাজ আন্তরিকভাবেই স্বরাজ ও অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হয়েছে বেশী। এই তুলনায় হিন্দুদের ক্ষতির পরিমাণ খুবই কম। সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় মোসলেম মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষনে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী খুব আবেগ-ঘন ভাষায় এ সম্পর্কে বলেছিলেন, "স্থায়ী গভর্ণমেন্ট অর্থাৎ Established government-এর সঙ্গে ননকোঅপারেশন চালানো অসম্ভব। নন-কো-অপারেশনের আসল সূত্র হইতেছে গভর্ণমেন্টের চাকুরী না করা। গভর্ণমেন্টের সমস্ত চাকুরী প্রায় হিন্দুদের একচেটিয়া। আমি জিজ্ঞাসা করি, হিন্দু ভ্রাতারা কয়টি চাকুরি পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ মাঝখান হইতে অনেক মুসলমান চাকুরী ত্যাগ করিয়া নিজ পরিবারের এবং সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন। এই নন-কোঅপারেশনের ফলে মালাবারের বীর জাতি আরব বংশীয় মোপালাগণ [৪২ক] প্রায় সবংশে নির্বংশ হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুদিগের সেরূপ কোনও ক্ষতি হয় নাই। সিরাজগঞ্জের মঙ্গলার হাটে বহু মুসলমান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ----- হিন্দুদিগের শত শত কলেজ-বিশেষত কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্পর্শ না করিয়া মোসলমানের সাধের আলীগড় কলেজ এবং লাহোরের ইসলামিয়া কলেজ ভাঙ্গা হইল কিসের জন্যে?[৪২খ] পাঞ্জাব ও সিন্ধুর সহস্র সহস্র মুসলমান অধীর ও উন্মাদ হইয়া নিজ নিজ গৃহে আগুন লাগাইয়া আফগানিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের যারপরনাই ক্ষতি ও ক্লেশ হইয়াছিল। হিন্দু সমাজ সেরূপভাবে কোনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। দেশী বস্ত্র ব্যবহারেও মুসলমানগণ প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। হিন্দু মাড়োয়ারী দোকানদারেরা বহুমূল্যে দেশী কাপড় বিক্রয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইয়াছেন। পক্ষান্তরে বহুমূল্যে মোটা কাপড় ক্রয় করিয়া মুসলমানেরা দন্ড দিয়াছেন।"[৪৩] সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর এই উক্তির প্রতিধ্বণি পাই 'শরিয়াতে এসলাম' পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে। বলা হচ্ছে, "যত মরণ এই মোসলমানের। স্কুল কলেজ বয়কটে যথার্থভাবে ইহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। দীন দরিদ্র, সহায়-সম্পদহীন মোসলমান ছাত্র কষ্টভোগ করিয়া,

৪২। ক) "প্রায় নিরস্ত্র মুসলিম মোপালাদের সাথে ভারী অস্ত্র-শস্ত্র ও বিমান সজ্জিত বৃটিশ বাহিনীর সংঘর্ষ এক মাসের বেশী চলেছিল। ঐ সংঘর্ষে দশ হাজার মোপালা নারী-পুরুষ নিহত হয়। বিশ হাজারের বেশী মোপালা নর-নারীকে গ্রেফতার করা হয়। অমানুষিক অত্যাচার চলে এদের উপর। এক তরফা বিচারে এক হাজারের বেশী লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়। দুহাজার মোপালাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়ে আন্দামানে পাঠানো হয়। আট হাজার মোপালার দশ বছরের কারাদন্ড হয়। অবশিষ্ট মোপালাদের ছয় মাসের কম কারাদন্ড কারও ছিলনা। প্রতিটি মসজিদের ইমামের শাস্তি হয়েছিল। ---------- এক্ষেত্রে গান্ধীর ভূমিকা ছিল বিস্ময়কর। তার নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব ভূমিকা পালন করে। মোপালাদের ব্যাপারে গান্ধী ও কংগ্রেসের নিরব উদাসীনতায় শুধু ভারতের মুসলমান সমাজ নয়, কংগ্রেসী মুসলমান সদস্যগণের মধ্যেও গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।" ('টেকনাফ থেকে খাইবার', বিশ্বেশ্বর চৌধুরী পৃষ্ঠা ১৪৫, ১৪৬)।

৪২। খ) অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে পন্ডিত মদন মালব্য অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মওলানা মুহাম্মদ আলীকে, এমনকি গান্ধীকে পর্যন্ত কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেননি। অথচ এই পন্ডিত মদন মোহন মালব্য নিজে খেলাফত কমিটিতে হাজির থেকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব খেলাফত কমিটিতে পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। ('পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি', পৃষ্ঠা ১৪২, 'ভারতের জাতীয় আন্দোলন', পৃষ্ঠা ১০০)।

৪৩। 'ইসলাম দর্শন', ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩১ (১৯২৪)।

www.icsbook.info

কতলোকের হাতপা ধরিয়া একটু পড়িবার সুযোগ করিয়া লইতেছিল, কিন্তু মৎলববাজ কংগ্রেসীদের দুরভিসন্ধিরূপ অশনিপাতে তাহা সমূলে ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। স্কুল কলেজ-মাদ্রাসা প্রভৃতি বন্ধ করিয়া দিয়া সহস্র সহস্র যুবককে ভবঘুরে বানাইয়া, বেকার সমস্যা এবং চোর ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া যে স্বরাজ আসিতে পারে, ইহা আমার বুদ্ধির অগোচর। অবশ্য ইহাতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির পথ রুদ্ধ করত; তাহাদিগকে পিষিয়া মারিবার বিঘ্নরহিত পথ অবশ্যই হইতে পারে।"[৪৪] মাসিক সওগাত স্বরাজকে কটাক্ষ করে লিখেছিল, "আমরা স্বরাজ স্বাধীনতার জন্য সভা করিয়া, চিৎকার করিয়া গলা ফাটাইতেছি, তথাপি ইংরেজ আমাদিগকে স্বরাজ দিতেছেনা বলিয়া সেই সভা করিয়াই ইংরেজের অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি, ইহাতে ইংরেজ হাসে, কারণ ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর। ---- ইংরেজ আমাদিগকে স্বরাজ দেয় না, তাছাড়া বলে, আমরা অতবড় কার্য্যের যোগ্য হই নাই। আমরা সভা করিয়া ইংরেজের এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কাগজে প্রতিবাদ ছাপিয়া দেই, কিন্তু আমরা কি সত্যই স্বরাজের যোগ্য হইয়াছি?"[৪৫]

বলা যায়, স্বরাজ ও অসহযোগ আন্দোলন কালে সংখ্যাগুরু জনগণের আন্ত রিকতার অভাবে সংখ্যালঘু মুসলানরা বৈষম্য, বঞ্চনা ও দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়েছিল এবং সার্বিক যোগ্যতা ও নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবের কারণে এই আন্দোলন আংশিকভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং ব্যর্থও হয়েছিল। পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ভাষায়, "১৯২২ সালে অহিংস প্রতিরোধ নীতি বর্জনের কারণ কেবলমাত্র চৌরীচৌবা নয়, যদিও অধিকাংশ লোকের তাই ধারণা। কারণ হলো, ঐ সময় গান্ধী নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সংগঠন দৃশ্যত শক্তিশালী এবং গণভিত্তিক হলেও কার্যত তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া জনসাধারণকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার শিক্ষাও দেয়া হয়নি।"[৪৬]

১৯২২ সালে স্বরাজ ও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃত্বের সাথে খেলাফত আন্দোলনের সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। এর আগেই মুসলিম লীগের সাথে কংগ্রেসের বিচ্ছিন্নতা এসেছিল। এই ভাবেই শেষ হয়ে গেল হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার একটি অধ্যায়। সহযোগিতা এসেছিল বিদ্যুৎ চমকের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে, কিন্তু যাবার সময় পেছনে রেখে গেল উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও অনাস্থার গাঢ় অন্ধকার।

৪৪। 'শরিয়তে এসলাম', ৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৭ (১৯৩০)।
৪৫। 'সওগাত', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ন, ১৩৩৫ (১৯২৮।
৪৬। 'Jawaharlal Neheru, Autobiography', (উদৃত-'উপমাহাদেশের রাজনীতি ও স্মরনীয় ব্যক্তিত্ব', পৃষ্ঠা ১৮৯)।

www.icsbook.info

৫

সংহার মূর্তির আবার উত্থান

লাক্ষ্ণৌ প্যাক্ট যেমন হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার স্মরণীয় দলিল, তেমনি এ দলিল আবার নতুন বৈরিতার ভিত্তিও। লাক্ষ্ণৌ চুক্তি মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন ও পৃথক প্রতিনিধিত্বের অধিকার দিয়েছিল। অবশ্য এ অধিকার মুসলমানরা মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মাধ্যমে পেয়েছিল। কংগ্রেস লাক্ষ্ণৌ চুক্তিতে এটা মেনে নিয়েছিল মাত্র। কিন্তু কংগ্রেসের ভেতর ও বাইরে একটি শক্তিশালী মহল এটা মেনে নিতে পারেনি। ১৮৮২ সালে পৌরসভাগুলোতে মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচনের সিদ্ধান্তের তারা যেমন বিরোধিতা করেছে, তারা যেমন বিরোধতিা করেছে ১৯০৯ সালে মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রদত্ত মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার, ঠিক তেমনি তারা মেন নিল না লাক্ষ্ণৌ চুক্তির পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে। তারা বুঝতে পেরেছিল মুসলমানরা পৃথক জাতি সত্তা নিয়ে তাদের হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লাক্ষ্ণৌ চুক্তির পর পরই তারা কিছু বললনা। কারণ কংগ্রেসের স্বরাজ, স্বদেশী বা রাজনৈতিক আন্দোলনে কংগ্রেস মুসলমানদের সহযোগিতা চায়। কিন্তু খেলাফত আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন যখনি স্তিমিত হয়ে পড়ল, তখনই হিন্দুরা মাথা তুলল, রুখে দাঁড়াল পৃথক নির্বাচন, পৃথক প্রতিনিধিত্বের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস নেতা মদন মোহন মালব্য আরও হিন্দুনেতাদের নিয়ে পুনর্গঠিত করলেন হিন্দু মহাসভা। শুধু হিন্দু মহাসভাই নয়, গড়ে উঠল আরও কিছু জংগী হিন্দু সংগঠন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নিষ্ক্রিয় 'আর্য সমাজকে সক্রিয় করে তোলা হলো। লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে 'সংগঠন' এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে 'শুদ্ধি আন্দোলন' ঝড়ের বেগে কাজ শুরু করে দিল। মুসলিম বিরোধী তাদের সংঘবদ্ধ উত্থানের একটা বড় কারণ ছিল খেলাফত আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা। 'খেলাফত' ও অসহযোগ আন্দোলনে মুসলমানরা বহুক্ষেত্রেই হিন্দুদের কৃতিত্ব ম্লান করে দিয়েছিল এবং একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিল। হিন্দুরা এটা মোটেই পছন্দ করেনি।"[১] তাছাড়া ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমস্ ফোর্ড সংস্কারের কয়েকটি দিকও হিন্দুদের উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছিল। এই আইন এককেন্দ্রীক সরকার ভেঙ্গে দেবার পথে একটা পদক্ষেপ বলে হিন্দুদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল। তারা বুঝতে পারল,

---

১। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি, পৃষ্ঠা ১৫০।

www.icsbook.info

প্রদেশগুলো স্বায়ত্বশাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলমানরা প্রাধান্য পেতে চলেছে। এর ফলে হিন্দুরা, সংখ্যাগরিষ্ঠরা গোটা দেশের উপর একতরফা আধিপত্য করার অধিকার হারাচ্ছে। এ কারণেই গান্ধী অবশেষে এই আইন প্রত্যাখ্যান করেন। এসব কারণ একত্রে মিলিয়ে মুসলমানদের সব 'অনর্থের মূল' ঠাওরে তাদের বিরুদ্ধে হিন্দুবাদী সংগঠনগুলো মারমুখী হয়ে উঠল। এসব সংগঠন জোর করে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করাও শুরু করল। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'রাজমুকুট'-এর ভাষায়, "-------- হাজার হাজার গরীব মুসলমানকে প্রলোভন দ্বারা হিন্দু করা হইতেছে। অসংখ্য ঘটনার মধ্যে একটি মাত্র উল্লেখ করিব। বাঙ্গালা ১৩০০ (১৮২৩) সালের ২রা আষাঢ় তারিখের আনন্দ বাজার বলেন যে, 'আর্য সমাজীদের চেষ্টায় আগরার শিকরারা গ্রামের ৬০০'শ মুসলমানকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্যান্য গ্রামেও ২০০'শ শুদ্ধি কার্যে যোগ দিয়াছে।'[২] শুধু মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করা নয়, মুসলমানদের মসজিদ দখলও তারা শুরু করল। ঐ 'রাজমুকুট' লিখছে, "মসজিদ লইয়া হিন্দু-মুসলমানে নানাস্থানে বিবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে আমি একটা মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। তাজমহলের ন্যায় মধ্যস্থলে একটা গম্বুজ ও চারিকোণে মিনার আছে, পূর্বদিকে দরজা আছে (মন্দিরের ন্যায়, চূড়া ছিল না, ও দক্ষিণ কিম্বা পশ্চিম দিকেও দরজা ছিলনা, কেবল হিন্দু বাড়ীর নিকট) - এরূপ একটি জুমা মাসজেদকে হিন্দুগণ মন্দির বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং পুলিশ ও ডিঃ ম্যাঃ সাহায্যে মুসলমানদের নামাজ পড়া বন্ধ করিলেন ও হিন্দু সংবাদ পত্রে তারবার্তা দিলেন যে, ঝালকাঠির দুর্বৃত্ত মুসলমানেরা জোর পূর্বক হিন্দু মন্দির অপবিত্র করিয়াছে (আনন্দ বাজার, ডিসেম্বর, ১৯২৩)। এই বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় কলিকাতা হইতে সরকারী এমারত পরীক্ষক তথায় উপস্থিত হইয়া মাসজেদ বলিয়া প্রকাশ করেন।"[৩]

হিন্দু সংগঠনগুলোর উস্কানীমূলক এই ধরনের আচরণের ফলেই দেশব্যাপী দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। এক হিসেবে ১৯২০ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত ১২৭ টি দাংগা সংঘটিত হয়। এই দাংগার একটি পরিসংখ্যান দিয়েছেন সুভাষ বসু। তিনি লিখছেন, "১৯২২ সালে মহরম উপলক্ষে দাঙ্গা শুরু হয়, ১৯২৩ সালে পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং ৩০০ জন মারা যায়। ১৯২৪ সালে ছোট বড় ১৮টি দাঙ্গা হয়। ১৯২৫ সালে ইতস্তত কিছু গোলমাল দেখা দেয়, কিন্তু ১৯২৬ সালের দাঙ্গা পূর্বের রেকর্ড ভংগ করে। এ বছর ৩৬টি দাঙ্গা সংঘটিত হয়। নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০০০ জন। ১৯২৭ সালে ৩১ টি দাঙ্গায় ১৬০০ জন নিহত হয়। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী-মে মাসের দাঙ্গায় বোম্বেতে ২০০ জন মারা

২। 'রাজমুকুট' সাইদ উদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা ২১৯, ২২০ (ফুট নোট সহ)।
৩। 'রাজমুকুট' সাইদ উদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা ২২০, ২২১ (ফুট নোট সহ)।

www.icsbook.info

যায়। ১৯৩১ সালের কানপুর দাঙ্গা সমগ্র ভারতকে কাঁপিয়ে তোলে। এতে মৃতের সংখ্যা ৪০০/৫০০ জন। বহু সংখ্যক মন্দির ও মসজিদ ধ্বংস করা হয়।"[৪] এই দাঙ্গা প্রসঙ্গে গান্ধী বললেন, "হিন্দু-মুসলিম সমস্যা মানুষের আয়ত্বের বাহিরে চলে গেছে।"[৫] বাইরে যাবার কথাই। গান্ধী এ সময় রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে হরিজন সেবায় মন দিয়ে বলা যায় দাঙ্গার জন্যে মাঠটা ফাঁকা করেই দিয়েছিলেন। গান্ধীর কংগ্রেস তো দাঙ্গাকে সহায়তাই দান করেছে। কংগ্রেস তখন দাঙ্গাবাজদেরই দখলে। "১৯২১ সালেও অর্থাৎ গান্ধী যুগেও একটি সুসংগঠিত মুসলমান বিরোধী কর্মী দল কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার অর্ধেক স্থান দখল করে বসলেন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে তাঁদের গুরুত্ব হয়ে উঠল সংখ্যানুপাতে ঢের বেশী।"[৬]

১৯২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া মুসলিম বিরোধী দাংগা হিন্দুদের দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা মুসলিম বিদ্বেষের সশস্ত্র বিস্ফোরণ। বঙ্গভঙ্গ রদ-আন্দোলনের সময় হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ প্রচন্ডভাবে মাথা তোলে, কিন্তু সে সময় হিন্দু স্বদেশীয়দের প্রথম টার্গেট ছিল বৃটিশ, তাদের বোমা নিক্ষেপ হয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এবার তারা টার্গেট করল মুসলমানদের। তারা ভাবল, ইংরেজদের মাথায় বোমা মেরে মুসলমানদের দাবী-দাওয়া ও উত্থান বন্ধ করা যাবে না। বঙ্গভঙ্গ তারা রদ করেছে, কিন্তু লাক্ষ্ণৌ প্যাক্ট ও মন্টেগু-চেমস ফোর্ডের সংস্কারের মাধ্যমে গোটা বঙ্গই মুসলমানেদর হাতে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং হিন্দুরা মুসলমানদের মাথা ভেঙ্গেই ব্যথা দূর করতে চাইল। মুসলিম বিরোধী দাংগা এরই রেজাল্ট। এই দাংগায় সংখ্যাগুরুর সংহার মূর্তির সামনে মুসলমানরা ছিল অসহায় এক আত্মরক্ষাকারী। দাংগার জন্যে পরিবেশ ও উত্তপ্ত অবস্থা তারা সৃষ্টি করে আসছিল বহুদিন ধরে। 'আল-এসলাম'- এর ভাষায় "১ম, সাহিত্যের দিক দিয়া হিন্দুদিগের মুসলমানের প্রতি অযথা ও অন্যায় আক্রমণ, ২য়, গো কোরবানীতে বাধা প্রদান, ৩য়, মুসলমানের রাজকর্ম লাভে হিন্দু কর্তৃক বাধা প্রদান, ৪র্থ, মুসলমানদের প্রতি হিন্দু জমিদারদের অবৈধ আচরণ এবং সাধারণ হিন্দুরাও পথে–ঘাটে, রেলে-ষ্টিমারে, হাটে, বাজারে তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও ঘৃণাসূচক ব্যবহার ও শ্লেষোক্তি প্রয়োগ", প্রভৃতি ছিল এই সব দাঙ্গার প্রস্তুতি পর্ব।[৭] সমকালীন পত্র-পত্রিকায় হিন্দুদের মানসিকতা ও তৎপরতা, মুসলমানদের অবস্থা ও মনোভাব সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। ১৯২৩ সালে দাঙ্গা যখন মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে, তখন সাপ্তাহিক ছোলতান লিখল, "কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষে বিশেষত পাঞ্জাবে ও ভারতে, উত্তরে পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু সংগঠন সমিতি

৪। "The Indian Struggle', by Subhash Bose (উদৃতঃ 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, পৃষ্ঠা ২০৪, ২০৫
৫। 'উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব,' পৃষ্ঠা ২০৫।
৬। 'ভারত কি করে ভাগ হলো', বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা ৩৩।
৭। 'আল-এসলাম', ৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩ ২৪ (১৯১৭)।

www.icsbook.info

দ্বারা যে কি ভীষণ ও বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এই 'হিন্দু সংগঠনের' সূত্রপাত করিয়াছেন ভারতের প্রসিদ্ধ জননায়ক পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়া। ---- উদ্দেশ্য হইতেছে, মোছলমানগণের শক্তিতে বাধা প্রদান, মোছলমানদিগকে সুযোগ মত জব্দ ও কাবু করা, ক্রমে ক্রমে মোছলমান শক্তি চূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে হয় পদানত করিয়া রাখা, অথবা সম্ভব হইলে ভারত ছাড়া করা। এই সকল উদ্দেশ্য নিয়ে 'হিন্দুসংগঠন' স্থাপিত। ---- গভর্নমেন্ট এই সকল ব্যাপারে নিরব। ----- আমরা এ সকল অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া কংগ্রেস ও স্বরাজহিতৈষী হিন্দুদিগের নিকট বিনীত অনুরোধ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহারা এই হিন্দু সংগঠন আন্দোলন বন্ধ করিতে প্রাণপন চেষ্টা করুন, অন্যথা ভারতে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইবে, সেই রক্তস্রোতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ভাসিয়া যাইবে।"[৮] "দেশের দুর্ভাগ্য-অশান্তির কারণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটিয়া গেল। সেই অগ্নিস্ফুলিগ ক্রমে ভারতের নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ---- বঙ্গদেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল, দুঃখের বিষয় ফরিদপুরে ---- ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়া গিয়াছে। ---- হায় হতভাগ্য ভারতবাসী! কোথায় তোমাদের স্বরাজ- আর কোথায় তোমাদের আপোষে মাথা ফাটাফাটি। কংগ্রেস ও খেলাফত কর্মীদের অবিলম্বে এই বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করা কর্তব্য।"[৯] "লাহোরের আর্য্য পত্রিকা কেশরী ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঞা মোহাম্মদ ফয়্যাজ খাঁর একখানি চিঠির প্রত্যুত্তর দিতে যাইয়া শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লামের প্রতি ভীষণ ও অশ্লীল আক্রমণ করিয়া বসিয়াছেন। --- কেশরী অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা ও ক্রটি স্বীকার না করিলে কোলকাতার ডেলি নিউজ পত্রের সম্পাদকের ঐ অপ্রীতিকর মন্তব্যের দ্বারা যেরূপ কলিকাতায় রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছিল, পাঞ্জাবে তথা সমগ্র ভারতে আবার সে অভিনয় সংঘটিত হইবে। ---- মুছলমানগণ দুনিয়ার সকল প্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ধর্মের প্রতি অবমাননা, বিশেষত ধর্ম প্রবর্তকের প্রতি বেআদপী ও অসম্মান সূচক উক্তি এক মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে।"[১০] "দাঙ্গার ফলে মুছলমানগণ শহীদ হইলেন, তাহাতেও হিন্দু-ভ্রাতাগণের তৃপ্তি হইতেছেনা। মালাবারে বহু সহস্র মোপালা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, জাতটাই ধ্বংসের দশায় উপনীত হইয়াছে, অথচ ইহাতেও আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণের প্রাণের জ্বালা মিটিতেছেনা। তবে কি শান্তির উপায় সেই হিন্দুমহাসভা ও শুদ্ধির প্রস্তাবমতে কোটি কোটি মুসলমানকে হিন্দু করা?"[১১]

৮। 'ছোলতান', ৮ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩০ (১০ই আগষ্ট, ১৯২৩) উদ্বৃত 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত', মুস্তফা নুরউল ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৮০।

৯। 'ছোলতান' ৮ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ২৫ শে শ্রাবণ, ১৩৩০ (২৫ শে মে, ১৯২৩), উদ্বৃত 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত', ৮ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ২৫ শে শ্রাবণ, ১৩৩০ (১৫ই জুন, ১৯২৩), উদ্বৃত 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত' মুস্তফা নুরউল ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৮৪।

১১। 'ছোলতান' ৮ম বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ২৮ শে ভাদ্র, ১৩৩০ (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩) উদ্বৃত ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৫।

www.icsbook.info

১৯২৪ সালে গোটা ভারতে মোট ১৮ টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়। তার মধ্যে দিল্লীর দাঙ্গাই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে মোহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী তার 'দিল্লীর গাজী ও শহীদগণ' শীর্ষক নিবন্ধে লিখেছিলেন, "বিগতকোরবানী উপলক্ষে দিল্লীতে যে মহামারী কান্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার মূলীভূত ৩টি কারণ আজ খুব স্পষ্ট হইয়াই আমাদের চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে। উহার প্রথম কারণ, গো-কোরবানী ও গো-জবেহ্ বন্ধ করিবার জন্য হিন্দুদিগের চিরাচরিত অন্যায় আব্দার ও অসঙ্গত ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয় কারণ, প্রবল হিন্দুগণ কর্তৃক মুসলানদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার, ইহার প্রমাণ স্বরূপ বঙ্গীয় জমিদারদিগের জুলুম, আর শাহবাদের ঘটনা এবং দিল্লীর একটি কূপ্ হইতে পানি তুলিবার অপবাদে দশ বারজন হিন্দুর পক্ষে সম্মিলিত একটি অষ্টম বর্ষীয় মুসলমান বালককে নির্মম প্রহার করা, প্রভৃতি বহু ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তৃতীয় কারণ, মুসলমানের ধর্ম কর্মে গভর্ণমেন্টের অন্যায় হস্তক্ষেপ। ----বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে স্ব স্ব কর্ম করিতে পারিবে' ----- এই উদার ঘোষণাবলীর অবমাননা করিয়া গর্ভনমেন্ট এখন বহু স্থানেই হিন্দুর মনতুষ্টি সাধনের জন্যে মুসলমানের ধর্ম এবং জাতিগত সাধারণ অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দিল্লীতে ঠিক এই ঘটনাই ঘটিয়াছিল।"[১২]

হিন্দু সংগঠনগুলোর ক্রম বর্ধমান মুসলিম বিদ্বেষী তৎপরতা এবং তাদের এ তৎপরতার প্রতি হিন্দু পত্রিকাগুলোর অন্ধ সমর্থন বিষয়ে ১৯২৫ সালে ইসলাম দর্শন ও রওশন হেদায়েৎ পত্রিকা লিখে, "মালব্যজী এবং লালাজীর সমস্ত বাকচাতুরীর পুরু আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহাদের প্রধানতম শিষ্যগণের মুখে সংগঠনের প্রকৃত স্বরূপ যেরূপভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা অতি ভয়াবহ। কিছুদিন পূর্বে লালা লাজপত রায়ের অন্যতম সহযোগী লালা হরদেও লাল প্রকাশ্য ভাবেই মুসলমানদিগকে হয় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ অথবা সসম্মানে জীবন লইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রকাশ্য হুকুম জারি করিয়াছিলেন। সম্প্রতি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রধানতম সহযোগী স্বামী সত্যদেব আরও স্পষ্ট ভাষায় শুদ্ধি সংগঠনের উদ্দেশ্য পরিব্যাক্ত করিয়াছেন। ---- আর্য সমাজ ও শুদ্ধি সংগঠনের দল তথা হিন্দু সমাজের ঐ প্রচেষ্টা কেবল যে পশ্চিম ভারতেই সীমাবদ্ধ আছে তাহা নহে। বঙ্গদেশের হিন্দু সভা, শুদ্ধি সভা ও নারী রক্ষা সমিতির কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য করিলে এবং তৎপ্রতি হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সংবাদপত্রের গভীর সহানুভূতি দেখিলে, এদেশেও উহার আয়োজন কিরূপ বিপুল উদ্যমে পরিচালিত হইতেছে, তাহা অতি সহজেই অনুমিত হইবে। ---- অসহযোগী 'সাভেন্ট', 'স্বরাজী', 'ফরওয়ার্ড' ও উদারপন্থী 'হিন্দুস্তান' হইতে আরম্ভ করিয়া মদরত

১২। 'ইসলাম দর্শন', ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩১ (সেপ্টেম্বর, ১৯২৪), উদ্বৃত ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৫।

www.icsbook.info

বেঙ্গলী', গাঁজারত 'নায়ক', মোসলেম বিদ্বেষ বিদগ্ধা বিকৃতরুচি ও রাহুরূপিণী 'বসুমতি' এবং সাম্য মৈত্রীর ধ্বজা ধারিণী 'সঞ্জীবনী' পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে ও একসুরে আর্য্য সমাজীদের কার্যকলাপ এবং 'শুদ্ধি সংগঠন ও নারীরক্ষা' আন্দোলন সমর্থন করিয়া যাইতেছেন। এ অবস্থায় মুসলমান সমাজের কর্তব্য কি? বিধর্মীয় এই সমবেত আক্রমণ হইতে তাহাদের আত্মরক্ষার উপায় কি? তা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া কর্তব্য নির্ধারণের জন্য আমরা দেশের আলেম, নেতা, কর্মী ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিগণকে আকুল কণ্ঠে আহ্বান করিতেছি।"[১৩] "সম্প্রতি স্বামী সদানন্দ 'সতর্কীকরণ ও হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা' নামক এক খানি ইসলাম বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তক লিখিয়া ইসলামে ভীষণ আঘাত করিয়াছেন। ---- এই প্রকার বিষ্ঠা বমন করিয়া স্বামীজির কি লাভ হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তবে এই প্রকার ইসলাম বিদ্বেষ পূর্ণ কদর্য্য পুস্তক প্রচারে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ঘটাইয়া শান্তিভঙ্গ হইতে পারে ইহা নিশ্চয়। এই জন্য আমরা সদাশয় গভর্ণমেন্টের বিশেষত সি আই ডি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আর ভাই মোসলমানদিগকে বলিতেছি ------ যাহাতে এই পুস্তক সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হয় ও গ্রন্থকারের কঠিন শাস্তি হয় তজ্জন্য সকলে চেষ্টা করুন।"[১৪]

এই সব আবেদন, আহ্বান কোন কাজে লাগেনি। প্রবল হিন্দু সংখ্যাগুরু ও হিন্দু সংবাদপত্রকে কিছুই বুঝানো যায়নি, সি আই ডি কিংবা সরকার কিছুই করেনি। দুর্বল মুসলমানদের কিছু করার তো সাধ্যও ছিলনা। ১৯২৬ সালে মুসলিম বিরোধিতা ভীষণভাবে বেড়ে যায়। তা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে। এই বছর ৩৬টি ভয়াবহ ধরনের দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। নিহতের সংখ্যা সরকারী হিসেবেই গিয়ে দাঁড়ায় এক হাজারে। এই হত্যাকান্ড দর্শনে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কলম আর্তনাদ করে উঠেছিল। যার প্রকাশে তার স্বভাবসুলভ ভংগীতে তিনি বলেন, "মারো শালা যবনদের!" 'মারো শালা কাফেরদের'! আবার হিন্দু-মুসলমানী কান্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। ----- দেখিলাম, হতআহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিলনা, মন্দিরের প্রধান দেবতা সাড়া দিলনা। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।"[১৫] নজরুলের এই পাইকারি কথায় সত্য-মিথ্যা পৃথক করা হয়নি, পৃথক করা হয়নি জালেম থেকে মজলুমকে, আর এটা সম্ভবও ছিলনা তাঁর পক্ষে। 'সত্যাগ্রহী' পত্রিকায় এই সত্যপ্রকাশটা সুন্দরভাবে ঘটে। সত্যাগ্রহী বলল, "এই কলিকাতার গত দাঙ্গার জন্য আর্য্য সমাজীরা কি পরিমাণ দায়ী, এ

১৩। 'ইসলাম দর্শন' অগ্রহায়ন ১৩৩২ (১৯২৫), উদ্বৃত ঐ, পৃষ্ঠা ২৮১।
১৪। 'রওশন হেদায়েৎ' ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩২ (১৯২৫), উদ্বৃত ঐ, পৃষ্ঠা ২৮১, ২৮২।
১৫। 'গণবাণী', ২৬ শে আগষ্ট, ১৯২৬ (উদ্বৃত ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৬)।

www.icsbook.info

কথা যাঁহারা আগাগোড়া দাঙ্গা সম্পর্কিত সংবাদ রাখেন, তাহারা নিশ্চয় অবগত আছেন, এবং গভীরভাবে মনে মনে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয়, কোন কালেও আর্য্যাসমাজীদের ইচ্ছা শুভ নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে চিরবিরোধের সৃষ্টি করিতে তাহাদের অভ্যুত্থান।"[১৬]

১৯২৭ সালে ৩১ টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গায় ১৬০০ মানুষ জীবন দেয়। আর ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী প্রচারণাও এ সময় তুঙ্গে ওঠে। ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের হৃদয় আহতকারী 'রঙ্গিলা রসুল' বই নিয়ে গন্ডগোলের ঘটনা এ সময়েই ঘটে। বিচারে গ্রন্থের লেখককে শুধু ছেড়ে দেয়া নয়, তার সাফাই গাওয়া হয়। এই অবিচার মুসলিম বিদ্বেষী তৎপরতাকে আরও উৎসাহিত করে। এ সম্পর্কে 'মোসলেম দর্পণ' এর মন্তব্য, "বর্তমান সময় ভারতবর্ষে যে সকল হিন্দু মোসলেম বিদ্বেষ প্রচার করাকে তাহাদের জীবনের একটা মহান কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে এবং অহরহ এই বিদ্বেষ বহ্নি প্রচার করত উভয় সম্প্রদায় তথা সমগ্র ভারতে অশান্তির অনল প্রজ্বলিত করত দিন দিন নতুন ইন্ধন যোগাইয়া দেশের শান্তি ও শৃংখলাকে অচিরে অস্মীভূত করিবার প্রয়াস পাইতেছে, অপিচ তজ্জন্য আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে আর্য্য নামধারী ভন্ড সম্প্রদায় যে স্পর্ধার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, ইহা বর্তমান 'রঙ্গিলা রসুল' ও তৎসংক্রান্ত বিচার-বিভ্রাট দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। ----- এই মোকদ্দমার রায়ে জাষ্টিস দিলীপ সিংহ যে সকল যুক্তি ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও মোসলমান সমাজের পক্ষে একান্তই অসহনীয়। তাঁহার মতে, 'রঙ্গিলা রসুল' পুস্তকে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রতি তীব্র শ্লেষ বাক্য ও ঘৃণিত গালাগালি বর্তমান থাকিলেও উহা ব্যক্তিগত এবং উহা দ্বারা নাকি ধর্মের অবমাননা ও আইনের সীমা লংঘন করা হয়না। ----- তিনি 'রঙ্গিলা রসুল' এর গ্রন্থকারকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। ----- বিচারক দিলীপ সিংহের এবম্বিধ দৃষ্ট নজিরের ফলস্বরূপ ইতিমধ্যেই দেশের চারদিকে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন হিন্দু সংবাদপত্রে এখন প্রকাশ্য ভাবে হজরতের নিন্দা সূচক ও ইসলাম বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে।"[১৭]

মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ প্রচার অব্যাহত থাকে এবং মুসলিম বিরোধী দাংগা চলে তিরিশের দশকেও অনেকখানি জুড়ে। ১৯৩১ সালের দাংগায় চার পাঁচ'শ লোক নিহত হয়। ঢাকায় বড় দাংগা হয় ১৯৩০ সালে। এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'সওগাত' বলেছিল, "ঢাকায় সম্প্রতি বিষম সাম্প্রদায়িক দাংগা হইয়া গিয়াছে। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে এ ব্যাপারে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর এবং মুসলমানরা হিন্দুদের উপর সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া নিজ নিজ নির্দোষিতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। ----- আমরা বরাবর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

১৬। 'সত্যাগ্রহী', ১৪ই পৌষ, ১৩৩৩ (১৯২৬) ঐ, পৃষ্ঠা ২৮২।

১৭। 'মোসলেম দর্পন', ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জুলাই ১৯২৭, উদৃত, ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৩।

www.icsbook.info

হাঙ্গামার নিন্দা করিয়াছি এবং ঢাকার ব্যাপারেও দাঙ্গাকারীদের নিন্দা করিতেছি। দুঃখের বিষয় কয়েকখানি হিন্দু চালিত সংবাদপত্র ঢাকার হিন্দুদের ভন্ডামীকে বীরত্বের পরিচায়ক বলিয়া প্রকারান্তরে তাহার প্রশংসাই করিয়াছেন।"[১৮]

হিন্দু পত্র-পত্রিকা ও হিন্দু রাজনীতিকদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলনা। হিন্দু রাজনীতিকরা কেউ প্রকাশ্যে, কেউ গোপনে হিন্দু মহাসভা ও শুদ্ধি আন্দোলনের সাথে ছিলেন। কেউবা মৌন থেকে তাদের সহযোগিতা করছিলেন। মানুষ প্রেমী, মুসলিম দরদী বলে কথিত মিঃ গান্ধী দাঙ্গা শুরু হবার পর হরিজন সেবায় মনোনিবেশ করলেন। ভীষণ ব্যস্ত দেখা গেল তাঁকে লবন-সত্যাগ্রহ নিয়ে। মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা ও শুদ্ধি আন্দোলনের প্রধান নায়ক স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে নিরস্ত করার কোনই চেষ্টা গান্ধী করেননি, কখনও সমালোচনা করেছেন এরও কোন প্রমাণ নেই। বরং গান্ধী সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন বিষয়ে 'হান্টার কমিটি'র কাছে সাক্ষ্য দান কালে লর্ড হান্টারের প্রশ্নের জবাব দেবার সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে 'আমার শ্রদ্ধাভাজন সহকর্মী' বলে অভিহিত করেন এবং আন্দোলন বিষয়ে তাঁর সাথে পত্রালাপের কথা স্বীকার করেন।[১৯] বিশের দশকের শুরুতে শীর্ষ হিন্দুনেতাদের মধ্যে বাংলার চিত্তরঞ্জন দাসই মুসলমানদের কিছুটা সমব্যথী হয়ে উঠেন এবং কংগ্রেসে থেকেও তাঁর রাজনৈতিক লাইনটা আলাদা করে নেন। ১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড এর ব্যবস্থা অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা নিয়ে কংগ্রেস দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায় এবং নির্বাচনে যোগ না দেয়ার পক্ষের গ্রুপ অর্থাৎ গান্ধী গ্রুপই জয়লাভ করে। এই অবস্থায় পার্লামেন্টে গিয়ে ইংরেজকে বিরোধিতার নীতিতে চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেসের আভ্যন্তরেই স্বরাজ পার্টি গঠন করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের এ সিদ্ধান্ত বিশেষ করে বাংলার যুব মহলে উৎসাহের সৃষ্টি করে। সোহরাওয়ার্দীর মত যুবনেতারা স্বরাজ্য পার্টিতে যোগদান করেন। স্বরাজ্য পার্টিকে শক্তিশালী করার জন্যে সি, আর দাস মুসলমানদের সহযোগতিা আন্তরিকতভাবে কামনা করছিলেন। কিন্তু ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য পার্টি বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও স্বরাজ্য পার্টি থেকে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান মুসলিম আসন থেকে নির্বাচিত হলেন। 'আইন সভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান প্রতিনিধিদের সাহায্য না পেলে কোন প্রগতিমূলক কাজ করাই সম্ভব হচ্ছিল না। চিত্তরঞ্জন এটা বুঝতে পেরে মুসলমানদের সন্তুষ্ট করে তাঁদের সাহায্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার আশায় ১৯২৩ সালে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মিলনীতে তার বিখ্যাত হিন্দু-মুসলিম চুক্তি সম্পাদন করলেন।'[২০] স্যার

১৮। 'সওগাত', ৭ম বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭(১৯৩০), উদ্বৃত ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৬।

১৯। 'সত্যাগ্রহ', মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী (অনুবাদক-শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়), প্রকাশক অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১৪।

২০। 'ভারত কি করে ভাগ হলো', বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা ৩৫।

www.icsbook.info

আব্দুর রহীম, মৌলবী আব্দুল করিম, মৌলবী মুজিবুর রহমান, মওলানা আকরম খাঁ, মওলানা মনীরুজ্জামন ইসলামাবাদী, প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং জে, এম, সেন গুপ্ত, শরৎ বসু, জে, এম,দাসগুপ্ত, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামক এই চুক্তি সম্পাদনে চিত্তরঞ্জন দাসকে সাহায্য করেছিলে।[২১] বাংলার হিন্দু মুসলিম সমঝোতার জন্যে সম্পাদিত এই চুক্তির শর্তগুলো ছিলঃ

ক) ব্যবস্থাপক সভায় জনসংখ্যা[২২] অনুপাতে সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে এবং প্রতিটি সম্প্রদায় স্বতন্ত্রভাবে তাদের সদস্য নির্বাচিত করবে।

খ) স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ (মুসলমান) ও সংখ্যালঘিষ্ঠ (হিন্দু) প্রতিনিধির সংখ্যা জনসংখ্যা অনুসারে শতকরা ৬০ এবং ৪০ ভাগ নির্দিষ্ট থাকবে।

গ) সামগ্রিকভাবে সরকারী চাকুরীতে ৫৫% মুসলমান নিয়োগ করা হবে এবং যতদিন পর্যন্ত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি অনুপাতে না পৌঁছে ততদিন পর্যন্ত ৮৮% চাকুরী মুসলমানরা পাবেন।

ঘ) মসজিদের সামনে বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিষিদ্ধ থাকবে।

ঙ) ঈদের সময় মুসলমানগণ বিনা বাধায় গরু কোরবানীর সুযোগ পাবেন।

চ) এসব নীতিমালা যাতে সুষ্ঠুভাবে পালিত হয় তার জন্য একটি কমিটি থাকবে এবং এর অর্ধেক সদস্য থাকবেন হিন্দু এবং অর্ধেক সদস্য থাকবেন মুসলমান।

মুসলমানদের প্রতি সুবিধাভোগী হিন্দুদের শুভেচ্ছার এটা একটা ঐতিহাসিক দলিল। লাক্ষ্ণৌ চুক্তি বাংলার মুসলমানদের যে অধিকার হরণ করেছেল, ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার তাদের যে অধিকার দেয়নি, বেঙ্গলপ্যাক্ট তাদেরকে সেই অধিকার দিল। ১৯২৩ সালের আইন-পরিষদ নির্বাচনের পর বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদিত হয়, বেঙ্গল প্যাক্টের পরপরই ১৯২৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনে মেয়র নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সোহরাওয়ার্দী নির্বাচিত হলেন ডেপুটি মেয়র। আর চীফ একজিকিউটিভ অফিসার ও ডেপুটি চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হলেন যথাক্রমে সুভাষ বোস এবং হাজী আব্দুর রশীদ।

এইভাবে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলো। কিন্তু লাক্ষ্ণৌ প্যাক্টের মতই এই চুক্তিটি শিক্ষিত, সচেতন এবং প্রভাবশালী হিন্দুমহলের প্রচন্ড বৈরিতার সম্মুখীন হলো। 'সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হলো সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দল। যাঁদের উপর চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের পরিচালনা ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এমনকি গান্ধীবাদী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পর্যন্ত প্রকাশ্য বক্তৃতায়

২১। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১০৬, ১০৭।

২২। যে ব্যবস্থা চালু ছিল তাতে ব্যবস্থাপক সভার মোট আসনের মুসলিম সদস্য শতকরা ৪০ ভাগ। অথচ এদের জনসংখ্যা শতকরা ৫৪ ভাগ।

www.icsbook.info

বলেছিলেন, 'মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করে করে আমরা তাদের একটার পর একটা দাবী বাড়িয়ে তুলতেই সাহায্য করছি।'[২৩] কেউ কেউ আরও স্পষ্ট করে বললেন, 'চিত্তরঞ্জন দাস মুসলমানদের নিকট দেশকে বিকিয়ে দিচ্ছেন এবং এ চুক্তি তিনি কখনও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে অনুমোদন করিয়ে নিতে পারবেন না।'[২৪] চিত্তরঞ্জন দাস ইন্তেকাল করলেন ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন। এরপরই বেঙ্গল প্যাক্ট বিরোধী এ হিন্দু মনোভাব তীব্র হয়ে উঠল। এ ক্ষেত্রে গান্ধীর ভূমিকা একটা বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে। বাংলার নেতৃত্বের জন্যে তিনি মুসলিম বিদ্বেষী সন্ত্রাসবাদীদেরই বেছে নিয়েছিলেন। 'গান্ধীজী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে চিত্তরঞ্জনের জায়গায় বাংলার নেতা করেছিলেন। শুধু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দাবী মেটাবার জন্য গান্ধীজী যে যতীন্দ্রমোহনকে বাংলার নেতা করেছিলেন তার উল্লেখ স্বরাজ্যদলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডঃ মুকুন্দরায় জয়াকর[২৫] উনিশ'শপঁচিশ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর লালা লাজপত রায়কে এক চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন এই ভাষায়ঃ 'বাংলা থেকে বন্ধুরা জানিয়েছেন অন্যায় হস্তক্ষেপের দ্বারা গান্ধীজী যে সেনগুপ্তকে বাংলার নেতা করে দিলেন তাতে পার্টি শিগগির ভেঙ্গে যাবে।'[২৬] ডঃ মুকুন্দরায় ঠিকই বলেছিলেন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বরাজ্য পার্টি আর স্বরাজ্যপার্টি থাকলোনা, হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক সহযোগিতার যে সর্বনিম্ন একটা সাহসী বুনিয়াদ চিত্তরঞ্জন গড়ে তুলেছিলেন তাকে ধ্বসিয়ে দেয়া হলো। মওলানা আবুল কালাম আজাদ এ সম্পর্কে লিখেন, "এই সাহসী ঘোষণা (বেঙ্গল প্যাক্ট) বঙ্গীয় কংগ্রেসের ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিলো। বহু কংগ্রেস নেতা তুলনামুলকভাবে এর বিরোধিতা করলেন এবং মিঃ দাসের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিলেন। তাকে সুবিধাবাদের এবং মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য অভিযুক্ত করা হলো। ------- এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, তিনি দেহত্যাগ করবার পর তার কিছু সংখ্যক শিষ্য তার আদর্শকে খর্ব করে দিলেন এবং তার এই ঘোষণাটিকে বাতিল করে দেয়া হলো। ফল এই হলো যে, বাংলার মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াল এবং দেশ বিভাগের প্রথম বীজ বপন করা হলো।'[২৭] দেশ বিভাগের বীজ বপিত হলো শুধু বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিলের মাধ্যমে নয়, কংগ্রেস ও স্বরাজ্যপার্টির হিন্দুরা বাংলার আইন পরিষদের হিন্দু জমিদার-সামন্তদের স্বার্থ যেভাবে সমর্থন করল এবং শোষিত মুসলিম সংখ্যাগুরুদের স্বার্থের যেভাবে তারা সর্বনাশ করতে চাইল তাও মুসলমানদেরকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করল। এই চিন্তার ফল হিসাবে বাংলার মুসলিম

২৩। 'ভারত কি করে ভাগ হলো', বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা ৩৫ (ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্রের বক্তব্যের জন্যে দেখুন 'দি বেঙ্গলী', ২৭শে এপ্রিল, ১৯২৭।

২৪। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১০৭।

২৫। ইনি পরে বিলাতের প্রিভিকাউন্সিল জজ নিযুক্ত হয়েছিলেন।

২৬। 'ভারত কি করে ভাগ হলো', বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা ৩৬ (আরও দেখুনঃ 'মাই লাইফ স্টোরি', ২য় ভাগ, পৃষ্ঠা ৬৩০)

২৭। 'India wins Freedom' পৃষ্ঠা ২১ (উদ্বৃতঃ 'ভারত কি করে ভাগ হলো', পৃষ্ঠা ৩৬)।

www.icsbook.info

নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে স্বরাজ্য পার্টির পাল্টা 'বঙ্গীয় প্রজা কমিটি' গঠন করলেন। এ সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "১৯২৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের প্রশ্নে দল নির্বিশেষে সব হিন্দু মেম্বাররা জমিদার পক্ষে এবং দল নির্বিশেষে সব মুসলিম মেম্বাররা প্রজার পক্ষে ভোট দেন। আইন সভা স্পষ্টত সাম্প্রদায়িকভাবে বিভক্ত হয়। পর বৎসর সুভাস বাবুর নেতৃত্বে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মিলনীতে (২২শে মে, ১৯২৬) দেশ বন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট বাতিল করা হয়।[২৮] কি মুসলমানদের স্বার্থের দিক দিয়া, কি প্রজার স্বার্থের দিক দিয়া, কোন দিক দিয়াই কংগ্রেসের উপর নির্ভর করিয়া চলা আর সম্ভব থাকিলনা। --------------- আমরা মুসলমান কংগ্রেসীরা মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস বর্জন করিয়া 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠন (১৯২৯) করি। স্যার আব্দুর রহীমএই সমিতির সভাপতি ও মওলানা আকরম খাঁ ইহার সেক্রেটারী হন। মৌঃ মুজিবুর রহমান, মোঃ আব্দুল করিম, মৌঃ ফজলুল হক, ডঃ আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী,খান বাহাদুর আব্দুল মোমিন সি আই ই ইহার ভাইস প্রেসিডেন্ট, মোঃ শামসুদ্দিন আহমদ ও তমিযুদ্দিন খাঁ জয়েন্ট সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। এইভাবে রাজনৈতিক মত ও দল নির্বিশেষে বাংলার সমস্ত হিন্দু নেতা জমিদারের পক্ষে কংগ্রেসে এবং সমস্ত মুসলিম নেতা প্রজার পক্ষে প্রজা সমিতিতে সংঘবদ্ধ হইলেন। এই পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া দেশপ্রিয় জে, এম, সেনগুপ্ত একদিন আফসোস করেছিলেন, আজ হইতে কংগ্রেস শুধু মুসলিম বাংলার আস্থাই হারাইলনা, প্রজা সাধারনের আস্থাও হারাইল। মিঃ সেনগুপ্তের ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল।'[২৯]

বেঙ্গল প্যাক্ট হিন্দু কংগ্রেস বাতিল করলে মওলানা আজাদ যেকথা বলেছিলেন, জে এম সেনগুপ্ত যেকথা বলেছিলেন, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও সে ধরনের কথাই বললেন। তাঁর কথা, "মুসলমানরা আর কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেনা, কারণ গয়া কংগ্রেসে হিন্দু-মুসলমানের সর্ব ভারতীয় চুক্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েও কংগ্রেস তা পালন করেনি।'[৩০] উল্লেখ্য, গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি এ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারেই বেঙ্গল প্যাক্ট করেন। এ প্যাক্টকে সর্ব ভারতীয় রূপ দেয়া কংসের দায়িত্ব ছিল, কিন্তু তা না করে, 'বেঙ্গল প্যাক্ট' কেই তারা হত্যা করল। ১৯২১ সালের পর স্বামী শ্রদ্ধানন্দদের প্রচারে উত্তপ্ত হয়ে ওঠা ভারতে যখন মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা চলছিল, যখন বেঙ্গল প্যাক্ট সম্পাদনের মাধ্যমে অন্তত বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক-

২৮। চিত্তরঞ্জন দাসের বিশ্বস্ত শিষ্য 'শরৎচন্দ্রবসু প্যাক্ট বিরোধীদের নেতার স্থান নিয়েছিলেন'। ('ভারত কি করে ভাগ হলো', পৃষ্ঠা ৩৭)

২৯। 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', আবুল মনসুর আহমদ।

৩০। 'অমৃত বাজার পত্রিকা', ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৭ (উদ্বৃতঃ 'ভারত কি করে ভাগ হলো, পৃষ্ঠা ৩৭, ৩৮)।

www.icsbook.info

উন্নয়নের চেষ্টা চলছিল, তখন মুসলিম লীগ সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের স্বার্থ নিয়ে কংগ্রেসের সাথে বুঝাপড়ায় রত ছিল এবং চেষ্টা করছিল হিন্দু-মুসলিম এক সাথে থেকে ভারতকে স্বাধীন করার আন্দোলন পরিচালনা করতে। মিঃ জিন্নাহ কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং এক সাথে আন্দোলন করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা তিনি বাদ দেননি। মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি বললেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বে একান্ত প্রয়োজন হিন্দু মুসলিম ঐক্য। এই একই কথা তিনি বারবার বলতে থাকলেন ১৯২৬ সাল পর্যন্ত।[৩১] হিন্দু মহাসভা এবং আর্যসমাজীদের মুসলিম খেদাও আন্দোলন তখন গোটা দেশে। মুসলিম বিরোধী দাংগায় কম্পমান গোটা দেশ। জিন্নার এ কথাগুলো হিন্দুদের কান স্পর্শ করলনা, অন্যদিকে মুসলিম লীগের অনেকে বিরক্ত হলো জিন্নার আপোশমুখিতায়। এই সময় ১৯২৭ সালে এল সাইমন কমিশন। ১৯২৪ সালের ১৮ই ফেব্রুারী কেন্দ্রীয় আইন সভার বিরোধী দলীয় নেতা মতিলাল নেহেরু ভারতের নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্যে গোল টেবিল বৈঠকের যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা গরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়। বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশন গঠন করে কার্যত সে দাবীই মেনে নিল।[৩২] যে সব বিষয়ের উপর সাইমন কমিননকে রিপোর্ট প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়, সে বিষয়গুলো হলো, ভারতবাসী দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্যে কতটা প্রস্তুত হয়েছে, দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অনুকুল পরিবেশ ভারতে কতটা সৃষ্টি হয়েছে এবং কি ধরনের শাসনতন্ত্র ভারতের সব ধরনের জনমত ও স্বার্থকে সন্তুষ্ট করতে পারবে।[৩৩] সাইমন কমিশনের মিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু এতে ছিলনা ভারতীয় কোন সদস্য। তাই কংগ্রেস একে 'প্রত্যাখ্যান করল। মুসলিম লীগের স্যার মুহাম্মদ শফীসহ কিছু সদস্য সাইমন কমিশনকে সহযোগিতা করতে চাইলেন। কিন্তু জিন্নাহ সাইমন কমিশনকে প্রত্যাখান করলেন এবং বললেন, 'জালিয়ানওয়ালাবাগ ছিল শারীরিক হত্যাকান্ড এবং সাইমন কমিশন হল আত্মার হত্যাকান্ড।'[৩৪] সাইমন কমিশনকে বয়কট করা হোল। এই বয়কট আন্দোলনে জিন্নাহ সফল ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করলেন। জিন্নার এই ভূমিকা লক্ষ্য করে গান্ধী এসময় বলেছিলেন, "উদারপন্থী নির্দলীয় ও কংগ্রেস একসঙ্গে একত্র হয়ে এই বয়কটে এত ভাল করেছে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি।'[৩৫] জিন্নাহ শুধু বয়কট সফল করেই গান্ধীর মত তাঁর দায়িত্ব শেষ করলেন না। সাইমন কমিশনের জবাব হিসেবে এবং সবদলের জন্যে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, ভারতের জন্যে এমন

৩১। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি', মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫৩।
৩২। 'ইতিহাস অভিধান (ভারত)', যোগনাথ মুখোপাধ্যায় পৃষ্ঠা ৩৩৭।
৩৩। ঐ, পৃষ্ঠা ৩৩৭।
৩৪। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য পৃষ্ঠা ১০০।
৩৫। 'ইয়ং ইন্ডিয়াঃ কালেকটেড ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী', ছত্রিশ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫।

www.icsbook.info

একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের স্বার্থে একটা প্রস্তাবনা প্রণয়ন করলেন। ১৯২৭ সালের ২০ শে মার্চ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের এই সম্মেলন জিন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো-

'ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র রচনার যে কোন পরিকল্পনায় বিভিন্ন আইন সভায় প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে মুসলমানদের সমঝোতায় সম্মত হওয়া উচিতঃ

(১) সিন্ধুকে বোম্বাই প্রদেশ থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র একটা প্রদেশ গঠন করতে হবে।

(২) অন্যান্য প্রদেশের মত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও বেলুচিস্তানে একই ধরনের শাসন-সংস্কার প্রর্বতন করতে হবে। যদি তা করা হয়, তাহলে মুসলমানরা সকল প্রদেশে যুক্ত নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করতে সম্মত আছে এবং অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলমান দের যতটা বিশেষ সুবিধা দেবে, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের সেই মোতাবেক বিশেষ সুবিধা দেবে।

পাঞ্জাব ও বাংলায় প্রতিনিধিত্বের হার জনসংখ্যার অনুপাতে হবে। কেন্দ্রীয় সংসদে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয়াংশের কম হবেনা, এবং তাও হবে যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে।"[৩৬ক]

কংগ্রেস তথা হিন্দুদের সবচেয়ে বড় মাথা ব্যাথার কারণ ছিল মুসমানদের পৃথক নির্বাচন। ঐক্যের স্বার্থে মুসলমানরা এ প্রস্তাবের মাধ্যমে সে অধিকার পরিত্যাগকরতে রাজী হলো। অবশ্য সাইমন কমিশন সমর্থনকারী স্যার শফীর গ্রুপটি যুক্ত নির্বাচন মেনে নিলনা। এই ক্ষুদ্র গ্রুপটি পৃথক হয়ে গেল এবং এদের দ্বারা পাঞ্জাবে শফী লীগ গঠিত হলো।[৩৬খ] বাংলা থেকেও এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল। [৩৬গ] এই ভাঙ্গন ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও শুধু হিন্দুদের সাথে ঐক্যের স্বার্থেই জিন্নাহ এই প্রস্তাবের উপর অটল ছিলেন এবং তা পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। এই প্রস্তাব 'দিল্লী প্রস্তাব' নামে পরিচিত হলো।

মুসলিম লীগ জিন্নার এই 'দিল্লী প্রস্তাব' ১৯২৭ সালে কংগ্রেসকে দেয় তার বিবেচনার জন্যে। ১৯২৮ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলন বসল। এই সম্মেলনে সব পক্ষের দাবী সামনে রেখে ভারতের জন্যে সংবিধানের একটা রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে একটা কমিশন গঠন করা হলো। কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন মতিলাল নেহেরু। স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রু, স্যার আলী ইমাম,

৩৬ ক। 'কায়দে আযম' আকবর উদ্দীন, ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২১০, ২১১।
৩৬খ। ঐ, পৃষ্ঠা ২১১।
৩৬গ। ঐ, পৃষ্ঠা ২১১।

www.icsbook.info

সুভাষচন্দ্র বসু, মাঠাও রাও এ্যাটা, এম আর জয়াকার, এন, এম, যোশী এবং সরদার মংগল সিং হলেন কমিশনের সদস্য। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে জয়াকার এবং যোশী কমিশনের কোন মিটিং এ যোগ দেননি। অসুস্থ স্যার আলী ইমাম একটি মাত্র মিটিং এ যোগ দিতে পেরেছেন।[৩৭] কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হলো। রিপোর্টে পৃথক নির্বাচন প্রথা বাতিল করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের যৌথ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলো, কিন্তু মুসলমানদের জন্যে কোন আসন সংরক্ষিত থাকলো না। মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকল, কিন্তু নির্বাচন হবে মিলিত ভোটের মাধ্যমে। বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের জন্যে আসন সংরক্ষণ থাকলোনা। রিপোর্টে দৃঢ় এককেন্দ্রীক শাসনের ব্যবস্থা করা হলো। সব মিলিয়ে নেহেরু রিপোর্ট মুসলমানদের সব দাবী-দাওয়াই অস্বীকার করল। হাতাশা নেমে এলো মুসলিম লীগ মহলে, মুসলমানদের মধ্যে। জিন্নাহ বললেন, নেহেরু রিপোর্ট হিন্দুর রিপোর্ট ছাড়া আর কিছু নয়।[৩৮] মওলানা শওকত আলী মন্তব্য করলেন যে, যৌবনে তিনি শখ করে একটি গ্রেহাউন্ড কুকুর পুষতেন। কিন্তু তিনি কুকুরটিকে খরগোষ তাড়া করতে দেখেননি। কিন্তু এ রিপোর্টে তাঁর মতে একটি গ্রেহাউন্ড একটি খরগোশকে তাড়া করে ফিরছে।[৩৯] নেহেরু রিপোর্টের ভূয়শী প্রশংসা করলেন মিঃ গান্ধী। এ ধরনের একটি চমৎকার রিপোর্ট প্রণয়নের জন্যে মিঃ গান্ধী ধন্যবাদ জানিয়ে টেলিগ্রাম পর্যন্ত করলেন মাতিলাল নেহেরুকে। গান্ধীর এ আনন্দে আহত হয়ে মওলানা মোহাম্মদ আলী বললেন, "আপোষ রফার জন্যে মুসলামনদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে গান্ধী ব্যর্থ করে দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার প্রতি চোখ বন্ধ রেখে তিনি সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ চান। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িক নীতির পৃষ্ঠপোষক। নেহেরু রিপোর্ট সংখ্যালঘুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠদের জুলুমকে আইনানুগ করার প্রচেষ্ট মাত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাকে এ রিপোর্ট জাতীয়তাবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। অপরদিকে সংখ্যাগুরুদের জুলুম হতে সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচের দাবীকে সাম্প্রদায়িকতা বলে আখ্যায়িত করেছে।"[৪০] এই অবস্থায় কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের সংঘবদ্ধ হতে বললেন। 'ভয় পাবার কিছু নেই' বলে তিনি মুসলমানদের আশ্বস্ত করলেন।[৪১]

৩৭। 'Indian National congress and the Muslims since 1928', Dr. Padma shah.
৩৮। 'Years of destiny: India 1926-1932', by J. Coatman 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১০১।
৩৯। (উদ্বৃতঃ 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়,' মাহবুবুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৭৬)।
৪০। 'The Indian National Congress and the Muslims since 1928',(উদ্বৃতঃ মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়,' মাহবুবুর রহমান পৃষ্ঠা ১৭৭)।
৪১। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১০১।

www.icsbook.info

নেহরু রিপোর্টের চূড়ান্ত বিবেচনার জন্যে ১৯২৮ সালের ২২শে ডিসেম্বর কোলকাতায় মুসলিম লীগ, কংগ্রেস এবং সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। কোলকাতায় মুসলিম লীগ, কংগ্রেস এবং সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। কোলকাতায় মুসলিম লীগ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হলো যে, পৃথক নির্বাচনের ধারা বজায় রাখতে হবে, কেন্দ্রীয় সংসদে এক তৃতীয়াংশ আসন সংখ্যালঘুদের জন্যে সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদেশকে দিতে হবে।[৪২]

সর্বদলীয় সম্মেলনে নেহেরু রিপোর্ট পেশ হলো। জিন্নাহ মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে রিপোর্টের কতকগুলো সংশোধনী পেশ করলেন। যথা, ক) কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ, (খ) বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন প্রথা চালু না করা পর্যন্ত জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানদের জন্যে আসন সংরক্ষণ, (গ) রেসিডিউয়ারী ক্ষমতা প্রদেশ সমূহের কাছে অর্পণ, (ঘ) নতুন সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সিন্ধুর পৃথকীকরণ স্থগতি না রাখা, ঙ) পৃথকও যৌথভাবে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর উভয় সভার চার পঞ্চমাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যতীত কোন সংশোধনী কার্যকর না করা, ইত্যাদি।[৪৩]

নেহেরু রিপোর্ট নিয়ে সর্বদলীয় সম্মেলনে চারদিন ব্যাপী আলোচনা হলো। চূড়ান্ত দিন ২৮ শে ডিসেম্বর জিন্নাহ মুসলমানদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে তার সমাপনী বক্তব্যের উপসংহারে বললেন, "ভারতকে এগিয়ে যাবার জন্যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত এবং এমন একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে যেন দেশের সব সম্প্রদায় সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে।' জিন্নার বক্তৃতার সমালোচনা করলেন স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, হিন্দুমহাসভার এম, আর, জয়াকার প্রমুখ। স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের দাবীকে খুব অযৌক্তিক মনে করলেন না। তিনি বললেন যদি জিন্নাহ খারাপ ও দুষ্ট ছেলে হন ----- তাহলে উনি যা চান দিয়ে দিন। এম, আর জয়াকার প্রতিবাদ করে বললেন, জিন্নাহ খারাপ কিংবা দুষ্ট ছেলে নন। দেশের গণ্যমান্য মুসলিম (কংগ্রেস নেতা) মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ আনসারী, ডাঃ কিচলু সবাই নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করেছেন।"[৪৪] গান্ধী এই কনভেনশনের বিতর্কে অংশগ্রহণ না করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিশ্চুপ ছিলেন।[৪৫] আলোচনা এবং গোটা পরিস্থিতি জিন্নাহকে খুবই আহত করল। তিনি অত্যন্ত ধীর ও শান্তকণ্ঠে বললেন, "আজ আমরা এক

৪২। 'রোজেজ ইন ডিসেম্বর,' চাগলা, পৃষ্ঠা ৯৬ (উদ্বৃতঃ 'স্বাধীনতার অজানা কথা,' ১০২)।
৪৩। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন' বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ১০৮।
৪৪। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১০২, ১০৩।
৪৫। 'History of Freedom Movement in India', Trarachand, Vol, Page 39

www.icsbook.info

কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। আমরা চাই হিন্দু-মুসলমান স্বাধীনতার পথে একসঙ্গে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাক। এই কাজ করবার জন্য আপনাদের শুধু মুসলিম লীগ নয়, সমস্ত ভারতের মুসলমানদের সাহায্যের দরকার হবে এবং আমি আপনাদের কাছে একজন মুসলমান নাগরিক হিসাবে নয়, একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে বলছি, আপনারা কি সামান্য কয়েকজনের কাছ থেকে সাহায্য পেলেই সন্তুষ্ট হবেন? আপনারা কি চাননা যে, মুসলিম ভারত আপনাদের সঙ্গে এগিয়ে যাক? সংখ্যালঘুদেরকে কি সংখ্যাগুরুদের দেবার মত কিছুই নেই? অতএব আমার এ 'সামান্য ছোট দাবীকে অস্বীকার করা কিংবা আমি যেন কোন চাপ সৃষ্টি না করি এই অনুরোধ বৃথা। আমার এই দাবী যদি সামান্য 'ছোট দাবী' হয় তাহলে স্বীকার করে নিতে আপত্তি কেন? শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠই এই দাবীকে স্বীকার করে নিতে পারে। আমি এই দাবী পেশ করছি। কারণ, আমার মনে হয় মুসলমানদের কাছে এই দাবী যুক্তিসঙ্গত। আমরা সবাই এই দেশের সন্তান, অতএব আমাদের এক সঙ্গে বসবাস করতে হবে, কাজ করতে হবে। আমাদের মধ্যে যতই বিভেদ থাকনা কেন, ঝগড়া-বিবাদ বাড়িয়ে কোন ফল হবেনা। আমরা যদি এই বিষয়ে একমত না হতে পারি, বন্ধু হিসেবে আমরা এক অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই। বিশ্বাস করুন, যতদিন ভারতে হিন্দু-মুসলিম এক না হবে, ততদিন দেশের কোন উন্নতি হবে না, এবং আমি মনে করি, কোন প্রকার যুক্তিতর্ক, বাধা-বিপত্তি আমাদের মীমাংসার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারবেনা। হিন্দু-মুসলমানদের মিলন দেখলে আমি সবচাইতে বেশী খুশী হবো।'[৪৬]

নেহেরুর জীবনীকার মাইকেল এডওয়ার্ডস বলছেন যে, "জিন্নার এই বক্তৃতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল, "আমরা বন্ধু হিসেবে একে অন্যের কাছ থেকে বিদায় নিতে চাই।' এই কথাটি বলার সময় তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।'[৪৭]

জিন্নার এই অশ্রু মাড়িয়েই সেদিন কোলকাতা কনভেনশনে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জিন্নার সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে দেয়া হলে জিন্নাহ পরাজিত হয়েছিলেন।

এই পরাজয়ে জিন্নাহ খুব বিচলিত হলেন। তাঁর কাছে এটা ছিল 'হিন্দু ও মুসলমানের পথ আলাদা হয়ে যাওয়া।[৪৮] 'কলকাতার এই কনভেনশনের পর থেকে জিন্নার রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন এল। নাগপুরের কংগ্রেস অধিবেশনে তার রাজনৈতিক জীবনে প্রথম পরাজয় হয়েছিল, কলকাতার অল পার্টি কনভেনশনে তার দ্বিতীয় পরাজয় হল। তারপর কিছুদিনের বিশ্রাম এবং এরপর থেকে আমরা তাঁকে ভিন্ন রূপে মুসলমান জনগণের নেতা

৪৬। 'মুহম্মদ আলী জিন্নাহ', এম এইচ সৈয়দ, পৃষ্ঠা ৪৩২-৪৩৫ (উদ্বৃতঃ 'স্বাধীনতার অজানা কথাঃ, পৃষ্ঠা ১০৩)।
৪৭। 'নেহেরু', মাইকেল এডওয়ার্ডস, পৃষ্ঠা ৪৩ (উদ্বৃতঃ 'স্বাতীনতার অজানা কথা', পৃষ্ঠা ১০৪)।
৪৮। 'Central Legistlature in British India', by Rashiduzzaman, Page 25, 26.

www.icsbook.info

হিসাবে দেখতে পাব।'[৪৯]

সংখ্যালঘু মুসলমানদের অশ্রু না মাড়িয়ে যদি সেদিন জিন্নার সংশোধনীগুলো গ্রহণ করা হতো, তাহলে ইতিহাসের ধারা হয়তো অন্যদিকে বইতো। কিন্তু 'উগ্র আর্যত্বের দাবীদার কংগ্রেস সর্বভারতব্যাপী তাদের প্রভুত্ব কায়েমের স্বার্থে বিভোর ছিল।"[৫০]

তারা মুসলমানদের সামান্য ছাড় দিতেও রাজী হয়নি। রাজী হবে কি করে? তারা তো চেয়েছিল, মুসলমানদের পদানত করে কিংবা দেশছাড়া করে গোটা ভারত কুক্ষিগত করতে। তাদের সংহার মূর্তির বারবার উত্থান তো এই কারণেই। কিন্তু তাদের স্বপ্ন সফল হয়নি। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের সাথে নিয়ে আত্ম-রক্ষার একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। যার ফল ছিল ভারত বিভাগ। এই ভারত বিভাগ যখন বাস্তব হয়ে হিন্দু নেতাদের সামনে এল, তখন গান্ধীর মত অনেকেই তাদের অন্যায় অবিচার বুঝতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে একটা সুন্দর কাহিনী বলেছেন সাবেক বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সেক্রেটারী আবুল হাশিম। এ কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন আবুল হাশিমের ছেলে বদরুদ্দীন উমর তার এক আলোচনায়। কাহিনীটি এইঃ ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট গান্ধী কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় আবুল হাশিম তার সাথে দেখা করেন। সাক্ষাতের বিবরণ দিয়ে আবুল হাশিম বলছেন, "আমাদের কথাবার্তার শেষ পর্যায়ে আমি গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করলাম, পাকিস্তানের বদলে আজ জিন্নাহ যদি তার ১৪ দফা প্রস্তাব দেন তাহলে তাঁর মনোভাব কি হবে।' তিনি বরলেন, 'হাশিম, আমি খুব আগ্রহে তা করবো।' শ্রদ্ধার সাথে এবং বিনয়ের সুরে আমি মন্তব্য করলাম, মহাত্মাজী আপনাকে তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, আপনি যখন জিন্নার ১৪ দফা অগ্রাহ্য করেছিলেন, সে সময় ১৫ ই আগষ্ট আপনার দৃষ্টিগোচর হয়নি।'[৫১]

৪৯। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ১০৪।
৫০। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৭৮।
৫১। 'সাপ্তাহিক বিচিত্রা', ঈদ সংখ্যা, ১৯৮৭।

www.icsbook.info

৬

নির্যাতিতের আত্মোপলব্ধি

কোলকাতার সর্বদলীয় কনভেনশন থেকে মুসলমানরা শুধু খালি হাতে নয়, বুকভরা হতাশা নিয়েও ফিরে এল। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী উদগ্রীব ছিলেন জিন্নাহ। ঐক্যের খাতিরেই জিন্নাহ মুসলিম লীগকে অনেক ত্যাগ স্বীকারে রাজী করিয়েছিলেন, এমনকি দলের ভাঙন পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেহেরু রিপোর্ট থেকে এক ইঞ্চিও নড়লনা। আঘাত পেয়েছিলেন জিন্নাই বেশী। তার স্ত্রীও মারা গেলেন এসময়। হঠাৎ আইন ব্যবসায়ে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন জিন্নাহ। যেন এর মাঝেই তিনি সবকিছু ভুলতে চাইলেন। মুসলমানরাও নিজেদের দিকে ফিরে তাকাল। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের একগুয়েমী, অসহনশীলতা, বৈরিতা থেকে তারা বুঝল, মুসলমানদের জাতিগত আত্মরক্ষার বিষয়টিকে কিছুতেই ছোট করে দেখা চলবেনা। মুসলমানরা 'দিল্লী প্রস্তাব' ও নেহেরু রিপোর্টের সংশোধনীতে হিন্দুদের যে ছাড় দিয়েছিল, সেখান থেকে তারা ফিরে এল। ১৯২৯ সালে ৩১ শে ডিসেম্বর এবং ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। মুসলমানদের প্রায় সকল দলের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগ দিলেন। যাদের মধ্যে ছিলেন স্যার শফি, আল্লামা ইকবাল, আলী ভ্রাতৃদ্বয় এবং জমিয়তে ওলামার প্রতিনিধিগণ। সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো- (১) ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্রগঠন করতে হবে এবং অবশিষ্ট (রেসিডুয়ারী) ক্ষমতা প্রদেশের হাতে রাখতে হবে, (২) স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি অব্যাহত রাখতে হবে, (৩) মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশ সমূহে তাদের চলতি 'ওয়েটেজ' সংরক্ষণ করতে হবে, (৪) কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ আসন থাকবে, (৫) সর্বপ্রকার সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের যথাযোগ্য অংশ নিশ্চিত করতে হবে এবং (৬) মুসলমানদের শিক্ষা, উন্নয়ন, ভাষা, ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন ও মুসলিম দাতব্য প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করতে হবে।[১] জিন্নাহ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু জিন্নাহ চলমান ঘটনা প্রবাহ থেকে দূরে থাকতে পারেননি, তিনি দিল্লীতে মুসলিম লীগের একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্যে পৃথক হয়ে যাওয়া স্যার শফির গ্রুপকেও তিনি আহ্বান করেন, কোলকাতার সর্বদলীয় কনভেনশন ব্যর্থ হয়ে যাবার পর স্যার শফির গ্রুপের সাথে জিন্নার ব্যবধান কমে এসেছিল। তাদের সংগে আলোচনায় সাব্যস্ত হয়েছিল যে, উভয় দল একই সময়ে অধিবেশন করবে

১। 'কায়েদ আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৪২।

www.icsbook.info

এবং যুক্ত অধিবেশন একই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করবে। এই সম্মেলনের জন্যে জিন্নাহ যে প্রস্তাব প্রণয়ন করলেন, তা তার প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও ঐক্য-চিন্তার জ্বলন্ত নিদর্শন। কোলকাতার সর্বদলীয় সম্মেলন থেকে তিনি চোখের জল নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এর পরও তিনি ঐক্যের দরজা বন্ধ করতে এবং নিজেদের দিক থেকে কোন ক্রুটি রাখতে চাইলেন না। জিন্নাহ তার প্রণীত প্রস্তাবে বললেন, 'যেহেতু ১৯২৮ সালের খৃষ্টমাস কলিকাতার সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল একটি শাসন সংস্কার পরিকল্পনা তৈরী করা এবং প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহ কর্তৃক সেটাকে জাতীয় চুক্তি হিসাবে অনুমোদন করা এবং যেহেতু নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক তা গৃহীত হয়নি, যেহেতু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মাত্র এক বছরের জন্য উক্ত রিপোর্ট গ্রহণ করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে, এই এক বছর অর্থাৎ ১৯২৯ সালের মধ্যে বৃটিশ পার্লামেন্ট রিপোর্ট মোতাবেক 'শাসন পদ্ধতি সংস্কার না করলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনাতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আইন অমান্য আন্দোলন চালাবে; এবং যেহেতু হিন্দু মহাসভা চূড়ান্ত ভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, নেহেরু রিপোর্টের সাম্প্রদায়িক সমঝোতা সম্পর্কিত একটি শব্দও পরিবর্তন করলে তারা তাৎক্ষণাৎ অনুমোদন প্রত্যাহার করবে, ---- সেইহেতু মুসলিম লীগ নেহেরু রিপোর্ট গ্রহণে অক্ষম। ---- লীগ সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করার পর সুদৃঢ় ও সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করেছে যে, নিম্নলিখিত মৌলিক নীতিগুলি স্বীকৃত না হলে ভারতের মুসলমানরা ভারতের শাসন ব্যবস্থার যে কোন ভাবী শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবেনাঃ

১। ফেডারেল পদ্ধতিতে ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের কাঠামো তৈরী করতে হবে এবং প্রদেশ সমূহের হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে।

২। সবগুলি প্রদেশকে একই ধরনের স্বায়ত্ব শাসন দিতে হবে।

৩। দেশের সমস্ত আইন সভা ও অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থাগুলি এমনভাবে গঠন করতে হবে যেন প্রতিটি প্রদেশের সংখ্যালঘুরা এমন কি কম সংখ্যক সম্প্রদায়ও সেগুলিতে পর্যাপ্ত ও সক্রিয় প্রতিনিধি পাঠাতে পারে।

৪। কেন্দ্রীয় আইনসভার মুসলিম প্রতিনিধিদের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশের কম হলে চলবেনা।

৫। ধর্মভিত্তিক দলগুলোর প্রতিনিধি নির্বাচন এখনকার মতই স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে করতে হবে। তবে যে কোন সম্প্রদায় যে কোন সময়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির পরিবর্তে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে।

৬। আঞ্চলিক পুনর্বন্টনের কোন প্রয়োজনীয়তা যদি কখনও দেখা দেয়, তবে তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কোন ক্রমেই নষ্ট করা চলবেনা।

www.icsbook.info

৭। সকল সম্প্রদায়কে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্থাৎ বিশ্বাসমত উপাসনা, অনুষ্ঠান, প্রচারণা, সংগঠন ও শিক্ষার স্বাধীনতা দিতে হবে।
৮। সিন্ধুকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা করতে হবে।
৯। কোন আইন সভায় ও নির্বাচিত সংস্থায় যদি কোন সম্প্রদায়ের তিন চতুর্থাংশ প্রতিনিধি সদস্যও এই মর্মে অভিযোগ করে যে, অমুক বিল বা প্রস্তাব অথবা এর অংশ বিশেষ তাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে তবে সেই বিল বা প্রস্তাব অথবা সে সবের কোন অংশবিশেষ গ্রহণ করা চলবেনা। এ ধরনের অপরাপর সমস্যারও অনুরূপ কার্যকরী ও বাস্তব সমাধান খুঁজে নিতে হবে।
১০। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে অপরাপর প্রদেশে অনুসৃত নীতি প্রয়োগ করতে হবে।
১১। রাষ্ট এবং অপরাপর স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা সমূহের চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই অন্যান্য ভারতীয়দের সাথে মুসলমানদেরকেও পর্যাপ্ত অংশ দিতে হবে।
১২। কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রী না হলে কেন্দ্রে বা প্রদেশে কোন মন্ত্রী সভা গঠিত হতে পারবেনা।
১৩। শাসনতন্ত্রে মুসলিম সংস্কৃতি সংরক্ষণ, মুসলমানদের শিক্ষা, ভাষা, ধর্ম ও নিজস্ব আইনের ও মুসলমান দাতব্য প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে পর্যাপ্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এসব যেন রাষ্ট্র ও অপরাপর স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য ও দানের ন্যায্য অংশ পায়, তারও ব্যবস্থা করতে হবে।
১৪। ভারতীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের ঐকমত্য ব্যতিরেকে কেন্দ্রীয় আইনসভা শাসনতন্ত্রীয় কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারবেনা।[১ক]
জিন্নাহ্ তাঁর বিখ্যাত এই 'চৌদ্দদফা প্রস্তাবটি সম্মেলনে পেশ করার সময় সকলের প্রতি আবেগপূর্ণ আহ্বান জানিয়ে বললেন, "যদি আপনারা কোন দায়িত্ব নিতে চান, গৃহীত সিদ্ধান্তকে যদি গুরুত্ব সহকারে কার্যকরী করতে চান, মুসলিম ভারতে আশা-আকাংখাকে যদি আপনারা তুলে ধরতে চান তাহলে একমাত্র সববেত সিদ্ধান্তের দ্বারাই সম্ভব হতে পারে।"[১খ]

জিন্নাহ মুসলিম লীগের এ সম্মেলনে কংগ্রেসভুক্ত মুসলিম নেতা যেমন মওলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ আনসারী, ডাঃ সালাম, ডাঃ কিচলু, প্রমুখকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তারা এসেছিলেন। কিন্তু জিন্নাহ যে সমঝোতার মনোভার এঁদের কাছ থেকে আশা করেছিলেন, তা পাননি। গান্ধী-নেহেরু-মালব্যরা যেমন কিছু শুনতে রাজী ছিলেননা, এঁরাও তাই। জিন্নার

১ক। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬।
১খ। 'Muhammad Ali Jinnah', সাইদ, পৃষ্ঠা ১৯৫, ১৯৬।

www.icsbook.info

আবেগপূর্ণ আহ্বানের এরা জবাব দিয়েছিল অত্যন্ত জঘণ্যভাবে। মাঝখানে কিছু সময় জিন্নাহ সম্মেলনে ছিলেন না, সেই সময় আমন্ত্রিত হয়ে আসা কংগ্রেসীরা মঞ্চ দখল করে কংগ্রেস নেতা ডাঃ আলমকে সভাপতির আসনে বসিয়ে বিশৃংখল এক পরিবেশে নেহেরু রিপোর্টের সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করে। কেউ একজন তা সমর্থনও করে। সভাপতির আসন থেকে সেই হট্টগোলের মধ্যে ডাঃ আলম ঘোষণা করেন প্রস্তাব পাশ হয়েছে।[১-গ] এই সময়ই বাইরে থেকে শত শত লোক এসে দরজা ভেংগে হলে প্রবেশ করে এবং কংগ্রেসীদের ঝেটিয়ে বের করে দেয়। এর অল্পক্ষণ পরেই জিন্নাহ এলেন। সংগে সংগে শান্ত হলো সম্মেলন। সংশোধনী সহ জিন্নার পেশকৃত চৌদ্দদফা পাশ হয়ে গেল। সংশোধনীতে বলা হলো, চৌদ্দ দফার অপরাপর দফাগুলি যদি কংগ্রেস মেনে নেয় তাহলে লীগ যুক্ত নির্বাচনে সম্মত হতে পারে।[১-ঘ] দুঃখের বিষয় জিন্নাহ যে কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করার জন্য যুক্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা তাঁর চৌদ্দ দফায় রেখেছিলেন, সেই কংগ্রেসীরাই উন্মত্তের মত কান্ড করে বেরিয়ে গেল সম্মেলন থেকে।

কংগ্রেস মুসলমানদের এ শুভেচ্ছার প্রতি নমনীয়তার প্রতি, ঐক্য আকাংক্ষার প্রতি একবারও ফিরে চাইলনা। বরং মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক বলে বিষোদগার করল হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেস একইভাবে। তারা তাদের সংখ্যাধিক্যের শক্তি দিয়ে বৃটিশকে বাধ্য করে তাদের দাবী আদায় করে নেয়ার পথে অগ্রসর হলো। মুসলমানরা কোলকাতা কনভেনশন থেকে বেরিয়ে আসার পর ঐ সম্মেলনেই কংগ্রেস ও হিন্দুমহাসভা নেহেরু রিপোর্ট পাশ করেছিল এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে বৃটিশ সরকার নেহেরু রিপোর্টভুক্ত দাবী সমূহ মেনে না নিলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন (ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস) এর পরিবর্তে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করবে।[১-ঙ]

কংগ্রেসের এই আলটিমেটাম শেষ হবার দুই মাস দুই দিন আগে অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ২৯ শে অক্টোবর ভারতের বড়লাট লর্ড অরউইন ঘোষণা করলেন, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী[২ক] বৃটিশ সরকার ভারত ও রাজণ্যবর্গ শাসিত ভারতের সমস্ত দল ও গোষ্ঠীকে নিয়ে ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করবে। এই সাথে তিনি আরও ঘোষণা করলেন যে, ১৯১৭ সালের ঘোষণা বাণীর অন্তর্ণিহিত অর্থই ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন দান করা।

মুসলিম লীগ ও অন্যান্য অনেক জাতিগোষ্ঠী গোল টেবিলের আইডিয়াকে গ্রহণ করলো। গ্রহণ করার প্রথম কারণ হলো, জিন্নাহ নিজেই ১৯২৯ সালের জুন

১গ। 'Quid-I-Azam', by G Allana, Page 214, 215.
১ঘ। 'Pathway to Pakistan', Khalikuzzaman, Page 101.
১ঙ। উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', ডঃ আব্দুল ওয়াহেদ, পৃষ্ঠা ১৫২।
ক। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট তখনও প্রকাশিত হয়নি। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালের জুন মাসে।

www.icsbook.info

মাসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডকে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে সাইমন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করে একটি সর্বদলীয় আলোচনা বৈঠক দাবী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "বৃটেনের কথার উপর ভারত আস্থা হারিয়েছে। ভারতের আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে পাওয়া ও বৃটেনের আন্তরিকতা প্রমাণ করাই হচ্ছে সর্বপ্রথম কাজ। ---- সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও ভারত সরকারের মতামত পাওয়ার পরে এবং প্রস্তাবগুলোকে সুনির্দিষ্ট রূপ দেয়ার আগে বৃটিশ সরকারের উচিত হবে ভারতের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো এবং তাদের সাথে একটা বৈঠকে বসে তাদের মতামত গ্রহণ করা। (কারণ বর্তমানে ভারতের সর্বসম্মত কোন অভিমত পাওয়া সম্ভব নয়।) ---- এ বৈঠকের উদ্দেশ্য হতে হবে ভারতের আশা-আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করা---- ।"[২খ] গোলটেবিলের প্রস্তাব জিন্নার গ্রহণ করার দ্বিতীয় কারণ ছিল, তখন অপ্রকাশিত সাইমন কমিশন রিপোর্টের অনেকগুলো যেমন ফেডারেল সরকার ব্যবস্থা, সর্বাধিক প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা, বোম্বাই থেকে সিন্ধুকে পৃথক করার প্রতি সহানুভূতি, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কিছুটা শাসন সংস্কার, প্রভৃতি মুসলিম লীগের অনুকুলে এসেছিল।[২গ] তৃতীয় কারণ ছিল, বৃটিশ সরকারের কাছে মুসলিমদের আলাদা প্রতিনিধিত্ব এবং সর্বদলীয় আরও একটি আলোচনার সুযোগ লাভ।' এসব দিক সামনে রেখেই জিন্নাহ অরউইনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবৃন্দের একটা ঘরোয়া বৈঠক ডাকলেন। যাতে কংগ্রেসের এম, সি চাগলা, মিসেস সরোজিনী নাইডু, হিন্দু মহাসভার এস,আর, জয়াকারের মত লোকও ছিলেন। এই বৈঠক থেকেই অরউইনের ঘোষণার প্রতি সমর্থন সূচক বিবৃতি যায়।[২ঘ] সবাইকে জড়িত করার জিন্নাহর এই কৌশল আংশিক ফল দিয়েছিল। হিন্দুমহাসভা প্রথম গোল টেবিলেও গিয়েছিল।

কিন্তু অরউইনের ঘোষণার কংগ্রেস সন্তুষ্ট হলোনা। কারণ, কংগ্রেসের দাবী অর্থাৎ নেহেরু রিপোর্ট ঐ গোল টেবিলে গৃহীত হবে এর কোন নিশ্চয়তা বড় লাটের কথায় নেই। গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের শর্ত হিসেবে কংগ্রেস চারটি বিষয় উত্থাপন করল। এক, গোলটেবিলকে ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাসের অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সংবিধান রচনার ক্ষমতা দিতে হবে, দুই, গোলটেবিলের অধিকাংশ সদস্য হতে হবে কংগ্রেসের মনোনীত প্রতিনিধি, তিন, সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিতে হবে, এবং চার, সময়িক কালের জন্য ডোমিনিয়ন সরকারের কাঠামোয় একটি সরকার গঠন করতে হবে।[৩] কংগ্রেসের এই দাবীর নাম দেয়া হলো দিল্লী মেনিফেস্টো। এই দিল্লী মেনিফেষ্টোর মাধ্যমে কংগ্রেস

২খ। 'Muhammad Ali Jinnah', সাইদ, পৃষ্ঠা ২০১, ২০৯ (উদ্বৃতঃ 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৫১)।
২গ। 'Report of the Indian Statutary commmission. Vol. ii. Page 13-103 (উদ্বৃতঃ 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৫৩, ২৫৪)
২ঘ.। Quid-I-Azam', by G, Allana, Page 219.
৩। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১০৮।

www.icsbook.info

আবার এ কথাই বলল যে, ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করবে একা কংগ্রেস, আর কেউ না। এটা মেনে নিলে গোল টেবিলেরও আর প্রয়োজন হয় না।

কংগ্রেসের এই দিল্লী মেনিফেস্টো বৃটিশ সরকার গ্রহণ করল না। কংগ্রেসের আলটিমেটাম যেদিন শেষ হচ্ছে সেদিন অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর লাহোরে কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলটিমেটাম অনুসারে এই সম্মেলনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করা হলো। গান্ধী সম্মেলনে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, এক, বর্তমান পরিস্থিতিতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রয়োজন নেই, দুই, কংগ্রেসের আদর্শ হলো 'স্বরাজ, মানে 'পূর্ণ স্বাধীনতা', এই পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার জন্যে সংসদ ও বিধান সভাকে বর্জন করতে হবে, তিন, সত্যাগ্রহ এবং ট্যাক্স না দেবার আন্দোলন শুরু করার পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হোক।[৪] গান্ধীর দাবীতে বিনা সংশোধনীতেই এই প্রস্তাবগুলো কংগ্রেস গ্রহণ করলো। এই সাথে কংগ্রেস নেহেরু রিপোর্ট বাতিল করলো।[৫] এর অর্থ কংগ্রেস এখন সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশকে বাধ্য করে কংগ্রেস সংখ্যাগুরু হিন্দু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত যে স্বরাজ চায় সেই স্বরাজ আদায় করবে।

সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেস সদস্যরা সংসদ ও বিধান সভা থেকে ইস্তাফা দিল। ২৬ শে জানুয়ারী (১৯৩০) কে 'স্বাধীনতা দিসব' ঘোষণা করা হলো। বলা হলো, এদিন সবাই 'পূর্ণ স্বরাজের' শপথ গ্রহণ করবে।[৬] ঠিক হলো গান্ধীজী তার আন্দোলন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দেশব্যাপী ছাত্ররা স্কুল-কলেজ বর্জন করবে, উকিল কোর্টে যাবে না, আইন-আদালত বর্জন করা হবে। আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার ধাপ হিসেবে গান্ধী মদ প্রস্তুত বন্ধ করা, লবণ ট্যাক্স বাতিল করা, প্রভৃতি ১১ দফা দাবী উত্থাপন করে ঘোষণা করলেন এসব দাবী অবিলম্বে মেনে না নিলে লবণ ট্যাক্স বন্ধ করার মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন তিনি শুরু করবেন।[৭]

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ দক্ষিণ ভারতের সবরমতী আশ্রম থেকে বোম্বাই এর সমুদ্রোপকুলবর্তী লবণ কেন্দ্র ডান্ডীর দিকে গান্ধীর পদব্রজে যাত্রা আরম্ভ থেকে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। ৫ই এপ্রিল গান্ধী তার লোকজন সমেত ডান্ডী পৌঁছলেন এবং লবণ আইন ভংগ করলেন। 'ইতিমধ্যে দেশের বহু ছাত্র স্কুল বর্জন করল এবং অনেকে সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তাফা দিলেন। চারদিকে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এ সময়ে ভারতের সর্বত্র ধর্মঘটের দিকে পা বাড়াল। চারদিকে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাও বৃদ্ধি পেল।[৮]

সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটলো বাংলায়। চট্টগ্রামে সূর্যসেনের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল অস্ত্রাগার লুন্ঠন হলো। শুধুঅস্ত্রাগার লুন্ঠন নয়, চট্টগামে বৃটিশ

৪। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১০৯।
৫। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', ডাঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ১৫২।
৬। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১১০।
৭। 'ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স' পট্টভি সিতারামিয়া, পৃষ্ঠা ৩৬৩, 'কালেকটেড ওয়ার্কস অব মহাত্মা গান্ধী,' ৪৩শ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১১-৪১৬।
৮। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১১১, 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন' বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ১১১।

www.icsbook.info

কর্তৃত্বকেও তারা চ্যালেঞ্জ করল। প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার যে প্রস্তাব গ্রহণ করে, চট্টগ্রামে তারই পূর্ণ বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছিল সূর্যসেনরা। এ বিষয়টা আরেকটু বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে, কিন্তু তার আগে গান্ধী পরিকল্পিত ও কংগ্রেস আহুত সূর্যসেনদের এ আন্দোলন সম্পর্কে মুসলিম লীগের পলিসি সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা দরকার।

কংগ্রেসের এ আন্দোলন ছিল এককভাবে কংগ্রেসের দাবী আদায়ের লক্ষ্যে। কংগ্রেসের এই দাবী হলো, সংখ্যাগুরু হিন্দুদের পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত স্বরাজ যাতে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব থাকবেনা। প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের। এ আন্দোলন ছিল মুসলিম লীগ অর্থাৎ মুসলিম স্বার্থের পাল্টা একটি আন্দোলন। এ আন্দোলনের সাফল্যের অর্থ মুসলমানদের বৃটিশের খপ্পর থেকে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের খপ্পরে পড়া। সুতরাং কংগ্রেসের এই আন্দোলনকে জিন্নাহ মুসলিম স্বার্থের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করলেন এবং আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করলেন।[৯] ১৯৩০ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে মওলানা মোহাম্মদ আলী মুসলমানদের কংগ্রেস হতে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেসের এই আন্দোলন সম্পর্কে আরও স্পষ্ট কথা বললেন। তিনি বললেন, "গান্ধী উগ্র সাম্পদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার পক্ষে কাজ করছেন। তাঁর যাবতীয় কার্যক্রমের লক্ষ্য হলো হিন্দু রাজত্ব স্থাপন এবং মুসলমানদের পদানত করে রাখা।"[১০] এখানেই শেষ নয় গান্ধীর আইন অমান্য শুরু হওয়ার পর মওলানা মোহাম্মদ আলী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে লিখেছিলেন, "মহাত্মা গান্ধী এবং মতিলাল নেহেরু হিন্দু মহাসভার পদাংক অনুসরণ করে চলেছেন। আমি আমার ক্ষমতার যতটুকু শক্তি আছে তার সমস্ত দিয়ে আপনার সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।" [১১]

চট্টগ্রামে সূর্যসেনের আন্দোলন ছিল মিঃ গান্ধীর পদাংক অনুসরণে এবং গান্ধীরই আইন অমান্য আন্দোলনের একটা অংশ। সূর্যসেন ছিলেন কংগ্রেসের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে মতিলাল নেহেরু জওহর লাল নেহেরুকে লিখেছিলেন, "বাংলায় বিপ্লবীরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে গভীরভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন।"[১২] সূর্যসেন ছিলেন এই সম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বিপ্লবীদেরই একজন। তিনি ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পর্যন্ত যাবতীয় বিপ্লবী কার্যক্রম চট্টগ্রামের কংগ্রেস অফিসকে কেন্দ্র করেই সম্পাদিত হয়েছে। সূর্যসেন ছিলেন কংগ্রেস রাজনীতির সাথে একাত্ম। ১৯২৮ সালে কোলকাতার যে সম্মেলনে নেহেরু

৯। 'পাকিস্তানঃ দেশ ও কৃষ্টি', মহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫৬, 'কায়েদা আযম,' আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৫৮।
১০। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৭৯, 'Towards Pakistan', ডঃ ওয়াহিদুজ্জামান, পৃষ্ঠা ৬৩।
১১। 'স্পীচেস এন্ড রাইটিংস অব মোহাম্মদ আলী,' (উদ্বৃতঃ 'ভারত কি করে ভাগ হলো', পৃষ্ঠা ১০৮)।
১২। 'ভারত কি করে ভাগ হলো', বিমলানন্দ শাসমল, পৃষ্ঠা ৫১।

www.icsbook.info

রিপোর্ট পাশ করা হয় এবং যে সম্মেলনে লীগ-কংগ্রেস বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয় ও জিন্নাহ অশ্রুসজল চোখে বিদায় নেন, সে সম্মেলনে সূর্যসেন ছিলেন কংগ্রেস প্রতিনিধি এবং গান্ধীপন্থী হাইলাইনারদের একজন। [১৩] এরপর ১৯২৯ সালে লাহোরে কংগ্রেসের যে সম্মেলনে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বাদ দিয়ে কংগ্রেস এককভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে, সে সম্মেলনেও সূর্যসেন চট্টগ্রাম থেকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিলেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদারের মতে এই সময় সূর্যসেন চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেসের সর্বেসর্বা ছিলেন এবং তার পছন্দমত লোক তিনি কংগ্রেসের লাহোর সম্মেলনে নিয়ে গিয়েছিলেন।। [১৪] চরম মুসলিম বিদ্বেষী নেতা এবং হিন্দু মহাসভার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা মদন মোহন মালব্যের সাথেও সূর্যসেনের একাত্মতার পরিচয় এ সম্মেলনকালে পাওয়া যায়। পন্ডিত মদন মোহন মালব্যের সভাপতিত্বে একটি সর্বভারতীয় হিন্দু ছাত্র সংগঠন তৈরী করার সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে ঐ সময় লাহোরে নিখিল ভারত ছাত্র কনভেনশন ডাকা হয়েছিল। সূর্যসেন এই কনভেনশনের জন্যেও প্রতিনিধি নিয়ে যান। তার কংগ্রেস প্রতিনিধিদেরও অনেকে সেখানে যোগদান করে। [১৫] বস্তুত সূর্যসেন মদন মোহন মালব্যের মতই কট্টর পন্থী একজন কংগ্রেস নেতা এবং কংগ্রেসের সব প্রোগ্রামই আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করেন। ১৯৩০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী তারিখকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯২৯ সালের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। সারা ভারতে বিভিন্ন স্থানে এই দিন কংগ্রেস রচিত 'স্বাধীনতা দিবেসের' সংকল্প পাঠ করা হয়। -------চট্টগ্রামেও কংগ্রেস সেক্রেটারী সূর্যসেন 'স্বাধীনতা দিবসে' কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য কর্মসূচী পালন করেন। [১৬] ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল মিঃ গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে কংগ্রেস কর্মী ও জনগণের উদ্দেশ্যে বাণী পাঠান। প্রতি গ্রামে নিষিদ্ধ লবণ তৈরী ও আমদানী শুরু করা হোক। -----ছাত্রগণ সরকারী স্কুল-কলেজ বর্জন করুন, সরকারী চাকুরেরা চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করুন। আমরা শিগগিরই দেখতে পাব স্বরাজ কবে দ্বারে সমাগত হবে তার জন্যে অপেক্ষা না করে স্বরাজ হাতে তুলে নেওয়ার জন্যে অস্ত্রাগার লুট করার সিদ্ধান্ত নিলেন সূর্যসেন। নিজেদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে পুলিশকে বিভ্রান্ত ও নিজেদের ব্যাপারে সরকারকে নিশ্চিন্ত রাখার জন্যে ১৯৩০ সালের ১৬ই এপ্রিল একটা ইস্তাহার ছাড়লেন সূর্যসেন। পূর্ণ স্বরাজ আমাদের দ্বারে সমাগত। "[১৭]

১৩। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পৃষ্ঠা ৮১।
১৪। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পৃষ্ঠা ৯০।
১৫। ঐ, পৃষ্ঠা ৯০।
১৬। ঐ, পৃষ্ঠা ১০০।
১৭। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পৃষ্ঠা ১০২।

www.icsbook.info

ইস্তাহারটি এই-

"দেশের দিকে দিকে স্বাধীনতার তূর্যধ্বনি শোনা যাইতেছে। সর্বত্র আইন অমান্যের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২১ সালে যেই চট্টগ্রাম ছিল সবার পুরো ভাগে আজ সেই চট্টগ্রাম পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে-ইহা ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয়।---কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে লবন আইন ছাড়া অন্য আইন (যেমন রাজদ্রোহ আইন) অমান্যও আরম্ভ হইয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া আমরাও ২১শে এপ্রিল হইতে আইন অমান্য করিব স্থির করিয়াছি। ইহার জন্যে সর্বসাধারণের সহানুভূতি চাই, সত্যাগ্রহী সেনা চাই। লোক ও টাকা চাই।[১৮]

শ্রী সূর্যসেন

সম্পাদক,

চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটি

সূর্যসেনরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলেন ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কালেও সূর্যসেন ছিলেন নিখাদ কংগ্রেস কর্মী, এবং বন্দেমাতরমের নির্জলা সৈনিক। অস্ত্রাগারের বিরাট লোহার গেট যখন দেওয়াল থেকে ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে তখন উল্লসিত বিপ্লবীদের গগণ বিদারী 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে চট্টগ্রামের নৈশ-আকাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠে।[১৯] 'একরকম বিনা আয়াসেই জিলার বিদেশী শক্তির শেষ প্রধান সশস্ত্র ঘাটি বিপ্লবীদের দখলে এসে গেল, তখন আবারও জোর গলায় ধ্বনি উঠল 'বন্দে মাতরম' 'স্বাধীন ভারত কী জয়'।[২০] রিজার্ভ ফোর্সের শেষ প্রধান এই সশস্ত্র ঘাটি বিনা আয়াসে দখলে আসার পেছনে একটা কাহিনী আছে। এই ঘাটি দখলের জন্যে 'বিপ্লবীরা যখন পাহাড়ের গা বেয়ে উপর দিকে উঠছেন, তখন তাঁরা ধ্বনি দিতে থাকেন 'গান্ধীরাজ হো গিয়া, ভাগো'। তাদের বক্তব্যকে আকাশের দিকে গুলীর আওয়াজ দিয়ে তারা সঠিক ভাবে বুঝাবারও চেষ্টা করছিল। ফলে সশস্ত্র পুলিশের মধ্যে বিভ্রান্তি[২১] সৃষ্টি হয় এবং রিজার্ভ ফোর্সের সিপাহী ব্যারাকের বিপরীত দিক থেকে পালাতে শুরু করে।[২২] সূর্যসেনদের এই 'গান্ধীরাজ' ছিল মূলত পন্ডিত মদন মোহন মালব্যদের 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সূর্যসেনের বিপ্লবী সৈনিকরা ছিল গান্ধীর 'সত্যাগ্রহী সেনা', আনন্দ মঠের 'বন্দে মাতরম' মুখরিত 'সন্তান সেনা'। এই কারণেই সূর্যসেনের বাহিনীতে কোন মুসলমান ছিল না। যারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে অংশ নিয়েছিল, যারা জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে সূর্যসেনের সাথী ছিল, তাদের মধ্যে একজন মুসলমানও ছিলনা।[২৩] পাহাড়তলী অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় বিপ্লবীরা লালদিঘী ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে

১৮। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পৃষ্ঠা ১০৪। ১৯। ঐ, পৃষ্ঠা ১২১২। ২০। ঐ, পৃষ্ঠা ১২৬।

২১। তখনকার রিজার্ভ ফোর্সে হিন্দী-উর্দুভাষী লোকই ছিল বেশী।

২২। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', পূর্ণেন্দু দস্তিদার, পৃষ্ঠা ১২৬।

২৩। জালালবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে সূর্যসেনের সাথীদের পূর্ণ তালিকা (উল্লেখ্য, এই যুদ্ধে সূর্যসেন তার গোটা বাহিনীকেই ব্যবহার করেন):- সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত লালসিং, লোকনাথ বাল, উপেন ভট্টাচার্য,

www.icsbook.info

একজন মুসলিম ড্রাইভারকে জোর করে পাহাড়তলীতে নিয়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভারের নাম ছিল আহমদ। লুণ্ঠন কাজ শেষে ড্রাইভারের চোখে মুখে এসিড ঢেলে তাকে বিকৃত ও বিকলাঙ্গ করে দেয়া হয়েছিল। ড্রাইভারের বক্তব্য, অনুযায়ী সে যেহেতু মুসলমান ছিল এবং লুণ্ঠনাকারীদের চিনিয়ে দিতে পারত, এ কারণেই তার চোখে-মুখে এসিড ঢালা হয়েছিল।[২৪] আসলে সূর্যসেনের আন্দোলনটাই এমন ছিল যে, তাতে কোন মুসলমান শামিল হওয়া সম্ভব ছিল না। সূর্যসেনের সহযোগী শ্রীমতি কুন্দপ্রভা সেন তার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, দেশ সেবা শিক্ষা নেবার উদ্দেশ্যে সূর্যসেনের সাথে দেখা করলে তিনি বললেন যে, 'পূঁজো করতে হবে বুকের রক্ত দিয়ে।' এই পূজোর বিবরণ দিতে গিয়ে কুন্দ প্রভা লিখছেন, "আমি পিছু পিছু চললাম, কিছুদূর এগিয়ে একটা মন্দিরের কাছে দু'জনেই পৌছলাম। দরজা খোলাই ছিল। মাষ্টার দা আর আমি ভেতরে ঢুকলাম। তারপর তিনি টর্চ জ্বালালেন। দেখলাম, ভীষণ এক কালী মূর্ত্তি। মাষ্টার দা এক হাতে লম্বা একখানা ডেগার বের করে আমার হাতে দিলেন, মায়ের সামনে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো কর। ওখানে বেল পাতা আছে। বুকের মাঝখানের চামড়া টেনে একটুখানি কাটার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ফোটা রক্ত বের হল। তা বেল পাতায় করে মাষ্টার দার কাছে নিয়ে গেলাম। ----আমি মায়ের চরণে রক্ত আর মাথা রেখে প্রতিজ্ঞা করলাম।'[২৫] ভারতের বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা মোজাফফর আহমদ যথার্থই লিখেছেন, "বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু রাজত্বের পুন প্রতিষ্ঠা।"[২৬] গান্ধীর অসহযোগ, স্বরাজ্য, আইন অমান্য আন্দোলন, প্রভৃতি সবই ছিল এই হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। এই কারণেই বাংলার জননেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে গান্ধী, সূর্যসেনদের এই আন্দোলন তৎপরতাকে গন্ডগোল বলে অভিহিত করেছিলেন। সূর্যসেনদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ১৭ দিন পর গান্ধী গ্রেপ্তার হলে এই বিষয়ের উপর এক আলোচনায় শেরে বাংলা বলেন, "ভারতের ৭ কোটি মুসলমানের ৭০ জনও কংগ্রেসের সমর্থক নয়। মিঃ গান্ধী যে রকম গন্ডগোল সৃষ্টি করেছেন তাতে তাঁকে

মধূদত্ত, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, লাল মোহন সেন, অর্ধেন্দু দস্তিদার, হিমাংশু সেন, শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, নির্মল লালা, দেশ প্রসাদ গুপ্ত, আনন্দ গুপ্ত, মনীন্দ্র গুহ, সহায়রাম দাস, প্রভাস বল, ফনীন্দ্র নন্দী, রজত সেন, ত্রিপুরা সেন, দ্বিজেন্দ্র দস্তিদার, বিধু সেন, মনোরঞ্জন সেন, কালিপদ চক্রবর্তী, শশাংক দত্ত, নারায়ন সেন, স্বদেশ রায়, সৌরিন্দ্র দত্ত চৌধুরী, নিতাই ঘোষ, সুধাংশ বোস, মতি কানুনগোয়, জিতেন দাস গুপ্ত, পুলিন ঘোষ, বনবীর দাসগুপ্ত, দীপ্তি মেধা চৌধুরী, বিনোদন দত্ত, হরিপদ মহাজন, সুবোধ রায়, বনবিহারী দত্ত, ফাতীর সেন, শান্তি নাগ, সরোজ গুহ, ভবতোষ ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল, কালি কিংকর দে, ক্ষিরোদ ব্যানার্জী, সীতারাম বিশ্বাস, ধীরেন দে, অশ্বিনী চৌধুরী, 'নিরঞ্জন রায়, শংকর, ননীদেব এবং কৃষ্ণ চৌধুরী। ('স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম', পুর্ণেন্দু দস্তিদার, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৫২)

২৪। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৪৪ (দ্রষ্টব্যঃ চট্টগ্রামের সাইফউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী বার-এট-ল, লিখিত 'সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট সন্ত্রাসবাদী সূর্যসেন' প্রবন্ধ)

২৫। 'কারাস্মৃতি', কুন্দ প্রভা সেনগুপ্তা (উদ্ধৃতঃ'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', পৃষ্ঠা ১৪৩)

২৬। 'আমার জীবন ও ভারতে কম্যুনিস্ট পার্টি', মোজাফফর আহমদ।

www.icsbook.info

গ্রেফতার করে রাখার জন্যে আমি ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।' [২৭] আরেকটা মজার ব্যাপার হলো, সূর্যসেনরা তাদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দায়, মুসলমানদের উপর চাপাতে চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে সুন্দর একটি তথ্য দিয়েছেন চট্টগ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী ও সংগামী পরিবারের সন্তান ব্যারিষ্টার স,এ,সিদ্দিকী। তিনি বলেছেন,"বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক শ্রী সূর্যসেনের অধিনায়কত্বে তারই পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সম্পন্ন হলো চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। এই বিপ্লবী প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আরও একটি ঘটনা, বলা যায় উপঘটনা। কোন ইতিহাসে সে উপ-ঘটনার কথা লেখা না হলেও আজও চট্টগ্রামের হাজার হাজার মানুষের মুখে তা জলজ্যান্ত সত্য হয়ে আছে। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসেই অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের প্যারেড ময়দানে সাড়া জাগানো মুসলিম কনফারেন্স। ঐ কনফারেন্সের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্যে তাতে যোগ দিয়েছিলেন এই উপমহাদেশের চিরস্মরণীয় মল্লবীর গামা। মুসলীম কনফারেন্সের কর্মীদের মাথায় ছিল তুর্কি টুপি, গায়ে বিশেষ রকমের ব্যাজ। সম্মেলনের পরপরই আরম্ভ হলো বিপ্লবীদের অভিযান। অভিযান শেষে বিপ্লবীদের পালাবার পথে দেখা গেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুসলিম কনফারেন্স কর্মীদের অনুরূপ তুর্কী টুপি ও বিশেষ ধরনের ব্যাজ। তাতে সহজেই মনে হতে পারে, অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ঐ কনফারেন্স কর্মীরা। সরকারের কাছেও তাই মনে হয়েছিল। --------কিন্তু যার কর্মতৎপরতায় ব্যর্থ হয়ে যায় বিপ্লবীদের অনিষ্টকারী এই সাম্প্রদায়িক পরিকল্পনা, তিনি চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার খান বাহাদুর মোমিন সাহেব। তাঁরই তদন্তে উৎঘাটিত হয় সত্যিকার ঘটনা। বেঁচে যায় মুসলিম কনফারেন্সের কর্মীবৃন্দ।" [২৮] এই ঘটনা প্রমাণ করে মুসলমানরা ছিল সূর্যসেনের আন্দোলনের প্রতিপক্ষ। গান্ধী তথ্যকংগ্রেসের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে তখন মুসলিম লীগ তথা মুসলমানদের চরম প্রতিপক্ষ হিসেবেই তৎপর ছিল। সূর্যসেনের আন্দোলন কংগ্রেসেরই আন্দোলন, তাই ঐ ঘটনায় বিস্ময় বোধ করার কিছু নেই। আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জওহরলাল নেহেরু গ্রেপ্তার হলেন ১৪ই এপ্রিল, আর গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হলো মে মাসে। আইন অমান্য আন্দোলন চলতেই থাকলো। বন্দীদের মুক্তি দিতে চাইলেন ভারত সরকার, কিন্তু কংগ্রেসের অন্য সব দাবী মেনে নিতে অপারগতা জ্ঞাপন করলেন। একসঙ্গে সবগুলো দাবী পুরনের দাবীতে অটল রইল কংগ্রেস। এর মধ্যেই প্রথম গোলটেবিল বৈঠক শুরু হলো ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর। মোট ৮৯ জন প্রতিনিধি এ গোলটেবিলে যোগ দিলেন। এর মধ্যে বৃটিশ প্রতিনিধি ছিলেন ১৬ জন এবং ১৬ জন ছিলেন

২৭। ১৯৩০ সালের মে মাসে কোলকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় গান্ধীর গ্রেফতারকে নিন্দা করার জন্যে আনীত এক প্রস্তাবের উপর আলোচনায় শেরে বাংলা একথা বলেন। (উদ্ধৃতঃ ভারত কি করে স্বাধীন হলো, পৃষ্ঠা ১০৯)।
২৮। 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭', এস,এ, সিদ্দিকী বার-এট-ল, পৃষ্ঠা ১১১, ১১২।

www.icsbook.info

ভারতের দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি। অবশিষ্ট ৫৭ জন ছিলেন কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দল যেমন মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, হরিজন, প্রভৃতির প্রতিনিধি। গোলটেবিলে মুসলিম প্রতিনিধি ছিলেন জিন্নাহ, আগা খান, স্যার মুহাম্মাদ শফী, মাওলানা মুহাম্মদ আলী, এ,কে, ফজলুল হক প্রমুখ। কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে হিন্দুদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, শ্রী নিবাস শাস্ত্রী, রামস্বামী আয়ার, জয়াকর, চিমনলাল সিতলাবাদ, রামস্বামী মুদালিয়ার প্রমুখ। গোলটেবিলের সামনে বিবেচ্য বিষয় ছিল সাইমন কমিশনের রিপোর্ট। উদ্বোধনী ভাষণে জিন্নাহ ভাবী শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করে বলেন, "ভারতের পরিস্থিতি এমন যে, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ, কি খৃষ্টান বা পারসিক, কি বঞ্চিত শ্রেণী, কি বণিক অথবা ব্যবসায়ী সমাজ-ভারতের প্রত্যেকেই আজ জোর দাবী জানাচ্ছে, ভারতকে পূর্ণ রূপেই স্বায়ত্ত্ব শাসন দিতে হবে। ------আমার বক্তব্য হলো গোটা বৈঠকের আলাপ আলোচনার একটা বিষয়কেই মৌলিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তা হলো, ভারতবাসী ভারতের মালিকানা চায়। আপনারা যে শাসনতন্ত্র তৈরী করবেন, অথচ আইন সভার নিকট দায়ী কোন ক্যাবিনেটের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করা হবে না, এ আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না। ------স্বায়ত্ত্ব শাসন জিনিসটা অবাস্তব কিছু নয়। সরকারের দায়িত্ব যদি এমন কোন ক্যাবিনেটের উপর অর্পিত হয় যা আইন সভঅর নিকট দায়ী, তবে প্রথমেই যে বিষয়টার প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তা হলো, বিভিন্ন স্বার্থ সংরক্ষিত রইলো কিনা। ভারতে যে সব সম্প্রদায় রয়েছে তাদের স্বার্থ ও অধিকার ক্ষুণ্ন করে আপনারা কোন শাসনতন্ত্রই তৈরী করতে পারেন না। প্রথমেই আসে সংখ্যালঘু সমস্যার কথা। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা সৃষ্টি হলেই তারা রাষ্ট্রীয় কাজে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করতে ও আনুগত্য দেখাতে পারে। তা যদি না পারেন, তাহলে যত শাসনতন্ত্রই তৈরী করুন না কেন, তা সফল ও কার্যকরী হবে না।"[২৯] শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক বলেছিলেন, "আমাদের সমাজের যে অবস্থা এবং এর চাহিদার যে বৈচিত্র রয়েছে, তাতে একটা মাত্র পন্থাই খোলা রয়েছে বলে আমি মনে করি।-------পুরাতন দাবী উত্থাপন করেই আমাদের বলতে হচ্ছে যে, ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে পর্যাপ্ত রক্ষা কবচের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক পর্যায়ে কোন সরকারের অগ্রগতি সম্ভব ও কার্যকরী হবে না। এ রকম রক্ষা কবচ ছাড়া কোন শাসনতন্ত্রই মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।"[৩০] হিন্দু নেতৃবৃন্দও বক্তৃতা করলেন। কংগ্রেস গোলটেবিলে আসেনি। কিন্তু হিন্দু মহাসভার এবং অন্যান্য নেতারা যে বক্তৃতা করলেন তাতে মুসলমানদের কোন কথা তাঁরা বুঝেছেন বলে মনে হলো না। মুসলমানদের

২৮। 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭', এস,এ, সিদ্দিকী বার-এট-ল, পৃষ্ঠা ১১১, ১১২।
২৯। 'Speeches and statement of Quid-I-Azam', রফিক আফজাল, পৃষ্ঠা ৩১৩, ৩১৭।
(৩০) 'Indian Round Table Conference Proceedings', page 246.

www.icsbook.info

অন্যান্য দাবী মানা দূরের কথা ফেডারেল রাষ্ট্র পদ্ধতির মত সাধারণ দাবীও তারা মেনে নিতে রাজী হলো না। আগা খান এ সম্পর্কে লিখেছেন, "আমি তাদেরকে বিশেষভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলাম। এককেন্দ্রিক ভারতের কথা চিন্তা না করে তারা যদি ফেডারেশনের নীতি গ্রহণ করেন, তাহলে তার ফল ভালই হবে এবং গোটা দেশের জন্যে বিরাট ও ত্বরিত পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে আমরা যে নিশ্চয়তা চাচ্ছিলাম, তা হলো-সত্যিকার একটি শাসনতন্ত্রঃ যেখানে পাঞ্জাব ও বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে শাসনতান্ত্রিক প্যাঁচ খাটিয়ে সংখ্যালঘু করা চলবেনা, সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে আলাদা করে নিয়ে তাকে একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শাসনতান্ত্রিক সরকারের নীতি চালু করা এবং সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিসের চাকরী প্রদানের বিষয়ে মুসলমানদের জন্যে সুনির্দিষ্ট ভাবে শাসনতান্ত্রিক নিশ্চয়তা।" ৩২

গোলটেবিলে একটা সিদ্ধান্তে পৌছার খাতিরে মুসলিম প্রতিনিধিরা শেষ পর্যন্ত বলেছিল, মুসলমানদের অন্যান্য দাবী মেনে নিলে মুসলমানরা যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি মেনে নেবে। হিন্দু প্রতিনিধিগণ এতে সম্মত হননি। এ সম্পর্কে চিমনলাল বলেছেন, "সাপ্রু, শাস্ত্রী এবং আমি যুক্ত নির্বাচনের খাতিরে তৎক্ষণাৎ তাদের এসব দাবী মেনে নিলাম। কিন্তু জয়াকর ও মুঞ্জের বিরোধিতা আমাদের বিশেষ হতাশ করল।--------কয়েকটা বিকাল আমরা নিজেরাই এই সমস্যাগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করলাম।" ৩২

১২ই নভেম্বর ১৯৩০ থেকে ১৯শে জানুয়ারী ১৯৩১ পর্যন্ত গোলটেবিলের দীর্ঘ আলোচনা এবং বিভিন্ন সাব কমিটিতে বিবিধ বিষয়ে নান আলোচনার পর স্থির হয়, (১) বৃটিশ ইন্ডিয়া ও যোগদানেচ্ছু রাজ্যসমূহের সমন্বয়ে একটি ফেডারেল সরকার গঠন করা হবে, (২) প্রদেশ সমূহ থেকে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা তুলে দেয়া হবে, (৩) বোম্বাই থেকে সিন্ধুকে পৃথক করার প্রস্তাব নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়, কিন্তু এর আর্থিক পরিস্থিতি বিবেচনার জন্যে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়, (৪) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে গভর্ণরের প্রদেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সকল বিষয়ে মোটামুটি মতৈক্য হওয়া সত্ত্বেও রেসিডিউয়ারী ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের অথবা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত হবে, তা সাব্যস্ত হয়নি এবং সাম্প্রদায়িক ও সংখ্যালঘু সমস্যারও কোন সমাধান হয়নি।' ৩৩ অথচ ভাবী শাসনতন্ত্রের জন্য এ দু'টিই ছিল প্রধান বিষয়। এদিক থেকে আগা খানের কথায় বলা যেতে পারে, প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়েছিল।'

এই ব্যর্থতা সম্পর্কে বোম্বাই ক্রনিকল-এর বিশেষ সংবাদদাতা লিখেন, "আমি

(৩১) 'Memories', আগা খান, পৃষ্ঠা ২১৮।
(৩২) 'Recollection and Reflection', চিমনলাল সিতলাবাদ, পৃষ্ঠা ৩৫৮ (উদ্ধৃত 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৬১)।
৩৩। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৬৬।

www.icsbook.info

বুঝলাম যে, সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে যদি আলাদা করে দেখা হয়, তাহলে মুসলমানরা যুক্ত নির্বাচন ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব মেনে নেবে। অপরাপর যেসব সাম্প্রতিক দাবী ছিল, মাননীয় আগা খান ও মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলমানরা সেসব বিষয়ে তেমন কিছু জোর দিচ্ছিল না। সম্মেলনে মুসলমানদের উপরোক্ত শর্তাবলী গৃহীত হলে তারা ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাসের দাবীতেই ঐক্যবদ্ধ হতে চেয়েছিল। মহাসভাপন্থীরা বাদে অপরাপর হিন্দুরা এ বিষয়ে রাজী ছিল। এ বিষয়ে জয়াকরের অভিমত দুঃখজনকভাবেই ঐক্যবদ্ধ ভারতের বিপক্ষে ছিল।" [৩৪]

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের বিদায়ী ভাষণে (১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩১) বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড আশা প্রকাশ করলেন, কংগ্রেস পরবর্তী বৈঠকে যোগ দেবে। স্বাভাবিক ভাবে ভাইসরয় লর্ড অরউইন কংগ্রেসের প্রতি নরম হলেন। ১৯৩১ সালের ২৫শে জানুয়ারী তিনি গান্ধী ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দিলেন। মুক্তি লাভের পর গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগাদানের জন্যে কয়েকটি শর্ত আরোপ করলেন। যেমন, অবশিষ্ট রাজবন্দীদের মুক্তি দেয়া, দমন নীতি বন্ধ করা, ছাটাইকৃত কর্মচারীদের পুনর্বহাল করা, সরকারের একচেটিয়া লবন ব্যবসায় বন্ধ করা, পুলিশ অত্যাচারের তদন্ত করা ইত্যাদি। এ শর্তগুলোর মধ্যে প্রথম গোলটেবিলে যোগদানের জন্যে যে সব শর্ত দিয়েছিল, তার নামগন্ধ নেই অর্থাৎ গান্ধী তার অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। গান্ধীর সাথে ভাইসরয় লর্ড অরউইনের বার ছয়েক বৈঠক হলো। ফল হিসেবে সম্পাদিত হলো 'গান্ধী অরউইন প্যাক্ট' এবং গান্ধী রাজী হলেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে। এ প্যাক্ট অনুসারে গান্ধী অর্থাৎ কংগ্রেসকে যা ছাড়তে হলো এবং সে যা লাভ করল তার যোগফল হলো জিরো। বৃথাই গেল গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন। এ চুক্তি কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদের বিশেষ করে নেহেরুকে নিরাশ করল। তিনি বললেন -----এ চুক্তি আমাদের আন্দোলনকে দূর্বল করবে।" [৩৫] এ অসন্তুষ্টির বড় কারণ ছিল, গান্ধী অরউইন বৈঠক ও চুক্তিতে কংগ্রেসের বড় রকমের নীতিগত হার হয়। কংগ্রেসের বড় দাবী হলো, কংগ্রেস ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সব ধর্মবিশ্বাসীদের সংগঠন। কিন্তু লর্ড অরউইন তার আলোচনায় কংগ্রেসকে হিন্দু সংগঠন হিসেবে নথিভুক্ত করেন। [৩৬] তাছাড়া গান্ধী অরউইন বৈঠকে গান্ধী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষে কোন জাতীয়তাবাদী (কংগ্রেস পন্থী) মুসলমানকে প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করেন এবং একাই কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। [৩৭]

৩৪। 'Muhammad Ali Jinnah', এম. এইচ. সাঈদ, page 214, 215.
৩৫। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১১৪।
৩৬। 'Dr. Padma Shah তার 'The Indian National Congress and the Muslims Since 1928' গ্রন্থে বলেন, "Lord Iruin recorded the Congress as the Hindu body".
৩৭। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৮০.

www.icsbook.info

পরে গান্ধী ডাঃ আনসারীকে গোলটেবিলে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করেন, কিন্তু সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বৃটিশ সরকার। অথচ ডাঃ আনসারী তখন কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি। এটা ছিল কংগ্রেসের বিরাট পরাজয় এবং মুসলিম রাজনীতির বিজয়।

লন্ডনে যখন প্রথম গোলটেবিল চলছিল, তখন ১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। এ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন কবি আল্লামা ইকবাল। এই সম্মেলনটি একটি ঐতিহাসিক মূল্য রাখে। কারণ এই অধিবেশনেই ইকবাল তার 'দুই জাতি' মতবাদটি ব্যক্ত করলেন। এই দুই জাতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইকবাল 'পাকিস্তান' শব্দটি উচ্চারণ করেননি বটে, তবে তিনি বললেন যে, 'মুসলিম দের জন্যে ভারতের মধ্যে এক মুসলিম ভারত গঠন করতে হবে।'[৩৮] আল্লাম ইকবালের এই বক্তব্য ছিল উদ্ভুত বাস্ত বতার একটি সকণ্ঠ উচ্চারণ। বিশ শতকের এই সময় থেকে বিভিন্ন সময় থেকে বিভিন্ন জনের লেখনি, গান ও চিন্তায় মুসলিম স্বাজাত্যবোধ ও আত্মচেতনা নতুন এক অবয়ব নিয়ে বিকশিত হতে থাকে।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের পর ১৯৩১ সালের মার্চে নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের কার্যকরী কমিটির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর বৈঠক ঘোষণা করল, "সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে গোলটেবিল বৈঠকে হিন্দু প্রতিনিধিদের মতের প্রেক্ষিতে মুসলমানরা দাবী করছে যে, হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের পূর্বে ভারতের শাসনতন্ত্র তৈরী করলে মুসলমানরা তা গ্রহণ করবে না এবং গোলটেবিল বৈঠকে যে ফেডারেল কাঠামো তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে তারও সংশোধন প্রয়োজন।"[৩৯] এ সময়ে জিন্নার একটি উক্তিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর। বৈঠকের আগে তিনি লন্ডন থেকে বোম্বাই এসেছিলেন। বোম্বাইয়ে তিনি বললেন, " মুসলমানরা যদি সংগঠিত না হয়, তাহলে তাদের মুক্তি নেই। কোন সরকার কখনও সংখ্যালঘুদের চিরকাল দাবিয়ে রাখতে পারে না। ------- আপনাদের খোলাখুলি বলতে চাই যে, হিন্দুরা নির্বোধ, তাদের বর্তমান আচরণও অত্যন্ত বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক। হিন্দুদের অধিকাংশের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনারা হয়তো জানেন যে, আমি জানি। ----পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দুরা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন দিতে রাজি নয়। ---হিন্দুরা উত্তমরুপে জানে যে, এই প্রদেশ দু'টিতে মুসলমানদের ভোটার সংখ্যা মাত্র চল্লিশজন (কারণ ভোটার লিস্ট হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণেই তৈরী)।"[৪০]

৩৮। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১১২।
৩৯। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৭০।
৪০। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৭১।

www.icsbook.info

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শুরু হলো ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর। চললো ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বৈঠকের চেয়ারম্যান বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড বৈঠকের শুরতেই বললেন, "যদি ভারতীয় প্রতিনিধিগণ সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানে অক্ষম হন, তাহলে সকলে সম্মত হলে তিনি এর শালিশী করবেন।"[৪১] সম্মতি দিল সকলে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে জিন্নাহ ও অন্যদের সাথে আল্লামা ইকবালও যোগ দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানই ছিল সবচেয়ে মৌলিক ও প্রধান বিষয়। সুতরাং গোলটেবিলের বাইরে ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌছার উদ্যোগ নিলেন আগা খান। লন্ডনের রিজ হোটেলে আগা খানের কক্ষে এই আলোচনার ব্যবস্থা হলো। একটা আপোশ রফায় পৌছার জন্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এই আলোচনা সম্পর্কে আগা খান তার স্মৃতি কথা লিখেন ঃ

"আমরা প্রেস ফটোগ্রাফারদের ছবি তোলার জন্য দাঁড়ালাম। তারপর আলোচনার জন্যে বসলাম। আলোচনার সূত্রপাত করে আমি মহাত্মাজীকে বললাম, 'তিনি যদি মুসলমানদের সত্যিকার পিতার স্থান গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে তারা আজাদী অর্জনের জন্যে তাকে যথাসাধ্য সহায়তা করে যাবে।' মহাত্মাজী আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,'সত্যি কথা বলতে কি, মুসলমানদের জন্যে কোন পিতৃসুলভতা আমি অনুভব করিনা। তবে রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তার কথা যদি বলেন, তাহলে সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই আমি আলাপ আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি। আমি কোন ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিতে পারি না।' প্রাথমিক আলোচনায় বেশি কিছু অগ্রগতি হলোনা। পরে অধিক রাত্রিতে রিজ হোটেলে আমার কামরায় আরো কয়েক দফা আলোচনা হয়। সেখানে আমিই ছিলাম মেজবান। আলোচনার এক দিকে ছিলেন মিঃ জিন্নাহ ও স্যার মুহাম্মাদ শফী, অন্যদিকে ছিলেন মহাত্ম গান্ধী ও অন্যরা।----এটা কোন আনুষ্ঠানিক আলোচনা ছিল না। আলোচনার পুরা দায়িত্ব মিঃ জিন্নাহ এবং স্যার মুহাম্মাদ শফীর উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

কয়েকটি বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচান আবর্তিত হচ্ছিল। যেমন, ভারতে এক জাতি রয়েছে, না দুই জাতি? ইসলাম কি কেবল সংখ্যালঘুদের অথবা যে সব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তারা বিশেষ রাজনৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব লাভের হকদার? কংগ্রেসের মনোভাব ছিল অনেকটা তত্বগত ও অবাস্তব। তারা তাদের একজাতিত্বে অনড় রইল অথচ আমরা জানতাম ইতিহাস তা সমর্থন করে না।---

মহাত্মা আমাদের উপর একটা প্রধান ও মৌলিক শর্ত চাপাতে চাচ্ছিলেন। তা হলঃ কংগ্রেস যেভাবে স্বরাজ-স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাখ্যা দিচ্ছে, কোন রকম নিশ্চয়তা

৪১। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৭২।

www.icsbook.info

দানের আগে মুসলমানদেরকে সেটাই লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। এতে মিঃ জিন্নাহ যে জওয়াব দিয়েছিলেন তা-ই ছিল সঠিক। তিনি বলেছিলেন, "রাউন্ডটেবিলে অপরাপর যে হিন্দু প্রতিনিধিরা এসেছেন, তাঁদের উপর এই শর্ত না চাপিয়ে কেন শুধু মুসলমানদের উপরেই এটা চাপাতে চান? বিষয়টা আলোচনায় বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল।

আমাদেরকে দলে ভেড়াবার গুরুত্ব মহাত্মা বুঝতে পেরেছিলেন, কে জানে? হয়তো তিনি আমাদের মতামত গ্রহণযোগ্য বলেই বুঝতে পারতেন, কিন্তু পন্ডিত মালব্য ও হিন্দু মহাসভাপন্থীরা তাঁর উপর দারুণ চাপের সৃষ্টি করেছিল।"[৪২]

এই শেষ কথাটির প্রতিধ্বনি করেছেন লর্ড জেটল্যান্ডও। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে অন্যতম ইংরেজ সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, "সম্ভবতঃ তিনি (গান্ধী) --- তাদের (মুসলমানদের) সঙ্গে সুযোগ সুবিধার খাতিরে একমত হতেন। কিন্তু তাঁর পাশেই ছিলেন হিন্দু মহাসভার অনমনীয় নেতা পন্ডিত দমন মোহন মালব্য। দুর্বলতার কোন চিহ্ন দেখলেই তিনি তাঁকে সতর্ক করে দিতেন। বর্ণ হিন্দুদের পুরাতন ঐতিহ্য সংরক্ষক এই উগ্র নেতার উপস্থিতিতে গান্ধী কর্তৃক মুসলমানদের মত গ্রহণের কোন সম্ভাবনা ছিলনা।"[৪৩]

গান্ধীর উপর হিন্দু মহাসভার প্রভাব ছিল। কারণ চিন্তার দিক দিয়ে হিন্দু মহাসভার সাথে তাঁর কোন পার্থক্য ছিলনা। গান্ধী বাইরে যে উদারতার ভান করতেন সেটা সংখ্যালঘুদের ঠকাবার জন্যেই। তিনি হরিজন দরদী সেজে এবং এক অনশন করে অচ্ছুত হরিজনদের নেতা ডঃ অম্বেদকরকে 'পুনা প্যাক্ট' এ রাজি করিয়ে ভারতের কোটি কোটি হরিজন-অচ্ছুতদের ভবিষ্যত চিরতরে মুছে দিয়েছেন। সেটাই তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু পারেননি। চেষ্টার কিন্তু কোন ত্রুটি ছিলনা। একারণেই কোন যুক্তির ধার তিনি ধারেননি, একগুয়েমী তিনি ছাড়েননি।

ভারতীয়দের প্রধান দু'টি পক্ষ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আপোষ রফা সম্ভব হলোনা। তখন ভারতে অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ দল সমূহের (যেমন অস্পৃশ্য বা হরিজন, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান, ভারতীয় খৃষ্টানদের একাংশ, ইউরোপীয় বনিক সমিতি) প্রতিনিধিগণ ও মুসলমান প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে একটা ঐকমত্যে পৌঁছল। এরা স্বতন্ত্র নির্বাচন সমর্থন করল এবং দাবী করল যে, তারা বৃটিশ ভারতের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৬ ভাগ। লন্ডনে সংখ্যালঘু কমিটির দশম অধিবেশনে আগা খান সংখ্যালঘুদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব পেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ গান্ধী এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করলেন এবং দাবী করলেন যে,

---

৪২। 'Memories' আগা খান, পৃষ্ঠা ২২৭-২৩১। (উদ্ধৃত: 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৭২, ২৭৩)।

৪৩। 'ইষ্ট এশিয়া এসোসিয়েশন', এর সভায় লর্ড জেটল্যান্ড -এর বক্তৃতা। (The Asiatic Review, London).Vol-xxviii, 1932. ৩৭৪ পৃষ্ঠা, উদ্ধৃত Muslim Separatism, by এ. হামিদ. পৃষ্ঠা ২২১)

www.icsbook.info

কংগ্রেস গোটা ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার ৮৫ বা ৯৫ ভাগের প্রতিনিধি।[৪৪]
কোন ভাল ফল ছাড়াই নিছক আলাপ আলোচনা ও তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শেষ হয়ে গেল ১৯৩১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে। এ গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার পর গান্ধী নতুন একটা প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি তার এ প্রস্তাবে বললেন যে, হিন্দু মুসলিম সমঝোতার প্রশ্নটি এখন মুলতুবি রাখা হোক এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক।[৪৫] হিন্দু সদস্যদের মধ্যে অনেকেই এই মত পোষণ করছিলেন। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, প্রভৃতি হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবীই ছিল যে, 'ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান করা যাবে।'[৪৬] মিঃ জিন্নাহ গান্ধীর এ প্রস্তাবের জবাবে বললেন, " এ সম্পর্কে (হিন্দু মুসলিম সমঝোতার প্রশ্ন) কিছু কথা উঠেছে, তা আমি ভাল করেই জানি। বলা হচ্ছে, এ সমস্যার দিকে মন দিয়ে কাজ নেই, চলুন আমরা অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি। কিন্তু আমি বৃটিশ প্রতিনিধিদের যা বলেছি, এখানে বাবুদেরকেও তাই বলছিঃ ভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধি তথা মুসলমানদের মনে সত্যি সত্যি বিশেষ ক্ষোভ রয়ে গেছে। অন্য সব কিছুই যখন আপনারা পুরোপুরিভাবে সমাধান করতে চান এবং প্রস্তুতিও এখন সম্পূর্ণ হয়ে আছে, তখন সাম্প্রদায়িক সমস্যারও সমাধান হওয়া প্রয়োজন। এটা এমন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে যে, আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার আগেই এর সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের সামনে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে জরুরী সিদ্ধান্ত। এই পন্থাটা আমরা বেছে নিয়েছি এই কারণে যে, এই পন্থাটা বেছে নিতে আমাদের বাধ্য করা হয়েছে।"[৪৭] কায়েদে আযমের এ কথা ছিল মুসলিম জনমতের প্রতিধ্বনি। মুসলমানদের দাবী ছিল, আগে হিন্দু মুসলিম সমস্যার সমাধান করতে হবে। কারণ পরে হিন্দু মুসলিম সমস্যার কথা বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে তলিয়ে যাবে। চিরাচরিত ভাবে তখন বলা হবে, হিন্দু মুসলিম সমস্যা একটা সমস্যাই নয় বরং এই অজুহাতে ওটা চাপা দেওয়া হবে। উপরন্তু প্রতিনিধিত্বশীল পদ্ধতির সরকারের কাছে সংখ্যাই হলো প্রধান কথা এবং এদিক দিয়ে মুসলমানরা দূর্বল।[৪৮]
গোলটেবিলে চাপ দিয়ে কিছু আদায় করতে গান্ধী যখন ব্যর্থ হলেন, তখন আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি ফিরে গেলেন আবার। ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী গান্ধী ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের গ্রেফতার করা হলো। তাদের গ্রেফতারের পর ধীরে ধীরে আন্দোলন আর থাকলো না। 'প্রথম চার মাস আন্দোলন খুব জোরে চলেছিল, তারপর এপ্রিল মাসে আন্দোলনে ভাটা পড়ে।'[৪৯]

৪৪। Indian Round Table Conference Second Session Proceedings, Appendi iii, ৫৫০-৫৫৫, ৫৩৭, ৫৯৩ পৃষ্ঠা। (উদ্ধৃত : 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৮০
৪৫। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৭৮।
৪৬। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৭৯।
৪৭। 'Speeches and Statements of Quid-I-Azam', রফিক আফজাল, পৃষ্ঠা ৪০৮।
৪৮। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৭৯।
৪৯। 'Mahatma Gandhi', by B. R. Nanda, Page 180.

www.icsbook.info

এইভাবে আন্দোলন দিয়ে বৃটিশকে বাধ্য করে এক তরফা স্বার্থ-সিদ্ধির পথ গান্ধীর আরেকবার ব্যর্থ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের শেষে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড এক ঘোষণায় বলেছিলেন, "যেহেতু ভারতীয় প্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্যে একমত হতে পারেননি, সেহেতু বৃটিশ সরকার যথাসম্ভব ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রয়োজনীয় রক্ষা কবচসহ সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"[৫০] এই ঘোষণা অনুযায়ীই ১৯৩২ সালের ১৬ই আগষ্ট বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে একটা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করা হলো। এই রোয়েদাদে পৃথক নির্বাচন মেনে নেয়া হলো এবং মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে কিছু সংশোধনীসহ 'ওয়েটেজ'[৫১] নীতি গ্রহণ করা হলো। অনুরূপভাবে বাংলা ও আসামে ইউরোপীয়দের এবং পাঞ্জাবে শিখদের 'ওয়েটেজ' দেয়া হলো। সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে আলাদা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে গভর্ণর শাসিত প্রদেশে পরিণত করা হলো। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে অচ্ছুত বা হরিজনদেরকে হিন্দুদের থেকে আলাদা সংখ্যালঘু বিবেচনা করে আলাদা আসন দেয়া হলো। সর্বশেষ এই বিধানটি অবশ্য টেকেনি। অচ্ছুতদেরকে হিন্দুদের সাথে রাখার জন্যে গান্ধী আমরণ অনশন শুরু করলে অচ্ছুত নেতা ডঃ অম্বেদকর হিন্দু নেতাদের চাপে গান্ধীর প্রাণ বাঁচাবার স্বার্থে গান্ধীর দাবী মেনে নেন এবং এই ভাবে অচ্ছুতরা আলাদা জাতি সত্তার সুযোগ হারায়। এই সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে পৃথক নির্বাচনসহ মুসলমানদের কিছু দাবী মানা হলেও আসন সংখ্যার দিক দিয়ে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৫৪.৮% ভাগ। সেই অনুসারে তাদের আসন পাবার কথা ছিল ১৩৫টি, কিন্তু পেল ১১৯টি। অনুরূপভাবে পাঞ্জাবে মুসলিম জনসংখ্যা শতকরা ৫৬ জন। অথচ পেল ১৭৫টি আসনের মাত্র ৮৫টি, অর্ধেকেরও কম। বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানো তাদেরকে আহত করে। আল্লামা ইকবাল বললেন, "অপরাপর সম্প্রদায়ের চাইতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষোভ অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত। বৃটিশ বিবেক কিভাবে এ বে-ইনসাফী করে যাচ্ছে, সত্যি আমি বুঝতে পারছিনা।"[৫২] কিন্তু সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পৃথক নির্বাচনের বিধান কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাকেই আঘাত করেছিল বেশী, তা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিক্রিয়া তাদের তরফ থেকে এল না। এই অবস্থা দেখে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদের অনুসারী একজন লেখক মন্তব্য করেছেন "মুসলিম লীগ সংগঠনের পক্ষ থেকে এইরূপ বাটোয়ারা প্রস্তাবে আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু অপরাপর জাতীয়তাবাদী মুসলিম

৫০। 'কায়েদে আযম' আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৮০।
৫১। 'ওয়েটেজ' নীতি হলোঃ সংখ্যালঘুদেরকে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশী আসন সুবিধা দেয়া।
৫২। ইকবালের বিবৃতি ঃ ২৪শে আগস্ট, ১৯৩২ Pakistan Movement: Historic Documents, Page 100-1003

www.icsbook.info

সংগঠনসমূহকে সঙ্গে লইয়া ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা কংগ্রেসেরই কর্তব্য ছিল, কিন্তু সেইরূপ সক্রিয় ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। ------ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের উক্তি হইতে ইহা পরিস্কার বুঝা যায় যে, জাতীয়তাবাদী মনোভাবের অন্তরালে হিন্দু সংহতি রক্ষার চিন্তাও কিছু কিছু কংগ্রেসী নেতার মনে উদিত হয়। নতুবা ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সাম্প্রদায়িক বাটেয়ারাকে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার বাস্তাব চিত্র উল্লেখ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই হিন্দু সংহতি নষ্টের বিষয় উল্লেখ করিতেন না।"[৫৩]

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আন্দোলনের ইচ্ছা ছিল না তা নয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা খোদ হিন্দুদের ঘরেই আগুন দিয়েছিল। অচ্ছুত বা হরিজনরা যদি হিন্দু জাতিদেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে হিন্দু জাতি শুধু দুর্বল নয়, তারা ভারতে সংখ্যালঘুও হয়ে যাবে। এটা ছিল কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার জন্যে মহা সংকট। এই মহা সংকটের দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। তাই এই মহা সংকট উত্তরনের জন্যে গান্ধী সামগ্রিকভাবে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে নয়, শুধু অচ্ছুতদের পৃথক নির্বাচন ও আলাদা আসন বাতিলের জন্যেই আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। গান্ধী ও কংগ্রেসের এই মনোভাব থেকে এ কথা পরিস্কার হয়ে যায় যে, হিন্দু জাতির স্বার্থ রক্ষাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দু জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্যে তারা যেমন মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন সহ মুসলমানদের পৃথক জাতিসত্তা অস্বীকার করে, তেমনি হিন্দু জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে তারা আবার এসব কথা ভুলেও যেতে পারে।' সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের সময় এটাই ঘটেছিল। '৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় এরই পুনরাবৃত্তি আমরা দেখব। বস্তুত কংগ্রেস ও হিন্দুরা মুসলমানদেরকে কোন ছাড় দিয়ে হিন্দু স্বার্থ ও হিন্দু জাতিসত্তার স্থায়ী ক্ষতি করার চাইতে মুসলমানদের দূরে ঠেলে দিতে সব সময়ই রাজী হয়েছে। এর পেছনে দর্শন বোধ হয় এটাই যে, হিন্দু জাতি ঠিক থাকলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের এক সময় না এক সময় গ্রাস করা যাবেই। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় পর্যায়ে কোন আন্দোলন না হলেও মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলায় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা ফুঁসে উঠেছিল। এর কারণ বোধ হয় এটাই যে, হিন্দুরা বাংলাদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের শাসনে আসার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে হিন্দুদের এ অবস্থা ছিল না। অচ্ছুতদের সাথে নিয়ে হিন্দুরা সেখানে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলায় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অর্থাৎ মুসলমানদের গরিষ্ঠতা লাভের বিরুদ্ধে শুধু হিন্দু রাজনীতিকরা নন, অরাজনৈতিক হিন্দু ব্যক্তিত্বও মাঠে নামলেন। এ সম্পর্কে মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দীন তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন, "এ আন্দোলনে শুধু হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক

৫৩। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকদা ও মুসলমান', ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ১৬৩।

www.icsbook.info

নেতারাই অংশ গ্রহণ করলেন তা নয়, কংগ্রেসী নেতারাও এ ব্যাপারে কম গেলেন না। এমন কি, ব্রাহ্ম (মতাবলম্বী) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পর্যন্ত এ সময়ে হিন্দু মহাসভার খাতায় নাম লিখিয়ে হিন্দু মহাসভার সভাপতি বনে যেতে দেখা গেল। শুধু কি তাই? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মহাসভা কর্তৃক আহুত কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত রোয়েদাদ বিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করলেন এবং গুরু-গম্ভীর ভাবে রোয়েদাদে বৃটিশ সরকার কর্তৃক মুসলিম লীগের দাবীর স্বীকৃতির তীব্র নিন্দা করলেন। আর মুসলমানদেরকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করতেও ভুললেন না।"[৫৪] বাংলায় হিন্দুদের এ আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান ব্যবধানকে আরও বাড়িয়ে তুলল এবং মুসলমানদের কাছে কংগ্রেস মুলত এক ভীষণ প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াল। মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, "শুধু কিছু সংখ্যক শো বয় ছাড়া আর সব মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও কর্মী পুরুষ কংগ্রেসের বাইরে এলেন এবং সদলবলে মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। জীবন্মৃত প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ নবজীবনে উজ্জীবিত হয়ে উঠল।"[৫৫]

বিস্ময়ের ব্যাপার, রবীন্দ্রনাথ মুসলিম বিরোধী হিন্দু স্বার্থের পক্ষের কোন আন্দোলন থেকেই কখনও পিছিয়ে থাকেননি। ১৯৮৬ সালের শিবাজী উৎসবে তিনি হাজির ছিলেন, কবিতা লিখেছেন। বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনেও তিনি প্রথম কাতারের একজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, সেখানেও তিনি হাজির, সভাপতিত্ব করেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথেও তাকে দেখা গেল একাত্ম। এসব থেকে প্রমাণ হয় হিন্দু মহাসভার জাতি চিন্তা এবং রবীন্দ্রনাথের জাতি চিন্তার মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিল না। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের ভাষায়, "স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীও এ প্রকার উক্তি করতে দ্বিধা করেননি যে, মুসলমানরা ধর্মে ইসলামানুসারী হলেও জাতিতে তারা হিন্দু। কাজেই তারা 'হিন্দু মুসলমান।' বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে এই 'হিন্দু মুসলমান' সৃষ্টির চেষ্টাই অব্যাহত গতিতে শুরু হয়েছিল (কলকাতা) বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে।"[৫৬] এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেই ছিল সোহরাওয়ার্দীর সংগ্রাম, এ.কে. ফজলুল হকের সংগ্রাম, মুসলিম লীগের সংগ্রাম, জিন্নার সংগ্রাম। সুতরাং এ সংগ্রামকে তো রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক বলতেই পারেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের চোখে মুসলমানরা তো কোন জাতি নয়।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক শুরু হলো ১৯৩২ সালের ১৭ই নভেম্বর। এই বৈঠক চলেছিল মোট আটত্রিশ দিন। এ বৈঠকে জিন্নাহকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কংগ্রেসও এ বৈঠকে আসেনি। সরকারীভাবে এ বৈঠককে গোলটেবিল না

৫৪। 'অতীত দিনের স্মৃতি', আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পৃষ্ঠা ১৪৩।
৫৫। 'অতীত দিনের স্মৃতি', আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পৃষ্ঠা ১৪৩।
৫৬। 'অতীত দিনের স্মৃতি', আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পৃষ্ঠা ১৫০।

www.icsbook.info

বলে বলা হয়েছে 'জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি'র বৈঠক। এই বৈঠকে স্বতন্ত্র সিন্ধু প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং তৎকালীন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল ঘোষণা করেন যে, ভারতের প্রস্তাবিত আইন সভায় মুসলিমদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে।[৫৭]

তিনটি গোলটেবিল আলোচনার ফল হিসেবে বৃটিশ সরকার ১৯৩৩ সালের ১৫ই মার্চ ভারতের শাসনতন্ত্রের উপর একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করলেন। শ্বেতপত্রে ভারতে একটি ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার কথা বলা হলো। যাতে দুই কক্ষ বিশিষ্ট ফেডারেল আইন সভায় থাকবে রাজ্য সভা (উচ্চতর সভা) ও আইন সভা (নিম্নতর সভা)। রাজ্য সভার মেয়াদ হবে ৭ বছর এবং আইন সভার ৫ বছর। রাজ্য সভার ২৬০ জন সদস্যের ১৫০ জন বৃটিশ ভারত থেকে, ১০০ জন দেশীয় রাজ্য থেকে এবং অবশিষ্ট ১০ জন থাকবে মনোনয়ন থেকে। বৃটিশ ভারতের ১৫০ জন সদস্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুসারে মুসলমানরা পাবে এই সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ আসন। আইন সভার ৩৭৫ সদস্যের ২৫০ জন বৃটিশ ভারতের এবং ১২৫ জন আসবেন দেশীয় রাজ্যের শাসক হিসেবে। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুসারে ২৫০ জনের ১০৫ জন পাবে সাধারণ হিন্দু, মুসলমান ৮২, অচ্ছুত (হিন্দু) শ্রেনী ১৯, শিখ ৬, ভারতীয় খৃষ্টান ৮, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ৪, ইউরোপীয় ৮, নারী ৯, শিল্প ও বাণিজ্য ১৪, ভূস্বামী ৭ এবং শ্রমিক ১০। কিছু আপত্তি থাকা সত্বেও মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ এবং শ্বেতপত্র দুটোকেই গ্রহণ করল। লীগ বলল, "যদিও এ সিদ্ধান্ত মুসলিম দাবীর তুলনায় অপ্রতুল, তবুও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে মুসলমানরা এটা মেনে নিচ্ছে। তবে তাদের সমুদয় দাবী মেনে নেওয়ার জন্য চাপ তারা দিয়ে যাবেই।"[৫৮] কংগ্রেস শ্বেতপত্র প্রত্যাখ্যান করল, এর দ্বারা কার্যত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদকেও প্রত্যাখান করল। কিন্তু তা সত্বেও কংগ্রেস এ রোয়েদাদ অনুসারে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো তাতে অংশগ্রহণ করল।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ১৯৩৪ সালের অক্টোবর নভেম্বরে। নির্বাচনে কংগ্রেস মোট আসন পেল ৫৫টি, সরকার পক্ষ ৫০টি এবং জিন্নার নেতৃত্বে এল ২২টি আসন। এমতাবস্থায় জিন্নার নেতৃত্বাধীন ২২টি ভোট যে দিকে যাবে তারাই জয়ী হবে। পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বসল ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৩৩ সালের শ্বেতপত্রের ভিত্তিতে প্রণীত একটি রিপোর্ট জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি বৃটিশ পার্লামেন্টে পেশ করে। সেই রিপোর্টটিই বিবেচনার জন্যে এল এই ভারতীয় পার্লামেন্টে। ফেব্রুয়ারী অধিবেশনেই তা পেশ করা হলো। রিপোর্টের বিবেচ্য বিষয় ছিল তিনটি, (১) দেশীয় রাজ্যসমূহসহ সর্ব ভারতীয় ফেডারেশন

৫৭। 'ইতিহাস-অভিধান' (ভারত), যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩২।
৫৮। 'Towards Pakistan', Dr. Waniduzzaman, Page 70.

www.icsbook.info

গঠন, (২) প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন কিছু শর্তসহ এবং (৩) সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ। এ তিনটি বিষয় নিয়ে বাকযুদ্ধ শুরু হলো পার্লামেন্টে।

রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করে কংগ্রেসের নেতা যে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন তা এইঃ "সমগ্র রিপোর্ট অগ্রাহ্য করা হোক, তবে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কে তার দল নিরপেক্ষ থাকবে অর্থাৎ কোন মত প্রকাশ করবে না।"[৫৯] এরপর জিন্নাহ তিনদফা সম্বলিত একটি প্রস্তাব পার্লামেন্টে উত্থাপন করলেন। প্রস্তাবটি এইঃ

(১) সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ মাফিক ব্যবস্থা ততদিন বলবত থাকবে যতদিন সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহ সর্বস্বীকৃত কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করতে না পারছে।

(২) প্রাদেশিক সরকার সম্পর্কীয় ব্যবস্থা অসন্তোষকর ও নৈরাজ্যজনক। এতে বহু আপত্তিকর বিষয় আছে, যথা, দ্বিতীয় পরিষদ গঠন, গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা দান, পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ সম্পর্কে বিশেষ নিয়ম, যার দ্বারা প্রশাসক এবং আইন সভার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অকার্যকরী করা হয়েছে। সুতরাং এই সকল আপত্তিকর বিষয়গুলি বাদ না দেয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ভারতের কোন দলের সন্তুষ্টি সাধন করবে না।

(৩) 'নিখিল ভারত ফেডারেশন', নামে কথিত কেন্দ্রীয় সরকার সংক্রান্ত পরিকল্পনা সম্বন্ধে পরিষদের মত এই যে, "এটা মূলত মন্দ, বৃটিশ ইন্ডিয়ার জনগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য এবং সেই কারণে ভারত সরকারের নিকট সোপারেশ করা হচ্ছে যে, তারা বৃটিশ সরকারকে এই অংশ সম্পর্কে বিধান তৈরী না করতে অনুরোধ করুন, এবং কেবল বৃটিশ ভারতে প্রকৃত ও সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা অবিলম্বে করুন এবং তজ্জন্য সমস্ত পরিস্থিতি ও পরিকল্পনা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে ভারতীয় মতের (নেতৃবৃন্দের) সাথে পরামর্শ করুণ"[৬০] মিঃ জিন্নার প্রস্তাব পেশ শেষ হবার পর কংগ্রেস দলের নেতা ভুলা ভাই দেশাই জিন্নার প্রথম দফা প্রস্তাবের উপর একটা সংশোধনী পেশ করলেন। যাতে বলা হলো, 'এই পরিষদ বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাতিল বা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।' ভুলা ভাই এর এ সংশোধনী সঙ্গে সঙ্গে ৪৪-৪৮ ভোটে বাতিল হলো।

প্রস্তাবের উপর অতপর আলোচনা শুরু হলো। সরকার পক্ষ ও কংগ্রেস বক্তৃতা করল। কংগ্রেসের দলনেতা ভুলা ভাই দেশাই জিন্নাহকে তীব্র আক্রমণ করে বললেন, "রাজনীতির সাথে ধর্ম ও জাতির প্রশ্ন জড়িত করা উচিত নয়।"

ভুলাভাই দেশাই এবং সরকার পক্ষের বক্তব্যের জবাব দিতে উঠে জিন্নাহ বললেন, "বিরোধী দলের নেতার প্রতিটি কথার সাথে আমি একমত। ধর্ম বা জাতির প্রশ্ন রাজনীতির মধ্যে আনা উচিত নয়, তার এই মন্তব্যের সাথেও আমি একমত।

৫৯। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩০০।

৬০। 'কায়েদে আযাম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩০০, ৩০১।

www.icsbook.info

ভাষার প্রশ্নটিও এমন কিছু নয়। এক একটা করে বিবেচনা করলে আমি তার সঙ্গে একমত। ধর্ম হচ্ছে মানুষ আর তার আল্লাহর মধ্যের ব্যাপার। তার এই কথাতেও আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু তাকে একটি বিষয় বিবেচনা করতে বলি - এটা কি একমাত্র ধর্মের সমস্যা? এটা কি শুধু ভাষার সমস্যা? নয়, স্যার, এটা হচ্ছে সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন এবং এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা। (কয়েকজন মুসলমান সদস্য-সভ্যতা ও তমদ্দুনেরও প্রশ্ন) অন্যান্য দেশে কি সংখ্যালঘু সমস্যা নেই? সেই সব দেশে তারা এই সব সমস্যার মোকাবিলা ও সমাধান করেন এবং এই সমস্যা (আমাদেরও) মোকাবিলা ও সমাধান করতে হবে। এখন সংখ্যালঘু বলতে কি বুঝায়? সংখ্যালঘু হচ্ছে কতকগুলি বিষয়ের একত্র সমাবেশের ফল। হতে পারে যে, সংখ্যালঘুদের ধর্ম অন্যদের থেকে পৃথক, তাদের জাতি হয়তো পৃথক, তাদের ভাষা হয়তো পৃথক, তাদের তমুদ্দিন হয়তো পৃথক। এই সবগুলোর -ধর্ম, তমদ্দুন, জাতি, ভাষা, কথা, সঙ্গীত ইত্যাদির - সমন্বয়ে রাষ্ট্র সংখ্যালঘুদের একটা স্বতন্ত্র সত্তা দিয়ে থাকে এবং সেই স্বাতন্ত্র সত্তা রক্ষাকবছ চায় সত্তা হিসেবে। নিশ্চয়ই এই সমস্যাকে আমাদের রাজনৈতিক সমস্যা রূপে মোকাবিলা করতে হবে। এড়িয়ে না গিয়ে অবশ্যই এর সমাধান করতে হবে।"[৬১]

এরপর জিন্নাহ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কিত হিন্দু সদস্যদের আপত্তির জবাব দিতে গিয়ে বললেন, "আমাদের হিন্দু বন্ধুরা হয়তো সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সন্তুষ্ট নন। আমি এই পরিষদকে বলছি যে, আমার মুসলিম বন্ধুরাও এতে সন্তুষ্ট নন। কারণ, এতে তাদের সব দাবী স্বীকার করা হয়নি। আমার নিজের তরফ থেকে বলছি, আমিও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সন্তুষ্ট নই, আর ব্যক্তিগতভাবে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের (সর্বদলীয়) নিজস্ব পরিকল্পনা প্রকাশ না করতে পারছি, ততক্ষণ আমার আত্মসম্মান বজায় থাকবে না। কিন্তু আমি পরিষদকে বলতে চাই, আমি এটা গ্রহণ করেছি। কারণ, একটা সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি, তবুও আমরা সমঝোতায় উপনীত হতে পারিনি। এই কারণে আমাদের পছন্দ হোক বা না হোক আমি এটা গ্রহণ করেছি। কারণ যদি তা গ্রহণ না করি তাহলে কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা তৈরীর সম্ভাবনা থাকে না।"[৬২]

মিঃ জিন্নাহ তার দীর্ঘ ভাষণে ফেডারেল পরিকল্পনা এবং প্রাদেশিক সরকার পরিকল্পনা বিষয়ে তার মতামত ব্যক্ত করলেন।

বির্তক শেষে সংশোধনী প্রস্তাবগুলো ভোটে দেয়া হলো। ভোটে জিন্নাহ উত্থাপিত তিনটি প্রস্তাবই পাশ হলো। এটা জিন্নাহ অর্থাৎ মুসলমানদের একটা বড় পার্লামেন্টারী বিজয়। এই বিজয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ও,এম, নাম্বিয়ার

৬১। 'Speeches and Writings of Mr. Jinnah' 1. Shah Muhammad Ashraf, Lahore.
৬২। 'Speeches and Writings of Mr. Jinnah'. 1. Shah Muhammad Ashraf, Lahore.

www.icsbook.info

তার 'From India's Press Gallery'তে লিখেছেন, "মিঃ জিন্নাহ কংগ্রেস দলকে উত্তমরূপে বুঝিয়ে দিলেন যে, কংগ্রেসের উপর ভারতীয় মুসলমানদের আস্থা নেই এবং আইন পরিষদে বা বাইরে কোথাও ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থের প্রতিকূল যে কোন পরিকল্পনা তারা সমর্থন জানাতে অস্বীকার করবে।"[৬৩]
এখানে বলা প্রয়োজন যে, পার্লামেন্টে এই বিতর্ক অনুষ্ঠানের আগে হিন্দু মুসলিম সমঝোতার জন্যে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ গভীর আগ্রহ নিয়ে মিঃ জিন্নার সাথে কয়েকবার বৈঠকে বসবেন। কিন্তু পাঞ্জাব ও বাংলার কায়েমী স্বার্থবাদী হিন্দু ও শিখদের অসম্ভব দাবী ও মনোভাবের কারণে আপোশ আলোচনা ব্যর্থ হয়।[৬৪] উল্লেখ্য, এ ধরনের উদ্যোগ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বহুদিন পর নেয়া হয়। এ সম্পর্কে 'Advance' পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, "কংগ্রেসের পক্ষে এতো মাস চুপ করে থাকা ঠিক হয়নি, বিশেষত যখন তারা (কংগ্রেস) সাম্প্রদায়িক সমঝোতায় সামগ্রিক চেষ্টা করা হবে বলে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল।"[৬৫] কংগ্রেস এভাবে চুপ করেছিল কারণ, তাদের আশা ছিল বৃটিশকে ভয় দেখিয়ে এবং সংখ্যাধিক্যের জোরে তারা সংখ্যালঘুদের হাতের মুঠোয় আনতে পারবে।
'ভারত শাসন আইন' বা বহু আকাঙ্খিত 'শাসনতন্ত্র' বিধিবদ্ধ হলো ১৯৩৫ সালের আগষ্ট মাসে। ১৯৩০ সালে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর তিন তিনটি গোলটেবিল বৈঠক এবং অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর অবশেষে এই আইন বিধিবদ্ধ হলো। এই ভারত শাসন আইনের প্রধান দিক দুটি ঃ একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, অন্যটি প্রাদেশিক। ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহসহ একটি ভারতীয় ফেডারেশন গঠনের ব্যবস্থা হলো। ফেডারেশনের কেন্দ্রে ভাইসরয়ের নেতৃত্বে একটা 'কাউন্সিল অব মিনিস্টারস' থাকবে। কেবল পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে মন্ত্রীসভা আইন সভার কাছে দায়ী থাকবে। দ্বিতীয়ত ভারতের এগারটি প্রদেশে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নিকট পূর্ণ দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা থাকবে। প্রধান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মতামতকে সামনে রেখে অধিকাংশ সদস্যের নেতাকে মন্ত্রীসভা গঠনের জন্যে আহবান জানানো গভর্ণরের কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। রেসিডিউয়ারী ক্ষমতা ইচ্ছামত বরাদ্দ করার ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলকে দেয়া হলো। ভারত শাসন আইনে মুসলমানদের যে সব দাবী স্বীকৃত হয়েছিল তার মধ্যে রয়েছে, সিন্ধুর স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হওয়া, শর্তযুক্ত হলেও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ, কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল পার্লামেন্টে এক তৃতীয়াংশ আসলন লাভ, স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা বজায় থাকা, ইত্যাদি। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঠিক রাখা হলো, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশ বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রতি সুবিচার করা হলো না। এ দু'টি প্রদেশে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা বিনষ্ট করা হলো।

৬৩। 'Muhammad Ali Jinnah', এম.এইচ. সাঈদ, Page 23.
৬৪। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩০৪।
৬৫। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩০৪।

www.icsbook.info

পাঞ্জাবে মুসলমানদের আসন পাওয়ার কথা শতকরা ৫৬ ভাগ, পেল ৪৯ ভাগ এবং বাংলায় পাওয়ার কথা ৫৪ ভাগ আসন, পেল ৪৭ ভাগ।

কংগ্রেস নেতা জওহার লাল নেহেরু এই ভারত শাসন আইনকে 'ক্রীতদাসের সংবিধান' বলে অভিহিত করলেন।[৬৬] তিনি ১৯৩৬ সালে লাক্ষৌতে কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা করলেন যে, 'এ আইনের বলে ভারতের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, কিন্তু ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। তাই এটা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।[৬৭] কিন্তু কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা এসব কথা বললেও ক্ষমতা লোভী কংগ্রেস সদস্যগণ ১৯৩৫ সালের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ গ্রহনের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন।[৬৮] তাই কংগ্রেস তার ফয়েজপুর অধিবেশনে প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ গ্রহনের সিদ্ধান্ত নিল। তবে বলল যে, যে সব প্রদেশে গভর্ণর তার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার না করার প্রতিশ্রুতি দেবেন, ঐসব প্রদেশেই শুধু কংগ্রেস সরকার গঠন করবে।[৬৯] কংগ্রেস ফেডারেল পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করল।

'ভারত শাসন আইন' সম্পর্কে মুসলিম লীগের আনুষ্ঠানিক মতামত প্রকাশ পেল ১৯৩৬ সালের ১১ ও ১২ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সাধারণ অধিবেশনে। স্যার সৈয়দ ওয়াজীর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে কায়েদে আযম এ সম্পর্কিত যে প্রস্তাব আনলেন, তা এই ঃ

"বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বারংবার অসন্তোষ ও অস্বীকৃতি ঘোষণা করার পরও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের আদলে গঠিত যে শাসনতন্ত্র 'ভারতবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।---লীগ মনে করে যে, প্রাদেশিক পরিকল্পনায় বহু আপত্তিকর বিষয় রয়েছে যার ফলে সরকারের সামগ্রিক শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রীসভা ও আইন পরিষদের প্রকৃত ক্ষমতা নস্যাত করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রাদেশিক পরিকল্পনা কাজে লাগানো উচিত। ----লীগের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্তর্ভুক্ত নিখিল ভারত ফেডারেল পরিকল্পনা মূলত খারাপ। এটা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল। পশ্চাদমুখী ও ক্ষতিকর এবং বৃটিশ ভারত বনাম ভারতীয় দেশীয় রাজ্য সমূহের প্রেক্ষিতে বৃটিশ ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর এবং ভারতের বহু আকাঙ্খিত পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা ও বিলম্ব সৃষ্টি করবে। সেই কারণে এটা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণের অযোগ্য।"[৭০] এখানে লক্ষণীয়

৬৬। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১২০।

৬৭। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৮২।

৬৮। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১২০।

৬৯। "গভর্নর জরুরী আইন দ্বারা মন্ত্রী সভা ভাঙিয়া দিতে পারিতেন এবং সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন"- এই সকল বিষয়ের প্রতি মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে পূর্বেই আপত্তি করা হইয়াছিল, কিন্তু তখন কংগ্রেস তাহার সহিত সহযোগিতা করে. নাই। বরং না গ্রহণ না বর্জন নীতির অন্তরালে পরোক্ষভাবে (কংগ্রেস) শর্তসমূহ মানিয়া লইয়াছিল।" (উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মুসলমান', ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ১৭৬, ১৭৭)।

৭০। 'Pakistan Movements: Historic Document', by G. Allana. Page 123, 124.

www.icsbook.info

বিষয় হলো, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের তীব্র সমালোচনা করেছে। কিন্তু অবস্থাগত কারণে উভয় পক্ষই প্রাদেশিক পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছে, আর প্রত্যাখ্যান করেছে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে। অথচ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারতো, তাহলে এমনভাবে বৃটিশ পরিকল্পনা তাদের গলধকরণ করতে হতো না। বরং তারা উভয়পক্ষ মিলে সর্বসম্মতভাবে কোন শাসন পরিকল্পনা পেশ করলে তা বৃটিশরা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। প্রধানত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হবার কারণেই বৃটিশেরা পক্ষ থেকে বিকল্প হিসেবে এই ভারত শাসন আইন এসেছে।
ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে এই আকাঙ্খিত ঐকমত্য কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনের অযৌক্তিক একগুয়েমীর কারণেই হয়নি। ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক পরিকল্পনা মেনে. নেয়ার মাধ্যমে কংগ্রেস কার্যত মুসলমানদের সব দাবীই মেনে নিয়েছে। অথচ কংগ্রেসের এই মেনে নেয়াটা যদি অসময়ে এবং বৃটিশের ডিকটেশনের না হয়ে.মুসলিম লীগের সাথে আপোশে হতো, তাহলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নিজেদের পছন্দমত শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারতো এবং তাদের শর্তে বৃটিশকে রাজী হতে বাধ্য করতে পারতো। কিন্তু কংগ্রেস এ পথ মাড়ায়নি। এর কারণ কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভা মুসলমানদের জাতীয় অস্তিত্ব এবং মুসলমানদের কোন জাতীয় দাবীর প্রতি স্বীকৃতি দিতে চায়নি। ভারত শাসন আইনের প্রাদেশিক পরিকল্পনা তারা যে মেনে নিয়েছিল, সেটা অস্বীকার করার জন্যেই। কংগ্রেস তার ফয়েজপুর অধিবেশনে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে প্রাদেশিক নির্বাচনে অংশ গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ই ঘোষণা করেছিল, '১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে বানচাল করার জন্যে তারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে।'[৭১] অর্থাৎ কংগ্রেস নির্বাচনের সুযোগে ক্ষমতায় গিয়ে ভারত শাসন আইন অর্থাৎ মুসলমানদের অর্জিত সুবিধাগুলো বাতিল করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যেমন করে তারা বাতিল করতে বাধ্য করেছিল মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন, যার মাধ্যমে মুসলমানরা কিছু সুবিধা অর্জন করেছিল। কংগ্রেসের অন্ধ ও বিদ্বেষাত্মক নীতির কারণেই তার সঙ্গে মুসলিম লীগের ঐক্য হতে পারেনি। কংগ্রেসের এই নীতি সম্পর্কে মিঃ জিন্নাহ মুসলিম লীগের উপরোক্ত সম্মেলনে বলেন, "দূর্ভাগ্যবশত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উটপাখির মতো কাজ করছে, তারা বালিতে মাথা গুঁজে মনে করছে অন্য কেউ তাদের দেখতে পাচ্ছে না। কংগ্রেস সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব দাবী করে কিন্তু স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়গুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। কংগ্রেসের ভাব হচ্ছে এইঃ আমাদের সাথে শামিল যদি হতে চাও, আসতে পারো,

৭১। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৮২।

www.icsbook.info

ইচ্ছা হয় তফাৎ থাকো।"[৭২] ইতিহাসকার ওয়ালব্যাংকও জিন্নার কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, "ভারতের ব্যাপারে কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন দলের কথা বলার অধিকার গান্ধী অস্বীকার করেন।"[৭৩]
এতদসত্ত্বেও মিঃ জিন্নাহ মুসলিম লীগের ঐ সম্মেলনেই কাংগ্রেসের প্রতি ঐক্যের আহবান জানিয়েছিলেন। বৃটিশ ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে সামনের দিনগুলোতে আইন পরিষদের ভেতরে ও বাইরে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, "----এ যেন দাবার ছক নিয়ে চারটি দল বসেছে। একটি হচ্ছে, সামগ্রিকভাবে বৃটিশ জনসাধারণ, আর তিনটি হচ্ছে দেশীয় রাজন্যবর্গ, হিন্দু ও মুসলমান। গ্রেট বৃটেনের উদ্দেশ্য হল, তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখা। ---- এর প্রতিকারের একমাত্র পন্থা হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক (বা নিয়মতান্ত্রিক) আন্দোলন। এর অর্থ হচ্ছে, আইন পরিষদগুলোকে এমনভাবে চালাতে হবে যাতে আইন পরিষদের মধ্যে ও বাইরে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে বৃটিশ সরকার তাদের (ভারতীয়দের) ইচ্ছ পুরণে বাধ্য হবে। ----প্রধান সম্প্রদায় দু'টি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে তবে এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।"[৭৪]
জিন্নার এই আহবান কংগ্রেসের অন্ধ মন ও বন্ধ কানে কোনই ক্রিয়া করেনি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনকে সামনের রেখে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল ১৯৩৬ সালেই। কংগ্রেস ১৯৩৬ সালের আগস্ট মাসে তার এক অধিবেশনে ১৯৩৫ সালের সংবিধান (ভারত শাসন আইন) প্রত্যাখ্যান ও জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত সংবিধান রচনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাচনী মেনফেস্টো প্রকাশ করে। অন্যদিকে এ বছরই জুন মাসে মুসলিম লীগ মিঃ জিন্নার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে নির্বাচনী বোর্ড ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সমর্থন করে এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংবিধান প্রত্যাখ্যান করে বিভিন্নমুখী কর্মসূচীসহ নির্বাচনী মেনিফেস্টো প্রণয়ন করে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টো তুলনা করলে দেখা যাবে এক পৃথক নির্বাচন বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই দুই দলের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এই ঐক্যের দিকটিকে সামনে রেখেই কংগ্রেসের সাথে একটা সমঝোতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কায়েদে আযম তার এক ভাষণে বললেন, "কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে আদর্শগত কোন বিরোধ নেই। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা উভয়েরই কাম্য। তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে নাকি তার দেশের জন্যে পূর্ণ স্বাধীনতা চায় না।"[৭৬]

৭২। `Muhammad Ali Jinnah', Sayid, Page 224, 245.
৭৩। `A Short History of India and Pakistan', ট. ওয়াল্টার ওয়ালব্যাংক, পৃষ্ঠা ১৮৬।
৭৪। 'Muhammad Ali Jinnah', by Sayid, Page 224, 245.
৭৫। 'Pakistan in the formative stage', by Khalid bin Sayid.
৭৬। `Muhammad Ali Jinnah', Sayid, Page 224, 245.

www.icsbook.info

কায়েদে আযমের এ কথাগুলোর মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য ও একক উদ্দেশ্যের বিষয়টাই তুলে ধরা হয়েছে। এর দ্বারা তিনি কংগ্রেসকে কাছে টানতে চেয়েছেন, যাতে করে উভয়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নির্বাচনে হিন্দুরা বলা যায় ঐক্যবদ্ধভাবেই কংগ্রেসের পতাকা তলে সমবেত হলো। কিন্তু মুসলমানরা তা পারল না। বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগ ছাড়াও একাধিক মুসলিম দল ও গ্রুপ নির্বাচন করতে এগিয়ে এল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পাঞ্জাবে ফজলে হোসেনের নেতৃত্বে ইউনিয়নিস্ট পার্টি, বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি, সিন্ধুতে আব্দুল্লাহ হারুনের নেতৃত্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি, যুক্ত প্রদেশে নবাব ছত্রীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারিষ্ট পার্টি। আর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তো খান আব্দুল গাফফার খানের মাধ্যমে কংগ্রেসেরই একচ্ছত্র প্রাধান্য চলছিল। এই অবস্থায় মুসলিম লীগ নির্বাচনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে খুবই খারাপ করল। এর ফলে গোটা ভারতের ৪৮৪টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ পেল মাত্র ১০৮টি আসন,[৭৭] অবশিষ্ট মুসলিম আসন চলে গেল আঞ্চলিক মুসলিম দলগুলোর হাতে। তবে কংগ্রেস মুসলিম সিট পাওয়ার ক্ষেত্রে একদম ভূমিশয্যা নিল। আব্দুল গাফফার খানের উপর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উনিশটি আসন বাদ দিলে গোটা ভারতে কংগ্রেস পেল মাত্র ৭টি মুসলিম আসন। অন্যদিকে গোটা ভারতের ৮০৮টি হিন্দু আসনের মধ্যে কংগ্রেস পেল ৭১১টি আসন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ কম সিট পেলেও সর্ব ভারতীয় একক বৃহৎ মুসলিম সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হলো। আর কংগ্রেস মাত্র ৭টি মুসলিম সিট ও ৭১১টি হিন্দু সিট নিয়ে হিন্দু সংগঠনে রূপান্তরিত হলো এবং এর দ্বারা মুসলিম লীগের দাবীই প্রমাণিত হলো যে, কংগ্রেস ভারতীয় হিন্দুদেরই একটি রাজনৈতিক দল।[৭৮]

নির্বাচনের ফল কতকগুলো বাস্তবতা ও সমস্যাকে সামনে নিয়ে এল। প্রমাণ হলো, সর্বভারতীয় মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন মুসলিম লীগ অত্যন্ত দূর্বল। এর কারণও ছিল। সাইমন্ডস-এর ভাষায় '১৯৩৭ সাল তক লীগ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠান, জনগণের সমর্থন আদায়ের জন্য খুব কম চেষ্টাই করা হয়েছিল"[৭৯] মুসলিম লীগের সীমাবদ্ধতার কথা জিন্নাহও এভাবে স্বীকার করেছেনঃ

৭৭। মুসলিম লীগ মাদ্রাজে ২৭টি মুসলিম সিটের মধ্যে ১১টি, বোম্বাইয়ে ২৯টির মধ্যে ২০টি, বাংলায় ১১৯টির মধ্যে ৪০টি (ফজলুল হকে প্রজাপার্টি ৩৮টি), যুক্ত প্রদেশে ৬৪-এর মধ্যে ২৮টি, পাঞ্জাবে ৮৪-এর মধ্যে ২টি, বিহারে ৩৯-এর মধ্যে শূন্য, মধ্য প্রদেশে ১৪-এর মধ্যে শূন্য, সীমান্ত প্রদেশে ৩৬-এর মধ্যে শূন্য, আসামে ৩৪-এর মধ্যে ৯টি, উড়িষ্যায় ৪-এর মধ্যে শূন্য, সিন্ধুতে ৩৫-এর মধ্যে শূন্য আসন লাভ করে।

৭৮। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ১৩০।

৭৯। `Making of Pakistan', আর. সাইমন্ডস, পৃষ্ঠা ৫৩।

www.icsbook.info

"১৯৩৬ সালের জুন মাসে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হয়েছিল এবং অন্যান্য প্রাদেশিক বোর্ডও গঠিত হয়। ---এ কাজে বাধা ছিল অনেক এবং কাজটি কম বৃহৎ নয়। কারণ এর আগে প্রস্তুতি নেয়া হয়নি, অথবা দক্ষ ও উপযুক্ত সংগঠকও ছিল না। ভারতের মুসলমানরা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ ও দূর্বল, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ এবং অর্থনৈতিক দিকে তাদের কোন অবস্থান না থাকায় সমগ্র ভারতব্যাপী নির্বাচন পরিচালনা একটা দুরূহ কাজ ছিল।"[৮০] একদিকে ছিল এই দুর্বলতা, অন্যদিকে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের আপোশহীন আগ্রাসী মনোভাব মুসলমানদের উদ্বিগ্ন করে তুলল। নির্বাচনে হিন্দুদের ঐক্য ও সংখ্যাগুরুত্ব কংগ্রেসকে ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৬টি প্রদেশে সরকার গঠনে অবাধ সুযোগ এনে দিল। অন্যান্য প্রদেশেও লীগের দুর্বলতা ও মুসলমানদের অনৈক্যকে কংগ্রেস তার স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ পেল। এই অবস্থায় কংগ্রেসের সেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ এবং মুসলমানদের সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করা যায় কিভাবে, সে চিন্তা মুসলিম চিন্তাশীলদের ভাবিয়ে তুলেছিল। এই ভাবনার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় নির্বাচনের পরপরই জিন্নার কাছে লিখা আল্লামা ইকবালের কয়েকটি চিঠিতে। তার মধ্যে সংকট থেকে মুসলমানদের স্থায়ী উত্তরণের দিক নির্দেশনাও রয়েছে। কবি ইকবালের তিনটি চিঠি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ

[এক]

[সম্পূর্ণরূপে গোপনীয়, লাহোর ২০শে মার্চ, ১৯৩৭]

প্রিয় মিঃ জিন্নাহ

আমার বিশ্বাস আপনি ভারতীয় জাতীয় সম্মেলনে পন্ডিত জওয়াহের লাল নেহেরুর বক্তৃতা পাঠ করেছেন এবং তার অন্তরালবর্তী মুসলিমের প্রতি যে নীতি অনুসৃত হয়েছে, আশা করি সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকেফহাল আছেন। আমার বিশ্বাস, নূতন সংবিধান যে অন্তত পক্ষে ভারতীয় মুসলমানদেরকে ভারত এবং মুসলিম এশিয়ার রাজনৈতিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মসংগঠনের এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে সে সম্বন্ধেও আপনি পুরোপুরি ওয়াকেফহাল। যদিও আমরা দেশের অন্য যে কোনো প্রগতিশীল পার্টির সঙ্গে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত, তবুও একথা আমাদের ভুলে গেলে কিছুতেই চলবে না যে, নৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে এশিয়াতে ইসলামের ভবিষ্যৎ মূখ্যত ভারতীয় মুসলমানদের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সংগঠনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আমার মতে নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলনের একটা সমুচিত জবাব দান করা উচিত। তার জন্য অবিলম্বে দিল্লীতে সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলন আহ্বান করা আপনার উচিত। তাতে খ্যাতনামা

৮০। 'Speeches & Writings of Mr. Jinnah, Vol-I' পৃষ্ঠা ২৬।

www.icsbook.info

মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের আমন্ত্রন করা হবে। এ সম্মেলনে পুনর্বার আপনাকে জোরের সঙ্গে পরিস্কার ভাষায় আলাদা একটি রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে মুসলমানদের লক্ষ্যের কথা বলতে হবে। ভারত এবং ভারতের বাইরের জগতকে জানানোর প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে, অর্থনৈতিক সমস্যাই ভারতের একমাত্র সমস্যা নয়। মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে, অধিকাংশ মুসলামনের কাছে সাংস্কৃতিক সমস্যা ভারতীয় মুসলমানদের কাছে অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন। কোনো ক্রমেই তা অর্থনৈতিক সমস্যার চাইতে কম গুরুত্বসম্পন্ন নয়।

আপনার অন্তরঙ্গ
মুহম্মদ ইকবাল

[দুই]
[ব্যক্তিগত, লাহোর ২৮শে মে, ১৯৩৭]

প্রিয় মিঃ জিন্নাহ
আপনার চিঠিখানি যথাসময়ে আমার কাছে পৌঁচেছে এবং সে জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি শুনে আনন্দিত হয়েছি যে আমি মুসলিম লীগের সংবিধান এবং কার্যসূচী পরিবর্তন করা সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম, আপনি তা মনে রেখেছেন। মুসলিম ভারত যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন তার গুরুত্ব আপনি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন, সে সম্বন্ধে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। লীগ কি উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের, না মুসলিম জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করবে, শেষ পর্যন্ত লীগকে তাই স্থির করতে হবে। নেহায়েত সঙ্গত কারণেই মুসলিম জনসাধারণ লীগের প্রতি কোনো আগ্রহ এ পর্যন্ত প্রদর্শন করেনি। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম জনসাধারণের জীবনের উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না, তা আমাদের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে না। নূতন সংবিধান অনুসারে উচ্চপদসমূহ উচ্চ শ্রেণীর অধিকারে চলে যাবে। অপেক্ষাকৃত ছোট চাকরিগুলো মন্ত্রীদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্নীয়দের হাতে চলে যাবে। অন্যান্য বিষয়েও আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ মুসলিম জনসাধারণের জীবনধারণের উন্নতি করার কথা চিন্তাও করেনি। ভারতের সমস্যা দিনে দিনে তীব্রতর হয়ে উঠছে। দু'শো বছর ধরে তাদের অধঃপতন হচ্ছে একথা মুসলমানেরা বুঝতে শুরু করেছে। সাধারণত তাদের বিশ্বাস, হিন্দু মহাজন এবং ধনীকেরাই হলো তাদের দারিদ্রের কারণ। বিদেশী শাসনও যে তার জন্য

www.icsbook.info

সমানভাবে দায়ী এ বোধ এখনো তাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি পুরোপুরি, কিন্তু সে ধারণা অবশ্যই আসবে। জওয়াহের লাল নেহেরুর নাস্তিকতাবাদী সমাজতন্ত্রে মুসলমানদের যথেষ্ট রকম সাড়া দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সুতরাং এখন প্রশ্ন হলো, কিভাবে মুসলমানদের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করা যায়। এ সমস্যা সমাধানে লীগের ভূমিকার উপরই লীগের সম্পূর্ণ ভবিষ্যত নির্ভর করছে। লীগ যদি এ ধরনের কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে না পারে, তাহলে মুসলিম জনসাধারণ লীগের প্রতি আগের মতো উদাসীন থাকবে, সে ব্যাপারে আমি এক রকম নিশ্চিত। সৌভাগ্যবশত ইসলামী আইন প্রয়োগ করে তার সমাধান এবং আধুনিক ভাবধা-রা অনুসারে বিকাশের একটি পন্থা রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে ইসলামী আইনের সতর্ক পর্যবেক্ষণ করে আমি এ উপসংহারে উপণীত হয়েছি যে, যদি সে আইন যথার্থরূপে বুঝে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সকলে অন্ততপক্ষে বেঁচে থাকার অধিকারটুকু অর্জন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু এদেশে ইসলামী শরীয়তের প্রয়োগ এবং বিকাশ সম্পূর্ণ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব নয়। অনেক বছর ধরে এই ছিলো আমার সৎবিশ্বাস এবং এখনো আমি বিশ্বাস করি যে, মুসলমানদের ভারতের সমস্যা এবং শান্তিপূর্ণ ভারতের জন্য এ হচ্ছে একমাত্র পন্থা। তা যদি ভারতে সম্ভব না হয়, তা'হলে তার একমাত্র বিকল্প হলো গৃহযুদ্ধ, প্রকৃত প্রস্তাবে যা কিছু দিন ধরে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার আকারে চলছে। আমার ভয় হচ্ছে, দেশের কোনো কোনো অংশে, বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্যালেস্টাইনের অবস্থার পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

আধুনিক সমস্যাগুলি হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের পক্ষে সমাধান করা অধিকতর সহজ। কিন্তু আমি উপরে যেমন বলেছি, মুসলিম ভারতের এ সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব করে তোলার জন্য আঞ্চলিক পুনর্বন্টন ব্যবস্থার প্রয়োজন অপরিহার্য এবং চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পন্ন একটি বা একটির বেশী মুসলিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি করতে হবে। এরকম একটি দাবী তোলার সময় এসেছে, আপনি কি একথা মনে করেন না? সম্ভবত জওয়াহের লাল নেহরুর নাস্তিকতাবাদী সমাজতন্ত্রের উত্তরে এই হবে আপনার দেওয়ার মতো যথার্থ উত্তর। সে যাহোক আমি আপনাকে আমার গভীর চিন্তার কথা প্রকাশ করলাম। আশা করি আপনি তা আপনার ভাষণে কিংবা মুসলিম লীগের আগামী অধিবেশনের আলোচনায়ও ব্যক্ত করা যায় কিনা গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখবেন। এই সঙ্কটের সময়ে মুসলিম-ভারত আশা করে যে আপনার প্রতিভা বর্তমান দুঃখকষ্ট হতে মুক্তি দেবার মতো কোনো পন্থা আবিস্কার করতে সক্ষম হবে।

আপনার অন্তরঙ্গ
মুহম্মদ ইকবাল

www.icsbook.info

[তিন]

[ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়, লাহোর ২১শে জুন, ১৯৩৭]

প্রিয় মিঃ জিন্নাহ

আপনার চিঠিখানা গতকাল আমার হস্তগত হয়েছে এবং সে জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমি জানি আপনি ব্যস্ত মানুষ। কিন্তু আমি আশা করি, ঘন ঘন চিঠি লিখি বলে আপনি কিছু মনে করেন না। কারণ আপনি হচ্ছেন একমাত্র মুসলিম যিনি সম্পূর্ণ ভারতে যে দূর্যোগ ঘনিয়ে আসছে, তাতে যথার্থ নেতৃত্ব দান করতে পারেন। আমি আপনাকে বলছি, আমরা এক ধরনের প্রকৃত গৃহযুদ্ধের মধ্যেই বাস করছি। পুলিশ এবং মিলিটারী না থাকলে তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তো। গত কয়েক মাসের মধ্যে ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অনেকগুলো দাঙ্গা হয়ে গেছে। গত তিন মাসের মধ্যেই একমাত্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে কমছে কম তিনটা দাঙ্গা হয়েছে এবং হিন্দু ও শিখ মিলে চার চার বার রসুলুল্লাহর মর্যাদাহানি করেছে। চারবারের প্রত্যেকটিতেই মর্যাদাহানি কারীদেরকে হত্যা করা হয়েছে। সিন্ধুতে কোরান শরীফও জ্বালানো হয়েছে। আমি সতর্কভাবে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি। এ সকল ঘটনা অর্থনৈতিক কিংবা ধর্মীয় নয়। বিশুদ্ধভাবেই রাজনৈতিক। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহেও মুসলমানদেরকে হিন্দু এবং শিখরা কোণঠাসা করে রাখার আকাঙ্খা রাখে। নূতন সংবিধান মতে মুসলমানদেরকে মুসলিম প্রধান প্রদেশসমূহেও অমুসলমানদের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। তার ফলে মুসলিম মন্ত্রীসভাও কোন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। মুসলমানদের উপর অবিচার করে যাদের উপর তারা নির্ভরশীল তাদের সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টা এর একটি এবং তারা যে চূড়ান্তভাবে নিরপেক্ষ তা তাদের কাছে প্রমাণ করাই এর অন্য একটি কারণ। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, আমাদের এ সংবিধান বর্জন করার সুস্পষ্ট কারণ রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে, একমাত্র হিন্দুদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নূতন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে হিন্দুরা নিরঙ্কুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা মুসলমানদেরকে একদম গণনায় না ধরলেও পারে। কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে মুসলমানদের নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। তার ফলে মুসলিম মন্ত্রীসভাও কোন যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না। মুসলমানদের সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। এ সংবিধান ভারতীয় মুসলমানদের অপরিমিত ক্ষতি সাধনের জন্য অভিসন্ধিমূলকভাবে যে প্রণয়ন করা হয়েছে, তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাছাড়া অর্থনৈতিক সমস্যা, যা মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, এটা তার কোনো সমাধান করে নাই।

ভারতে মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব স্বীকার করে তাদের কেবল একটি

www.icsbook.info

সাম্প্রদায়িক ন্যায্য প্রাপ্যই মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু সে সংবিধানে একটি জাতির দারিদ্র নিরসনের কোনো ব্যবস্থা নেই এবং তার কিছু করতে পারে না, তার অস্তিত্বের স্বীকৃতিরও কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট যে মুসলমানদের রাজনৈতিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন, তা মোটেই ভুলে যাবার কথা নয়। অন্য হিন্দু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভা, যা হিন্দু জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি বলে আমার মনে হয়েছে, ঘোষণা করেছে যে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মিলিতভাবে জাতি গঠন করা অসম্ভব। সুতরাং এরকম পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ ভারতের প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা হলো ভারতকে জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত ভাবে পুনর্বন্টন করা। অনেক বৃটিশ রাজনীতিবিদও তা বুঝেন। এ সংবিধানের কারণে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছে, শীগগিরই তা ভারতের প্রকৃত অবস্থা তাদের দৃষ্টি খুলে দেবে। আমার মনে পড়ে লর্ড লোথিয়ান আমাকে ইংলন্ড ত্যাগ করার প্রাক্কালে বলেছিলেন, আমার পরিকল্পনাই হলো ভারতের বিসংবাদের একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান, কিন্তু সে জন্য পঁচিশ বছর সময়ের প্রয়োজন। পাঞ্জাবের কতিপয় মুসলমান উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম সম্মেলন আহবানের কথা বলেছেন এবং তা দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। সে যা হোক, আমি আপনার সঙ্গে একমত। আমাদের সম্প্রদায় এখনো যথেষ্ট রকমের সুসংবদ্ধ এবং সুশৃঙ্খল নয়, সে কারণে এ রকম একটি সম্মেলন আহ্বান করার যথার্থ অবস্থা এখনো প্রস্তুত হয়নি। কিন্তু আমি মনে করি যে, আপনি অন্তত বক্তৃতায় মুসলমানেরা শেষ পর্যন্ত কোন কর্মপন্থা গ্রহণ করবে তার আভাস দেবেন।

আমার মনে হয়, একটি মাত্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ সম্বলিত নূতন সংবিধানের কোনোও আশা নেই। মুসলিম প্রদেশসমূহের সমবায়ে পৃথক একটি যুক্তরাষ্ট্র, আমার উপরে বর্ণিত সূত্র অনুসারে গঠন করাই হলো ভারতের একমাত্র শান্তিপূর্ণ পন্থা এবং মুসলমানদেরকে অমুসলমানদের প্রভুত্ব থেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায়। ভারতের ভেতরে অথবা বাইরের অন্যান্য জাতিসমূহের মতো উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বাঙলার মুসলমানদের কেন জাতি বলে মেনে নেয়া হবে না? ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং বাঙলার মুসলমানদের বর্তমানে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহকে অগ্রাহ্য করা উচিত। মুসলিম সংখ্যালঘু এবং সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এটাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং কোনো মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশে না করে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের অধিবেশনের ব্যবস্থা করলে সবদিক দিয়ে ভালো হয়। আগষ্ট মাসটা লাহোরের জন্য ভালো নয়। আমি মনে করি অক্টোবরের মাঝামাঝি লাহোরের আবহাওয়া যখন ভালো হবে, তখন মুসলিম লীগের আগামী অধিবেশন

www.icsbook.info

লাহোরে অনুষ্ঠিত হওয়ার যুক্তিযুক্ততা প্রসঙ্গে আপনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন। পাঞ্জাবে নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং মুসলিম লীগের আগামী অধিবেশন লাহোরে অনুষ্ঠিত হলে পাঞ্জাবের মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটার সম্ভাবনা বর্তমান রয়েছে।[৮১]

আপনার অন্তরঙ্গ
মুহম্মদ ইকবাল

ইকবালের এই পত্রগুলোতে প্রধানত তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এক, মুসলমানদের নিরাপত্তা, দুই, মুসলিম লীগকে শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা এবং তিন, ভারতে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র-ফেডারেশন গড়ার যৌক্তিকতা। তিনটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ সংক্রান্ত পরামর্শ সে সময়ের জন্যে ছিল এক দিকনির্দেশিকা। খোদ কায়েদে আযমের ভাষায় "আমি মনে করি এই সকল পত্র বিশেষত যেগুলোতে মুসলিম ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে তার মতামতের বিশ্লেষণ পরিস্কার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলোর প্রভূত ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।"[৮২]
নির্বাচনের পর মিঃ জিন্নাহ একদিকে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী এবং অনদিকে কংগ্রেসের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করলেন। চেষ্টা করলেন মুসলিম লীগ, কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলসমূহের মিলিত মন্ত্রীসভা গঠনের, যাতে করে এক সাথে চলা ও কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বাংলা এবং পাঞ্জাবেও কংগ্রেসের সাথে যৌথ মন্ত্রীসভা গঠনের প্রস্তাব জিন্নাহ করলেন।[৮৩] জিন্নার মনে বোধ হয় তখনও এ ক্ষীণ আশা জেগে ছিল যে, কংগ্রেস অবশেষে বাস্তবতা মেনে নেবে এবং উভয়পক্ষের সম্মানজনক এক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় রাজী হবে। কিন্তু তা হলো না। 'কংগ্রেসের পক্ষে সে অবস্থায় যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের আবহাওয়া অনুকূল থাকলেও কংগ্রেস লীগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল।'[৮৪] শুধু প্রত্যাখ্যান নয়, যৌথ মন্ত্রীসভা গঠনের জন্যে যে শর্ত আরোপ করল, তা অত্যন্ত অপমানকর। শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরীর ভাষায় "কংগ্রেসের শর্তসমূহ মুসলিম লীগের পক্ষে মানিয়া লইবার অর্থই হইল লীগ সংগঠনের আত্মহত্যা"[৮৫] এই ধরনের অপমানকর শর্ত আরোপ মুসলিম সংখ্যাগুরু বাংলার ক্ষেত্রে করা হয়।[৮৬] উত্তর প্রদেশের জন্যে কংগ্রেস যে শর্ত আরোপ করে তা এইঃ

৮১। ইকবালের এ চিঠিগুলো আকবর উদ্দীনের 'কায়েদে আযম' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৪৮-৩৫৩।
৮২। 'Iqbal's letters to Jinnah' পুস্তিকার ভূমিকা দৃষ্টব্য।
৮৩। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ১৭৭।
৮৪। 'Parliamentary Government in India', by স্যার বি.পি. সিংহ, পৃষ্ঠা ২১৬।
৮৫। 'ভারতে মুসলিম রাজনীতি', শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৪৯।
৮৬। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', পৃষ্ঠা ১৭৮।

www.icsbook.info

ক) মুসলিম লীগকে উত্তর প্রদেশ এ্যাসেম্বলীতে পৃথক দল হিসেবে সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে।
খ) সকল মুসলিম লীগ সদস্যকে কংগ্রেস দলে যোগদান করতে হবে।
গ) উত্তর প্রদেশ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড ভেঙ্গে দিতে হবে।'[৮৭]
শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী যথার্থই বলেছেন এ ধরনের শর্ত আরোপ করা আর মুসলিম লীগকে আত্মহত্যা করতে বলা একই কথা।' প্রকৃত পক্ষে কংগ্রেস মুসলিম লীগ তথা মুসলমানদের স্বতন্ত্রের বিলুপ্তিই চাইছিল। এই মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়ে এই সময় নেহেরু কোলকাতায় বলেই ফেললেন, "আজ দেশে মাত্র দুইটি শক্তি আছে, কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকার।---কংগ্রেসের বিরোধীতা করার মানে হলো ইংরেজ শাসনকে স্বীকার করে নেওয়া।"[৮৮]
নেহেরুর এই ধরনের উক্তি শুধু মুসলিম লীগের ঐক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার পথ বন্ধ করা নয়, একেবারে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। নির্বাচনে বিরাট বিজয় লাভের ফলে মনে হয় কংগ্রেসের মুখোশ খুলে গিয়েছিল। ভারতের ১১টি প্রদেশের ৬টিতে ক্ষমতায় গিয়ে এবং আরও কয়েকটিতে কোয়ালিশন করে কংগ্রেস মনে করছিল গোটা ভারতে শুধু তারাই আছে, ভারত শুধু তাদেরই। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কোলকাতাতেই এক জনসভায় নেহেরুর জবাব দিতে গিয়ে বললেন, "আর একটা তৃতীয় শক্তি আছে এবং সেটি হচ্ছে ভারতের দশ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ। --- ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একচেটিয়া কোন অধিকার যেমন কংগ্রেসের নেই, তেমনি তারা এর একমাত্র অভিভাবকও নয়। আমি সব সময়েই বলেছি, মুসলিম লীগ দেশের আজাদী হাসিলের জন্য যে কোন প্রগতিশীল দলের সাথে হাত মেলাতে রাজী আছে। তবে এর জন্যে সংখ্যালঘু সমস্যার একটা সন্তোষজনক সমাধান করতে হবে। তাছাড়া, সর্বসাধারণের অভিমত অগ্রাহ্য করে আমরা কখনও কোন দলের সাথে মিশে যেতে পারিনা, সে দল যত বিরাট এবং তার নীতি ও কর্মসূচী যত উন্নতই হোক।"[৮৯] জিন্নাহ নেহেরুকে আরও বললেন, "মুসলিমদের নিয়ে আপনি কোন চিন্তা-ভাবনা করবেন না। ওদের বাদ দিয়ে কথা বলুন।"[৯০] এক বক্তৃতায় নেহেরু জিন্নার জবাব দিতে গিয়ে বললেন, "জিন্নাহ আপত্তি করেছেন কংগ্রেস যেন বাংলার মুসলিমদের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ না করেন।----- কিন্তু আমি জানতে চাই মুসলিম কে? যারা জিন্নাহ ও মুসলিম লীগকে অনুসরণ করে তারাই কি মুসলিম? এরা কি চায়? মুসলিম লীগের দাবী কি? -----মুসলিম লীগ কি ভারতের স্বাধীনতার দাবী করে? তারা কি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধীতা করে? -----আমি

৮৭। 'ঐ, পৃষ্ঠা ১৭৯।
৮৮। 'নেহরু' প্রথম খন্ড, এস, গোপাল, পৃষ্ঠা ২২৪।
৮৯। 'India Wins Freedom: The other Side', by W. Khan, Page 75 এবং 'নেহেরু', প্রথম খন্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা ২২৪।
৯০। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১২৫।

www.icsbook.info

মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের চাইতে প্রতিদিন আরও অসংখ্য মুসলিম জনগণের সংস্পর্শে আসি”[৯১] জিন্নাহও এর ত্বরিত জবাব দিলেন, “পিটার প্যানের মত নেহেরু কখনই বড় হবেন না। নেহরু নিজেকে সবজান্তা ব্যক্তি বলে গণ্য করেন ---- নিজের ব্যাপার ছাড়া তিনি দুনিয়ার সব সমস্যার ঝক্কি নিতে চান। ----এবং অন্যের ব্যাপারে অনর্থক নাক গলান।”[৯২]

নেহেরুর শেষ উক্তিটা শুনে মনে হবে, মুসলিম লীগের মুসলমানদের বিরুদ্ধেই বুঝি তার এই রাগ, অন্য মুসলমানদের তিনি বোধ হয় বন্ধু। কিন্তু তা নয়। কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদেরকেও কংগ্রেস পাত্তা দেয়নি। কংগ্রেসপন্থী জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল যারা সব সময় কংগ্রেসের সাথে এতদিন সহযোগিতা করে আসছিল এবং যারা যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করার জন্য কংগ্রেসের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছিল, তাদেরকেও কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করেনি।”[৯৩] কেন গ্রহণ করেনি এ সম্পর্কে তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজেই লিখছেন, “কংগ্রেস ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ একটি সুস্পষ্ট কর্মপন্থা নিয়ে এবং সুনির্দিষ্ট একটি নীতির অনুসরণে। কাজেই কোন সাম্প্রদায়িক নীতির উপর নির্ভর করে এমন কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী পরিষদে গ্রহণ করলে নির্বাচক মন্ডলীকে প্রতারিত করা হবে।”[৯৪] ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের এই দাবী সত্য নয়, কারণ চরমতম সাম্প্রদায়িক দল হিন্দু মহাসভাকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করতে কংগ্রেসের বাধেনি। আসল কথা হলো, অস্তিত্ববাদী কোন মুসলমানকে কংগ্রেস তার মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে রাজী ছিল না। এই জন্যই খাকসার পার্টি, খোদাই খিদমতগার পার্টি, ইউনিয়নিষ্ট পার্টি, মোমেন পার্টি, আহরার পার্টি, প্রজা পার্টি ইত্যাদি মুসলিম দল কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় স্থান পায়নি। কারণ তারা সব ছেড়ে ছুড়ে নিজেদের কংগ্রেসের মধ্যে বিলীন করতে চায়নি। যে সব মুসলমান স্বতন্ত্র সত্তা-পরিচয় বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে পেরেছিল তাদেরকেই শুধু কংগ্রেস পরিষদে ও মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়েছিল। এ বিষয়ের দিকে অংগুলি সংকেত করেই জিন্নাহ বলেছিলেন, “যে সকল মুসলমান তাহাদের সমাজের প্রতি যতখানি দুষমনি করিতে পারিবে, তাহারাই কংগ্রেসের নিকট ততখানি আদরের হইবে।”[৯৫] ঠিক এই কথাই অন্যভাবে বলেছিলেন বাংলার জননেতা শেরে বাংলা এ.কে, ফজলুল হকও। বৃটিশ বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস ও হিন্দুদের সাথে চলার তিক্ত অভিজ্ঞতার অধিকারী শেরে বাংলা বলেন, “আমাকে যখন হিন্দুগণ সমালোচনা করিয়া কঠিন মন্তব্য করেন, তখন আমি বুঝতে পারি যে, আমি নিশ্চয়ই মুসলমান সমাজের উপকার করিয়াছি।”[৯৬]

৯১। 'জিন্নাহ', স্ট্যানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা ১৪৭, ১৪৮, 'নেহেরু', প্রথমখন্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা ২২৪, 'নেহেরু এ পলিটিক্যাল অটোবায়োগ্রাফি', মাইকেল ব্রেমার, পৃষ্ঠা ২৩৩।
৯২। 'নেহেরু', প্রথম খন্ড, এস. গোপাল, পৃষ্ঠা ২২৪ এবং 'জিন্নাহ', স্ট্যানলি ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা ১৪৮।
৯৩। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ১৮৩।
৯৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৩ (দ্রষ্টব্য ঃ ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের 'খন্ডিত ভারত')।
৯৫। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ১৮৫।
৯৬। ঐ, পৃষ্ঠা ১৮৫।

www.icsbook.info

লীগ কংগ্রেস তথা হিন্দু মুসলমান সহযোগিতার আরেকটি সম্ভাবনা এইভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল। নির্বাচনের আগে কিংবা পরে-কোন সময়ই ঐক্যের সম্ভাবনা কাজে লাগল না। যুক্ত প্রদেশের ইংরেজ গভর্ণর স্যার হ্যারি হেগ লিখেছেন, "সাধারণ নির্বাচনের সময় একটা ব্যাপারে আমার বিশ্বাস ছিল যে, নির্বাচনের পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হবে।"[৯৭] কিন্তু তা হয়নি কংগ্রেসের কারণেই। শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, "জিন্নাহ নিতান্ত জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমানের মত লক্ষ করিয়াছিলেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে সদিচ্ছ, ভালবাসা এবং স্নেহ ও শ্রদ্ধা তখনই দেখানো উচিত যখন তুমি শক্তিশালী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কংগ্রেস উপযুক্ত হইয়া এবং জয়ী হইয়া এইরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারে নাই এবং লীগ যখন সহযোগিতার জন্যে অর্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল, তখন একদিকে কংগ্রেস সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করে, অন্যদিকে কংগ্রেসের সভাপতি গণলীগের সহিত আপোশ আলোচনা চালাইতে থাকে। কংগ্রেসের নীতিভ্রষ্টতা যেমন দেখা যায়, তেমনি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভংগীর অস্বচ্ছতা প্রকাশ পায়।"[৯৮] শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী আরও লিখেছেন, "লীগকে কোণঠাসা করিবার শেষ ইচ্ছা কংগ্রেসের থাকিলে ১৯৩৭ সালই ছিল উপযুক্ত সময়, যখন সংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল এবং মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল এবং লীগ দুর্বল ছিল ও কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতার আহবান জানাইয়াছিল।"[৯৯] কিন্তু এ সুযোগ গ্রহণ করতে হলে তো মুসলিম লীগ ও মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র ও সমান সত্তা হিসেবে কংগ্রেসের মেনে নিতে হতো। কংগ্রেস এই স্বীকৃতি দিতে রাজী ছিল না।

এখানে বলা আবশ্যক, ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাজেন্দ্র প্রসাদ জিন্নার সাথে আপোশ আলোচনার একটা মহড়া চালান। মহড়া বলছি এজন্য যে, এতে আন্তরিকতা নয় রাজনীতি বেশী ছিল। আলোচনা যখন ব্যর্থ হলো, রাজেন্দ্র প্রসাদ হঠাৎ পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে ব্যর্থতার জন্যে জিন্নাহকে দায়ী করলেন এবং আপোশ মীমাংসার প্রস্তাব দিয়ে বললেন, 'যদি জিন্নাহ প্রস্তাবিত মুসলমান নেতাদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পারেন, তাহলে তিনিও (রাজেন্দ্র প্রসাদ) কংগ্রেসের দ্বারা তা মঞ্জুর করিয়ে নেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

জিন্নাহ এক পাল্টা বিবৃতিতে সংবাদপত্রে ঐ ধরনের বিবৃতি প্রদান এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে আপোশ আলোচনা পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন, "বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ আমাদের আলোচনার সুত্রের কথা ভুলে গেছেন। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ও অন্য কংগ্রেস নেতাগণ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্পর্কিত

৯৭। `Asiatic Review', London, 1940. Vol. 36. Page 126-143 (উদ্ধৃত ঃ Towards Pakistan. ওয়াহিদুজ্জামান, পৃষ্ঠা ৮৫।

৯৮। 'ভারতে মুসলিম রাজনীতি', শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী।

৯৯। 'ভারতে মুসলিম রাজনীতি', শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী।

www.icsbook.info

তিক্ত বিতর্ক নিরসনের উদ্দেশ্যে আমার সাথে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। বিবেচ্য প্রশ্ন ছিল ঃ সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় সমূহের সম্মতিযুক্ত বিকল্প প্রস্তাব স্থিরীকৃত না হওয়া পর্যন্ত ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদ অনুযায়ী কাজ করা যায় কিনা। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ ও তার বন্ধুদের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি। এরপর প্রস্ত াব আসে যে, যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে মুসলমানদের স্বার্থ অধিকতর সংরক্ষিত হয়, এমন প্রস্তাব এলে আমি (জিন্নাহ) বিবেচনা করবো কিনা। ---- স্বভাবতই আমি উত্তরে বলি যে যদি এরূপ কোন পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়সমূহ অর্থাৎ হিন্দু ও শিখদের দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহলে অবিলম্বে আমি তা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সামনে পেশ করবো। মুসলমানদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ যেহেতু গ্রহীত হয়েছে, তাই এখন যদি কোন বিকল্প প্রস্ত াব আনয়ন করতে হয়, তাহলে তা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ দুই সম্প্রদায় অর্থাৎ হিন্দু ও শিখদের পক্ষ থেকে আসা উচিত। ----- ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে যা বলেছিলাম তার পুনরুক্তি করে বলছি যে, যদি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ তার ফর্মুলা কংগ্রেসের দ্বারা গৃহীত হওয়া সম্পর্কে এত নিশ্চিত থাকেন, তাহলে কংগ্রেসের অনুমোদনসহ প্রস্তাবটি আমার নিকট পাঠালে আমি অবিলম্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাছে পেশ করবো। -----আমি মুসলমানদের ও জনসাধারণকে জানাচ্ছি, অতীতের কোন ঘটনার দ্বারা আমি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত নই। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন সম্মানজনক সমঝোতা হলে আমার চাইতে বেশী খুশী কেউ হবে না এবং আমি তাতে সর্বাধিক সাহায্য করবো। আমার আন্তরিকতার প্রমাণ স্বরূপ জানাচ্ছি যে, মাত্র গত মে মাসে মিঃ গান্ধী যখন তিথলে ছিলেন, তখন হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের অনুরোধ করে আমি তার কাছে বার্তা পাঠাই। ১৯৩৭ সালের ২২শে মে তারিখে এর উত্তরে মিঃ গান্ধী আমাকে জানান, "পারলে আমি কিছু করতাম, কিন্তু আমি সম্পূর্ণ অসহায়। ঐক্যের উপর আমার বিশ্বাস পূর্বের মতই উজ্জল কিন্তু এই নিবিড় অন্ধকারে আমি কোন আলো দেখতে পাচ্ছি না।"[১০০] অন্ধকারে আর আলো জ্বলেনি। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আপোশ মহড়ার এই বিবৃতির পর ইতি ঘটে। প্রকৃত পক্ষে আশেপাশের কোন চিন্তা তখন কংগ্রেসের মাথায় ছিল না। তারা তখন প্রায় ৭টি প্রদেশে সরকার গঠন করেছে। আর মুসলিম লীগের মাত্র একটি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা বাংলা প্রদেশে শেরে বাংলার প্রজাপার্টির সাথে। এমন দুর্বল মুসলমানদের সঙ্গে ভারতের দুই তৃতীয়াংশ রাজত্বের প্রত্যক্ষ অধিপতি কংগ্রেস আপোশ আলোচনায় আসবে কেন? শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী যাকে দুঃখজনক বলেছেন, সেটাই ছিল কংগ্রেসের কাছে গৌরবের।

কিন্তু দিন কারো সমান যায় না। মুসলিম লীগেরও গেল না। ১৯৩৭ সালের

১০০। 'ভারতে মুসলিম রাজনীতি', শ্রী বিনয়েন্দ্র চৌধুরী।

www.icsbook.info

নির্বাচনের পর মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে লাগলো। ১৯৩৭ সালেই মুসলিম লীগের নতুন ১৭০টি শাখা গঠিত হলো, মুসলিম লীগে যোগদান করল অগণিত মানুষের স্রোত। বাংলায় শেরে বাংলা নতুন করে মুসলিম লীগের সহযোগী হলেন। সোহরাওয়ার্দী, নাজিমুদ্দিন ও শেরে বাংলার মিলিত শক্তি বাংলায় মুসলিম লীগকে নতুন জীবন দান করলো। পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশেও পরিস্থিতি একদম পাল্টে গেল। আল্লামা ইকবাল, নওয়াব আহমদ ইয়ারখান দওলতানা প্রমুখের চেষ্টায় পাঞ্জাবে নতুন হাওয়া বইল। পাঞ্জাব ইউনিয়নিষ্ট পার্টির নতুন নেতা স্যার সিকান্দার হায়াত খান মুসলিম লীগে যোগদান করায় পাঞ্জাব মুসলিম লীগের হাতে চলে এল। একদিকে মুসলিম লীগের এই উত্থান, অন্যদিকে অধিকাংশ প্রদেশের নতুন শাসক কংগ্রেসের মুখের উপর ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে লাক্ষ্ণৌতে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ঐতিহাসিক এই কারণে যে, প্রকৃতপক্ষে এখান থেকে মুসলিম লীগ মুসলিম গণসংগঠন হিসেবে তার অগ্রযাত্রা শুরু করে দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, কিভাবে কংগ্রেস অন্য দল ভাঙিয়ে, কোথাও বা স্বার্থান্বেষী কোন মুসলমানকে লোভ দেখিয়ে মন্ত্রীর গদীতে বসিয়ে মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে প্রচার করছে, হিন্দীকে জাতীয় ভাষা এবং বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত করা হচ্ছে, কংগ্রেসের পতাকাকে মানতে ও সম্মান করতে সকলকে বাধ্য করা হচ্ছে - এসব বিষয় উল্লেখ করার পর বললেন ঃ

"শুরুতে যতটুকু ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার দ্বারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় একথা প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দুস্তান হচ্ছে হিন্দুদের জন্যে। জাতীয়তাবাদের নামে কংগ্রেসেরই হম্বিতম্বি চলছে। হিন্দু মহাসভা টু শব্দটিও করছে না। ---- এই পরিস্থিতিতে মুসলমানের সামনে আজ একটিমাত্র পন্থাই সুস্পষ্ট খোলা আছে। সময় থাকতেই তা তাদের উপলব্ধি করতে হবে। তাদের আজ সংহত হতে হবে। ---আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে মুসলমানেরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করুক, এই আমি দেখতে চাই। আমাদের আজ এমন একদল লোকের প্রয়োজন যারা বিশ্বাসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যাদের সাহস ও সংকল্প দুইই রয়েছে; গোটা পৃথিবী বিরোধীতা করলেও যারা খালি হাতেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পিছপা হবে না।----সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সাথে কোন সমঝোতা সম্ভব নয়। কেননা, কোন হিন্দু নেতাই দায়িত্ব নিয়ে কোন কথা বলেন না এবং এ বিষয়ে কোন গরজও দেখা যায় না। ---- সমানে সমানে এবং উভয় পক্ষ যদি পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও ভয় করে, তবেই সমঝোতা সম্ভব, যদি দুর্বল পক্ষই কেবল আবেদন করে, তাতে তার দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। রক্ষাকবচ ও সমঝোতার বিষয়টা যদি ক্ষমতার দ্বারা পরিচালিত না হয়, তাহলে তা ছেঁড়া কাগজের টুকরা

www.icsbook.info

ছাড়া আর কিছুই হবে না। - তা বুঝতে রাজনীতি জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না। রাজনীতির অর্থই হল ক্ষমতার অধিকার - কেবল ইনসাফ, তার ব্যবহার আর সদিচ্ছার জন্য চিৎকার করলেই তা লাভ করা যায় না। ---এরা (কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ) তিন রকম কথা বলেন। একটা কথা হচ্ছে, হিন্দু মুসলিম সমস্যা বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আর একটা কথা হচ্ছে, 'মুসলমানদের বর্তমান সংহত ও অসহায় অবস্থায় মুসলমানদের সামনে কিছু টুকরো টাকরা ফেলে দিলেই তাদের বশে আনা যাবে।' তৃতীয় কথাটি হচ্ছে, 'নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখা যাচ্ছে না।'--- আজ নিজেদেরকেই ভাগ্য নির্ধারণ করতে হবে। কেবল একটা মাত্র জিনিসই মুসলমানদের পারে তাদের হারানো বুনিয়াদ খুঁজে নিতে। তা হল, নিজেদের আত্মাকে জাগ্রত করতে হবে। নিজেদের মহান ভ্রাতৃত্বের বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে , একটা মাত্র রাজনীতির পতাকা তলে সমবেত হওয়ার সবক এখতিয়ার করতে হবে। মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক, মোসাহেব, প্রতিক্রিয়াশীল - এ ধরনের কোন শ্লোগান চিৎকারে বিচলিত হলে চলছে না।--- এই সকল শব্দ মুসলমানদের মধ্যে হীনমন্যতা সৃষ্টির জন্যই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মুসলিম লীগ আইন পরিষদের ভেতরে বাইরে বৃটিশ সরকার বা কোন দল বা পার্টির হাতে মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে দেবে না। --- আমার বক্তব্য হলো, জনকল্যাণের জন্য গঠনমূলক ও প্রগতিশীল কোন কর্মসূচী প্রণয়ন করা আজ আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সেই সাথে মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নতির পন্থা ও উপায় আপনাদের খুঁজে নিতে হবে। --- কোন সিদ্ধান্তে পৌছার আগে শতবার চিন্তা ভাবনা করে দেখুন। কিন্তু যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, একপ্রাণ, এক দেহ নিয়ে তা কার্যকরী করুন।"[১০১]

মিঃ জিন্নার বক্তৃতার পর আরও কয়েকজন বক্তৃতা দিলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলার জননেতা এ,কে, ফজলুল হক এবং মওলানা আকরম খাঁ। আকরম খাঁ হিন্দুদের বন্দেমাতরম সঙ্গীতের বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলেন শ্রোতাদের কাছে। আর এ, কে, ফজলুল হক তার বক্তৃতায় এমন কথা পর্যন্ত বললেন যে, ইউ, পি'র একজন মুসলমানের জানের বদলা বাংলায় আমরা দু'জনের জান নিয়ে ছাড়বো।[১০২]

১৯৩৭ সালের মুসলিম লীগ সম্মেলনের মাধ্যমে লীগের নতুন উত্থান মুসলমানদের মধ্যে যেমন আশা, আবেগ, উন্মাদনার সৃষ্টি করলো, তেমনি কংগ্রেস ও হিন্দুদেরকেও সচেতন করে তুললো। ওয়াল্টার ওয়াল ব্যাংক-এর ভাষায় "মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবনে মিঃ নেহেরু ও তার সহকারীদের চৈতন্যোদয় হল। বিষয়টিকে তারা (মুসলিম লীগের) আপোশহীন মনোভাব হিসেবে গণ্য

১০১। 'Speeches & Writings of Mr. Jinnah' জামিল উদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৯-২৪।
১০২। 'Pathway to Pakistan', by Khaliquzzaman, Page 171.

www.icsbook.info

করলেন। এর পরেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটা প্রস্তাব পাশ করল যাতে সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি পরিপূর্ণ মর্যাদা দানের কথা বলা হল।"[১০৩] যে গান্ধী ১৯৩৭ সালের মে মাসে কোন 'আলোর রেখা দেখতে পাননি' এবং করার মত কোন কাজ দেখেননি, সেই গান্ধী মুসলিম লীগের লাক্ষ্মৌ সম্মেলনের পরই ১৯৩৭ সালের ১৯ শে অক্টোবর কায়েদে আযমকে লিখলেন, "আপনার বক্তৃতা পড়ে মনে হলো এর সমস্তই যুদ্ধ ঘোষণা। তবে শুধু আশা করেছিলাম যে, আপনি অন্ততঃ এই বেচারীকে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র রূপে রাখবেন। (সে জন্য) আমি দুঃখিত। ঝগড়া করতে দু'জনের দরকার হয়। যদি আমি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী না হতে পারি তবু আমাকে (ঝগড়ার মধ্যে) এক পক্ষ হিসেবে পাবেন না। ---"[১০৪] গান্ধীর এ চিঠির জবাব দিলেন কায়েদে আযম ৫ই নভেম্বর তারিখে। তিনি লিখলেন, "---আমার বক্তৃতাকে যুদ্ধ ঘোষনা গণ্য করাতে আমি দুঃখিত। এটা সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক। আবার পড়বে ও বুঝতে চেষ্টা করবেন। স্পষ্টত ঃ আপনি গত বারো মাসের ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টি দেননি। ---- আপনাকে 'যোগ-সেতু ও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে রাখা সম্বন্ধে (বলছি), আপনি কি মনে করেন না যে, আপনার পূর্ণ নিরবতা আপনাকে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে এক করে দিয়েছে, যদিও আপনি কংগ্রেসের চার আনা সদস্যও নন? ----পত্রে আমি কোন সুনির্দিষ্ট বা গঠনমূলক প্রস্তাব দেখতে পাচ্ছি না।।"[১০৫]

এই ভাবে জিন্নাহ-গান্ধী পত্রালাপ চলল। ১৯৩৮ সালের৩রা ফেব্রুয়ারী গান্ধী মিঃ জিন্নাহকে লিখলেন, "আপনি আমার নিরবতার জন্যে অভিযোগ করেছেন। এই নিরবতার কারণ সম্পর্কে আমি পুরোপুরিই সচেতন। ---- আপনার বক্তৃতা যে যুদ্ধ ঘোষণা তা আপনি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু আপনার পরবর্তী কালের বক্তব্য আমার প্রথম ধারণাকেই সুদৃঢ় করেছে।"[১০৬] কায়েদে আযম এর জবাবে ১৫ই ফেব্রুয়ারী লিখলেন, "আপনার অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আপনি লাক্ষ্মৌর বক্তৃতা ও পরবর্তীকালের বক্তব্যগুলোকে যুদ্ধ ঘোষণা বলে মনে করেছেন, আসলে তা নয়। সে সব যে আত্মরক্ষামূলক বক্তব্য, সে কথাই আমি আবার বলব। --- আপনি আরও বলেছেন, আমার বক্তব্যে আপনি সেই পুরাতন জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিটিকে খুঁজে পাননি। আপনার এ বক্তব্য কি সঠিক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? জাতীয়তাবাদ কোন ব্যক্তি বিশেষের একচেটিয়া অধিকার নয়, বর্তমানের জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নিরুপণও খুব সহজ নয়। ---- মূল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা পত্র দ্বারা সম্ভব নয়।"[১০৭] এর উত্তরে গান্ধী ২৪শে ফেব্রুয়ারী লিখলেন, "হিন্দু মুসলিম বিষয়ে আমি ডাঃ আনসারির জীবিতকাল

১০৩। `A Short History of India and Pakistan, টি. ওয়াল্টার ওয়ালব্যাংক, পৃষ্ঠা ১৮৮।

১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭ এ উল্লেখিত পত্রগুলোর জন্যে শরিফুদ্দিন পীরজাদার `Quid-I-Azam Jinnah's Correspondence' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

www.icsbook.info

পর্যন্ত তার পরামর্শ মত চলতাম, তার মৃত্যুর পর মওলানা আবুল কালাম অজাদ এ বিষয়ে আমার পরামর্শদাতা।"[১০৮ক] এরপর গান্ধী মিঃ জিন্নাহকে মওলানা আজাদের সাথে সাক্ষাত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

মিঃ জিন্নাহ গান্ধীর এ কৌশল সম্ভবত পছন্দ করেননি। তাছাড়া এ সময় জিন্নার কাছে বড় বিষয় ছিল আলোচনা কোন মর্যাদা নিয়ে হবে। মর্যাদার বিষয়টা সুচিহ্নিত হবার পরেই শুধু ঠিক হতে পারে আলোচনা কার সাথে কি নিয়ে হওয়া উচিত। ১৯৩৮ সালের ৩রা মার্চ জিন্নাহ গান্ধীকে লিখেছেন, "আমরা এমন এক পর্যায়ে পৌচেছি যেখানে মুসলিম লীগ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রাখা উচিত নয় যে, মুসলিম লীগই ভারতে একক ক্ষমতা সম্পন্ন ও প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান, পক্ষান্তরে কংগ্রেস ও গোটা দেশের অপরাপর হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসেবেই আপনি কথা বলছেন ---মাত্র এই ভিত্তিতেই আমরা এখন এগিয়ে যেতে পারি।"[১০৮খ]

জিন্নার এ প্রস্তাব ছিল তখন কংগ্রেসের হজমের অযোগ্য বস্তু। এই পয়েন্টে এসেই জিন্নাহ-গান্ধী পত্রালাপ অচলাবস্থায় পৌছে। তবে ঠিক হলো যে, ১৯৩৮ সালের এপ্রিলে তারা সাক্ষাৎ করবেন।

গান্ধীর সাথে জিন্নার যখন পত্রালাপ চলছিল, সেই সময় ১৯৩৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী নেহেরু জিন্নাহকে পত্র লিখেন। যে নেহেরু হিন্দু মুসলমান সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না, সেই নেহেরুই ১৯৩৭ সালের মুসলিম লীগ (লাক্ষ্ণৌ) সম্মেলনের পর এই সমস্যার ব্যাপারে জিন্নার সাথে পত্রালাপ শুরু করলেন।[১০৯] নেহেরু এক পত্রে লিখলেন, "আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমরা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টি বিবেচনা করতে যাচ্ছি। আমার মনে হয় আপনি যে পথে এগুতে চান, তা আশাপ্রদ নয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তর্ক চালানো যে আদৌ সমীচিন নয় সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। ---- মতের পার্থক্য ও ঐক্যের আসল সূত্র কোনগুলি, তা জানার জন্যে আমি আগ্রহী। ---- আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এ সম্পর্কে আমি এখনও অন্ধকারেই আছি। আপনার শেষ পত্রেও এ বিষয়ে কোন আলোক দেখতে পাইনি। এ বিষয়ে যদি কোন আলোকপাত আপনি করেন এবং কোন কোন বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে, যা বিবেচনা করা যেতে পারে, তা যদি আপনি দেখিয়ে দেন, তাহলে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবো।"[১১০]

মিঃ জিন্নাহ ৩রা মার্চ (১৯৩৯) নেহেরুর এ চিঠির জবাবে বললেন, "আপনার চিঠিতে আপনি যে বিষয়টার উপর জোর দিয়েছেন তা হল, মতবিরোধের

১০৮-ক ও ১০৮-খ- এ উল্লেখিত পত্রগুলোর জন্যে শরিফুদ্দিন পীরজাদার `Quid-I-Azam Jinnah's Correspondence' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১০৯। জিন্নাহ নেহেরু এই পত্রালাপ ১৯৩৯ সালের ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত চলেছিল।

১১০। উল্লেখিত চিঠির জন্য শরিফউদ্দিন পীরজাদার `Quid-I-Azam Jinnah's Correspondence' দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩৯-৪১।

www.icsbook.info

কারণগুলো এক এক করে আমাকেই ফর্দ করে আপনার বিবেচনার জন্যে আপনার কাছে পাঠাতে হবে। তারপর তার ভিত্তিতেই চিঠিপত্র লেনদেন হবে। আমার বিবেচনায় এটা আকাংখিত ও সুষ্ঠ পন্থা নয়। আপনি যে পন্থার উপর জোর দিচ্ছেন, তা মামলারত কোন দুই ব্যক্তির ব্যাপারে খাটতে পারে, যেখানে মক্কেলের তরফ থেকে উকিলেরা কাজ করে। কিন্তু জাতীয় কোন সমস্যার সমাধান এ পন্থায় সম্ভব নয়। ------ আপনি যখন বলেন যে, আমার আশংকা হয় মতবিরোধের মূল কারণ কি তা জানি না, তখন আপনার এ অজ্ঞতায় কৌতুক বোধ না করে আমি পারি না। বিষয়টা সম্পর্কে পড়াশুনার জন্যে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। আত্মতৃপ্ত কোন মনোভাব গ্রহণ করবেন না।"[১১১]

জিন্নার এ চিঠির জবাবে নেহেরু তার ৮ই মার্চ (১৯৩৯)-এর চিঠিতে নিজেই বিরোধীয় তিন[১১২] বিষয়ের উল্লেখ করে বললেন, "বর্তমানে এই তিনটিই হলো মূল বিষয়। আরো ছোট খাট বিষয় থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু আপনি মূল বিষয়ের কথা বলেছেন, সে জন্য সেগুলো আর উল্লেখ করলাম না। ---- সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ-এর ব্যাপারে কংগ্রেসের অভিমত বিশ্লেষিত হয়েছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারের নিশ্চয়তা কংগ্রেস যথাসাধ্য দিয়েছে। এ বাদেও যদি কিছু নিশ্চয়তার প্রয়োজন থাকে, তবে তার উল্লেখ করা প্রয়োজন---।"[১১৩] ১৯৩৯ সালের ১৭ই মার্চ জিন্নাহ নেহেরুর এ চিঠির জবাবে লিখলেন, "যে প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম, আমি যতদূর বুঝেছি, সেটা ছিল, সরকারে, দেশের শাসনে ও জাতীয় জীবনে মুসলমানদের ধর্ম, তমদ্দুন, ভাষা, ব্যক্তিগত আইন এবং রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কিত রক্ষাকবচ। এ ব্যাপারে বহু প্রস্তাবই দেয়া হয়েছে----। আপনি সম্ভবতঃ ১৪ দফার নাম শুনে থাকবেন।----- আমার মনে হয়, কংগ্রেসের হরিপুর অধিবেশনে আপনি বলেছিলেন, 'অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই আমি তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সমস্যা পর্যবেক্ষণ করেছি। যদি আদতেই কিছু না থাকে তবে কি দেখতে পাওয়া যায়?' সম্ভবতঃ আপনি মিঃ অ্যনের সাক্ষাতকার পড়ে থাকবেন। সেখানে তিনি মুসলিম লীগের কতিপয় দাবী তুলে ধরে কংগ্রেসের প্রতি হুসয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন।"[১১৪] নেহেরু এই চিঠির জবাব দিলেন ৬ই এপ্রিল তারিখে। এই চিঠিতে নেহেরু মুসলমানদের ডজনেরও বেশী দাবীর একটা তালিকা তুলে ধরলেন। তারপর এক এক করে তিনি দাবীগুলোর ব্যাপারে তার মত জানিয়ে দিলেন। জিন্নাহ নেহেরুর এ চিঠির জবাবে লিখলেন, "আমি আপনাকে যা লিখেছিলাম তা থেকে সরে গিয়ে বা তার বিকৃত অর্থ ধরে নিয়ে আপনি যা করছেন, তাতে আমি শুধু দুঃখই প্রকাশ করতে পারি।

১১১, ১১৩, ১১৪-এ উল্লেখিত চিঠির জন্য শরিফউদ্দিন পীরজাদার 'Quid-I-Azam Jinnah's Correspondence' দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩৯-৪১।

১১২। তিনটি বিষয় : (ক) সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ যেখানে স্বতন্ত্র নির্বাচন ও আসন সংরক্ষণের বিষয় রয়েছে, (খ) ধর্মীয় অধিকারের নিশ্চয়তা এবং (গ) সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও এ বিষয়ে নিশ্চয়তা।

www.icsbook.info

আপনার অনুরোধক্রমে যে বিষয়গুলি আপনার নিকট তুলে ধরেছিলাম, আপনি সে সবেরও ভুল ব্যাখ্যা করে বসে আছেন। চিঠিতে আপনি আগের থেকেই যেভাবে নিজের রায় দিয়ে দিয়েছেন এবং এতদসংক্রান্ত বেশ কিছু সংখ্যক বিষয় সম্পর্কে আপনার অনড় সিদ্ধান্ত যেভাবে অগ্রিম প্রকাশ করেছেন, তাতে আমি বেশ দুঃখ পেয়েছি। এতে যে নেতবিাচক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে, তাতে আলোচনার দ্বারা আর কোন সমঝোতায় পৌছানো সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।"[১১৫]

এভাবেই জিন্নাহ নেহেরু পত্রালোচনার ইতি ঘটে। এই পত্রালাপ থেকে এ কথা পরিস্কার, (ক) কংগ্রেস মুসলমানদের সমস্যা বা বিরোধীয় বিষয়কে প্রথমে স্বীকৃতিই দিতে চায়নি, অজ্ঞতার ভান করে, (খ) পরে সমস্যাগুলো উল্লেখ করলেও সমাধানের ব্যাপারে নতুন কোন কথা বলেনি, পুরাতন সেই কথাগুলোই নতুন করে সামনে এনেছে, যার কারণে অতীতে বার বার সমঝোতা প্রচেষ্টা ভেঙে গেছে।

সুভাষচন্দ্র বসুর সাথেও ১৯৩৮ সালের মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত জিন্নার পত্রালাপ চলে। এ সময় সুভাষবসু কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবেই তিনি এ পত্রালাপ করেন। এ পত্রালাপেরও লক্ষ্য ছিল সমঝোতার একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু ফল হয়নি। আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হবার প্রধান কারণ ছিল কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম লীগকে মুসলমানদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দানে অসম্মতি। সুভাষ বসু তার ১৯৩৮ সালের ২৫শে জুলাই তারিখের চিঠিতে মুসলিম লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নাহকে জানান, "লীগের একক মর্যাদা স্বীকার করার বিরুদ্ধে হুসিয়ারী দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট ইতিমধ্যেই অনেক চিঠিপত্র এসেছে। মুসলীম লীগের বাইরেও অনেক মুসলিম প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সব পত্র লেখকের অনেকেই কংগ্রেসের গোঁড়া সমর্থক। ------ তদুপরি, ব্যক্তিগতভাবেও অনেক মুসলমান কংগ্রেসের সদস্য। মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর এদের অনেকেরই প্রভাব উল্লেখযোগ্য। বিপুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী সীমান্ত প্রদেশও কংগ্রেসের দৃঢ় অনুসারী। ---- এমতবস্থায় কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিম লীগকে একমাত্র ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রতিনিধিত্বশীল মুসলিম প্রতিষ্ঠান (লীগের প্রস্তাব অনুসারে 'একমাত্র' শব্দটি বাদ দেওয়া সত্তেও মূলত ঃ এর অর্থ তাই দাঁড়ায়) হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া সম্ভব নয়।"[১১৬]

সুভাষ বসুর এ চিঠির জবাব দিলেন কায়েদে আযম ২রা আগস্ট (১৯৩৮)। চিঠিতে তিনি বললেন, "উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে কংগ্রেস-কোয়ালিশন উজীর সভা বিদ্যমান, সে বিষয়টি লীগ কাউন্সিল অবগত আছে। কিন্তু লীগ

১১৫-এ উল্লেখিত চিঠির জন্য শরিফউদ্দিন পীরজাদার 'Quid-I-Azam Jinnah's Correspondence' দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ৩৯-৪১।

১১৬। 'Quid-I-Azam Jinnah's Correspondence' শরিফ উদ্দীন পীরজাদা, পৃষ্ঠা ৩৩-৪৬।

www.icsbook.info

কাউন্সিলের দৃঢ় অভিমত হলো, কংগ্রেসের মধ্যেকার এই সব মুসলমান কখনো ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে না, করতেও পারে না। এর কারণও খুব সোজা। কারণ, তারা সংখ্যায় খুব নগণ্য। তাছাড়া কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার দরুন তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হওয়ার বা তাদের তরফ থেকে কথা বলার অধিকারও হারিয়েছে। ----(যে সব মুসলিম প্রতিষ্ঠানের কথা কংগ্রেস বলেছে)– ঐসব প্রতিষ্ঠান যদি এককভাবে বা যুক্তভাবে মুসলমানদের তরফ থেকে কথা বলার অধিকারী হতো, তাহলে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট বা মিঃ গান্ধীর পক্ষ থেকে হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে মুসলিম লীগের সাথে যোগাযোগ করার কোনই প্রশ্ন উঠতো না।"[১১৭]

জিন্নার এই যুক্তির কোন জবাব ছিল না কংগ্রেসের কাছে। জিন্নার এ চিঠির কোন জবাব দেননি সুভাষ বসু। জবাব দেয়ার কিছু ছিল না। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ সর্ববৃহৎ এবং একমাত্র সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু তখনও যে দুর্বলতা লীগের ছিল, সে দুর্বলতা ১৯৩৭ সালের অক্টোবরের লীগ সম্মেলনের পর কেটে যায়। মুষ্টিমেয় কিছু কংগ্রেসী মুসলমান ছাড়া মুসলিম লীগ এখন মুসলিম জনগনের সংগঠনে পরিণত হয়েছে, একথা বুঝেই তো নেহেরু, গান্ধী এবং সুভাষ মুসলিম লীগ সভাপতি জিন্নার সাথে আলোচনা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এই বুঝাটা তারা মুখে স্বীকার করতে চাইল না। এর কারণ বোধ হয় এটাই যে কংগ্রেস কোন নিরপেক্ষ সংগঠন ছিল না। ভারতের অচ্ছুত (হরিজন) সম্প্রদায়ের নেতা ডক্টর আম্বেদকরের ভাষায় "কংগ্রেস যে একটি হিন্দু সংস্থা, তা অস্বীকার করে লাভ নেই। যে প্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের প্রাধান্য তাতে কার্যতঃ হিন্দু মানসিকতার প্রতিফলন হবেই এবং হিন্দুর আশা-আকাঙ্খাকে সমর্থন জানাতে হবেই। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে একটিই পার্থক্য রয়েছে। তা হল, মহাসভার বক্তব্য কিছু রূঢ় এবং কংগ্রেসের বক্তব্যে থাকে রাজনীতি এবং ভদ্রতা।"[১১৮] এই হিন্দুবাদী সংগঠন কংগ্রেস, যার লক্ষ্য গোটা ভারতের উপর একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, মুসলিম লীগকে স্বীকৃতি দিতে পারে না। কারণ তার ফলে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও তাদের দাবীর বৈধতাও স্বীকার করে নিতে হয় এবং ভারতের উপর একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার তাহলে আর কোন পথ থাকে না। সুভাষ বসুর সাথে আলোচনার সময় মুসলিম লীগ মুসলমানদের একক সংগঠন হবার দাবী পরিত্যাগ করেছিল শুধু কংগ্রেসকে তুষ্ট করার জন্যেই, তবু কংগ্রেস মুসলিম লীগকে মেনে নেয়নি।[১১৯] এই অস্বীকৃতির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে এক উৎকট মুসলিম বৈরিতা, এক সীমাহীন মুসলিম বিদ্বেষ এবং এক ভয়ংকর সংহার মূর্তি ভদ্র ভাষার বাঁধনে প্রচ্ছন্ন ছিল। এরই নগ্ন প্রকাশ

১১৭। `Quid-I-Azam Jinnah's Correspondence' শরিফ উদ্দীন পীরজাদা, পৃষ্ঠা ৩৩-৪৬।
১১৮। `Pakistan or the Partition of India বি. আর. আম্বেদকর, পৃষ্ঠা ৩০।
১১৯। জিন্নার কাছে লেখা সুভাষবসুর ২৫শে জুলাই, ১৯৩৮-এর চিঠি দ্রষ্টব্য।

www.icsbook.info

আমরা দেখেছি ভারতে কংগ্রেস শাসিত ও প্রভাবিত প্রদেশগুলোতে। ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৩৯ সালের ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত ভারত শাসন আইনের অধীনে কংগ্রেস ভারতে ছয়টি প্রদেশে [১২০] ক্ষমতাসীন ছিল। এই কংগ্রেসী শাসনে মুসলমানরা ধর্ম, সংস্কৃতি, চাকুরী, ব্যবসায় সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাহীন নির্যাতনের শিকার হয়। ইংরেজ লেখক আয়ান স্টিফেনের ভাষায় "যুক্ত প্রদেশ ও অন্যান্য স্থানের প্রাদেশিক মন্ত্রীরা 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার বিষয়টাকে নিজেদের দৈনন্দিন কাজের অঙ্গীভূত করে নেন। এতে অহিন্দুদের মধ্যে বিরূপতা দেখা দেয়। মুসলমানদের উপর সব রকমের চাপ ও হয়রানির অভিযোগ শোনা যেতে থাকে। স্কুলের ছাত্রদের হিন্দু পদ্ধতিতে জোড় হাতে মিঃ গান্ধীর প্রতিকৃতি পূজা করার ব্যবস্থা চালু করা হয়। বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের আপত্তিকর উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতও ছাত্রদের গাইতে বলা হয়। গরুর গোশত খাওয়া বন্ধের জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চলে। উর্দু ভাষা ও বর্ণমালা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। বড় বড় চাকুরীতে হিন্দুদের নিয়োগ করা হতে থাকে।"[১২১] কংগ্রেস মন্ত্রীসভার দু'বছর শাসনকালে ৩০টি ভয়াবহ ধরনের দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে কংগ্রেসের পূর্ণ সমর্থক মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর বাসস্থান ফয়জাবাদ জেলার টাণ্ডা নামক ছোট্ট শহরে দাঙ্গায় সত্তর জন মুসলমান পুলিশের গুলিতে নিহত হয় এবং দু'শ জনকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয়। মধ্য প্রদেশের চাঁদপুর বিশোয়ারায় প্রায় চার'শ মুসলমানকে গ্রেফতার করে দড়ি দিয়ে পা বেঁধে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় আদালতে। সেসন কোর্টে বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে ২ জনের ফাঁসি, ২৪ জনের দ্বীপান্তরবাসের দন্ড দেয়া হয়। হাইকোর্ট[১২২] এদের সকলকেই খালাস দেয় এবং রায়ে বলে যে, "মামলাটা বড় করুণ। সাক্ষীর পর সাক্ষী যে জবানবন্দী দিয়েছে, তার প্রত্যেকটাই মিথ্যা। ---- সম্পূর্ণ মামলাটাই সাজানো। এ যেন এমন একটা বীভৎস উৎসব যাতে সাক্ষীরা কে কতজন মুসলমানকে ফাঁসির কাঠে ঝোলাতে পারে, তাই নিয়ে পরস্পরের প্রতিযোগিতা চলেছে।"[১২৩] এই ভাবে নিম্ন আদালতগুলোতে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ও পরিষদ সদস্যগণ হস্তক্ষেপ করতেন এবং কোর্টকে প্রভাবিত করতেন, যার কারণে এলাহাবাদ হাইকোর্টকে তার এক রায়ে বলতে হয়, "এটা প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে, এই কোর্ট তার কোন বিচারকের উপর, বিশেষতঃ অসহায় জুনিয়র বিচারকদের উপর প্রভাব বিস্তার বরদাশত করবে না।"[১২৪] দুই বছরের শাসনে কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে যে কি

১২০। যুক্ত প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বে।
১২১। 'Pakistan Old Country: New Nation', Jon Stephens, Page 93.
১২২। হাইকোর্টের অধিকাংশ বিচারক তখন ইংরেজ।
১২৩। 'কায়েদে আযম', (আকবর উদ্দীন) গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪০১।
১২৪। 'Pirpur Report, 1939 ', পৃষ্ঠা ১৮ (উদ্ধৃতঃ 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪০২।

www.icsbook.info

বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ তদানীন্তন 'পীরপুর রিপোর্ট' ও 'শরিফ রিপোর্টে' পাওয়া যাবে। সরেজমিন তদন্তের পর মুসলিম লীগ নিয়োজিত কমিশন এ রিপোর্ট তৈরী করেছিল। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চালানো হচ্ছিল সে সম্পর্কে বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ,কে,ফজলুল হক জওহর লাল নেহেরুকে লেখা এক দীর্ঘ চিঠিতে বলেছিলেন, "কংগ্রেসের নীতির দরুণ এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যেখানে (পূর্বের) অদলীয় সরকারসমূহ কর্তৃক আরোপিত বিধি নিষেধের বেড়া মারমুখো হিন্দুরা ভেঙ্গে ফেলেছে। মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপরে তারা নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। তাদের ইচ্ছা কি?----না, গোমাতাকে সম্মান দেখাতেই হবে, মুসলমানদের গরুর গোশত খেতে দেয়া হবে না, মুসলমানদের ধর্মকে হেয় করতেই হবে, কেননা এটা কি হিন্দুর দেশ নয়? সে কারণেই আজান দেয়া বারণ করা, মসজিদে মুসল্লীদের উপর হামলা, নামাযের সময় মসজিদের সামনে বাজনা বাজানোর মত কাজ হচ্ছে।---সুতরাং মর্মান্তিক ঘটনার পর মর্মান্তিক ঘটনা যদি ঘটেই চলে এবং দুধের নহরের পরিবর্তে যদি রক্তের স্রোত বয়ে থাকে, তবে বিস্ময়ের কি আছে।"[১২৫]

ভারতের ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন সম্পর্কে বিদেশীদের মন্তব্য থেকেও কংগ্রেসের স্বরূপ পরিস্কার হয়ে যায়। ইতিহাসকার টি,ডব্লিউ, ওয়ালব্যাংক লিখছেন, "এদেশে কংগ্রেস শাসনের এমন অন্যান্য দিক রয়েছে, যাতে মুসলমানরা বিক্ষুব্ধ ও ভীত হয়ে উঠেছিল। ----- 'সরকারী চাকুরীর প্রায় সবগুলো পদে কংগ্রেসীদের নিয়োগ করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকার মুসলমানদের উর্দু ভাষার পরিবর্তে হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যম করার দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। সর্বশেষ কংগ্রেস গণ-সংযোগ অভিযানের নামে মুসলমানদেরকে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে টেনে এনে নেহেরু ও গান্ধীর দলে ভিড়ানোর ব্যবস্থা করে।"[১২৬] সি, বি, বার্ড উড লিখছেন, "কংগ্রেসের রাজনৈতিক দর্শন হচ্ছে এমন এক ধরনের টোটালিটারিয়ান নিয়ন্ত্রণ যেখানে সকল প্রকার বিরুদ্ধবাদিতাকে জাতীয় যন্ত্রের মত শোষণ করাই তার নিয়ম।"[১২৭] লন্ডনের ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত (১৮ই আগষ্ট, ১৯৪২) এক পত্রে ভারতীয় খৃষ্টান রেভারেন্ড বানার্জী বলেন, "এ সময়ে কংগ্রেস ছিল জার্মানীর নাৎসী দলের ভারতীয় সংস্করণ।" একজন বৃটিশ পর্যটক এফ, ইয়েটস ব্রাউন লিখছেন, "কংগ্রেস শাসনের প্রথম দু'বারের মধ্যে দাঙ্গা দ্বিগুন হয়েছে।"[১২৮] স্যার জেমস ক্রেয়ার বলেছেন, "কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে এমন বহু ঘটনা ঘটেছে যেগুলি সুপরিকল্পিত এবং মুসলমানদের সন্দেহ প্রমাণের

১২৫। 'Towards Pakistan', by Wahiduzzaman, Page 1
১২৬। 'A Short History of India and Pakistan', টি, ডব্লিউ, ওয়ালব্যাংক, পৃষ্ঠা ১৮৭।
১২৭। 'A Continent Experiments', সি, বি, বার্ডউড, পৃষ্ঠা ১৯।
১২৮। 'The Indian Pageant', এফ, ইয়েটস ব্রাউন, পৃষ্ঠা ১৪৯।
১২৮। 'The Indian Pageant', এফ, ইয়েটস ব্রাউন, পৃষ্ঠা ১৪৯।

www.icsbook.info

জন্যে যথেষ্ট।[১২৯] এল, এফ, রাশব্রুক উইলিয়ামস লিখেছেন, "কংগ্রেস শাসন থেকে সংখ্যালঘুরা এই সত্যই উপলব্ধি করতে পারলো যে, প্রশাসনিক, এমন কি শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। কেননা, বিষয়টা শাসক গোষ্ঠীর মানসিকতার সাথে জড়িত। আর শাসক দল অর্থাৎ কংগ্রেস অপরাপর দলগুলিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরাজিত বলেই মনে করে। তাছাড়া, সমঝোতা বলে কোন শব্দ কংগ্রেসের অভিধানে আছে বলে মনে হয় না। কংগ্রেস কেবলমাত্র নিজেকেই প্রগতি, প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের 'সোল এজেন্ট'বলে মনে করে।"[১৩০]

কংগ্রেস শাসন মুসলমানদের এই উপলব্ধিই দিয়েছিল। ১৯৩৯ সালের ২২শে মার্চ ভারতীয় আইন পরিষদে এক বিতর্ককালে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বললেন, "সে কারণেই তাদের (কংগ্রেসের) প্রতি আমার বক্তব্য হলো, আপনাদের সাথে আমাদের কোন সহযোগিত চলতে পারে না। হয়তো তারা বলবেন, ঠিক আছে এখানে আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। হ্যাঁ, আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারেন, আপনারা অগ্রগামীও থাকতে পারেন, আর্থিক দিক থেকেও আপনারা শক্তিশালী হতে পারেন এবং একথাও আপনারা ভাবতে পারেন যে, সংখ্যা গণনাই এখানে শেষ কথা। কিন্তু আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই, আপনাদের উভয়কেই (সরকার ও কংগ্রেসকে) পরিস্কার করে বলে দিতে চাই, আপনারা এককভাবে বা যৌথভাবে আমাদের এই জাগরণকে বানচাল করতে পারবেন না। যে ইসলামী সংস্কৃতি কৃষ্টির আমরা উত্তরাধিকারী, সেই কৃষ্টি সংস্কৃতিকে আপনারা কোন দিনই ধ্বংস করতে পারবেন না। এই যে প্রেরণা, তা ছিল, এখনও আছে এবং চিরকাল থাকবে। আপনারা আমাদের বল প্রয়োগ দ্বারা কোণঠাসা করতে পারেন, আমাদের উপর জুলুম চালাতে পারেন এবং যা খুশী আমাদের অনিষ্টও আপনারা করতে পারেন, কিন্তু শেষ বারের মতো আমরা এই কঠোর সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি যে, যদি আমাদের ধ্বংসই হয়ে যেতে হয়, তাহলে সংগ্রাম করেই আমরা ধ্বংস হবো।

-----বৃটিশ সরকার আমাদের প্রাথমিক অধিকার ও নাগরিকত্বের মর্যাদা সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে। সংখ্যালঘুদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গভর্নর ও গভর্নর জেনারেল বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি এখন প্রতারণা অপেক্ষাও জঘণ্য প্রমাণিত হয়েছে।"[১৩১] উল্লেখ্য, এর মাস আড়াই আগে মুসলিম লীগের পাটনা সম্মেলনেও মিঃ জিন্নাহ এ ধরনের কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, "কংগ্রেস হিন্দু মুসলিম সমঝোতার আশা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছে।"[১৩২]

১২৯। 'Fortnightly Review, March, 1940, 'India and Her Future' (প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।
১৩০। 'Reflections of Indian Discontent',এল. এফ. রাশব্রুক উইলিয়ামস, পৃষ্ঠা ২৩৮, ২৩৯।
১৩১। 'Speeches and Writings of Mr. Jinnah', জামিল উদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা ৮৪, ৮৫।
১৩২। ঐ, পৃষ্ঠা ৭০।

www.icsbook.info

বৃটিশ সরকারের অধীনে প্রদেশ শাসনের কর্তৃত্ব পেয়ে কংগ্রেস অর্থাৎ হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি যে মারমুখো আচরণ করলো তাতে স্বাধীন ভারতে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের রূপ কেমন হবে তা মুসলমানরা বুঝল। মুসলমানরা উপলব্ধি করল, স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্র মুসলমানদের কোন কাজেই আসবে না। গণতন্ত্রের পোশাকে সংখ্যাগুরুর শাসন ভয়াবহ ধরনের জাতীয় স্বৈরতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করবে। এই উপলব্ধি থেকে মুসলিম লীগ ভাবল, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কিংবা সংখ্যালঘুদের জন্যে শাসনতান্ত্রিক কোন গ্যারান্টি মুসলমানদেরকে সংখ্যাগুরুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবেনা। সুতরাং হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা হওয়া উচিত বলে মুসলিম লীগ মনে করতে লাগল। মিঃ জিন্নাহ ১৯৩৯ সালের শেষ দিকে লন্ডনের ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানকে একটা সাক্ষাতকার দেন। তাতে এই চিন্তারই প্রতিফলন ঘটেছে। সে সাক্ষাতকারে তিনি বলেনঃ "প্রতিনিধিত্বমুলক কোন সরকারের সম্পর্কে মুসলমানদের সর্বদাই ভীতি ও আশঙ্কা ছিল, ভারতে গণতন্ত্র প্রবর্তন সম্পর্কে তো বটেই। ১৯০৮ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কারে ও ১৯১৬ সালে লাক্ষ্ণৌতে হিন্দু মুসলিম চুক্তিতে মুসলমানেরা যে স্বতন্ত্র নির্বাচন, ওয়েটেজ, নির্ধারিত রক্ষা-কবচ চাচ্ছিল, তা ছিল সেই ভীতি ও আশঙ্কারই বহিঃপ্রকাশ। প্রদেশসমূহে এই নতুন শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার পর বিষয়টা (মুসলমানদের আশঙ্কা) সন্দেহাতীত বলেই প্রমাণিত হয়েছে। বিশেষতঃ কংগ্রেস হাই-কমান্ড যেভাবে নিজেদের নীতি ও কর্মসূচী বাস্ত বায়িত করে চলেছেন, তাতে দেশের অপরাপর দলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজেকে নিকৃষ্টতার ফ্যাসিবাদী ও ক্ষমতাশালী দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করাই যে কংগ্রেসের মতলব-তা প্রকট হয়ে উঠেছে। শাসনতন্ত্রের কার্যক্রমের দ্বারা এটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ভারতে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী সরকার গঠন অসম্ভব। কেননা, এর ফলে, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সরকারই চিরদিনের মত হাতিয়ারের সহায়তায় এই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের উপরে নিজেদের শাসন ও প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

সুতরাং অন্যান্য কারণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করেও একথা আমি বলতে পারি যে, আমার বিচার বিবেচনায়, ভারতে গণতন্ত্রের অর্থই হবে হিন্দুরাজ কায়েম করা। কিন্তু মুসলমানেরা এই অবস্থার নিকট কোনক্রমেই নতি স্বীকার করতে পারেনা। এ ছাড়াও ছয় কোটির মত অস্পৃশ্য রয়েছে, প্রায় ষাট লক্ষের মত রয়েছে খৃষ্টান, ইহুদী, পারশিক ও বৃটিশ নাগরিক। সুতরাং সকল দিক সতর্কতার সাথে বিবেচনা করেই মুসলিম লীগ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সমস্যাবলী পুনর্বার নতুন করে বিবেচনা করতে হবে। এবং যেহেতু মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও

www.icsbook.info

প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, সেহেতু মুসলিম লীগের সমর্থন ও অনুমোদন ব্যতীত মহামান্য সরকারের পক্ষে কোন ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি দান করা উচিত হবে না।

মুসলমানেরা ভারতে আজাদী কামনা করে না, এ ধরনের কোন অপপ্রচারে হয়ত বৃটেনবাসীরা বিভ্রান্ত হতে পারেন। আমরা নিঃসন্দেহে আজাদী ও মুক্তি কামনা করি। তবে প্রশ্ন হল যে, মুক্তি কার এবং সে আজাদী কাদের? মুসলিম ভারত পূর্ণ আজাদী ও পূর্ণ মুক্তিই কামনা করে। এবং নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও তামাদ্দুনিক বিষয়সমূহ নিজেদের প্রতিভা অনুযায়ী বিকাশ সাধনের পক্ষপাতী। তারা কারো দ্বারা শাসিত বা ধ্বংস হতে চায় না এবং সেই সাথে তারা এও চায় হিন্দু ভারতেও তারা (হিন্দুরা) অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা লাভ করুক।

কংগ্রেস জোর দিয়ে বলেছে যে, তারাই শুধু ভারতীয়দের প্রতিনিধি। তাদের এই দাবী যে শুধু ভিত্তিহীন তাই নয়, ভারতের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতিবন্ধক। তারা নিজেরাও এটা ভাল করেই জানে যে, তারা গোটা ভারতের প্রতিনিধি নয়। এমনকি তারা গোটা হিন্দু সমাজেরও প্রতিনিধি নয়। মুসলমানদের জন্য তো নয়ই। যদিও তারা পাশ্চাত্যের সাধারণ চলতি অভিমতানুসারে, মুসলমানদেরকে সংখ্যালঘু হিসাবেই অভিহিত করতে চায়, তবুও আসল সত্য এই যে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও বাংলায় মুসলমানেরা নিঃসন্দেহে সংখ্যাগরিষ্ঠ। করাচী থেকে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতের এই এলাকায় যে জনসংখ্যার বাস সংখ্যার দিক থেকে তা গ্রেট বৃটেনের দ্বিগুণ এবং আয়তনের দিক থেকে দশ গুণ বড়। কংগ্রেস যতদিনে অহমিকার এই আসমান থেকে মাটিতে নেমে না আসবে এবং বাস্তবতার মুখোমুখি না দাঁড়াবে ততদিন পর্যন্ত ভারতে অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য দায়ী হবে তারাই। ফ্যাসিবাদ ও গায়ের জোরে আজ তারা যে নীতি ও কর্মসূচী ব্যাপক ভাবে চালু রেখেছে তাতে ভারতে কোন দিনই শান্তি কায়েম হতে পারে না।"[১৩৩]

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো জার্মানী কর্তৃক পোলান্ড আক্রমণের মাধ্যমে। আর ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। যুদ্ধ ঘোষণার পর বৃটেন স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয়দের সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করলো। বৃটেনের এ বেকায়দা অবস্থাকে কংগ্রেস একটা সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করল। ইতিপূর্বেও কংগ্রেস যখনই সুযোগ পেয়েছে বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করেছে। সে স্বার্থটা হলো, ভারতের কর্তৃত্ব একক ভাবে কংগ্রেসের হাতে পাওয়া। এবারও তাই করল। কংগ্রেস সহযোগিতা শর্ত হিসেবে যে দাবীগুলো পেশ করলো, তাকে এ চারটি দফায় ভাগ করা যায়:

(১) বৃটেনকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণা করতে হবে। অন্য কথায় নাৎসীবাদ তথা

১৩৩। 'Speeches and Writings of Mr. Jinnah', জামিল উদ্দীন আহমদ, পৃষ্ঠা ৮৮-৯১।

www.icsbook.info

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই যদি এই যুদ্ধ হয়, তাহলে ভারত থেকেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান করতে হবে এবং ভারতের শাসনব্যবস্থা ও যুদ্ধ পরিচালনায় মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে সহযোগিতার পূর্ণ দায়িত্ব ভারতকেই দিতে হবে।

(২) এই উদ্দেশ্য সাধরনের জন্য গভর্ণর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিল কার্যতঃ বাতিল করে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠন করতে হবে।

(৩) কংগ্রেস ভারতের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান বিধায় ক্যাবিনেট গঠনের দায়িত্ব কংগ্রেসকে দিতে হবে এবং কংগ্রেস মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুদের সঙ্গে ক্যাবিনেট গঠন কার্যে সমঝোতা করবে।

(৪) স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে গণ-পরিষদ গঠন করতে হবে এবং এই গণ-পরিষদ যে শাসনতন্ত্র তৈরী করবে, বৃটিশ সরকার ও পার্লামেন্টকে সেটা চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নিতে হবে।[১৩৪]

কংগ্রেসের এ দাবীর এক কথায় অর্থ কংগ্রেসের হাতে ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। কংগ্রেসই ক্যাবিনেট গঠন করবে, সেই যুদ্ধ পরিচালনা করবে এবং তার নিয়ন্ত্রিত গণপরিষদই চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে, তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তরের আর বাকি কোথায়। ক্যাবিনেট গঠনে মুসলিম লীগের সাথে সমঝোতার কথা কংগ্রেস বলেছে বটে, তবে সমঝোতা হবে কংগ্রেসের কর্তৃত্বের অধীনে। সুতরাং কেমন হবে তা বলাই বাহুল্য। ভারতের ভাইসরয় কংগ্রেসের এ দাবীর জবাবে যা বললেন তা হলোঃ

(১) বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য থেকে যুদ্ধের লক্ষ্য সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা করা যায়। তিনি বলেছেন, পৃথিবীতে সকল দেশের জনসাধারণ যাতে শান্তিতে বাস করতে পারে, আক্রমণের ভয়ে সর্বদা সশঙ্কিত না থাকে সেই ব্যবস্থা করার জন্যই এই যুদ্ধ। এই প্রসঙ্গে অন্যতম বৃটিশ নেতা স্যার স্যামুয়েল হোর বলেছিলেন, বৃটেন সাম্রাজ্যবাদের পর্যায় অতিক্রম করেছে এবং অন্যান্য দেশের জনসাধারণকে স্বায়ত্বশাসনে সাহায্য করাই তার বর্তমান নীতি।

(২) যুদ্ধ চলার সময় নতুন শাসনতন্ত্র তৈরী করার কাজে মনোনিবেশ করা যেতে পারে না। তবে যুদ্ধান্তে বৃটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতাদের ও দেশীয় রাজ্যসমুহের সঙ্গে পরামর্শ করে নতুন শাসনতন্ত্র তৈরীর ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত আছে।

(৩) ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিদের গভর্ণর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং

১৩৪। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪৯১।

www.icsbook.info

তাদের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের জন্য সদস্যদের সমান মর্যাদা, ক্ষমতা ও ভাতা দেওয়া হবে। তাছাড়া যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি পরামর্শ সংস্থা গঠন করা হবে।[১৩৫]

বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবী মানল না, কিন্তু তারা একটা জিনিস মানল, যুদ্ধের পর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বদলে নতুন শাসনতন্ত্র তৈরী করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগও ভারতের বৃটিশ সরকারের কাছে কতিপয় দাবী উত্থাপন করল। ৫ই নভেম্বর (১৯৩৯) লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নাহ যুদ্ধে সহযোগিতার শর্ত হিসেবে নিম্নলিখিত চারটি দাবী উত্থাপন করলেন এবং জবাব চাইলেনঃ

(১) অবস্থানুযায়ী যথাসম্ভব শীঘ্র, অথবা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছাড়াও ভারতের দাবী শাসনতন্ত্রের সমস্যা সম্পূর্ণরূপে নতুনভাবে পরীক্ষা ও পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

(২) ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়, অর্থাৎ মুসলমান ও হিন্দুদের অনুমোদন ও সম্মতি ব্যতীত বৃটিশ সরকার অথবা পার্লামেন্ট (ভারতের) শাসনতন্ত্র তৈরী সম্বন্ধে নীতিগত বা অন্যভাবে কোন ঘোষণা করবে না।

(৩) ফিলিস্তিনের আরবদের সকল ন্যায়সঙ্গত দাবী বৃটিশ সরকারকে পূরণ করতে হবে।

(৪) কোন মুসলিম শক্তি বা দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের নিয়োগ করা হবে না।[১৩৬]

এই দাবী উত্থাপন ছাড়াও জিন্নার চিঠিতে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশ গুলোতে কংগ্রেস সরকার কর্তৃক মুসলমানদের উপর অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার দাবী করা হয়।

ভারতের বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে জিন্নার এ চিঠির জবাব দেয়া হলো ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে। বলা হলো ঃ

(১) আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, বৃটিশ সরকারের অনুমোদন মোতাবেক ১৮ই অক্টোবর তারিখে আমি যে ঘোষণা প্রকাশ করেছিলাম তদ্বারা ১৯৩৫ সালের আইনের কোন অংশ অথবা তৎ-ভিত্তিক কোন নীতি ও পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনার বহির্ভূত নয়।

(২) দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি আপনাকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, ভারতের শাসনতান্ত্রিক গুরুত্ব সম্পর্কে বৃটিশ সরকার সম্পূর্ণ অবহিত এবং এ বিষয়ে কোন ভুল ধারণা থাকা ঠিক নয়।

(৩) বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনে আরবদের যুক্তিসঙ্গত দাবী পূরণের চেষ্টা করে আসছে এবং এর গুরত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

১৩৫। এর জন্যে দৃষ্টব্য 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩।

১৩৬। এর জন্যে দ্রষ্টব্য 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩।

www.icsbook.info

(৪) পরিশেষে আপনি ভারতের বাইরে কোন মুসলিম শক্তি বা দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ না করার বিষয় উল্লেখ করেছেন। সৌভাগ্যবশতঃ প্রশ্নটি অবাস্তব। কারণ, বৃটিশ সরকার কোন মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত নয়। অবশ্য আপনি বুঝতে পারেন যে, এ রকম একটা ব্যাপক নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এর ফলে ভবিষ্যতে অচিন্তিতপূর্ব পরিস্থিতিতে ভারতের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের পরামর্শ অনুযায়ী বৃটিশ সরকার ভারতের মুসলমানদের মনোভাব সংরক্ষণের জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করেছেন”[১৩৭-ক]

এখানে উল্লেখ্য, এর আগে ১লা নভেম্বর, ১৯৩৯, তারিখে ভারতের বৃটিশ ভাইসরয় গান্ধী, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জিন্নাহকে আলোচনার জন্যে ডেকেছিলেন এবং লীগ ও কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরাট ব্যবধানের কথা উল্লেখ করে এ সম্পর্কে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার আগে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতার আহ্বান জানান। এই আহ্বান সামনে রেখে কায়েদে আযম জিন্নাহ সমঝোতার জন্যে নিম্নলিখিত শর্ত আরোপ করেনঃ

“ (১) প্রদেশসমূহে যুক্ত বা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন, (২) প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহে মুসলিম বিরোধী আইন প্রণয়নকালে মুসলমান সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ বিরোধিতা করলে উক্ত রূপ আইন প্রণয়ন করা হবে না, (৩) সরকারী বা পাবলিক ভবনসমূহে কংগ্রেসী পতাকা তোলা যাবে না, (৪) বন্দে মাতরম সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা সমঝোতা করতে হবে, (৫) মুসলিম লীগকে ধ্বংস করার চেষ্টা থেকে কংগ্রেসকে বিরত হতে হবে।”[১৩৭-খ]

মুসলিম লীগের এ শর্তগুলো ভারতের বৃটিশ ভাইসরয় আইন পরিষদে কংগ্রেস দলের প্রধান ভুলাভাই দেশাই-এর সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু গান্ধীর মনোভাব আপোশ আলোচনা বানচাল করে দেয়। ফলে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে, লীগ-কংগ্রেসের মধ্যে সাময়িক যে আপোশ হতে পারতো তা আর হলোনা।

এদিকে কংগ্রেসের দাবী ভারতের বৃটিশ সরকার প্রত্যাখ্যান করায় এর প্রতিবাদে ১৯৩৯ সালের ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে সমস্ত কংগ্রেস মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করল এবং তাদের দাবী মেনে নিতে বৃটিশকে বাধ্য করার জন্য ধর্মঘট, মিছিলসহ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে দিল। এই ব্যাপারটা বৃটিশও ভালভাবেই অনুভব করেছিল। ১৯৩৯ সালের ২রা নভেম্বর বৃটিশ “হাউস অব লর্ডসে” বক্তৃতা দিতে গিয়ে মার্কুইস অব স্যালিসবারী সরকারের পক্ষ থেকে বলেন, “কংগ্রেস আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বৃটেনকে বাধ্য করতে চায়”[১৩৮-ক]

১৩৭-ক। এর জন্যে দ্রষ্টব্য 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩।

১৩৭-খ। এর জন্যে দ্রষ্টব্য 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩।

১৩৮-ক। 'The Struggle for Pakistan', আই.এইচ. কোরায়শী, পৃষ্ঠা ১৪৭।

www.icsbook.info

মুসলমানরা কংগ্রেস শাসন থেকে মুক্তি লাভ করায় মুসলিম লীগ ২২শে ডিসেম্বর 'নাজাত দিবস' ঘোষণা করল।
মুসলিম লীগ কংগ্রেসের নতুন আইন অমান্য আন্দোলনকে ভয়ের চোখে দেখল। যুদ্ধের কারণে দুর্বল হয়ে পড়া বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের সমর্থন আদায়ের জন্যে কংগ্রেসের চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে পারে, এ ভয় তারা করল। এ ভয় তাদের বাড়ল স্যার জাফরুল্লাহ খানের কথায়। জাফরুল্লাহ খান ১৯৪০ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী গোপনে একজন মুসলিম সদস্যকে বললেন, "বৃটিশ সরকার কংগ্রেসকে তোষণের জন্যে অনেকদূর অগ্রসর হতে প্রস্তুত। এমতাবস্থায় কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের কোন রকম সমঝোতায় উপস্থিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, নতুবা you may miss the bus."[১৩৮-খ] স্যার জাফরুল্লাহর কথা অবিশ্বাসের কোন উপায় ছিলনা, কারণ 'তিনি ভারতের বৃটিশ ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল' এর সদস্য বিধায় তিনি অনেক কিছুই জানতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেসের সাথে কোন সমঝোতায় পৌঁছা সম্ভব ছিলনা মুসলিম লীগের। এই কথাই জিন্নাহ বললেন আলিগড়ের এক ছাত্র সভায়। বললেন তিনি, "মিঃ গান্ধীর শর্তে কোন সমঝোতা সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ সম-পর্যায়ভুক্ত গণ্য না করলে সমঝোতা হতে পারে না। যে কোন হিন্দুর মতো আমাদেরও এই দেশের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করার অধিকার আছে। --------কংগ্রেস ক্ষমতা হাতে পেয়ে দেশের উপর হিন্দুদের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখেছিল"[১৩৯]
এই আধিপত্যকে আরও সার্বিক ও সুবিস্তৃত করার জন্যেই কংগ্রেস নতুন করে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করল। এই অবস্থায় কংগ্রেসের সাথে যেমন সমঝোতা সম্ভব নয়, তেমনি এক শাসনতন্ত্রের অধীনে তাদের সাথে বসবাসও সম্ভব নয়। মুসলিম লীগ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছার পরই জিন্নাহ ১৯৪০ সালের ৬ই মার্চ ভারতের বৃটিশ ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাত করে তাকে জানিয়ে দিলেন, "২৩শে মার্চের সাধারণ অধিবেশনে মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের দাবী করবে।'[১৪০] এটা কায়েদে আযমের স্বকল্পিত বা হঠাৎ করে বলা কোন উক্তি ছিলনা। এর দু'দিন আগে ৩রা ও ৪ঠা মার্চ মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

১৩৮-খ। Path way to Pakistan', by. Khaliguzzaman, Page 232

১৩৯। ১৯৪০ সালের ৬ই মার্চ কায়েদে আযম আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সভায় এ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। '(কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪৬৯) এই ছাত্র সভায় কায়েদে আযম আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। সেটা হলো, 'ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয়, তারা স্বতন্ত্র একটা জাতি। স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে তাদের মর্যাদা সব দিক দিয়ে হিন্দুদের সমকক্ষ।'

১৪০। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৫১১।

www.icsbook.info

১৯৪০ সালের ২২শে মার্চ লাহোরে বসল মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক সাধারণ অধিবেশন। চলল ২৩ তারিখ পর্যন্ত। এই অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের আগে মুসলিম লীগ সভাপতি কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যে ভাষণ দিলেন তা ঐ প্রস্তাবের ভূমিকা হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিন্নাহ তাঁর দীর্ঘ ভাষণের একটি অংশে বললেন, "আমি দ্ব্যর্থহীন ভাবে ভারতে স্বাধীনতা চাই। কিন্তু তা ভারতের সকলের জন্য হওয়া চাই, কেবল একটি অংশ অথবা তার চাইতেও খারাপ যা কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন দলের স্বাধীনতা এবং মুসলমান ও সংখ্যালঘুদের দাসত্ব হলে চলবেনা। ---- গত সাড়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতার ফলে আমরা এখন অত্যন্ত আশংকাগ্রস্ত এবং কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনা। কংগ্রেস ও বৃটিশের মধ্যে যে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি (অলিখিত) হতে পারে, একথা আমরা কখনো বিশ্বাস করতে পারিনা। ------ নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তি ব্যতীত আর কারো উপর আপনারা নির্ভর করতে পারেন না। এই হচ্ছে আপনাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। আমাদের একটা দাবী হচ্ছে অবস্থানুযায়ী যথাসম্ভব শীঘ্র অথবা যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সামগ্রিকভাবে নতুন করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং ১৯৩৫ সালের আইন সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। বৃটিশ সরকারকে কোন ঘোষণা করতে বলার উপর আমাদের আস্থা নেই। এই সব ঘোষণার কোন মূল্য নেই। ------- কংগ্রেস বলে, 'প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত গণপরিষদ দ্বারা শাসনতন্ত্র গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে এবং এখনই ভারতকে 'মুক্ত ও স্বাধীন' ঘোষণা করতে হবে। সংখ্যালঘিষ্ঠদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ অবশ্যই এই পরিষদ রক্ষা করবে। যদি তারা (মুসলমানরা) তাতে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে বিষয়গুলি অতি উচ্চ ও নিরপেক্ষ আদালতে মীমাংসার জন্য দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন।' (গান্ধীর) এই প্রস্তাব অবাস্তব ও অকার্যকর। ---- বৃটিশ এদেশ থেকে যাক বা না যাক, (এই প্রস্তাব অনুসারে) ব্যাপক ক্ষমতা জনগণের নিকট হস্তান্তরিত হবে। (সে ক্ষেত্রে) প্রথমতঃ গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠদের সাথে মুসলমানদের মতানৈক্য হলে কে ট্রাইবুন্যাল নিয়োগ করবে? আর যদি বা মতানৈক্যের ফলে সালিশী নিয়োগ করা সম্ভব হয়, তাহলে ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্ত কে কার্যকরী করবে? কার্যত তা করা হচ্ছে কিনা তাই বা কে দেখবে? কারণ তার আগেই তো বৃটিশরা প্রধানত বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। তাহলে ট্রাইবুন্যালের রোয়োদাদ কার্যকরী করবে কে? উত্তর সেই একই - হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠরাই করবে এবং সেটা বৃটিশ বেয়নেট অথবা মিঃ গান্ধীর 'অহিংসা'(?) দ্বারা করা হবে। আমরা কি আর তাদের বিশ্বাস করতে পারি? ---- তিনি (গান্ধী) বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। কিন্তু আমি কি তাঁকে দেখতে পারি যে, তিনি সংগ্রাম করছেন একটা গণপরিষদের জন্যে, যা

www.icsbook.info

মুসলমানরা গ্রহণ করতে রাজী নয়, যেখানে মুসলমানরা হবে এক তৃতীয়াংশ। মুসলমানরা বলতে চায়, এভাবে কেবল মাথা গুণতি দ্বারা তারা কোন মীমাংশায় উপনীত হতে পারবে না, বন্ধুদের সাথে কাজ করতে হলে প্রয়োজন অন্তরের মিল। ----- কেবল আমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চাই।

বৃটিশ সরকার মুসলমানদের উপর কোন শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিক, এ আমরা চাই না। যদি আমাদের বিনা অনুমোদনে ও সম্মতি ছাড়া কোন অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে ভারতের মুসলমানরা তাতে বাধা দেবে। ------- ভুলবশতঃ সর্বদাই মুসলমানদের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে এবং আমরাও বহুদিন যাবৎ এই ধারণা পোষণ করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ (সম্প্রদায়) নয়। যে কোন সংজ্ঞায় মুসলমানরা একটা পৃথক জাতি। ---- এমনকি বৃটিশ ভারতের মানচিত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আমরা এই দেশের বৃহৎ অংশসমূহ দখল করে আছি এবং এই সকল অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ -যথাঃ বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান। ----- হিন্দু মুসলিম সমস্যার শ্রেষ্ঠ সমাধান কি?

এই প্রশ্ন উথাপনে পর মিঃ জিন্নাহ ১৯২৪ সালে চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে ভারতের একজন শীর্ষ হিন্দু নেতা লালা লাজপত রায়ের লেখা একটা চিঠির[১৪১] উল্লেখ করলেন এবং বললেন, "ভারতের সমস্যা আন্তঃ সাম্প্রদায়িক নয়, এটা আন্ত র্জাতিক এবং এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা হচ্ছে, ভারত বিভাগ করে প্রধান জাতিগুলিকে স্বায়ত্ব শাসিত স্বতন্ত্র আবাসভূমি দেওয়া। ----- আমি বুদ্ধিজীবিদের নিকট আবেদন জানাচ্ছি। পৃথিবীর সকল দেশের বুদ্ধিজীবিরাই সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রপথিক হয়েছেন। মুসলিম বুদ্ধিজীবিরা এখন কি করতে চান? বন্ধুগণ আমি আপনাদের মনস্থির করতে বলছি, এবং জনগণকে সংহত করার পন্থা স্থির করতে বলছি। আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করুন। জনগণ সম্পূর্ণ সজাগ রয়েছে। তারা কেবল আপনাদের নেতৃত্বের অপেক্ষায় আছে। ইসলামের সেবক হিসেবে আপনারা এগিয়ে আসুন।"[১৪২]

১৪১। চিত্তরঞ্জন দাসের কাছে লেখা লালা রাজপত রায়ের চিঠির একাংশ ঃ
"একটা বিষয় যা আমাকে অত্যন্ত উদ্বেগগ্রস্ত করে তুলেছে এবং যে সম্পর্কে আমি অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করতে বলি তা হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম একতা। বিগত ছয় মাসের বেশীর ভাগ সময় আমি নিজেকে মুসলিম জাতির ইতিহাস ও আইন শাস্ত্র অধ্যয়নে নিয়োজিত করেছি এবং আমার ধারণা এই ঐক্য সম্ভবও নয়, বাস্তব সম্মতও নয়। অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিম নেতৃবৃন্দের আন্তরিকতা স্বীকার করেও আমি মনে করি তাদের ধর্ম এ রকম কোন কিছুকে কার্যকরী ভাবেই বাধা প্রদান করে। আপনার মনে আছে হাকিম আজমল খান ও ডঃ কিসলুর সাথে আমার যা আলোচনা হয়েছিল তা কোলকাতায় আমি আপনার কাছে রিপোর্ট করি। হিন্দুস্তানে হাকিম আজমল খান অপেক্ষা চমৎকার লোক হতে পারে না। কিন্তু কোন মুসলিম নেতা কি কোরআনকে অতিক্রম করতে পারেন? ----- কিন্তু আমি যা অনুধাবন করেছি তা যদি সত্য হয় তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, যদিও বৃটিশের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হতে পারি, তবুও আমরা বৃটিশ শাসন পদ্ধতি অনুযায়ী শাসন (অর্থাৎ নিছক সংখ্যাগুরুর কর্তৃত্ব) প্রতিষ্ঠা করতে পারিনা। ----- কিন্তু প্রতিকার কী?

১৪২। আমি ভারতের সাত কোটি মুসলমানকে ভয় করিনা। (কারণ সংখ্যায় হিন্দুরা তিনচারগুণ বেশি) কিন্তু হিন্দুস্তানের সাতকোটির সাথে আফগানিস্তান, মধ্যএশিয়া, আরব, মেসোপটেমিয়া ও তুরস্কের সশস্ত্র মোর্চা অপ্রতিরোধ্য।

www.icsbook.info

জিন্নার বক্তৃতার পর অধিবেশনে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হলো। উত্থাপন করলেন তদানীন্তন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ,কে, ফজলুল হক। প্রস্তাবের সমর্থন উত্থাপন করলেন যুক্ত প্রদেশের চৌধুরী খালিকুজ্জামান। তারপর একে একে সমর্থন জানালেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ। উপস্থিত জনসমুদ্রও গগণবিদারী 'আল্লাহু আকবর' আওয়াজ তুলে সমর্থন জানাল যুগান্তকারী এই প্রস্তাবের পক্ষে। প্রস্তাবে বলা হলো ঃ

(১) "নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতি ও কাউন্সিল শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাপারে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এই সভা তাহা সমর্থন ও অনুমোদন করিতেছে এবং এই অভিমত ব্যক্ত করিতেছে যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অঙ্গীভুত যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা দেশের বিশেষ অবস্থায় পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ও অচল; এবং মুসলিম ভারতের পক্ষে গ্রহণের একেবারে অযোগ্য।

(২) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন যে নীতি ও পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে রচিত ভারতের সমস্ত দল, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের সহিত পরামর্শক্রমে তা পুনর্বিবেচিত হইবে বলিয়া সম্রাটের গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে বড়ঘাট ১৯৩৯ সালে ১৮ই অক্টোবর তারিখে ঘোষণা প্রচারিত করেন' এই সভা তাহা আশাপ্রদ বলিয়া মনে করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে যে, সমগ্র শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাটি যদি নতুন করিয়া আদ্যন্ত পরীক্ষিত না হয় তাহা হইলে মুসলিম ভারত সন্তুষ্ট হইবে না এবং তাহাদের সমর্থন ও অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্য কোন পরিকল্পনা তাহাদের পক্ষে বিবেচিত হইবে না।

(৩) প্রস্তাব করিতেছে যে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বর্তমান অধিবেশনের সুচিন্তিত অভিত এই যে, নিম্নলিখিত মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করিয়া রচিত নয় এমন কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকরী ও মুসলিম ভারতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। ভৌগোলিক দিক দিয়া সন্নিহিত অঞ্চলগুলিকে প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক পূনর্বিন্যাস দ্বারা এরূপভাবে পৃথকী'কৃত ও গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম, ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে লইয়া এমন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয় যে তাহার অন্তর্ভুক্ত উপাদানসমূহের প্রত্যেকটি হইতে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম।

(৪) এই সকল অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের ধর্মগত, কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন বিভাগীয় ও অন্য বিষয় সম্বন্ধীয় অধিকার ও স্বার্থ'রক্ষার জন্য তাহাদের সহিত পরামর্শ ক্রমে শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার মধ্যে

--- আমি সত্যই এবং আন্তরিকভাবেই হিন্দু মুসলিম একতায় বিশ্বাস করি (অবশ্য যতক্ষণ মুসলমানদের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে দাবিয়ে রাখা যায়) কিন্তু মুসলিম নেতাদেরকেও বিশ্বাস করতে রাজী আছি (অবশ্য যতক্ষণ তাদের বাধ্য বশংবদ করে রাখা যায়) কিন্তু কোরআন-হাদিসের অনুশাসনের কি হবে? এই মুসলিম নেতৃবৃন্দ তো তার বিরুদ্ধে যেতে পারে না। আমরা কি তখন একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে যাব? আমি আশা করি, আপনার বিদগ্ধ মানস ও প্রজ্ঞা পূর্ণ মস্তিস্ক এই অসুবিধাজনক পরিস্থিতি হতে নিষ্ক্রমণের কোন একটা পথ বের করবে।" (পাকিস্তান আন্দোলন' নাজিম উদ্দিন আহামদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫, তৃতীয় প্রকাশ ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৯৭)।

www.icsbook.info

যথোপযুক্ত কার্যকরী ও আদেশাত্মক রক্ষাব্যবস্থার বিধান করিতে হইবে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলসমূহের মুসলমানরা যেখানে সংখ্যালঘু সে স্থানেও বিশেষ করিয়া মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির ধর্মগত, কৃষ্টিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও ক্রমে যথোপযুক্ত কার্যকরী ও আদেশাত্মক রক্ষা ব্যবস্থার বিধান করিতে হইবে।"[১৪৩]

মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক লাহোর অধিবেশন থেকে দুটি মুল জিনিস বেরিয়ে এল। এক, একটা উপলব্ধির পূর্ণতা, দুই সেই উপলব্ধিজাত নীল নক্সা বা কর্মসূচী। উপলব্ধিটা হলো যে, মুসলমানরা ভারতের সংখ্যালঘু নয়, তারা একটা জাতি। এই সত্যটা সত্য হিসেবে আগেও ছিল, কিন্তু এর উপলব্ধিটা সক্রিয় ছিল না। এই কারণেই ১৯০৯ সালের মার্লি-মিন্টো, ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংখ্যালগু তত্ব তাদের মেনে নিতে আপত্তি হয়নি, বরং সংখ্যাগুরুর কাছ থেকে সংখ্যালঘুর রক্ষাকবচ আদায়ই ছিল তখনকার মূল লক্ষ্য। ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগ অধিবেশনে এবং ১৯৩৭ সালে কায়েদে আযমকে লেখা চিঠিতে আল্লামা ইকবাল মুসলিম জাতি সত্তার স্বতন্ত্র অধিকারের প্রতি স্পষ্ট অংগুলি সংকেত করিছিলেন এবং মওলানা মওদূদী ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত' শীর্ষক লেখায় সংখ্যাগুরু হিন্দুদের অধীনে গণতন্ত্রের অসারতা এবং মুসলমানদের জাতীয়তার যে রূপ তুলে ধরেছিলেন,[১৪৪] তা থেকেই এই হারানো উপলব্ধির সক্রিয় উত্থান শুরু হয় কায়েদে আযমের মধ্যে। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত প্রদেশগুলোতে কংগ্রেসের মুসলিম দলনকারী দুঃশাসন এই উপলব্ধিটিকে জ্বলন্ত করে তুলল যে, সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সজীব জাতি মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসেবে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের অধীনে বাস করতে পারবে না। একটা পূর্ণ জাতি হিসেবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জাতীয় আবাসভূমি তাদের চাই। এই চাওয়া ছিল ঐ মাহান উপলব্ধির একটা মহত্তম পুরস্কার। এ পুরস্কারেরই একটি নাম 'বাংলাদেশ' ভারত উপমহাদেশের পূর্বপ্রান্তে, আরেকটি নাম 'পাকিস্তান' ভারতের পশ্চিম প্রান্তে। এই পুরস্কার গুলিই প্রমাণ করছে ঐ উপলব্ধির উত্থান ছিল কত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত এই উপলব্ধির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উত্থান ও পূর্ণতা লাভ ছিল ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সময়ের সেরা ঘটনা।

১৪৩। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ২৮১, ২৮২।

১৪৪। 'মওলানা রাজনীতিতে ১৯৩৮-৩৯ সালে 'তরজুমানুল কোরআনে' প্রকাশিত এক ধারাবাহিক প্রবন্ধের মাধ্যমে কংগ্রেসের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে মুসলমানদেরকে সাবধান করে দেন। উপরন্তু তিনি এ উপমহাদেশেমুসলমানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করেন। কংগ্রেসের ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ তিনি খুলে দেন এবং প্রমাণ করেন যে, ভারতের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে গণতন্ত্র অনুপযোগী। কারণ এখানে মুসলমানদের এক ভোট এবং তিনটি ভোট রয়েছে কংগ্রেসের। তিনি হিন্দুদের জাতীয় সাম্রাজ্যবাদের নিন্দা করে এ মতামত ব্যক্ত করেন যে, পৃথক নির্বাচন অথবা পরিষদের কিছু বেশী সংখ্যক আসন লাভ এবং চাকুরীর একটা সংখ্যার হার নির্ধারণ মুসলমান জাতির রাজনৈতিক সমস্যার কোন সমাধান নয়। তিনি এ ব্যাপারে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন।" (Evolution of Pakistan,' শরীফুদ্দিন পীরজাদা, পৃষ্ঠা ১৯১)।

www.icsbook.info

৭

ভূ-লণ্ঠিত পতাকার উত্তোলন

উনিশ শ' চল্লিশ সাল পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশের মুসলিম রাজনীতির ধারা একটাই ছিল। সে ধারার বাহক ছিল মুসলিম লীগ। কিছু মুসলিম ব্যক্তি ও সংগঠন কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু তারা ছিল কংগ্রেসী রাজনীতির সাথে যুক্ত, মুসলিম রাজনীতি তারা করেনি। ১৯৪০ সালের পর রাজনীতির এ বহমান স্রোতে ব্যতিক্রমের একটি সুস্পষ্ট বুদ্বুদ উত্থিত হলো। মুসলিম রাজনীতির নতুন এক ধারা এসে পা ফেলল রাজনৈতিক অঙ্গনে। মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের ঠিক ১৭ মাস ২ দিন পর মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া মৌল এক উপলব্ধি মূর্ত হয়ে উঠল জামায়েত ইসলামী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মওলানা মওদূদী ১৯৪১ সালের ২৬ শে আগস্ট জামায়াতে ইসলামী নামক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করলেন যে দর্শনকে সামনে রেখে তা তাঁর ভাষায়ঃ

"দুনিয়াকে ভবিষ্যতের অন্ধকার যুগ থেকে রক্ষা করে তাকে ইসলামের নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, এখানে ইসলামের সঠিক ধারণা ও মতবাদ বিদ্যমান আছে, বরঞ্চ সঠিক মতবাদের সাথে একটি সত্যনিষ্ঠ দলেরও প্রয়োজন। এ দলের সদস্যদেরকে ঈমানের দিক দিয়ে সুদৃঢ় ও অবিচল হতে হবে এবং আমলের দিক থেকে হতে হবে প্রশংসনীয় ও উচ্চমানের। কারণ তাদেরকে সভ্যতা সংস্কৃতির ভ্রান্ত অবস্থা ও রীতি নীতির বিরুদ্ধে কার্যতঃ বিদ্রোহ করতে হবে এবং এপথে আর্থিক কোরবানী থেকে শুরু করে কারাদন্ড এমনকি ফাঁসরি ঝুকিও নিতে হবে।"[১] ১৯৪১ সালের প্রেক্ষাপটে মওলানা মওদূদীর এই উচ্চারণ মনে হয় শুনতে খুবই নতুন, কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা নতুন মোটেই নয়। তিনি মুসলমানদের ভুলে যাওয়া এক মৌল উপলব্ধির উচ্চারণ করেছেন মাত্র। এই উপলব্ধিকে মৌল বলছি এ কারণে যে, মুসলিম জাতির উত্থানই ঘটানো হয়েছে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেয়ার এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার জন্যে, আর মুসলমানরাই বিশেষ কল্যাণের একমাত্র শক্তি।[২] মুসলিম জাতি সৃষ্টির

১। মাসিক 'তরজুমানুল কোরআন', ১৯৪১ এ প্রকাশিত 'এক সালেহ জামায়াত কি জরুরত' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। (উদ্বৃতঃ জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস' আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা ৮৪)।

২। "তোমরা (মুসলমানরাই) বিশ্বে কল্যাণের শক্তি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (সূরা আল-ইমরান, ১১০ আয়াত)

www.icsbook.info

এ লক্ষ্য থেকেই মৌল ঐ উপলব্ধিটি বাংময় হয়ে উঠেছিল। সমকালীন এক উদ্বেগ এবং এক প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে। মওলানা মওদূদীর ভাষায় "আমার এমন এক স্বাধীনতা প্রয়োজন যার সাহায্যে আমি পতনোন্মুখ ইসলামী শক্তিকে সামলাতে পারি, জীবনের যাবতীয় সমস্যাবলী মুসলমান হিসেবে সমাধান করতে পারি এবং হিন্দুস্তানে মুসলিম জাতিকে একটা স্বাধীন জাতি হিসবে দেখতে পারি।[৩] লক্ষনীয়, মওলানা মওদূদী শুধু স্বাধীনতা চাচ্ছেন না, এমন স্বাধীনতা চাচ্ছেন, যা পতনোন্মুখ ইসলামী শক্তিকে নবজীবন দান করবে, এমন স্বাধীনতা তিনি চাচ্ছেন যার দ্বারা মুসলমানরা মুসলমান হিসেবে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাবে। এই উপলব্ধি যা বলছে, তা লাহোর প্রস্তাবের রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকে অনেক ব্যাপকতর, গভীরতর এবং সামগ্রিক। জাতি হিসেবে মুসলমানদের এ এক আবহমান মানস রূপ। সাময়িকভাবে হারিয়ে যাওয়া এ মানস রূপেরই উদ্বোধন করলেন মওলানা মওদূদী সময়ের এক মহা তাকিদ থেকে। মওলানা বললেন, "এখন আমরা যদি মুসলমান থাকতে চাই এবং স্পেন ও সিসিলীতে মুসলমানদের যে দুর্দশা হয়েছিল ভারতের মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা দেখতে যদি আমরা না চাই, তাহলে আমাদের জন্যে একটি মাত্র পথই খোলা আছে। তা হলো এই যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মুখ কুফরী সরকারের[৪] দিক থেকে সত্যনিষ্ঠ সরকারের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা আমরা করব। এ উদ্দেশ্যে আমাদেরকে এক সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্যে বদ্ধপরিকর হতে হবে। তার পরিণাম সাফল্য হোক অথবা মৃত্যু। ...... আমি মনে করি এ জাতিকে বাঁচাতে হলে এই শেষ সুযোগটিই বাকি আছে। আমাদের বিশেষ মহল যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন, আমাদের জনসাধারণের মধ্যে ঈমানের এক দমিত অগ্নিশিখা বিদ্যমান আছে এবং এটাই আমাদের শেষ সম্বল। এটা নির্বাপিত হওয়ার পূর্বে এ থেকে আমরা অনেক কাজ নিতে পারি। শর্ত এই যে কিছু এমন মর্দে মুমিন দাঁড়িয়ে যেতে হবে খালেস নিয়তের সাথে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার জন্যে।[৫] খালেস নিয়তে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করার শর্ত পূরণের জন্যেই জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা হলো ১৯৪১সালে। উপরের আলোচনা থেকে এই আন্দোলনের তিনটি লক্ষ্য বেরিয়ে এলঃ এক, দেশের স্বাধীনতা অর্জন, যেখানে গঠিত হবে মুসলমানদের সরকার, দুই, এই স্বাধীনতা হবে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলমানদের জন্যে

৩। মওলানা মওদূদীর 'মুসলামান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ', গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪। বৃটিশ ভারতে মুসলমানদের অনুসরণীয় পথ সম্পর্কে মওলানার বক্তব্যঃ 'মুসলমানদের জন্যে দেশের এমন স্বাধীনতা সংগ্রাম হারাম যার ফলে অমুসলিম ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতা ভারতীয় অমুসলিমদের হাতে চলে যাবে। তাদের জন্যে এটাও হারাম যে, তারা এ হস্তান্তর ক্রিয়া চুপচাপ বসে থেকে দেখবে। তাদের জন্যে এটাও হারাম যে, তারা ইংরেজ শাসন কায়েম রাখার সহায়ক হবে।" (মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

৫। 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ (মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত)' মওলানা মওদূদী, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

www.icsbook.info

পরিপূর্ণভাবে অর্থবহ। এবং তিন, এ সংগ্রামকে এগিয়ে নেবার জন্যে আত্মনিবেদিত কর্মীদল তৈরী করা। এই তিনটি লক্ষ্যের প্রথমটি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের অনুরূপ এবং শেষ দু'টি জামায়াতে ইসলামীর নিজস্ব। শেষ দু'টি জামায়াতে ইসলামীর নিজস্ব হলেও এ দু'টি ছাড়া যেন লাহোর প্রস্তাব পুর্নাংগ হচ্ছেনা। এখানেই ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী গঠনের সার্থকতা। লাহোর প্রস্তাব যেমন মুসলমানদের অপরিহার্য রাজনৈতিক প্রয়োজনের ফল, ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা তেমনি ইসলাম ও মুসলমানদের অপরিহার্য সামগ্রিক স্বার্থ চিন্তার একটা পরিণতি।

মুসলমানদের রাজনৈতিক চিন্তা ও সাংস্কৃতিক উত্থান পতনের ইতিহাসে ১৯৪১ সালের এই উপলব্ধি একটা যুগান্তকারী ঘটনা। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এক ধারাবাহিকতার নতুন যাত্রা শুরু হলো এর মাধ্যমে। আধুনিক ইতিহাসে ভারতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবীর মাধ্যমে এই ধারাবাহিকতার যাত্রা শুরু। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধোত্তর হতাশার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, ভেবেছিলেন, ভারতে ইসলামের গৌরব ও শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামের শিক্ষা ও চরিত্রে মানুষকে আবার সুসজ্জিত করে তুলতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত একদল লোক এবং ব্যাপক আন্দোলন। এই লোক তৈরীর জন্যেই তিনি দিল্লীতে খুললেন তার বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই বেরিয়ে এলেন শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলবী, বেরিয়ে এলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ, শাহ ইসমাইল শহীদ, প্রমুখের মত বৃটিশ সাম্রাজ্য কাঁপানো হাজারো বিপ্লবী মুজাহিদ। শুরু হলো আন্দোলন, শুরু হলো তাদের দেশকে স্বাধীন করার, মুসলমানদের মুক্ত করার এবং ইসলামকে বিজয়ী করার সংগ্রাম। বাংলাসহ সমগ্র ভারতে পৌনে এক'শ বছর ধরে চলল বৃটিশের বিরুদ্ধে তাদের অসহযোগ এবং সংগ্রাম। বাংলায় তিতুমীরের সংগ্রাম এবং হাজী শরিয়তুল্লাহর ফারায়েজী আন্দোলন ছিল এই আন্দোলনেরই অংশ। অবশেষে সিপাহী বিপ্লবোত্তরকালে বৃটিশের ব্যাপক গণহত্যা, ফাঁসি, দ্বীপান্তর, জেল-জুলুম, ইত্যাদির ফলে এবং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবের কারণে ১৮৭০ সালের দিকে এই আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়, ভূলুন্ঠিত হয় 'শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবীর উত্তোলিত পতাকা'। থেমে যায় মুসলমানদের সার্বিক মুক্ত করার ও ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলন। সেই সাথে শেষ হয়ে যায় মুসলমানদের বৃটিশ বিরোধী শতাব্দী কালের অসহযোগ। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলনের অন্যতম নেতা সিপাহী বিপ্লবের দিল্লী ফ্রন্টের অন্যতম সংগঠক হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী গ্রেফতারের কঠিন পরওয়ানা এড়িয়ে চলে গিয়েছিলেন মক্কা শরীফে। আর সিপাহী বিপ্লবের দিল্লী যুদ্ধে আহত মওলানা কাশেম নানতুবিও বৃটিশ গোয়েন্দাদের শ্যেন

www.icsbook.info

দৃষ্টি পাশ কাটিয়ে দিল্লী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসা। অনুরূপভাবে হাজারো সংগ্রামী আলেম গ্রাম-গ্রামান্তরে স্ফুলিংগ অনির্বাণ রাখার জন্য শিক্ষা দানমূলক দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয়েছিলেন এবং এভাবেই শাহ ওয়ালী উল্লাহ পরিকল্পিত এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ, হাজী শরিয়তুল্লাহ প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের সার্বিক মুক্তি বিধান ও ইসলামকে বিজয়ী করার আন্দোলন তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল জনারণ্যে। অনেক ঘটনার ভীড়ে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের আন্দোলনের পতাকা। এই শূণ্যস্থান পূরণে এগিয়ে এসেছিল বৃটিশের সাথে আপোশকামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এই আন্দোলনই পরবর্তীকালে রূপ নিল বৃটিশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে। এ সংগ্রামের লক্ষ্য হলো দেশ ও জাতিকে ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্ত করা। মুসলমানদের এই বিরাট দায়িত্বই গ্রহণ করেছিল মুসলিম লীগ। মুসলিম জাতির জন্যে একটা আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠাই ছিল তার লক্ষ্য, কিন্তু এই আবাস ভূমিকে ইসলামের রাজ্যে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি তার ছিলনা। বালাকোট, নারকেলবাড়িয়া ও ফরায়েজী আন্দোলনের উত্তরসূরী আলেম সমাজ ভারতের মুক্তি সংগ্রামে এলেন বটে এবং খিলাফত আন্দোলনের মত বিরাট আন্দোলন তারা পরিচালনা করলেন বটে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরীদের দায়িত্ব পালন করলেন না, তাদের ভূলুণ্ঠিত পতাকা তাঁরা তুলে ধরলেন না। ১৯২০ সালে গঠিত হলো জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ। জমিয়ত ইসলামী আদর্শ, মুসলিম কৃষ্টি, পবিত্র স্থান সমূহের মর্যাদা সংরক্ষণ, ইসলামী শিক্ষার অধিকার অর্জন, ইসলামী শিক্ষার আলোকে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন, ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার, ইত্যাদিকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করল। কিন্তু সব লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তি যে কাজ, স্বাধীন ইসলামের প্রতিষ্ঠা, তাকেই তাঁরা পাশ কাটালেন অথবা বর্জন করলেন। শুধু তাই নয়, দেওবন্দ ভিত্তিক আলেমদের প্রধান ও বড় অংশ জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অখন্ড জাতিয়তাকে সমর্থন করল। এরা মুসলিম লীগের আন্দোলনের ক্ষতি করার চেষ্টা অব্যাহত ভাবে চালিয়ে গেছে। অর্থাৎ শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, হাজী শরীয়তুল্লাহর আন্দোলনের ভূলুণ্ঠিত পতাকাকে তারা নির্মমভাবে পদদলিত করেছেন। এই ভূলুণ্ঠিত ও পদদলিত পতাকাকেই উর্ধে তুলে ধরলেন মওলানা মওদূদী ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মওলানা মওদূদীর হাতে শাহ ওয়ালী উল্লাহর ইসলামী আন্দোলন আরও সুন্দর, আরও সুশৃঙ্খল, আরও সুচিন্তিত এবং মহানবী (সঃ) এর শিক্ষা ও আদর্শের আরও ঘনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে উঠল।

১৯৪১ সালে মওলানা মওদূদী কর্তৃক জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা তার এক

www.icsbook.info

যুগেরও বেশী কালের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থায় গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ফল। তিনি তার পর্যবেক্ষণে দেখেছিলেন, "দুনিয়ার ফিৎনা ফাসাদের মূল উৎস হলো মানুষের উপর মানুষের প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব। এ থেকেই অনাচার অকল্যাণের সূচনা হয় এবং এ থেকেই আজ হলাহলের বিষাক্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। ---- কোথাও একটি জাতি আরেকটি জাতির খোদা হয়ে বসেছে, কোথাও এক শ্রেণী আরেক শ্রেণীর খোদা, কোথাও একটি জাতি প্রভুত্ব, কর্তৃত্বের আসন অধিকার করে আছে, কোথাও জাতীয় রাষ্ট্র খোদার আসনে বিরাজমান, কোথাও কোন ডিক্টেটর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন, 'আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদা আছে বলে আমার জানা নেই' (সূরা কাসাস, ৮৩) ---- এটাই হলো সেই অশুভ শক্তি যা মানুষের সকল বিপদ মুসিবত, সকল বিপর্যয় ও ধ্বংস এবং সকল বঞ্চনার মূল কারণ। তার উন্নতি অগ্রগতির পথে এটাই বড় বাধা। --- এর প্রতিকার এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে, মানুষ সকল খোদায়ীর দাবীদার শক্তিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র আল্লাহকে নিজের 'ইলাহ' এবং একমাত্র রাব্বুল আলামীনকে নিজের 'রব' বলে মেনে নেবে ---- এটাই সেই বুনিয়াদী সংস্কার সংশোধনের কাজ যা আল্লাহর মহান নবীগণ মানুষের জীবনে করেছেন।"[৬]
এই মৌল সমস্যার পটভূমিতে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে মওলানা মওদূদীর বক্তব্য হলোঃ 'মুসলমানদের বাঁচার উপায় থাকলে শুধু এর মধ্যেই আছে যে, তাদেরকে আবার নতুন করে জাতির মুবাল্লিগের ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধুমাত্র এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই তারা সেসব জটিলতা থেকে মুক্ত হতে পারে যার মধ্যে তারা এখন নিমজ্জিত আছে। --- এ কথা তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে, ইসলামের নিজস্ব একটা জীবন বিধান আছে। তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা আছে, নিজস্ব রাজনৈতিকও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আছে, তার নিজস্ব চিন্তাধারা আছে, নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা আছে - যা সব দিক দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো থেকে অনেক ভালো ও উচ্চমানের। সভ্যতা সংস্কৃতির ব্যাপারে কারো কাছে হাত পাততে হবে, এ ধারণা তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।"[৭]
মুসলমানদের সার্বিক মুক্তি বিধানই ছিল মওলানা মওদূদীর সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য। এ সার্বিক মুক্তির মধ্যে মুসলমানদের আশু রাজনৈতিক মুক্তির প্রতি মওলানা সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মুসলমানদেরকে হিন্দু জাতি সত্তার মধ্যে গ্রাস করার জন্যে কংগ্রেস যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, মওলানা মওদূদী সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। পন্ডিত নেহেরু তার 'আমার কাহিনী' বইতে হিন্দু মুসলিম এক জাতীয়তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলে মওলানা তার তীব্র

৬। 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস', আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা ৮২।
৭। ঐ, পৃষ্ঠা ৮০।

www.icsbook.info

সমালোচনা করে বললেন, "কথাগুলো কত সুন্দর, কত নির্দোষ, কত অক্ষতিকর, কিন্তু কত হলাহলপূর্ণ। ---- এ নতুন পলিসির দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্টই দেখতে পাবেন যে, এ প্রকৃতপক্ষে একটি 'শুদ্ধি আন্দোলন' ভিন্ন রূপে ও আকারে। এ ধর্মীয় শুদ্ধি নয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শুদ্ধি। এর পরিণাম ফলও তাই যা ধর্মীয় শুদ্ধির ছিল। ---- এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা একজন সুচতুর ব্যক্তি। তিনি (নেহেরু) বলেন, 'তোমরা (মুসলমানরা) জাতিহীনও এবং তোমাদের কোন সভ্যতা নেই। অতএব কোন কিছু পরিত্যাগ করার প্রশ্নইত উঠে না। আসলে তোমরা ভারতীয় জাতির লোক। এসো, আপন জাতির সাথে মিশে যাও, পেটের জন্যে প্রচুর অন্ন জুটবে।'- এটাওত এক চুমুক হলাহল। কিন্তু দেখুন, কত বুদ্ধিমান লোক তা মাতৃস্তন্য মনে করে পান করছে।"[৮] মওলানা মওদূদী, মিঃ গান্ধী, কংগ্রেস নেতা ভুলা ভাই দেশাই, প্রমুখের উক্তি পর্যালোচনা করে দেখান যে, তারা খুব বেশী হলে একটা 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক সেকুলার স্টেট' দিতে পারেন। মওলানা এ ধরনের রাষ্ট্রকেও প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "মুসলমানরা কিছুতেই এ ধরনের রাষ্ট্র মেনে নিতে পারে না। --- মুসলমানদের এতোটা নির্বোধ কি করে মনে করা হল যে, তারা এ ধরনের রাষ্ট্র নিজেদের মস্তকের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে সংগ্রাম করবে? ---- এটি জাতি কি স্বয়ং তার কবর খনন করার জন্যে জীবন বিলিয়ে দেবে?"[৯]

মওলানা মওদূদী কংগ্রেসপন্থী মুসলমানদের কথা ও কাজের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাদের নানা অপপ্রচারের জবাব দেন। একবার বিজনৌরের মাসিক পত্রিকা 'মদিনা'য় কংগ্রেসের ইসলামিয়াত বিভাগের সদস্য মানযার রিজভী 'মিঃ জিন্নার ফাঁকা বুলি' শীর্ষক প্রবন্ধে জিন্নাহকে হেয় করার চেষ্টা করলে মওলানা মওদূদী তার জবাব দিয়ে বললেন, "রিজভী সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গিই ভ্রান্ত এবং মিঃ জিন্নারই ঠিক।"[১০] মওলানা মওদূদী কংগ্রেস পন্থী চিন্তাধারার জন্যে মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদের মত ব্যক্তিদেরও কঠোর সমালোচনা করেন। এক জাতীয়তা সংক্রান্ত মওলানা আজাদের একটা বিবৃতির জবাবে মওলানা মওদূদী 'যমযম' পত্রিকায় লেখেনঃ "আমাদের আসল পজিশন এখন এই যে, যদি তারা (সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু) আমাদের উপর জুলুম করে তাহলে আমাদের কোন কোন প্রতিনিধি সরদার প্যাটেল অথবা অন্য কোন সরদারের কাছে আবেদন নিবেদন করবে। তারপর এ জুলুমের প্রতিকার তখনই সম্ভব যখন নেহায়েৎ মেহেরবানী করে তাঁরা অবস্থার প্রেক্ষিতে কোন প্রতিকার করতে চাইবেন। প্রকৃত পক্ষে এ পজিশন কিছুতেই গোলামীর পজিশন থেকে ভিন্নতর

৮। 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস', আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা ৭১।
৯। ঐ, পৃষ্ঠা ৭৩।
১০। 'মদিনা', *(বিজনৌর), নভেম্বর, সংখ্যা ৩৭ (ঐ, পৃষ্ঠা ৭২)।

www.icsbook.info

নয়, যা এ যাবৎ ইংরেজ শাসনের আমলে আমাদের রয়েছে।"[১১] মওলানা মওদূদীর এই স্পষ্ট ও আপোশহীন ভূমিকার জন্যে মিঃ নেহেরু তাকে 'স্বাধীনতা বিরোধী' এবং সাম্রাজ্যবাদী' বলে আখ্যায়িত করেন। এই সমালোচনার উত্তরে মওলানা মওদূদী বলেন, "আমরা আমাদের নিজেদের কবর খনন করার ব্যাপারে তাদের হাত শক্তিশালী করতে অস্বীকার করছি। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার দুশমন ও সাম্রাজ্যবাদী তারা নিজেরাই, তারা নিজেরাই স্বাধীনতা অর্জন করার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এমন পন্থা অবলম্বন করছেন যা ভারতের এক চতুর্থাংশ অধিবাসী কিছুতেই মেনে নিতে পারে না।"[১২]

এই সব বাক বিতন্ডা এবং কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের জুলুম অত্যাচারের প্রেক্ষিতে হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে অনিশ্চয়তা যখন চারদিকে তীব্র হয়ে উঠল, তখন ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে মওলানা মওদূদী সমস্যা সমাধানের জন্যে তিনটি বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রস্তাবগুলোর মধ্যে পরিস্থিতি সম্পর্কে মওলানার সঠিক বিশ্লেষণ ও ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রমাণ মেলে। বিকল্প প্রস্তাব তিনটি এইঃ

প্রথম প্রস্তাব

"দুই অথবা তার অধিক জাতির দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সঠিক ও সুবিচারপূর্ণ পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

একঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের (International Federation) মূলনীতির ভিত্তিতে। অন্য কথায় এটা একটি মাত্র কোন জাতির রাষ্ট্র হবে না। বরঞ্চ চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহের একটা রাষ্ট্র (A State of Federation) হবে।

দুইঃ এ ফেডারেশনে শরীক প্রত্যেক জাতি সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের (Cultural Autonomy) অধিকারী হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি তার জীবনের বিশেষ পরিমন্ডলে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও সংস্কার সংশোধনের জন্যে সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।

তিনঃ সকলের জন্যে সমান এমন আঞ্চলিক বিষয়সমূহের জন্যে যে কর্ম-পদ্ধতি তৈরি করা হবে তা হবে সমঅংশীদারীত্বের (EQUAL PARTNERSHIP) ভিত্তিতে।

সাংস্কৃতিক স্বায়ত্ত শাসনের মূলনীতি হবে নিম্নরূপঃ

১। যে সব জাতি নিয়ে ফেডারাল রাষ্ট্র হবে তার প্রত্যেকটি (Soveregn) সার্বভৌম হবে, অর্থাৎ সে তার কাজের পরিসীমার মধ্যে আপন এখতিয়ার খাটাতে পারবে।

২। শিক্ষা, ধর্মীয় বিষয়াদি (যথা মসজিদ, উপসানালয়, আওকাফের নিয়ম শৃংখলা, ধর্মীয় নির্দেশাবলী আপন জাতির লোকের উপর কার্যকর করা এবং নির্দেশ লংঘন করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা), বিশেষ সাংস্কৃতিক, সামাজিক বিষয়াদি (যথা বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার) এবং জাতীয় সামাজিক ব্যবস্থায়

১১। 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস,' আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা ৭৩, ৭৪।
১২। ঐ, পৃষ্ঠা ৭২।

www.icsbook.info

(National Social System) প্রত্যেক জাতির পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার থাকবে এবং কেন্দ্রের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে না।

৩। এসব উদ্দেশ্যে প্রত্যেক জাতির পৃথক পৃথক জেলা ও প্রদেশ ভিত্তিক কাউন্সিল থাকবে। এসবের উপর থাকবে একটি সুপ্রীম কাউন্সিল। উপরোক্ত বিষয়গুলি এ সব কাউন্সিলে পেশ করা হবে এবং এসব স্থান থেকেই সে সবের জন্যে আইন বিধি অনুমোদন করা হবে। এসব আইনের মর্যাদা দেশীয় আইন থেকে কম মর্যাদাশীল হবে না। এসব কার্যকর করার জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো (Executive Structure) থাকবে এবং জাতীয় কাউন্সিলের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আইন শৃংখলার ব্যয়ভার বহনের জন্যে কর আরোপ করার ও তা আদায় করার পূর্ব এখতিয়ার এ জাতীয় ব্যবস্থায় থাকবে। দেশের রাজস্ব তহবিল থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রত্যেক জাতির জন্যে বরাদ্দ করা হবে যেমন ফেডারেল রাষ্ট্র সমূহ এবং ফেডারেল কেন্দ্রের মধ্যে অর্থ বন্টন হয়ে থাকে।

৪। চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহের (Federated Nations) মধ্যে অথবা ফেডারেশনের কোন অংশ ও কেন্দ্রের মধ্যে কোন আইন সম্পর্কিত বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা ফেডারেল কোর্ট (Federal Court) করবে।

৫। নিজদের বিশেষ আইন অনুযায়ী মীমাংসার জন্যে প্রত্যেক জাতির স্থায়ী বিচার ব্যবস্থা থাকবে আর কোর্টগুলোর তার পরিপূর্ণ বিচারের এখতিয়ার থাকবে।

তারপর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশ্ন আসে। এ সম্মিলিত শাসন ব্যবস্থা অপরিহার্যরূপে 'সমঅংশীদারীত্বের' নীরি ভিত্তিতে হবে। কারণ এ হচ্ছে সার্বভৌম জাতিসমূহের ফেডারেশন। কোন একটি জাতির একক শাসন ব্যবস্থা নয়।"

দ্বিতীয় প্রস্তাব

"যদি আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের এ কাঠামো গ্রহণ করা না হয় তাহলে দ্বিতীয় এ হতে পারে যে, বিভিন্ন জাতির জন্যে পৃথক পৃথক ভূমি খন্ডের সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। যেখানে তারা তাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বানাতে পারে। অধিবাসী বিনিময়ের জন্যে পচিশ বছর অথবা কমবেশী দশ বছরের মুদ্দৎ নির্ধারিত করতে হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অধিক পরিমাণ আভ্যন্তরীণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতে হবে, ফেডারেল কেন্দ্রের অধিকার কম করা হবে। এ অবস্থায় আমরা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে মিলে একটা ফেডারেল রাষ্ট্র বানাতে শুধু রাজীই হবো না বরঞ্চ একে প্রাধান্য হবে।

এভাবে এটা সম্ভব যে পঁচিশ বছরের মধ্যে মুসলমানগণ ভারতে অন্যান্য অঞ্চল থেকে হিজরত করে এসব অঞ্চলে এসে একত্র হবে এবং হিন্দুগণ নিকটস্থ অঞ্চলগুলোতে চলে যাবে।"

www.icsbook.info

তৃতীয় প্রস্তাব

"এ প্রস্তাবও যদি গৃহীত না হয় তাহলে সর্বশেষ দাবী আমাদের এই হবে যে, আমাদের (মুসলমানদের) জাতীয় রাষ্ট্রগুলো পৃথক ভাবে গঠন করা হোক। তাদের একটা পৃথক ফেডারেশন হবে। এমনকি হিন্দু রাষ্ট্রগুলোরও একটা পৃথক ফেডারেশন হবে। তারপর এ দুই অথবা ততোধিক ফেডারেল রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এই ধরনের (Confederation) হতে পারে যেখানে বিশেষ বিশেষ স্বার্থে যেমন প্রতিরক্ষা, পরিবহন ও বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ে নির্দিষ্ট শর্তে সহযোগিতা হতে পারে।"[১৩]

এ প্রস্তাব পেশের পর মওলানা মওদূদী যে কথাগুলো বলেন তা সেই সময়ের মুসলমানদের নির্ভয় দৃঢ়তাকেই তুলে ধরে। মওলানা বলেন, "আমাদের হিন্দু প্রতিবেশীগণ এবং তাদের ইংরেজ পৃষ্ঠপোশকদের ভালো করে বুঝে নেয়া উচিত যে, বর্তমান শাসনন্ত্র (১৯৩৫ সারে ভারত শাসনআইন)এবং এমন প্রতিটি শাসন ব্যবস্থা যা একজাতীয়তার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে তা কোন অবস্থাতেই আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না।"[১৪]

মওলানা মওদূদী হিন্দু মুসলমান সমস্যা সমাধানের জন্যে যে তিন তিনটি শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, তারই তিন নম্বর বিকল্পটি ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ একটু পরিবর্তিত আকারে মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের আকারে ভারতীয় মুসলমানদের একক এক দাবীতে পরিণত হলো।

এই কারণেই মুসলমানদের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রশ্নে মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে কোন পাথর্ক্যই ছিল না। জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে আদর্শিক আন্দোলন অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলন চালাবার সাথে সাথে মওলানা মওদূদী দৃঢ়তার সাথে তার রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করেছেন যা ছিল ঐ সময়ের একান্ত দাবী। বিশেষ করে কংগ্রেসের ঐ সব আলেম ও মুসলমানের পক্ষ থেকে যখন প্রশ্ন তোলা হলো ভারতকে খন্ড-বিখন্ড করা সহ্য করা যায় কিভাবে, তখন মওলানা মওদূদী বললেন, "মুসলমান হিসেবে আমার কাছে এ প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব নেই যে ভারত অখন্ড থাকবে, না দশ খন্ডে বিভক্ত হবে। সমস্ত পৃথিবী এক দেশ। মানুষ তাকে সহস্র খন্ডে বিভক্ত করেছে। আজ পর্যন্ত পৃথিবী যত খন্ডে বিভক্ত হয়েছে, তা যদি ন্যায় সংগত হয়ে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে আরও কিছু খন্ডে বিভক্ত হলেই বা ক্ষতিটা কি? এ দেব প্রতিমা খন্ড বিখন্ড হলে মনঃকষ্ট তাদের যারা তাকে দেবতা মনে করে। আমি যদি এখানে এক বর্গমাইলও এমন জায়গা পাই যেখানে মানষের উপর খোদা ব্যতীত অন্য কারো প্রভূত্ব কর্তৃত্ব থাকবে না, তাহলে এ সামান্য ভূমিখন্ডকে আমি সমগ্র ভারত

১৩। 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস', আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা ৭৪, ৭৫, ৭৬।
১৪। 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস', আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা ৭৬।

www.icsbook.info

অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান মনে করব।"[১৫] কংগ্রেসী মুসলমান ছিল মুষ্টিমেয়। কিন্তু কংগ্রেসী সুতার টানে তাদের নর্তন কুর্দন ছিল খুব বেশী। তারা অভিযোগ তুলল মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী এবং ইহুদীদের ফিলিস্তিন দাবীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এর দাঁত ভাঙা জবাব দিয়েছেন মওলানা মওদূদী। তিনি বলেন, "পাকিস্তান দাবীর সাথে ইহুদিদের জাতীয় আবাসভূমির দাবীর কোন তুলনা হতে পারে না। ফিলিস্তিন প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদের আবাস ভূমি নয়। ইহুদীদের এ অবস্থা নয় যে, জাতীয় আবাসভূমি স্বরূপ তাদের একটা দেশ আছে যার স্বীকৃতির জন্যে তারা চেষ্টা করছে। বরঞ্চ তাদের দাবী হলো, তাদের জাতীয় আবাসভূমি নয় এমন একটা দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এনে তাদের বসবাসের সুযোগ দেয়া হোক এবং বলপূর্বক সে দেশকে তাদের জাতীয় আবাসভূমি বানিয়ে দেয়া হোক। পক্ষান্তরে পাকিস্তান দাবীর ভিত্তি এই যে, যে সব অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেগুলো তাদের জাতীয় আবাসভূমি। মুসলমানদের বক্তব্য এই যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সংগে এক হয়ে থাকার ফলে তাদের জাতীয় আবাসভূমির রাজনৈতিক সত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে তা থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হোক এবং অখন্ড ভারতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিবর্তে হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারত নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র হোক। অন্য কথায় মুসলমানদের এ দাবী নয় যে, তাদের জন্যে একটা জাতীয় আবাসভূমি বর্তমান রয়েছে স্বতন্ত্রভাবে সেখানে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েম করার অধিকার তাদের দেয়া হোক।"[১৬]

এইভাবে মওলানা মওদূদীরপক্ষ থেকে সেদিন পাকিস্তান দাবীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যাখ্যা পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল। বিশেষ করে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদের উপর লেখা তাঁর 'মাসয়ালায়ে কাউমিয়াত' গ্রন্থটি পাকিস্তান আন্দোলনকে সীমাহীন সহায়তা দান করে। কংগ্রেস পন্থী মওলানা হুসাইন আহমদ মাদানির একজাতীয়তাবাদের মতবাদ খন্ডন একমাত্র মওলানা মওদূদীই করেছিলেন। মওলানা মওদূদীর ঐ গ্রন্থটির লাখ লাখ কপি বিতরণ করা হয়েছিল গোটা ভারতে। বস্তুত মুসলিম জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় আবাসভূমির প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোন থেকে জিন্নাহ ও মওলানা মওদূদী একই অবস্থানে ছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মওলানা মওদূদী বরং অধিকতর স্পষ্ট ছিলেন। নয়া দিল্লী তেকে প্রকাশিত "The Jamaat-Islami of Pakistan" গ্রন্থে এই দিকটি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ

"কতকগুলো ক্ষেত্রে মওলানা মওদূদীর যুক্তি জিন্নার চেয়ে সুশৃংখল ও অকাট্য।

১৫। 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাশ', মওলানা মওদূদী (জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২১৫, ২১৬)
১৬। 'তর্জুমানুল কোরআন', জুলাই-অক্টোবর সংখ্যা, ১৯৪৪।

www.icsbook.info

সাধারণ মুসলমানদের মতে মওলানা মওদূদী ও জিন্নাহ একই কথা বলছেন। যেমন জিন্নাহ ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে বলেছিলেন, 'হিন্দু ও মুসলমান দুইটি স্বতন্ত্র ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক রীতি-নীতি ও সাহিত্যের অধিকারী। তাদের একে অপরের মধ্যে বিয়ে হয় না, তারা সঙ্গে বসে খায় না এবং তারা দুই দ্বন্দ্বমান ধারণা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তিশীল দুই সভ্যতার অধিকারী। এই দুই জাতির ইতিহাসের দুই উৎস থেকে প্রেরণা পেয়ে থাকে। তাদের বীর আলাদা, কাব্য আলাদা, কাহিনী আলাদা।" ঠিক এই সময়েই মওলানা মওদূদী বলেন, "সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ইতিহাস শিক্ষার ধারাবাহিকতা থেকে একটি জাতি তার জাতীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়। যখন কোন জনগোষ্ঠী দীর্ঘ সময় ধরে একই ধরনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নৈতিক ধারণার মধ্যে বাস করে, তখন তারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ধারণ করে। তাদের এই ঐতিহ্য চেতনা এক জেনারেশন থেকে আরেক জেনারেশনে প্রবাহিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তারা যৌথ সত্তা লাভ করে একটা জাতিতে পরিণত হয়। একটি জাতির থাকে নির্দিষ্ট অভ্যাস ও রীতি-নীতি যাতে তারা অভ্যস্ত হয়, থাকে তাদের নির্দিষ্ট জীবনবোধ, যাকে তারা ভালোবাসে এবং এই সব কিছুর যোগফল যা তাই হলো সংস্কৃতি।" এই ভাবে মওলানা মওদূদী তাঁর কথার উপসংহার টেনে বলেন যে, "মুসলমানরা এই বৈশিষ্টের দিক দিয়েও একটা স্বতন্ত্র জাতি।" এছাড়া অখন্ড ভারতে মুসলমানদের ভাগ্য সম্পর্কে জিন্নাহ ও মওদূদী একই ধরনের ভয় পোষণ করতেন। জিন্নাহ বলেন, 'মুসলিম ভারত এমন কোন শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে একমত হতে পারে না যা একটা হিন্দু সংখ্যাগুরু সরকারের জন্ম দেবে। হিন্দু মুসলমানকে একত্র করে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেবার অর্থ হবে হিন্দু রাজত্ব।' মওদূদীও ঠিক একই কথা বলেন। তাঁর ঘোষণা, "ভারতে যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্যে পৃথক নির্বাচন কিংবা অন্য কোন প্রকার রক্ষা ব্যবস্থাই তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে না।' বস্তুত মওদূদী যা বলছিলেন, দেখা যাবে মুসলিম লীগ তাই দাবী করছিলেন।"[ক]

মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর এই রাজনৈতিক ঐক্য দেখে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে মওলানা তাহলে মুসলিম লীগে যোগ না দিয়ে জামায়াতে ইসলামী গঠন করতে গেলেন কেন? এ ব্যাপারে আগেই কিছুটা বলা হয়েছে যে, মুসলিম লীগ শুধুমাত্র মুসলানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্যে আন্দোলন করছিল। এ জন্যেই আমরা দেখি কায়েদে আযম মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দাবীকেও রাজনৈতিক পোশাক পরিয়ে পরিবেশন করছেন। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থ নিয়ে, যার ভিত্তি ইসলামী জীবনবোধ।

ক। 'The Jamaat- Islami of Pakistan', Kalim Bahadur, Chetana Publication, New Dellhi, Page 40,41

www.icsbook.info

এই কারণেই দুই দলের সামগ্রিক দৃষ্টিভংগী এক হয়নি। যেমন বলা যায়, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে মুসলিম লীগ ১৯৩৭ সালে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে এবং সরকার গঠনে রাজী হয়েছে। কিন্তু মওলানা এই পদক্ষেপকে মুসলিম স্বার্থের অনুকুল মনে করেন নি। মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কা সে সময় আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল, যার প্রকাশ আমরা দেখি ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে ধারবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর 'মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত' নিবন্ধে। এ সময়ের অবস্থা সম্পর্কে মওলানা মওদূদী লিখেন, "--------১৯৩৭ সালে এ আশংস্কা দেখা দিল যে ভারতের মুসলমানরা ঐ ভৌগলিক জাতীয়তার শিকার হয়ে না পড়ে যা প্রবল ঝনঝার ন্যায় গোটা দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। ------ অতএব এ আশংকা নির্মূল করার জন্যে আমি পত্রিকায় 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' শীর্ষক প্রব্ধ ধারাবাহিকভাবে ১৯৩৭ সালের শেষে এবং ১৯৩৮ সালে লিখি, যা ১৯৩৯ সালের প্রারম্ভে পুস্তকাকারে প্রকাশ লাভ করে। এসব নিবন্ধাদিতে আমার লক্ষ্য ছিল এই যে, মুসলমানরা যেন অন্তত পক্ষে তাদের মুসলমানিত্বের নিম্নস্তরে নেমে না যায় এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা হারিয়ে না ফেলে। এজন্যে আমি তাদের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তার অনুভুতি জাগ্রত করার চেষ্টা করি। তাদেরকে সেই গণতান্ত্রিক ধর্মহীন শাসন ব্যবস্থার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেই, যা একজাতীয়তার ধারণার ভিত্তিতে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছিল। সেই সাথে ঐ সব 'আইনানুগ রক্ষাকবচ এবং মৌলিক অধিকার' এর তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করি যার উপর আস্থা পোষণ করে মুসলমানগণ ঐ ভয়াবহ গণতান্ত্রিক সংবিধানের জালে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করছিল। একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তিই এখানে ইসলামকে সমুন্নত দেখতে চায় সে অবশ্যই এ ধারণা পোষণ করবে যে তার নিকটে পূর্ব থেকেই যে পুঁজি মওজুদ আছে তা যেন নষ্ট হয়ে না যায়। তারপর সে অতিরিক্ত পুঁজি লাভ করার চেষ্টা করবে। যারা প্রথম থেকে কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'তে বিশ্বাসী এবং নিজেদেরকে মুসলমান বলে, তাদের সম্পর্কেই আমাদের প্রথমে চিন্তা করা দরকার। তারা যেন বিনষ্ট হয়ে না যায়। এ জন্যে আমি আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করি যাতে মুসলমানদেরকে অমুসলিম জাতীয়তার মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা যায় এবং তাদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করা যায় যে তারা একটি স্থায়ী জাতীয়তার ধারক ও বাহক। তাদের জন্যে এ কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তারা অন্য জাতির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।"[১৭]

প্রমাণিত হয়েছে মওলানা মওদূদীর এ দৃষ্টিভংগীই সঠিক ছিল। মুসলিম লীগ

১৭। 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস', আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা ২১৮, ২১৯।

www.icsbook.info

ও কায়েদে আযম পরে এই নীতিতেই ফিরে এসেছিলেন। তারা এ চূড়ান্ত উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন যে, বিপুল হিন্দু সংখ্যাগুরুত্বের মধ্যে গণতন্ত্র মুসলমানদের জন্যে কোন রক্ষাকবচ নয়, এমনকি অখন্ড ভারতে একক একটি রাষ্ট্রে কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক গ্যারান্টিই মুসলমানদের জন্যে যথেষ্ট হবে না এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো তারা বুঝলেন যে, মুসলমানরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জাতি, তাদের আবাসভূমিও ভারতে চিহ্নিত যেখানে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা ভারতে এক রাষ্ট্র এক শাসনতন্ত্রের অধীনে নিজেদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করে ধ্বংসের পথে যেতে পারে না। বস্তুত মওলানা মওদূদী মুসলমানদের মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টির জন্যে ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে প্রাণপাত প্রচেষ্ট চালিয়েছিলেন। ১৯৩৯ সালে মুসলিম লীগ ও কায়েদে আযম যখন এই উপলব্ধিতে পৌঁছিলেন, তখন মওলানা মওদূদী স্বস্তি প্রকাশ করে লিখেছিলেন, "আমি এখন দেখছি যে, মুসলিম জাতি খোদার ফজলে হিন্দু জাতির মধ্যে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেছে। তাদের মধ্যে আপন জাতীয়তার অনুকুলে এতোটা মজবুত হয়েছে যে, কোন নেহেরু এবং গান্ধীর সাধ্য নেই যে, তাদেরকে হিন্দু এবং ভারতীয় জাতীয়তার মধ্যে একীভূত করে ফেলে।"[১৮] মওলানার ১৯৩৯ সালের এ ভবিষ্যত বাণী বা অনুমান সত্য প্রমাণ হয়েছিল। নেহেরু গান্ধীর কোন ছল-চাতুরীই ল্যাহোর প্রস্তাব ঠেকাতে পারেনি।

বস্তুত সামগ্রিক লক্ষ্যগত পার্থক্য অর্থাৎ মুসলিম লীগের অসম্পূর্ণতার কারণেই মওলানা মওদূদী মুসলিম লীগে যোগ দিতে পারেন নি এবং জামায়াতে ইসলামী গঠন তাঁর জন্যে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি মওলানাকে চিঠি লিখলে তার জবাবে মওলানা লীগের এ অসম্পূর্ণতার কথাই তুলে ধরেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "আপনারা কখনও এ কথা মনে করবেন না যে কোন প্রকার মতানৈক্যের কারণে আমি অংশগ্রহণ করছি না। প্রকৃত পক্ষে আমার অক্ষমতা এই যে, আমি বুঝতে পারছি না যদি অংশ গ্রহণ করি তাহলে কিভাবে করব। অর্ধ বা অসম্পূর্ণ উপায় পদ্ধতি আমার মনে ধরে না।"[১৯] মুসলিম লীগের এই অসম্পূর্ণতার পটভূমিতে জামায়াতে ইসলামী গঠনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মওলানা যা বলেছেন তা এইঃ "যদি আমাদের লক্ষ্য হয় ইসলামের প্রতিষ্ঠা, তাহলে সে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে আমাদের জাতিকে নৈতিক দিক দিয়ে তৈরী করে নিতে হবে। এর জন্যে শিক্ষা, দীক্ষা, চিন্তাধারা, নৈতিকতা, তাহযীব তামাদ্দুন, রাজনীতি, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই আমাদেরকে কাজ করতে হবে। এই কাজ ছাড়া এ উদ্দেশ্য সফল হওয়া বড় কঠিন। ---- এ আন্দোলনে সঠিকভাবে ও সকল বিভাগে নেতৃত্ব নির্বাচনে অতি সাবধানতার সাথে কাজ করতে হবে।

১৮। 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস', আব্বাস আলী খান, পৃষ্ঠা ২২১, ২২০।
১৯। 'তর্জুমানুল কোরআন', জুলাই-অক্টোবার, ১৯৪৪ (উদ্বৃত, ঐ পৃষ্ঠা ২১৫)।

www.icsbook.info

সমাজতন্ত্রী, নাস্তিক, ধর্মহীন, জায়গীরদার, জমিদার, প্রভৃতি সকলকে একস্থানে একত্র করলে যে ভীড় জমে ওঠে তা কোন দিনই জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে না। এরা তো একে অপরের ধ্বংস সাধনে ও নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই জাতিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। ফলে গন্তব্য স্থান থেকে লক্ষ্যচ্যুত হতে হবে। .... মুসলমানদের মৌলিক বৈশিষ্ট এই যে তারা একটি আদর্শবাদী ও সত্যের দিকে আহ্বানকারী দল। কোন মূল্যেই যেনতার এ বৈশিষ্ট প্রভাবিত না হয়।"[২০]

এক কথায় মুসলিম লীগ ছিল মুসলমানদের রাজনৈতিক আন্দোলন, আর জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মুসলমানদের সামগ্রিক স্বার্থের আন্দোলন অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলন হিসেবে। এ ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল শুধু বৃটিশ ভারত নয়, এর লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা উত্তর ভারতও। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জিত হলেই অর্থাৎ মুসলমানদের স্বাধীনতা অর্জিত হলেই মুসলিম লীগের কাজ লক্ষ্যগত দিক থেকে শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তখনই প্রকৃতপক্ষে শুরু হবে রাষ্ট্রপরিচালনা ছাড়াও জাতি হিসেবে মুসলমানদের পূর্ণ বিকাশ ঘটানোর আসল কাজ। এ বিরাট ও মহান কাজ আঞ্জাম দেওয়া ছিল জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যগত দিক থেকে জামায়াতে ইসলামীর কাজ ভৌগলিক সীমানা ও কালের বাঁধনে আবদ্ধ নয়। মুসলিম ভারত, হিন্দু ভারত- দু'জায়গাই তার কাজের সমান ক্ষেত্র। তাই তো স্বাধীনতা উত্তরকালে আমরা দেখছি, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, শ্রীলংকা সব জায়গায় জামায়াতে ইসলামী মুসলিম জাতিগঠন ও ইসলামী রেনেসাঁর কাজে প্রাণপাত চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বস্তুত ১৯৪১ সালে মওলানা মওদূদী কর্তৃক জামায়াতে ইসলামী গঠন ছিল হিমালয়ান উপমহাদেশের মুসলিম জীবনে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের এই যে পতাকা মওলানা মওদূদী পুনঃ উত্তোলন করলেন, তা এই হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রোথিত হয়েছিল খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী, হযরত শাহ জালাল, শাহ মখদুম, খান জাহান আলী, শেখ আহমদ সরহিন্দী, শাহওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, হাজি শরীয়তুল্লাহ প্রমুখ মুসলিম জননেতাদের দ্বারা এবং সর্বশেষে তা ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল উনিশ শতকের ষাটের দশকে ইসলামকে বিজয়ী করা ও বৃটিশকে উৎখাত করার শত বছর ব্যাপী সংগ্রামের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে। সুতরাং ১৯৪১ সালে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের পুনরুত্থান ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। উপমহাদেশীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক জীবনের সাথে এর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।

২০। 'জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস', পৃষ্ঠা ২১৪।

www.icsbook.info

বিজয় এল বাস্তবতার

জি, আল্লানার ভাষায় "২৩শে মার্চ (১৯৪০) তারিখে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হিন্দু ও কংগ্রেস আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল। মুসলিম লীগ যে এখন ভারত বিভক্ত করে দু'টো স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য দাবী করেছে, এটা তারা বুঝতে পারল। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল তারা। গর্জাতে লাগলেন হিন্দু নেতারা। এই প্রস্তাবের নিন্দাবাদ করার জন্যে হিন্দুরা একে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' আখ্যা দিল।[১] মুসলিম লীগও তাদের অভিযোগে খুশী হয়ে বলল, "হ্যা, ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ তারিখের প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব।"[২]

অনেক হিন্দু নেতা পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদগার করে বললেন, 'উন্মাদ ভিন্ন আর কেউ এতে বিশ্বাস করতে পারে না।' নেহেরু একে 'কাল্পনিক' আখ্যায়িত করে বললেন, 'এ হলো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিড়ালের থাবার মতো' তিনি ঘোষণা করলেন, 'ভারতের সংবিধান স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং জাতীয় একতার উপর ভিত্তি করে তৈরী করতে হবে।'[৩] আর গান্ধী বললেন, "মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব আমাকে হতবুদ্ধি করেছে।" তিনি আরও বললেন, "ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করার পূর্বে আমার অঙ্গচ্ছেদ কর।"[৪]

জাঁদরেল হিন্দু নেতারাও এতটা বেসামাল হয়ে পড়ার কারণ, তারা কল্পনা করেনি যে, দুর্বল সংখ্যালঘুদের সংগঠন মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের মত দাবী তোলার সাহস সত্যিই পাবে। তাদের কল্পনাতীত বিষয় যখন তাদের সামনে বাস্তব রূপ নিয়ে হাজির হলো, তখন তারা সত্যিই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল তারা 'মুসলিম জাতি' নামক অত্যন্ত মূল্যবান শিকারটি হাত ছাড়া

১। ১৯৩২ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী তার 'Now or Never' পুস্তিকায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল যেমন পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ইরান, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, প্রভৃতি নিয়ে 'পাকিস্তান' নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব থেকেই 'পাকিস্তান' নামের উদ্ভব।

২। 'Quid -e-Azam', জি, আল্লানা, পৃষ্ঠা ৩১৯, ৩২০।

৩। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১৪০।

৪। 'কালেকটেড অয়াকর্স অব মহাত্মা গান্ধী', একান্ন খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৭ এবং 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৫২৪।

www.icsbook.info

হয়ে যাবার আশংকায়। হিন্দু নেতাদের ক্রোধ ও আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হলেন কায়েদে আযম। তাদের অনেক গাল-মন্দ ও অভিযোগ শোনার পর কায়েদে আযম জবাবে বললেন,[৫] "আমি মিঃ গান্ধী থেকে শুরু করবো। তিনি বলছেন যে, এর দ্বারা ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করা হবে। কথাটা শুনতেই আতংক উপস্থিত হয়। মুসলমানরা যাতে ভারতের অঙ্গচ্ছেদ না করে সে জন্যে কি তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে? জিজ্ঞাসা করি, ভারত কবে এক ছিল? কখনো এক ছিল কি? অঙ্গচ্ছেদ শব্দটা ব্যবহার করা হচ্ছে কেন? এরপর তাঁর (গান্ধীর) শিষ্য মিঃ রাজা গোপালচার্য আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, এটা যেন একটা শিশুকে দ্বিখন্ডিত করার মত। জিজ্ঞাসা করি, শিশুটা কোথায় যে তাকে দ্বিখন্ডিত করা হচ্ছে? এটাও যথেষ্ট হলো না মনে করে তিনি আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, এটা যেন দুই হিন্দু ভাই ঝগড়া করছে ও তাদেরএকজন গো'মাতাকে দু'টুকরা করতে চাচ্ছে। .....সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মনোভাবের প্রতি আমি পরম শ্রদ্ধা পোষণ করি। কিন্তু রাজা গোপালাচার্যর মতো একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমি 'গো'মাতাকে' দু'টুকরো করার প্রস্তাব করছি- এই উপমা দিয়ে যখন হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগ আরো উত্তেজিত করতে চান, তখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁদের আর কোন যুক্তি না থাকায় এই নৈরাশ্যজনক পন্থা অবলম্বন করেছেন।"[৬]

নেহেরু লাহোর প্রস্তাবকে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের থাবা' বলে অভিহিত করে এর বিরুদ্ধে মানুষকে বিক্ষুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ এই যে, বৃটিশরা এবং বৃটিশ সরকার লাহোর প্রস্তাবকে সুদৃষ্টিতে দেখেননি। লাহোর প্রস্তাবের ব্যাপারে বৃটিশের যে তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ ঘটেছিল সেটা কংগ্রেসের খুবই কাছাকাছি। ১৯৪০ সালের ২রা এপ্রিল ইংল্যান্ডের 'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' বলে, "তিনি (কায়েদে আযম) ভারতীয় রাজনীতিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন এবং পাকিস্তান দাবী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বুকে আঘাত করেছে ও এর ফলে ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের অগ্রগতি ব্যাহত হবে।"[৭] এর ২০ দিন পরে বৃটিশ সেক্রেটারী অব স্টেট মিঃ এমারীও অনুরূপ উক্তি করেন। তিনি বলেন, "---এই তথাকথিত পাকিস্তান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে যে বিপুল অসুবিধা রয়েছে সে সম্বন্ধে আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না। ---- কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা ভারতকে যে ঐক্য, আভ্যন্তরীণ শান্তিও আইনের শাসন দিয়েছি, সেটা বৃটিশের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নয়।"[৮]

৫। ১৯৪১ সালের ২রা মার্চ মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের বিশেষ অধিবেশনে কায়েদে আযমের বক্তৃতা।
৬। 'Speches & Writings of Mr. Jinnah', পৃষ্ঠা ২২১, ২৩০।
৭। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৫৪০।
৮। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৫৪০।

www.icsbook.info

সম্মুখ পথে মুসলিম লীগকে কাবু করা যাচ্ছে না দেখে কংগ্রেস মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও মুসলিম লীগে ভাঙন সৃষ্টির হীন পথ অনুসরণ করলো। এ কাজে তারা ব্যবহার করলো কংগ্রেসী মুসলমানদের। কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদকে দিয়ে পাঞ্জাবের লীগ নেতা শওকত হায়াতকে লীগ থেকে ভাগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হলো।[৯] কায়েদে আযম যথাসময়ে জানতে পারায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়। পাঞ্জাবের মত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাতেও কংগ্রেস এই প্রচেষ্ট চালায়।[১০] কংগ্রেসের এই প্রচেষ্টা সফল হয় সিন্ধুতে। কারণ সিন্ধুর প্রধানমন্ত্রী খান বাহাদুর আল্লাবকস ছিলেন একজন কংগ্রেস পন্থী। এই আল্লাবকস দিল্লীতে একটি সম্মেলন ডেকে কংগ্রেসের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে ঘোষণা করলেন, "ভারতের নয় কোটি মুসলমান ভারতের আদি অধিবাসীদের বংশধর ও উত্তরাধিকারী এবং তারা এই মাটিরই সন্তান। ধর্মান্তর কোন ক্রমেই জাতীয়তা পৃথক করতে পারে না।"[১১] কিন্তু এসব করে কংগ্রেস মুসলিম জনমতের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারল না। বরং যে কংগ্রেসী মুসলমানরা এসব কাজে অংশ নিল তারা মুসলিম মহলে নিন্দিত হলো। শেরে বাংলার মত সর্বজন প্রিয় নেতাও বাংলায় কংগ্রেসের সাথে মিলে মন্ত্রীসভা গঠন করায় মানুষের ব্যাপক অনন্তুষ্টি কুড়িয়েছিলেন। এই অবস্থায় কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আবুল কালাম আজাদ জিন্নার স্মরণাপন্ন হলেন। ১৯৪০ সালের ১২ জুলাই তিনি এক গোপন তারবার্তায় জিন্নাহকে লিখলেন, "--- কংগ্রেসের দিল্লী প্রস্তাবে জাতীয় সরকার বলতে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে গঠিত সরকার বুঝায়, একদলীয় সরকারের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তি বাদ দিয়ে সাময়িক বন্দোবস্তে যোগ দিতে কি লীগ রাজী হতে পারে না? যতি তাই হয়, তারযোগে বিষয়টি পরিস্কার জানান।"[১২] এর জবাবী তারবার্তায় কায়েদে আযম বললেন, "আপনার টেলিগ্রাম আস্থা সৃষ্টি করে না। পত্র দ্বারা বা অন্য উপায়েও আমি আপনার সাথে আলোচনা করতে অস্বীকার করি। কারণ আপনি মুসলিম ভারতের সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়েছেন। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, আপনাকে মাত্র 'লোক দেখানো' কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে ও তদ্বারা বাইরের দেশগুলোকে প্রতারণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনি মুসলমান বা হিন্দু কারো প্রতিনিধি নন। কংগ্রেস হচ্ছে একটা হিন্দু সংস্থা। যদি আপনার আত্মসম্মান থাকে, আপনি এখনি পদত্যাগ করুন। এতোদিন লীগের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য কাজ করেছেন। আপনি নিজেই জানেন যে, তাতে আপনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। ও পথ ছাড়ুন।"[১৩]

৯। 'Path way to Pakistan', চৌধুরী খালিকুজ্জামান, পৃষ্ঠা ৩১৫।
১০। 'Quid-e-Azam: As I see him', হাসান ইস্পহানী, পৃষ্ঠা ৪৯, ৫০।
১১। 'ভারতের মুসলিম রাজনীতি', বিনয়েন্দ্র চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৫৭।
১২, ১৩। 'Quid-i-Azam Jinnah's Correspondence', শরিফুদ্দীন পীরজাদা, পৃষ্ঠা ৩।

www.icsbook.info

মওলানারা আজাদের কাছে পাঠানো জিন্নার এই তারবার্তা নিসন্দেহে খুব কঠোর। তবে তা বাস্তবতার নিরেট প্রতিধ্বনি। এই সত্য কথাগুলো মওলানা আজাদকে এইভাবে বলার দ্বিতীয় লোক আর ভারতে ছিল না। একমাত্র জিন্নাহই তা পারতেন এবং তিনি তার বলেছেন। আর একথাগুলো বলা জিন্নার জন্যে অপরিহার্য ছিল। কংগ্রেসী মুসলমানরা যেভাবে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার বিরামহীন প্রচেষ্টা চালচ্ছিল, যেভাবে তারা মুসলিম লীগকে কষ্ট দিচ্ছিল এবং মওলানা আজাদ তাঁর ঐ তারবার্তায় যে প্রতারণামূলক প্রস্তাব তুলে ধরেছিলেন, তাতে মওলানাকে ঐ ভাবে স্পষ্ট কথা বলা ছাড়া বোধ হয় আর উপায়ও ছিল না। মওলানার প্রস্তাবকে এই জন্যেই প্রতারণা বলা যেতে পারে যে, মওলানা তাঁর তারবার্তায় 'জাতীয় সরকার' বলতে 'বহুদলীয় সরকার' বুঝিয়েছেন তা কংগ্রেসের আসল কথা নয়, কংগ্রেসের আসল রূপ এটা নয় মোটেই। কংগ্রেস মুসলিম লীগ বা কোন মুসলিম দলের অস্তিত্ব স্বীকারই করে না। মওলানা আজাদ জিন্নাহকে টেলিগ্রাম পাঠাবার মাত্র ক'দিন আগে জুন মাসে গান্ধী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় এই কথাটি অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় বিশ্ববাসীকে পুনর্বার জানিয়ে দিয়েছিলেন। মিঃ গান্ধী তাঁর এই বক্তব্যে বলেন, "সকল দলকে আহ্বান করে একটা সাধারণ সমঝোতায় পৌছানোর জন্য প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আমার নিকট আবেদন করা হচ্ছে। তারা বলেন, তা হলেই (অর্থাৎ সমঝোতার পর) আমরা গ্রেটবৃটেনের নিকট যা চাইবো, তা পাবো। এই বন্ধুরা একটা আসল কথা ভুলে যাচ্ছেন। কংগ্রেস সমগ্র ভারতের পক্ষে কথা বলার দাবী করে এবং নির্ভেজাল স্বাধীনতা চায়। যারা তা চায় না, কংগ্রেস তাদের সাথে সাধারণভাবে সমঝোতায় পৌছতে পারে না। একটিমাত্র গণতান্ত্রিক, নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে - অর্থাৎ কংগ্রেস, অন্য সবই স্ব-মনোনীত অথবা অংশ বিশেষ কর্তৃক নির্বাচিত। এমতাবস্থায়, বর্তমানে মাত্র দুটি পক্ষ আছে- কংগ্রেস ও যারা কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করে এবং যারা করে না। এই দুয়ের মধ্যে কোন এক পক্ষ কর্তৃক তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্জন ব্যতীত পারস্পারিক সাক্ষাতের (বা আলোচনার) সাধারণ ক্ষেত্র নেই।"[১৪] এখানে গান্ধী কংগ্রেস ও কংগ্রেস মতাবলম্বী ছাড়া অন্য দলের অধিকার, অস্তিত্ব অস্বীকার করছেন। একমাত্র কংগ্রেস ও কংগ্রেস পন্থীদেরকেই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলছেন এবং অন্যরা কংগ্রেস পন্থী না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে আলোচনা, এমনকি সাক্ষাতও করা যায় না বলে গান্ধী মন্তব্য করছেন। এই যখন কংগ্রেসের মানসিকতা, তখন তার সাথে মিলে মুসলিম লীগ জাতীয় সরকার গঠন করতে পারে কেমন করে? অথচ এই উদ্ভট প্রস্তাবই মওলানা আজাদ কায়েদে আযমকে দিয়েছিলেন। আসলে প্রস্তাবটি ছিল একটা রাজনৈতিক

১৪। গান্ধীর 'হরিজন' পত্রিকা, জুন ১৯৪০ (উদ্বৃতঃ 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৫৪৯)।

www.icsbook.info

প্রতারণা, যার লক্ষ্য ছিল মুসলিম লীগকে নীতিচ্যুত করে বেকায়দায় ফেলা।

অন্যদল বিশেষ করে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ও অধিকার অস্বীকার করার এই যে কংগ্রেসের নীতি, তার লক্ষ্য ছিল ভারতের কর্তৃত্ব এককভাবে কংগ্রেসের হাতে নিয়ে আসা। এই দাবীতেই কংগ্রেস যুদ্ধে বৃটিশকে সক্রিয় সহযোগিতা করেনি বরং শুরু করে আইন অমান্য আন্দোলন, যার একমাত্র লক্ষ্যই হলো চাপ দিয়ে বৃটিশের কাছ থেকে ভারতের শাসন ক্ষমতা হাত করে নেয়া। ১৯৪০ সালের শুরু থেকেই যুদ্ধে বৃটেনের অবস্থা খারাপ হতে লাগল এবং কংগ্রেসের চাপে বৃটিশের নতি স্বীকারের উদ্বেগও বাড়ল। এর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবেই লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে মুসলমানদের জন্যে পৃথক ও স্বাধীন আবাসভূমির দাবী উত্থাপন করা হল এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মুসলিম লীগ বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলল, যাতে বৃটিশ কংগ্রেসের একক দাবী মেনে নেবার সুযোগ না পায়। সম্ভবত এরই ফল হিসেবে ১৯৪০ সালের ১৮ই এপ্রিল বৃটিশ সেক্রেটারী অব ষ্টেট ভারত সম্পর্কে যে ঘোষণা দিলেন, তার এক জায়গায় বললেন, "---- যে যুক্ত ভারতের ধারণা বহু ভারতীয় ও ইংরেজকে পরিশ্রম করতে প্রেরণা দিয়েছে, তার বাস্তবায়নের জন্যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ মতৈক্য হওয়া আবশ্যক। কারণ, আমি ভাবতে পারি না যে, এ দেশের কোন সরকার বা পার্লামেন্ট ভারতের আট কোটি মুসলমানের উপর তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক এমন শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেবে, যার অধীনে তারা শান্তিতে ও স্বস্তিতে বাস করতে পারবে না।"[১৫]

বৃটিশ সেক্রেটারী অব ষ্টেটের এই বক্তব্যে মুসলমানদের ইচ্ছার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু কংগ্রেসের দাবী অখন্ড ভারতের চিন্তা যে তাদের মাথায় রয়েছে, এ কথারও প্রকাশ ঘটেছে। এই চিন্তা এবং কংগ্রেসের চাপ একত্র হয়ে যে কোন সময় মুসলমানদের প্রতি দেয়া বৃটিশের প্রতিশ্রুতি পাল্টে দিতে পারে। মুসলিম লীগের এই আশংকা জুনের দিকে দারুনভাবে বৃদ্ধি পেল, যখন যুদ্ধে বৃটেনের অবস্থা আরও সংগীন হয়ে উঠল। জার্মানীর নাৎসী বাহিনীর হাতে এপ্রিলে নরওয়ে ও ডেনমার্ক এবং মে'তে বেলজিয়াম ও হল্যান্ডের পতন ঘটার পর ১৯৪০ সালের ২২ শে জুন ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করার উদ্বেগজনক খবর ভারতে এল। নাৎসী বাহিনী তখন বলা যায় বৃটেনের মাথার উপর। এই অবস্থায় কংগ্রেস ঘোষণা করল, "যদি বৃটিশ সরকার যুদ্ধের পর ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে' -এই দ্বিধাহীন ঘোষণা দেয়, তাহলে কংগ্রেস দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে তৎক্ষণাৎ অস্থায়ী জাতীয় সরকারে যোগ দিতে প্রস্তুত আছে।"[১৬] বৃটিশও তার গরজে কংগ্রেসের প্রতি নরম হলো। পরিস্থিতি বৃটিশ সরকারকে কোন সিদ্ধান্তের দিকে

১৫। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৫৫৮।
১৬। Mahatma Gandhi', বি. আর. নন্দ, পৃষ্ঠা ২১৮।

www.icsbook.info

নিয়ে যায়, এ চিন্তা মুসলিম লীগের মধ্যে বড় হয়ে দেখা দিল। ১৯৪০ সালের ২৭ শে জুন জিন্নাহ ভারতের বড় লাটের সাথে সাক্ষাত করলেন এবং ১লা জুলাই তারিখে একটা স্মারক লিপি প্রেরণ করলেন বড় লাটের কাছে। তাতে মুসলিম লীগের পক্ষে থেকে বলা হলোঃ

১) ভারতের বিভাগ সম্পর্কিত লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতি বিরোধী কোন ঘোষণা অথবা বিবৃতি বৃটিশ সরকার করতে পারবে না।

২) বৃটিশ সরকারকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, মুসলিম ভারতের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত বৃটিশ সরকার কোন অন্তর্বর্তী বা চরম পরিকল্পনা গ্রহণ করবে না।

৩) ইউরোপের দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, শান্তি, ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ও বহিরাক্রমণের হাত থেকে দেশেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার সমূহে মুসলিম লীগকে সমান অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

৪) ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল সম্প্রসারিত করার পর যদি কংগ্রেস যোগদান করে, তাহলে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা হিন্দুদের সমান হবে, আর যদি কংগ্রেস যোগদান না করে, তাহলে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যাধিক্য থাকিবে। কারণ, কংগ্রেস যোগ না দিলে মুসলমানদেরই প্রধান ভার বহন করতে হবে।

৫) যে সকল প্রদেশে ৯৩ ধারা প্রবর্তিত হয়েছে, সেই সকল স্থানে বেসরকারী পরমর্শদাতা নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য থাকতে হবে।

৬) অন্ততঃ ১৫ জন সদস্য নিয়ে একটি 'যুদ্ধ কাউন্সিল' গঠন করতে হবে। ভাইসরয় কাউন্সিলের সভাপতি হবেন, কংগ্রেস যোগ দিয়ে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা সমান থাকবে, না দিলে মুসলমানদের সংখ্যাধিখ্য থাকবে।

৭) একজিকিউটিভ কাউন্সিল, যুদ্ধ কাউন্সিল ও প্রাদেশিক পরামর্শদাতাদের মুসলমান সদস্যগণ মুসলিম লীগ কর্তৃক মনোনীত হবে।

কংগ্রেস মুসলিমলীগের এ প্রস্তাবকে ভালো চোখে দেখার কথা নয়। তাদের মতে 'এরূপ দাবীর অর্থ মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা ছাড়া আর কিছু নয়।'[১৭] বৃটিশ সরকারও একে ভালো চোখে দেখল না। মুসলিম লীগের এ স্মারক লিপির জবাবে ভাইসরয় ১৯৪০ সালে ৬ই জুলাই জিন্নাহকে এক নোটে জানালেন, "মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক মুসলিম প্রতিনিধি প্রেরণের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেন। কিন্তু দায়িত্ব হবে সমষ্টিগতভাবে

১৭। 'খন্ডিত ভারত', ডঃ রাজেন্দ্র, পৃষ্ঠা ১৮০।

www.icsbook.info

গভর্ণর জেনারেলের পরিষদের। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যরূপে কে কে গৃহীত হবেন বড় লাটের সাথে পরামর্শ করে ভারত সচিব তা স্থির করবেন। এই হল প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার কথা। --- বড় লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদের অথবা উহার বেসরকরী উপদেষ্টা রূপে যে সকল মুসলিম সদস্য গৃহীত হবেন, তাদের মনোনয়নের দায়িত্ব মুসলিম লীগের উপর অর্পণ করা নিয়মতান্ত্রিক দিক দিয়ে অসম্ভব। কিন্তু প্রয়োজন বোধে কারও নাম যদি আপনি প্রস্তাব করেন তা যথাযোগ্য গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে না,. এরূপ আশংকার কোন হেতু নেই।"[১৮] এই চিঠিতে ভাইসরয় তার সরকারের নীতির কথা বললেও ভাইসয়ের এ জবাব কংগ্রেসকে খুশী করলো। কিন্তু এই ঘটনার ৩৮ দিন পর ১৯৪০ সালের ১৪ই আগস্ট বৃটিশ সেক্রেটারী অব ষ্টেট ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে যা বললেন তাতে আবার হতাশ হলো কংগ্রেস। সচিব বৃটেনের হাউস অব কমন্স এ বললেন, "এ কথা সত্য যে,কংগ্রেস এককভাবে বৃটিশ ভারতের সর্ববৃহৎ দল। কিন্তু সেই কারণে তারা যে সমগ্র ভারতের পক্ষে কথা বলার দাবী করে- এ দাবী ভারতে জটিল জাতীয় জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমুহ অস্বীকার করে। এর অন্য অংশ (বা উপাদান) সমূহ কেবল সংখ্যায় লঘিষ্ঠ হিসাবে তাদের দাবী করে না; পরন্তু তারা দাবীকরে ভারতের ভাবী নীতি স্থিরীকরণের ব্যাপারে স্বতন্ত্র মৌলিক অংশ হিসাবে স্বীকৃতি। --- ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে, ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সংস্কৃতিতে তাদের ও তাদের স্বদেশবাসী হিন্দুদের মধ্যে গভীর পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্রে পার্থক্য অপেক্ষা গভীরতর। --- এতদসত্বেও ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানরা যে কংগ্রেসের কাজে অংশগ্রহণ করেনি তা নয়, কিন্তু দলগত (সমষ্টিগত) ভাবে মুসলমানেরা তফাৎ থেকেছে। বর্তমান আইনের (১৯৩৫ সালের আইনের) ব্যাপারে তাদের প্রধান আপত্তি এই যে, এর দ্বারা কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অত্যন্ত অধিক ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে। তারা ভৌগলিক, অঞ্চল ভিত্তিক নির্বাচিত গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত শাসনতন্ত্র মোটেই চায় না। যে কোন শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত আলোচনায় তারা স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দাবী করে, এবং কেবল এমন ধরনের শাসনতন্ত্র তারা গ্রহণ করতে রাজী আছে যা সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাত থেকে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেবে।"[১৯]

এই বৃটিশ বক্তব্যে জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বার্থের প্রতি একটা স্বীকৃতি আছ বটে, কিন্তু মুসলিম লীগের ভারত বিভাগ বা পাকিস্তান দাবীকে সমর্থন করা হয়নি। বরং ঐক্যবদ্ধ ভারতের চিন্তা তুলে ধরে এখানে লাহোর প্রস্তাবের বিরোধিতাই করা হয়েছে। তবু যেহেতু এই বৃটিশ বক্তব্যে মুসলিম জাতি সত্বাকে

১৮। 'খন্ডিত ভারত', ডঃ রাজেন্দ্র, পৃষ্ঠা ১৮০।
১৯। 'The Indian Annual Register, 1940', Vol-11 পৃষ্ঠা ৩৭৫।

www.icsbook.info

স্বীকার করা হয়েছে, তাই কংগ্রেস এই বৃটিশ বক্তর্বের ঘোরতর বিরোধিতা করল। ১৯৪০ সালের ১৮ থেকে ২২শে আগস্ট অনুষ্ঠিত অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বৃদ্ধির অভিযোগ এনে বৃটিশ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল এবং এই কমিটির ১৩ই অক্টোর (১৯৪০) এর অধিবেশনে কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যদিও এই আইন অমান্য আন্দোলনের কারণ হিসেবে তারা যুদ্ধের বিরোধিতাকে সামনে রাখল, তবু সকলের কাছেই একথা পরিস্কার ছিল যে, আসলে কংগ্রেস চাচ্ছে চাপ দিয়ে বৃটিশকে তাদের দাবী মানতে বাধ্য করতে। কংগ্রেসের এই মনোভাবকে জিন্নাহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন ১৯৪০ সালের নভেম্বর দিল্লীতে তাঁর এক বক্তৃতায়। তিনি বললেন, "হিন্দুরা কংগ্রেস দেশের জনগণের স্বাধীনতা বা মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করছে, একথা আমি স্বীকার করতে অক্ষম। তাদের আইন অমান্য আন্দোলনের কারণ আমরা জানি। বৃটিশ সরকারও জানে। কংগ্রেসই ভারতীয় জনগণের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান, এই স্বীকৃতি জোর করে বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে আদায় করতে চায়। কংগ্রেস বলছেঃ 'আমার সাথে সমঝোতা কর। আমাদের সাথে চুক্তিকর এবং মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপেক্ষা কর।"[২০] ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারীতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের আন্দোলনের মুখে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলঃ "পরিস্থিতির প্রয়োজনে মুসলিম লীগ এ দেশের মুসলমানদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে দ্বিধা করবে না।"

এই সময় মসুলিম শক্তির একটা পরীক্ষাও হয়ে যায়। ১৯৪১ সালের জুলাই এ ভারতের ভাইসরয় স্যার সিকান্দার হায়াত, এ, কে ফজলুল হক, স্যার মুহাম্মদ সা'দউল্লাহ, স্যার সুলতান আহমদ, ছতরীর নবাব ও বেগম শাহ নওয়াজকে ডিফেন্স কাউন্সিলের সদস্য করলেন মুসলিম লীগের অজান্তে। তাদের নেয়ার পর জিন্নাহকে চিঠি দিয়ে জানান হলো। মুসলিম লীগ যুদ্ধে বৃটিশকে সমর্থন করছিল, সহযোগিতা দিতেও রাজী ছিল, ডিফেন্স কাউন্সিলে অংশ গ্রহণেও প্রস্তুত ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগের প্রস্তাব ছিল, ডিফেন্স কাউন্সিলে মুসলিম কাউকে নিতে হলে মুসলিম লীগের মাধ্যমে নিতে হবে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এর অন্যথা করল। স্বাভাবিক ভাবেই একে মুসলিম লীগ মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরানো এবং মুসলিম লীগের শক্তি পরীক্ষার একটা চেষ্টা বলে মনে করল। সুতরাং মুসলিম লীগ এর প্রতিবাদ করল এবং মুসলিম লীগ সদস্যদের ডিফেন্স কাউন্সিল থেকে পদত্যাদের আহ্বান জানাল। যারা পদত্যাগ করল না, তাদেরকে মুসলিম লীগ থেকে বহিস্কার করা হলো। বহিস্কৃতদের মধ্যে বাংলার শেরে বালা এ, কে, ফজলুল হকও ছিলেন।

২০। 'Speeches & Writings of Mr. Jinnah', জামিল উদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা ১৮২।

www.icsbook.info

নীতির প্রশ্নে এই আপোশহীনতা মুসলিম লীগের সংহতি বৃদ্ধি করেছিল এবং অন্যদের কাছে মুসলিম লীগের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

১৯৪১ সালের শেষে এসে জাপান জার্মানীর পক্ষে গিয়ে আমেরিকা ও বৃটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় এবং বিদ্যুত গতিতে বার্মা দখলে এনে ভারত সীমান্তে এসে হাজির হওয়ায় বৃটেনের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠল। এ সময় জাপানীরা কোলকাতায় বোমা ফেললে ভারতীয় জনগণের মধ্যেও ত্রাসের সৃষ্টি হলো। ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা এই সময় বৃটেনের জন্যে অপরিহার্য হয়ে উঠল। সুযোগ বুঝে কংগ্রেস ১৯৪১ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর তারিখে গৃহীত ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে বলল, "স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আক্রান্ত ও যুদ্ধরত দেশসমূহের প্রতি কংগ্রেসের অনিবার্য সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু একমাত্র মুক্ত ও স্বাধীন ভারতই জাতীয় ভিত্তিতে দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এবং এই যুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্য থেকে উদ্ভাবিত বৃহত্তর সমস্যাসমূহ সমাধানে সাহায্য করতে পারে।"[২১] কংগ্রেস এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তার আগের দাবীর ই প্রতিধ্বনি করল, যে দাবীতে কংগ্রেস ভারতকে স্বাধীনতা দানের সুস্পষ্ট ঘোষণা চেয়েছিল এবং যুদ্ধকালীন সময়ে কংগ্রেসকে ভারতে মন্ত্রসভা গঠন করতে দেয়ার প্রস্তাব করেছিল। যার অর্থ ছিল মুসলমান সহ সকল সংখ্যালঘুর অধিকার ও অস্তি ত্ব উপেক্ষা করে কংগ্রেস কর্তৃক ভারতের শাসন কর্তৃত্ব কুক্ষিগত করা। কংগ্রেস শুধু এই প্রস্তাব গ্রহণ নয়, তার পাশাপাশি বৃটিশের প্রতি তাদের শুভেচ্ছার নিদশন হিসেবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিল।

এই অবস্থায় ভারতের সংখ্যাগুরু জনগনের প্রতিনিধি কংগ্রেসের চাপে যুদ্ধে বিপর্যস্ত বৃটেনের নতি স্বীকারের আশংকা দেখা দিল। উদ্বিগ্ন মুসলিম লীগ ২৬ থেকে ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৪১) তার ওয়াকিং কমিটির এক প্রস্তাবে বলল, "----সাম্প্রতিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করলে আশংকা হয় যে, --- নীতি বর্জন করে কংগেসকে সন্তুষ্ট করার চেষ্ট হচ্ছে। সেই কারণে ওয়াকিং কমিটি বৃটিশ জনসাধারণ ও সরকারকে সাবধান করে দিচ্ছে যে, যদি --- প্রতিশ্রুতি থেকে কোন রূপ বিচ্যুতি ঘটে তাহলে মুসলমানেরা এটাকে বিশ্বাস ভংগ রূপে গণ্য করবে। তাছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত বা ঘোষণা করা হলে মুসলিম ভারত তা সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করবে।"[২২] এই প্রস্তাব গ্রহনের ৫ দিন পরে ২রা জানুয়ারী (১৯৪২) লীগ সভাপতি কায়েদে আযম এক বিবৃতিতে আরও স্পষ্টভাবে বললেন, "---কংগ্রেস ভারতের আশু শর্তহীন স্বাধীনতার এবং অখন্ড ও গণতান্ত্রিক ভারত ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে বয়ঃপ্রাপ্তদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদ

২১। 'কায়েদে আযম', আকরু উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৫৮৫।
২২। 'Quid-e-Azam', G Allana পৃষ্ঠা ৩৩৫, ৩৩৬।

www.icsbook.info

গঠনের দাবী বিন্দুমাত্র ত্যাগ করে নাই। এর সুস্পষ্ট অর্থ হচ্ছে হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠা। মুসলমানদের কাছে এটা কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। --- মুসলিম ভারত বাঁচার তাগিদে এবং আত্তনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস ও অন্যান্য হিন্দু প্রতিষ্ঠান সমূহ মুসলমানদের সর্বভারতীয় সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য করে সমগ্র ভারতের উপর প্রাধান্য ও শাসন প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করছে। এই ভাবে তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের উপর শাসন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ---- ব্যবস্থা করছে।"[২৩] এর মাস খানেক পরে ফেব্রুয়ারী (১৯৪২) মাসে কোলকাতার এক অনুষ্ঠানে জিন্নাহ তার বক্তৃতায় বললেন, "মুসলমানদের পায়ের তলায় রাখবার ও হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের (কংগ্রেস ও হিন্দুদের) চালবাজি নিতান্ত শিশু ও বুঝতে পারে, কিন্তু তাদের এই চালবাজি কখনো সফল হবে না- সময়ে তা প্রমাণিত হবে। --- বাঙালী মুসলমানেরা ভারতের অন্যান্য অংশের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে এবং অবশিষ্ট ভারতও ঐক্যবদ্ধভাবে বাঙলার সাথে দাঁড়াবে।"[২৪]

এখানে উল্লেখ্য, মুসলিম লীগ দলগতভাবে বৃটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করেনি, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে লীগ কাউকেই বাধা দেয়নি। পাঞ্জাব ও বাংলার প্রধানমন্ত্রীগণ বিশেষ করে পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী শওকত হায়াত খান পুর্নোদ্যমে বৃটিশকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। অন্য পক্ষে দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কংগ্রেস ১৯৩৯ সাল অর্থাৎ যুদ্ধের শুরু থেকেই আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছিল। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চীনের রাষ্ট্রপ্রধান মার্শাল চিয়াং কাইশে ভারতে এলেন। বৃটিশ সরকারই তাঁকে নিয়ে এল কংগ্রেসকে বুঝাবার জন্যে, যাতে কংগ্রেস বৃটিশকে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করে। উল্লেখ্য, চিয়াং কাইশেকের সাথে নেহেরুর পূর্ব পরিচয় ছিল। কিন্তু চিয়াং কাইশেকের আগমনে কোন ফল হয়নি। তখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মওলানা আজাদ। চিয়াং কাইশেকের সাথে আলোচনায় কংগ্রেস সেই কথাই বলল যা তারা বার বার বলে আসছে। যুদ্ধে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিকতার পক্ষে থাকতে চায় কিনা - চিয়াং কাইশেকের এমন একটা প্রশ্নের জবাবে মওলানা আজাদ বলেন, "যুদ্ধ শেষে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি এবং যুদ্ধকালীন অবস্থায় কংগ্রেসকে সর্ববিভাগে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিলে বর্তমান ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন মেনে নিয়ে সহযোগিতা করতে কংগ্রেস প্রস্তুত।"[২৫] কংগ্রেসের এ দাবীর সরলার্থ হলো, 'ভারতের মুসলমান ও অন্যান্য সকল সংখ্যালঘুর দাবী ও অধিকার' পদদলিত করে সমগ্র ভারতে কংগ্রেসের একাধিপত্য স্থাপন। কংগ্রেসের এ মানসিকতার কারণেই কোন সমঝোতা -প্রয়াস ফলপ্রসূ হয়নি।

২৩। ঐ
২৪। 'Quid-e-Azam', G.Allana পৃষ্ঠা ৩৩৫, ৩৩৬।
২৫। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ২৯২।

www.icsbook.info

একদিকে যুদ্ধে বৃটেনের খারাপ অবস্থা, অন্যদিকে ভারত-সমস্যা সমাধানের জন্যে মিত্রদের চাপে বাধ্য হয়ে বৃটিশ সরকার একটা সুস্পষ্ট সমাধান প্রস্তাব নিয়ে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে পাঠালেন ভারতে। ১৯৪২ সালের মার্চে তিনি ভারতে এলেন। তাঁর মিশনের অন্যান্য সদস্য ছিলেন, লর্ড পেথিক লরেন্স এবং মিঃ এম, ভি, আলেকজান্ডার। স্যার ক্রিপস কংগ্রেসের ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলেই হয়তো বৃটিশ সরকার আশা করে তাকেই পাঠিয়েছিল সমস্যা সমাধানের জন্যে। এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস বৃটিশ সরকারের দেয়া প্রস্তাব ঘোষণা করলেনঃ

"ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতিসমূহ সম্পর্কে এদেশ উদ্বেগ প্রকাশিত হওয়ায় মহামান্য সম্রাটের সরকার সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে ভারতের যথাশীঘ্র সম্ভব স্বায়ত্বশাসন লাভের উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান, সেগুলোর নির্দিষ্ট পর্যায়ে উল্লেখ স্পষ্ট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, একটা নতুন ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা যা একটি ডোমিনিয়ন হবে এবং এই নতুন ডোমিনিয়ন বৃটেন ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের রাজার প্রতি আনুগত্যের সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ থাকবে, কিন্তু অন্যান্য ডোমিনিয়নের সকল বিষয়ে সমান থাকবে, আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ে কোন মতেই অধীস্থ থাকবে না। মহামান্য সম্রাটের সরকার এই লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রকাশ করছেনঃ

১) যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে ভারতের জন্যে একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিম্ন বর্ণনানুযায়ী একটি নির্বাচিত সংস্থা গঠিত হবে।

২) এই শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সংস্থায় দেশীয় রাজ্যসমূহের অংশগ্রহণের জন্যে নিম্ন বর্ণনানুযায়ী ব্যবস্থা থাকবে।

৩) মহামান্য সম্রাটের সরকার উক্ত রূপে রচিত শাসনতন্ত্র গ্রহণ ও কার্যকরী করার দায়িত্ব গ্রহণ করছে, কিন্তু শর্ত হলোঃ

ক) বৃটিশ ভারতের কোন প্রদেশ যদি নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণে সম্মত না হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে বর্তমান শাসনতন্ত্র বজায় থাকবে এবং যদি পরে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে সেরূপ ব্যবস্থা থাকবে। এইরূপ যোগদানে অনিচ্ছুক প্রদেশগুলো যদি ইচ্ছা করে, তাহলে সম্রাটের সরকার একই রূপ পন্থায় রচিত ইন্ডিয়ান ইউনিয়নের পূর্ণ সমমর্যাদা সম্পন্ন নতুন শাসনতন্ত্রে সম্মতি দিতে প্রস্তুত থাকবে।

খ) সম্রাটের সরকার এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সংস্থার মধ্যে আপোশ আলোচনার দ্বারা এক সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। এই সন্ধিচুক্তিতে বৃটিশের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় সন্নিবেশিত হবে; এতে সম্রাটের সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের

www.icsbook.info

রক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে ভবিষ্যত সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধা নিষেধ আরোপিত হবে না।

৪) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে ভারতের প্রধান সম্প্রদায়গুলি যদি অন্য কোন পন্থা সম্পর্কে একমত না হয়, তাহলে নিম্নোক্ত উপায়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সংস্থ্যা গঠিত হবে।

যুদ্ধের পর প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হবে এবং নির্বাচনের ফলাফল জানবার অব্যবহিত পরে সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভার নিম্ন পরিসদসমূহ একক ইলেক্টোরাল কলেজ হিসেবে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সংস্থার সদস্য নির্বাচন করবে। নতুন সংস্থা ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্য সংখ্যার প্রায় এক দশমাংশ হবে।

৫) ভারতের বর্তমান সংকটপূর্ণ সময় থেকে নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশ অপরিহার্যরূপে অবশ্যই সম্রাটের সরকারের হাতে রাখতে হবে। কিন্তু ভারতের সামরিক, নৈতিক ও বস্তুগত সম্পদ পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর দায়িত্ব ভারতের জনগণকে গ্রহণ করতে হবে। দেশের কমনওয়েলথ ও জাতি-ইউনিয়নের পরামর্শ সভায় আশু ও কার্যকরী অংশগ্রহনের উদ্দেশ্যে সম্রাটের সরকার ভারতের প্রধান প্রধান অংশ সমূহের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করার ইচ্ছা করেন। এই রূপে তারা ভারতের ভাবী স্বাধীনতার জন্যে অতি প্রয়োজনীয় কাজে সক্রিয় ও গঠনমূলক সাহায্য প্রদানে সক্ষম হবেন।"

সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই ঘোষণা দানের পর ক্রিপস মিশন ২৫ শে মার্চ থেকে ৯ ই এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে এ নিয়ে আলাপ করেন। ২৭ শে মার্চ তারিখে সাক্ষাত হয় মিঃ গান্ধীর সাথে। গান্ধী ক্রিপসকে বলেন যে, "ক্রিপস যে প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন, তার বাইরে যদি তাঁর কিছু দেয়ার না থাকে তাহলে ক্রিপস পরবর্তী হাওয়াই জাহাজে ইংল্যন্ড ফেরত যেতে পারেন।"[২৬] দলগত ভাবে কংগ্রেস তার প্রতিক্রিয়া জানাতে আরও সময় নিল ৫ দিন। কংগ্রেস ২রা এপ্রিল তার প্রস্তাবে বলল, যেহেতু পরিকল্পনায় প্রদেশসমূহকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে এবং ভারতের অখন্ডতা নষ্ট করার পথ সুগম করা হয়েছে, তাই প্রস্তাবটি কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য নয়। যে কারণে কংগ্রেস ক্রিসপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল, সেটাই ছিল মুসলিম লীগের জন্য প্রস্তাবটি গ্রহণ করার পক্ষে প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু তবু মুসলিম লীগ ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারল না। মুসলিম লীগ ১১ই এপ্রিল তার প্রস্তাবে বলল, "যদি ক্রিপস প্রস্তাবে একাধিক ইউনিয়ন গঠনের ব্যবস্থার দ্বারা পরোক্ষভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা

২৬। 'History of the Freedom Movement in India', Vol-IV. Page 345 (Tarachand).

www.icsbook.info

স্বীকৃত হয়েছে, তথাপি --- বর্তমান আকারে বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ, দুই জাতির জনগণকে একক ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে বাস করতে বাধ্য করা উচিত নয় এবং যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সংস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ইউনিয়ন গঠন তাতে মুলমানদের যোগ দিতে বাধ্য করা সংগত নয়।"

উল্লেখ্য যে, কংগ্রেস ২রা এপ্রিল তারিখ ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও তা গোপন রাখলো। শুধুমাত্র গোপন চিঠিতে বিষয়টি ক্রিপস মিশনকে জানায় এবং তার সাথে দরকষাকষিতে লিপ্ত হলো। দরকষাকষি ব্যর্থ হবার পর ১১ ই এপ্রিল কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আর এই প্রত্যাখ্যানের কারণ যেটা কংগ্রেস প্রকাশ্যে বলেছিল (২রা এপ্রিলের প্রস্তাব অনুসারে), সেটা ছিল না। ক্রিপস নিজেই বলেছেন, "বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার কারণ সম্বন্ধে কংগ্রেস বাইরে যা প্রকাশ করছে তা ঠিক নয়, পরন্তু --- সেক্রেটারী অব ষ্টেট ও ভাইসরয়ের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সম্পূর্ণ জাতীয় সরকার গঠনের কংগ্রেসী দাবী বৃটিশ স্বীকার করতে রাজী না হওয়ায় কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।"[২৭] আসলে কংগ্রেসের ২রা এপ্রিলের প্রস্তাব ছিল বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির একটা কৌশল এবং গান্ধীর ২৭শে মার্চের উক্তিও ছিল তাই। ২রা এপ্রিলের পর কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অবিরাম চাপ দিয়ে গেছে যুদ্ধকালীন অবস্থায় একজিকিউটিভ কাউন্সিলের পরিবর্তে কংগ্রেসের মনোনীতদের নিয়ে একটা পূর্ণ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় বৃটিশ সরকারকে রাজী করতে। এই ভাবে কংগ্রেস যে কোন উপায়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব হাত করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। "গান্ধী, নেহেরু, রাজেন্দ্র, মওলানা আজাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এ প্রসংগে বক্তব্য এই ছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা হাতে পেলে সাম্প্রদায়িক তথা হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান আপনাতেই হয়ে যাবে। কারণ, তখন মুসলিমরা ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের সাথে আপোশ করতে বাধ্য হবে। বৃটিশ সরকারের পক্ষে তখনকার পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব হবে। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারী ক্ষমতা আয়ত্তাধীন হওয়ার পর গণপরিষদ গঠন ও ইচ্ছামত শাসনতন্ত্র তৈরী করাও খুব সহজ হবে।"[২৮] কিন্তু বৃটিশের অস্বীকৃতির জন্যে যুদ্ধের ডামাডোলের সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তগত করার কংগ্রেসের এ সাধ পুরণ হয়নি। এই অবস্থাতেই কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেয় ১১ই এপ্রিল তারিখে। আর ব্যর্থ ক্রিপস মিশন ১২ই এপ্রিল স্বদেশ যাত্রা করে।

ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলো, কিন্তু এর মাধ্যমে স্পষ্ট হলো যে, বৃটিশ সরকার

২৭। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৬০০।
২৮। ঐ, পৃষ্ঠা ৬০০।

www.icsbook.info

ভারতের সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে মুসলমানদের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার ব্যাপারে দৃঢ় এবং সে কারণেই নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কংগ্রেস লীগের সমঝোতার উপর বৃটিশ সরকার জোর দিচ্ছিল। এ ছাড়া বুঝা গেল যে, বৃটিশ সরকার একক ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের পক্ষপাতি হওয়া সত্তেও এক বা একাধিক প্রদেশের প্রস্তাবিত ভারতীয় ইউনিয়নের বাইরে থাকার দাবী স্বীকার করার মাধ্যমে বৃটিশ সরকার পরোক্ষভাবে ভারত বিভাগের সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। এতে মুসলিম লীগেরই জয় হলো।[২৯] আর মুসলিম লীগের জন্যে যেটা জয় ছিল, সেটা কংগ্রেসের কাছে পরাজয়।

এই পরাজয় এবং পর্দা -অন্তরালের দরকষাকষিতে ব্যর্থ হয়ে কংগ্রেস বিশেষ করে গান্ধী ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। মনে হলো ভারতে বৃটিশের অস্তিত্ব তিনি মুহূর্তের জন্যেও বরদাশত করতে রাজী নন। তাঁর বৃটিশ বিরোধী এ মনোভাব উদ্দীপ্ত হয়েছিল জাপানী বিজয়ের দ্বারাও। কংগ্রেস নেতা মওলানা আজাদের মতে "এই সময় গান্ধীর ধারনা হয়েছিল যে, মিত্র শক্তিরা (বৃটেন পক্ষ) এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না।"[৩০] ক্ষুব্ধ গান্ধী হয়তো তখন শুধু জাপানের বিজয় নয়, জাপানের ভারত বিজয়ও কামনা করছিলেন। মওলানা আজাদের সাক্ষ্যঃ "গান্ধী তাঁকে (মওলানা আজাদকে) স্পষ্টতঃ বলেন, যদি জাপানী বাহিনী কখনও ভারতে আসে তাহলে তারা আমাদের শত্রু হিসেবে আসবে না, আসবে বৃটিশের শত্রু রূপে।"[৩১] বস্তুতঃ এই চিন্তায় উৎসাহিত হয়েই ক্রিপস মিশন চলে যাবার পর গান্ধী বলে বসলেন, "বৃটিশের ভারত ত্যাগ নিয়ে আলোচনার কোন প্রশ্ন উঠে না। তারা হয় (ভারতের) স্বাধীনতা স্বীকার করবে, নয়তো করবে না।"[৩২] গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই মনোভাবে উজ্জীবিত হয়েই কংগ্রেস বৃটিশের বিরুদ্ধে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করলো। ১৯৪২ সালের ১৫ইং জুলাই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি তার এক প্রস্তাবে বলল, "কংগ্রেস দীর্ঘকাল ধরে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, কিন্তু বিদেশী শক্তির উপস্থিতির দরুন সমাধান সম্ভব হয়নি। ----বৈদেশিক অধীনতা ও হস্তক্ষেপ শেষ হলে পক্ষগণ পারস্পরিক সমঝোতায় পৌছাবে। তাছাড়া ভারত স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণ কার্যকরীভাবে রোধ করা যাবে না। সেই কারণে অনতিবিলম্বে বৃটিশের ভারত ত্যাগ করা উচিত। যদি তা না করা হয় তাহলে ১৯২০ সাল থেকে এ যাবত যে 'অহিংস শক্তি সঞ্চিত হয়েছে' কংগ্রেস তা প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।"[৩৩]

২৯। 'India Wins Freedom: The other Side', A. W. Khan, পৃষ্ঠা ১৩৮ (মুল বিবরণের জন্যেঃ 'India Pakistan Year Book, 1948 দ্রষ্টব্য)।

৩০। 'India Wins Freedom: A.K. Azad, Page 41.

৩১। ঐ, পৃষ্ঠা ৪১।

৩২। 'India Pakistan Year Book, 1948' Page 922

৩৩। 'Documents on the India Situation Since the Crips Mision', New York, 1942, Page 28, 29.

www.icsbook.info

মওলানা আজাদের মতে কংগ্রেসের এ কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি লক্ষ্য ছিল বৃটিশকে ভয় দেখানো এবং তার উপর চাপ সৃষ্টি করা। আর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্য, যুদ্ধকালীন সময়ে কংগ্রেসকে জাতীয় সরকার গঠনের অধিকার দিতে বৃটিশকে বাধ্য করা। মওলানা আজাদ বলেছেন, "প্রস্তাবটি অনেকটা দরকষাকষির জন্যে করা হয়েছিল।"[৩৪] এই দরকষাকষির জন্যেই গান্ধী তাঁর আশ্রম-বাসিনী শিষ্যা মীরা বেনকে[৩৫] ভাইসরয়ের নিকট পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ফল হয়নি। ভাইসরয় লর্ড লিনথিগো তার সাথে দেখা করতেই রাজী হননি। এই ব্যর্থতা মাথায় নিয়ে ক্রুদ্ধ কংগ্রেস ১৯৪২ সালের ৭ই আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ১৫ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব অনুমোদন করে বলল, "যদি বৃটিশ ভারত ত্যাগে অসম্মত হয়, তাহলে গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস সংগ্রাম আরম্ভ করা হবে। গান্ধী আন্দোলনের নেতৃত্বে গ্রহন করলেন এবং মুসলিম লীগের মত দলগুলোকে 'ভুই ফোঁড়' আখ্যা দিয়ে ঘোষণা করলেন, "এ হবে জনগনের সংগ্রাম...। কতকগুলো দলের সাহায্যে কংগ্রেসকে ধ্বংস করা অসম্ভব।"

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের ও বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন মুসলিম লীগ সভাপতি জিন্নাহ। তিনি বললেন, "এই আন্দোলনের ফলে কেবল যে উগ্রতা দেখা দেবে তাই নয়, পরন্তু এর ফলে বহু রক্তপাত ও নির্দোষ মানুষের জীবন নষ্ট হবে, একথা কংগ্রেসী নেতৃবন্দ জানেন না বিশ্বাস করা অসম্ভব। এই সংকটকালে বল প্রয়োগ দ্বারা তারা তাদের সকল দাবী আদায় করতে চান, অথচ এই দাবী পুরন হলে অন্য সকল স্বার্থের, বিশেষতঃ মুসলমানদের স্বার্থ কোরবানী করা হবে।"[৩৬] জিন্নাহ আরও বললেন যে, কংগ্রেস বৃটিশ সরকারকে ব্ল্যাক মেইল করতে চাচ্ছে এবং এর মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে ভারতে এমন একটা সরকার ব্যবস্থা মেনে নিতে ও এমন একটি সরকাররের ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে চাপ দিচ্ছে যা ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করবে।[৩৭] ১৬ই থেকে ২০ শে আগস্ট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত দীর্ঘ এক প্রস্তাবে মুসলিম লীগ বলল, "বৃটিশ সরকার কর্তৃক কংগ্রেস তোষণনীতি অনুসরণ এবং মুসলিম লীগের বিভাগ নীতি বৃটিশ সরকার অগ্রাহ্য করার ফলে ভারত ছাড় আন্দোলন-রূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। ... মুসলিম লীগ স্বাধীনতা চায়, কিন্তু কংগ্রেস যে স্বাধীনতা চায়, তাতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা ও পাকিস্তান ধ্বংস করা হবে। ওয়ার্কিং কমিটি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছে যে,পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাই ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা এবং মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবী করে ও সেই সাথে হিন্দুস্তান তথা

৩৪। India Wins Freedom', A.K. Azad, Page 80.
৩৫। মীরা বেন জাতিতে ইংরেজ। আসল নাম মিস শ্লেড। ৩৬। 'কায়েদে আযম' আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৬২০।
৩৭। 'The Great Divide', by S.V. Huson, page 106.

www.icsbook.info

হিন্দুদের স্বাধীনতাও দাবী করে।[৩৮] অতপর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ তফাৎ থাকার নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, "আশা করা যায়, মুসলমানদের উপর কোন প্রকার উৎপীড়ন অথবা ভয়ভীতি প্রদর্শণ করা হবে না।"[৩৯] কিন্তু মুসলিম লীগের এ শেষ আশাবাদটা পূর্ণ হয়নি।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করার পরপরই অর্থাৎ ৯ই আগস্ট তারিখে গান্ধী, নেহেরু সহ শীর্ষস্থানীয় সকল কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। হিংসাত্মক আন্দোলন শুরু হয়ে যায় সংগে সংগেই। গান্ধীর জীবনী লেখক বি, আর নন্দের ভাষায় "কয়েকটি প্রদেশে বিশেষতঃ বিহার, যুক্ত প্রদেশ, বাঙলা ও বোম্বাইতে জনতার ক্রোধ বাঁধ ভাঙার মত প্রবাহিত হয় এবং বৃটিশ শাসনের প্রতীকসমূহের উপর তারা চড়াও হয়। ডাকঘর, থানা, আদালত পুড়িয়ে দেয়া হয়, রেল লাইন, রেল ভবনসমূহ ও রেলের জিনিসপত্রের ক্ষতি করা হয়, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়া হয়"[৪০] কয়েকটি স্থানে ট্রেনযাত্রী ইউরোপীয়কে হত্যা করা হয়।[৪১] কিন্তু হিন্দুদের এই হিংসাত্মক কর্মকান্ডের বড় লক্ষ্য ছিল মুসলমানরা। ৯ই আগস্ট গোলমাল শুরু হওয়ার পর থেকেই মুসলমানদের উপর "নানা স্থানে হিন্দুদের অত্যাচারের খবর জিন্নার অফিসে আসতে থাকে।[৪২] 'বিশেষতঃ বিহার ও যুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে পুলিশের মুসলমান দারোগাদের হত্যা করা হয়, কনষ্টেবলদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়।"[৪৩] কংগ্রেসের এই হিংসাত্মক আন্দোলনের সময় ৭৫০ জন লোক নিহত হয়, আহত ১২ শতের অধিক। সম্পদের ক্ষতি হয় অপরিমেয়।

কংগ্রেসের এই ধ্বংস ও বিদ্রোহকে কংগ্রেসী ঐতিহাসিকরা স্বতঃস্ফূর্ত বলে অভিহিত করেছেন। আসলে তা নয়। এটা ছিল কংগ্রেসের সুপরিকল্পিত একটা বিদ্রোহ। কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল, নেতাজী সুভাষ বসুর পরিচালনায় জাপানী বাহিনীর বাংলায় প্রবেশ আসন্ন। তারা প্রবেশ করলেই কংগ্রেস শাসন ক্ষমতা হাতে নেবে। কংগ্রেসের বিদ্রোহ ছিল তারই প্রস্তুতি। কংগ্রেস নেতা মওলানা আজাদের ভাষায় "মে ও জুন (১৯৪২)মাসে সমগ্র পরিকল্পনা তৈরী করা হয়। ---- পরিকল্পনা ছিল এই যে, জাপানীরা যেমনি বাংলায় পৌছবে ও বৃটিশ বিহারের দিকে পশ্চাদপসরণ করবে, অমনি কংগ্রেস দেশের শাসন ভার গ্রহণ করবে।"[৪৪] বহু দরকষাকষি এবং অনেক চাপ ও হুমকি ধমকি সত্বেও বৃটিশের ঘাড়ে চড়ে যখন ভারতের কর্তৃত্ব দখল করা সম্ভব হয়নি, তখন কংগ্রেস এইভাবে জাপানীদের

৩৮, ৩৯। 'Pakistan Movement, Historic Document', G. Allana, Page 221-225৪০। 'Mahatma Gandhi' B.R. Nanda, Page 230, 231
৪১। 'Pathway to Pakistan', Khaliquzzaman, page 285-286.
৪২। 'Muhammad Ali Jinnah: A political study', M.H Saiyed, Page 335
৪৩। 'Pathway to Pakistan', Khaliquzzaman, page 285-286.
৪৪। 'India Wins Freedom', A.K. Azad, Page 73, 74-81.৪৫। বক্তৃতাটির পূর্ণ বিবরণ এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হলো।

www.icsbook.info

সহায়তার ভারতের ক্ষমতা তার একক হাতে কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল।

কিন্তু কংগ্রেসের এ আশাও সফল হলোনা। জাপানী বাহিনীর ভারত প্রবেশ যেমন হলোনা, তেমান কংগ্রেসের বিদ্রোহ কয়েক সপ্তাহের বেশী টিকলোনা। কংগ্রেসের ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হয়েছিল আগস্টের ৯ তারিখ থেকে এবং তা শেষ হয়ে গেল সেপ্টেম্বরের (১৯৪২) মধ্যেই।

কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়টা নিস্তব্ধ রাজনীতির কাল। এ সময় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ জেলে ছিলেন এবং বাইরে কংগ্রেসের আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছিল। মুসলিম লীগ এ সময়টাকে দলের বিস্তার ও শক্তি বৃদ্ধির জন্যে কাজে লাগায়। ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে দিল্লীতে মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে কায়েদে আযম মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হন। পুনঃনির্বাচিত জিন্নাহ মুসলিম লীগের এ সম্মেলনে এক অস্বাভাবিক দীর্ঘ ভাষণ দেন, যার মধ্যে ছিল অতীতের বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা। ভাষণটিকে মুসলমানদের সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ের ও অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা হয়। এতে তিনি ১৮৬১ সাল থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন ও শাসনতান্ত্রিক অগ্রগাতির বর্ণনা দেন।[৪৫]

১৯৪৩ সালের ২০ শে অক্টোবর লর্ড ওয়াভেল ভারতের নতুন ভাইসরয় হিসেবে ভারতে আসেন। ভারতের ভবিষ্যত সম্পর্কে লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৪ সালের ১৭ই জুলাই ভারতের আইন পরিষদে বললেন, "আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যুদ্ধ জয়, কিন্তু সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্যেও আমাদের তৈরী হতে হবে... ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা তৈরী করা কঠিন কাজ। তবে বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে পারি যে, বৃটিশ কমনওয়েলথের স্বাধীন অংশীদার হিসেবে পূর্ণ ও শর্তহীন স্বায়ত্ত শাসিত উন্নতিশলী ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনই বৃটিশ জনসাধারণের ইচ্ছা। --- আপনারা ভুগোল পরিবর্তন করতে পারবেন না ---- ভারত একটা স্বাভাবিক ইউনিট।"[৪৬] এই বক্তৃতায় ওয়াভেল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের খুব প্রশংসা করেন, তবে বলেন যে, "১৯৪২ সালের ৮ই আগস্টের প্রস্তাব প্রত্যাহত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীদের মুক্তি দেয়া সম্ভব নয়।"[৪৭] উল্লেখ্য, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তখন জেলে আটক ছিলেন।

ওয়াভেলের বক্তব্যে ছিল কংগ্রেস তোষণের সুর। বিশেষ করে ঐক্যবদ্ধ ভারত সম্পর্কে ওয়াভেলের উক্তি মুসলিম লীগকে খুবই বিক্ষুব্ধ করল। ভাইসরয়ের এই উক্তির উত্তরে কায়েদে আযম বললেন, 'ভাইসরয় কংগ্রেসের সরোবরে সাঁতার কাটছেন।'[৪৮]

৪৬, ৪৭। 'Transfer of power in India', V.P. Menon, Page 153, 154.
৪৮। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৬৫৯।

www.icsbook.info

স্বাস্থ্যগত কারণে ১৯৪৪ সালের ৬ই মে গান্ধীকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হলো। উল্লেখ্য, এর আগে জেল থেকে ওয়াভেলের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে গান্ধী বলেন যে, আগস্ট আন্দোলনের (ভারত ছাড় আন্দোলন) হিংসাত্মক কার্যাবলীর জন্যে কংগ্রেস মোটেই দায়ী নয়।' উত্তরে ওয়াভেল কংগ্রেসের কার্যক্রমের ব্যর্থতা উল্লেখ করেন এবং বাধা দানের নীতি পরিত্যাগ করে সহযোগিতার জন্যে আবেদন করেন।[৪৯] পরে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশ গ্রহনের কথাই অস্বীকার করে। ১৯৪৫ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের পক্ষে জওহরলাল নেহেরু, বল্লভ ভাই প্যাটেল ও গোবিন্দ বল্লভ পন্থ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, "নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অথবা গান্ধীজী কারও দ্বারা এই আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়নি।"[৫০] গান্ধীজি জেল থেকে বেরিয়ে ওয়াভেলের পরামর্শ মোতাবেক ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের আইন অমান্য বিষয়ক অংশটি প্রত্যাহার করে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

মিঃ গান্ধী জেল থেকে বেরুনোর ২৮ দিন আগে ১৯৪৪ সালের ৮ই এপ্রিল রাজা গোপালাচারী হিন্দু মুসলিম ঐক্যের একটি পরিকল্পনা জিন্নার কাছে পেশ করেন। রাজা গোপালাচারীর এ ফর্মূলায় বলা হলোঃ

"ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে আপোশ মীমাংসার শর্তাবলী, যাতে মিঃ জিন্নাহ ও গান্ধীজী একমত হলেন এবং তারা মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করবেন।

(১) স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন অস্থায়ী সরকার গঠনে কংগ্রেসের সহযোগিতা করবে।

(২) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি জেলা সমূহ, যেখানে মুসলমানরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল জেলার সীমানা চিহ্নিত করার জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করা হবে। পরিচিহ্নিত অঞ্চলের অধিবাসীরা হিন্দুস্তান থেকে আলাদা হতে চায় কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে অথবা অন্য কোন কার্যকরী পন্থায় গণভোট গ্রহণ করতে হবে। যদি অধিকাংশ অধিবাসী সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে মত দেয় তাহলে সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা হবে এবং পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো স্বাধীন ইচ্ছামত যে কোন রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে।

(৩) অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে সকল দলের নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ থাকবে।

(৪) বিভাগ সাব্যস্ত হলে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, যোগাযোগ ও অন্যান্য অত্যাবশীয়

৪৯। 'Transfer of Power in India', V.P. Menon, Page 155, 156.
৫০। 'India Today', R.P Dutt, Page 564.

www.icsbook.info

বিষয়ে নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য পারস্পারিক চুক্তি হতে হবে।
(৫) অধিবাসীদের স্থানান্তর ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গণ্য হবে।
(৬) বৃটেন কর্তৃক ভারত শাসনের সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তরের পর এই সকল ব্যবস্থা কার্যকরী করার বাধ্যবাধকতা থাকবে।"[৫১]

এই পরিকল্পনার সাথে লিখিত পত্রে রাজা গোপালাচারী জিন্নাহকে জানান যে, "বিরোধ নিষ্পত্তির একটা ভিত্তির অবতারণা করছি। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে আমি গান্ধীজীর সাথে এ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তিনি এতে পূর্ণ অনুমোদন দান করেছেন ---।"[৫২] গোপালাচারির এ ফর্মুলার ব্যাপারে হাঁ বা না বলা জিন্নার জন্যে সম্ভবপর ছিলনা কতকগুলো কারণে। যেমনঃ (১) মুসলিম লীগের সাথে আলোচনা করার আগেই তাকে এ ফর্মুলা গ্রহণ অথবা বর্জন করতে হবে, (২) ফর্মুলার ভালো মন্দ নিয়ে আলোচনা করা যাবেনা, পুরোটাই গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে এবং (৩) গান্ধী ও গোপালাচারী কংগ্রেসের দায়িত্বশীল নেতা দুরের কথা, সাধারণ সদস্যও নন, অথচ জিন্নাহ মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট। গান্ধী ও গোপালচারীর কথা বলার মধ্যে কোন দলীয় বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু জিন্নার আছে। তাছাড়া ফর্মুলার শর্তাবলীতে এমন সব বিষয় আছে যা অস্পষ্ট, বিভ্রান্তি কর এবং মুসলিম লীগের এ পর্যন্তকার দাবী ও সিদ্ধান্তের খেলাফ, যা জিন্নাহ মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিতে পারেন না। যেমনঃ (১) এক নম্বর ফর্মুলায় উল্লেখিত স্বাধীন ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপরেখা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। (২) এই ১ নং ফর্মুলায় এমনভাবে কথা বলা হয়েছে যাতে মনে হয় মুসলিম লীগ স্বাধীনতা চায়না, যা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। (৩) এছাড়া এক নম্বর ফর্মুলার মূল পক্ষ বানানো হয়েছে কংগ্রেসকে, আর মুসলিম লীগকে সহযোগী, অথচ মুসলিম জাতির প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম লীগ সমান মর্যাদা সম্পন্ন। (৪) ফর্মুলার দ্বিতীয় শর্তে সকল অধিবাসীর গণভোট দেয়ার পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে এবং জেলাওয়ারী গণভোট গ্রহণের ফলে পাকিস্তান হবে জেলাওয়ারী ও শতধা বিচ্ছিন্ন, তাছাড়া অঞ্চল চিহ্নিত করলেও ভোটের জন্যে যে কমিশন হবে তা গঠন করবে কে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে কে? (৫) চার নম্বর শর্তে উল্লেখিত চুক্তি সম্পাদনের দায়িত্ব কে পালন করবে, কারণ বিভাগোত্তর সরকার গঠনের আগেই এটা হচ্ছে। (৬) ফর্মুলার ষষ্ঠ শর্ত অনুসারে বৃটিশ কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে? সেটা যদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে হয়, তাহলে সেখানে কংগ্রেস যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় এবং তারা যদি কোন অজুহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়?

৫১। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৬৬০।
৫২। 'কায়েদে আযম' আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৬৬০।

www.icsbook.info

এসব অসুবিধা ও ফাঁক ফোকর সামনে থাকা সত্ত্বেও জিন্নাহ রাজা গোপালাচারীকে জানিয়ে দিলেন, তিনি ফর্মুলাটি মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাতে পারেন। জিন্নার এই জবাবের প্রেক্ষিতে রাজা গোপালাচারী ১৯৪৪ সালের ৮ই জুলাই এক টেলিগ্রাম মারফত আলোচনা ভেঙ্গে দিলেন এবং বললেন, যেহেতু কায়েদে আযম এই ফর্মুলার অনুমোদনে অনিচ্ছুক, তাই লীগ কাউন্সিলে এটা পেশ করে কোন লাভ নেই'।

লক্ষনীয় যে, গান্ধীর কাছ থেকে অনুমোদন নেয়ার এক বছর পর রাজা গোপালাচারী জিন্নার কাছে ঐ ফর্মুলাটি পেশ করেছিলেন। কেন তিনি এত দেরী করেছিলেন বা কেন তাকে এত দেরী করানো হয়েছিল? আবার তাড়াহুড়া করে আলোচনা তিনি ভেঙ্গে দিলেনই বা কেন? প্রথম প্রশ্নটির উত্তর আমরা পাই 'Gandhi-Junnah Talks' পুস্তিকার ভূমিকায় লিয়াকত আলী খানের কাছ থেকে। তিনি লিখেন, "মিঃ গান্ধীর অনুমোদন প্রাপ্ত ফর্মুলাটির গোপনীয়তা এক বছরেরও বেশী সময় ছিল। এসময় গান্ধী ও ভাইসরয়ের মধ্যে সমঝোতায় উপনীত হওয়ার জন্যে আলাপ-আলোচনা চলছিল। ---- বৃটিশ সরকার জাতীয় সরকার গঠনের দাবী মেনে নিলে কংগ্রেসর উদ্দেশ্য সফল হতো। --- কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাদের চেষ্টা সফল হলে মুসলিম লীগ তথা কায়েদে আযমের সাথে আলোচনার কোনই প্রয়োজন হতোনা।"[৫৩] অর্থাৎ মুসলিম লীগকে পাশ কাটিয়ে এককভাবে বৃটিশের কাছ থেকে দাবী আদায়ে ব্যর্থ হবার পর মুসলিম লীগকে সাথে পাবার আশায় জিন্নার কাছে এসেছিল কংগ্রেস। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা এর উল্টো। সেটা হলো, "কায়েদে আযমকে হাত করতে ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে অক্ষম হয়ে গান্ধী ও কংগ্রেস আবার বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে উৎগ্রীম হয়ে উঠেছিলেন।"[৫৪] এর আরও একটা কারণ এই ছিল যে, ইতিমধ্যে গান্ধী জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং বৃটেনে শ্রমিক দল কংগ্রেসের সঙ্গে আপোশ করার জন্যে বৃটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। এতে বৃটিশ সরকারের সাথে আলোচনার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিল মনে হয়। আলোচনা ভেঙ্গে দেয়ার মাত্র ২ দিন পর ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী পত্রিকা 'নিউজ ক্রনিকলের' বিশেষ প্রতিনিধি স্টুয়ার্ট গোল্ডার এসে গান্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন। মনে করা হয় তিনি কোন উচ্চ মহলের প্রতিনিধি ছিলেন। তার কাছে গান্ধীও নরম সুরে কথা বলেন। যেমন তিনি বলেছিলেন, "১৯৪২ সালে যা দাবী করা হয়েছিল, ১৯৪৪ সালে তা করা যায় না, আইন অমান্য আন্দোলনও আর করা যায় না। বর্তমানে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন

৫৩। 'কায়েদে আযম' আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৬৬১।
৫৪। ঐ,পৃষ্ঠা ৬৬৪।

www.icsbook.info

জাতীয় সরকার পেলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন।"[৫৫] আসলে গোপালচারীর ফর্মুলা ছিল জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের জন্যে একটা ফাঁদ। কায়েদে আযম এ দাবী মেনে নিলে টাকার জোরে মীরজাফর সৃষ্টি করে কংগ্রেস তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নিত। কংগ্রেসের এ ষড়যন্ত্রের প্রমাণ মিলে 'মাদ্রাজ সানডে অবজারভার' পত্রিকার বিরুদ্ধে আনীত রাজা গোপালাচারীর মানহানি মামলার বিবরণীতে। এই মামলার সাক্ষী রাজা গোপালাচারীর সহকর্মী ও বন্ধু মিঃ গুণবর্ধন কোর্টে সাক্ষ্য দান কালে বলেনঃ আমি (গুনবর্ধণ) তাঁকে (গোপালাচারীকে) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কংগ্রেস মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে নাকচ করার পরেও তিনি কেন পাকিস্তান দাবীকে সমর্থন করে চলেছেন? তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, 'এ সম্বন্ধে ঘোষণা সমূহকে বিশেষ মনোযোগের সাথে আপনার পড় উচিত। দেখতে পাবেন, আমি যা বলেছি মিঃ জিন্নার স্কিম হতে তা সম্পূর্ণ পৃথক। সোজাসুজি পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কংগ্রেস একটা মস্তবড় ভুল করেছে। মিঃ জিন্নাহ চেয়েছিলেন পাকিস্তানের মুসলিমরাই কেবল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে, আমি বলি পাকিস্তানের হিন্দু মুসলিম উভয়েই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাঙ্গালার অমুসলিমরা গণনায় সংখ্যালঘিষ্ট হলেও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে ভীষণ শক্তিশালী। যদি তারা দেখতে পায় যে, এ অঞ্চলগুলো পৃথক হবার উপক্রম করেছে, তখন কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে এ সুযোগকে তারা নস্যাত করে দেবে। পাকিস্তান দাবীকে বাধা দিলেই তা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবে।--- কংগ্রেস এখানেই ভুল করেছে। আর আমি এ ভুলের সংশোধন করেছি মাত্র। জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠনের ব্যাপারে একবার কোন রকমে আমরা যদি লীগের সমর্থন পাই এবং কংগ্রেস হাতে ক্ষমতা পায় তখন এ সংকটকে কি করে আমাদের স্বার্থে কাজে লাগানো যায় তা আমরা জানি।"[৫৬] এই জীবন্ত সাক্ষ্যের পর আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা যে, কেন রাজা গোপালাচারী গান্ধীর সাথে শলা-পরামর্শ করে ফর্মুলাটি জিন্নার কাছে পেশ করেছিলেন এবং কেন তাড়াহুড়া করে জিন্নাহকে দিয়ে পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। মিঃ জিন্নাহ কংগ্রেসের এই ফাঁদকে শুধু ছিঁড়েই ফেলেননি, বিভিন্ন দিক থেকে, অনেক হিন্দু নেতার মতে, তাঁরই জয় সূচিত হয়েছিল। বিখ্যাত হিন্দুনেতা শ্রী নিবাস শাস্ত্রীর ভাষায়ঃ "ফর্মুলা (গোপালাচারী ফর্মুলা) লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মিঃ জিন্নাহ জয়ী হয়েছেন। তিনি কংগ্রেস ও দেশের উপর সর্বাধিক প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা পাকিস্তানের নীতি স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন।[৫৭] রাজনীতিকদের মধ্যে তিনি

৫৫। 'India Wins Freedom The other side', A.W. Khan, Page 177

৫৬। 'পাকিস্তান আন্দোলন', নাইম উদ্দিন আহমদ, মেম্বার কেন্দ্রীয় পরিষদ, নিখিল বাংলা মুসলিম ছাত্র লীগ, প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৬৮, ৬৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ-১৯৭০)

৫৭। গোপালাচারী ফর্মুলা প্রতারণামূলক ছিল বটে, কিন্তু এর দ্বারা গান্ধী ও গোপালাচারী দেশ বিভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব তা নীতিগত স্বীকার করেছিলেন।

www.icsbook.info

ভাগ্যবান। চার বছর আগে তিনি লর্ড লিনলিথিগোর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের সাথে পরামর্শ না করে এবং তাদের সম্মতি না নিয়ে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রে কোন পরিবর্তন আনা হবে না। মিঃ জিন্নাহ্ এ বিষয়েও গর্ব করতে পারেন। ---- কংগ্রেস তার পূর্বতন দাবীর বিরুদ্ধে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি --।"[৫৮]

রাজা গোপালাচারী ও জিন্নার মধ্যকার আলোচনা ভেঙ্গে পড়ার ঠিক দু'মাস পরে সেপ্টেম্বরের ৯ তারিখে (১৯৪৪) জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে আলোচনা শুরু হলো। আলোচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মিঃ গান্ধী। কিন্তু গান্ধীর এ উদ্যোগ ছিল ব্যক্তিগত। অর্থাৎ নিজ দায়িত্বে তিনি আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। তবে তিনি বলেছিলেন আলোচনায় কোন সিদ্ধান্ত নিলে সেটা তিনি কংগ্রেসকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেবেন। অন্যদিকে জিন্নাহ্ মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে এবং তাদের পক্ষ থেকে আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলেন। সুতরাং এদিক থেকে আলোচনায় জিন্নাহ্ ও গান্ধীর অবস্থান সমান ছিল না। এটা ছিল আলোচনার একটা অসুবিধাজনক দিক। আলোচনায় এ অসুবিধা বা ফাঁক গান্ধী ইচ্ছা করে সৃষ্টিকরে রাখতেন, বেকায়দায় পড়লে যাতে তিনি বলতে পারেন, যা তিনি বলেছেন বা মেনে নিয়েছেন তা তাঁর ব্যক্তিগত, কংগ্রেসের নয়। গান্ধীর এ দ্বি-মুখিতায় বিরক্ত হয়েই সম্ভবতঃ ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ওয়াভেলকে বলেছিলেন, "গান্ধীজী জীবিত থাকা অবস্থায় এই দেশে কোন রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়।"[৫৯]

আলোচনায় মিঃ গান্ধী প্রথমে রাজা গোপালাচারীর ফর্মুলাকেই ভিত্তি হিসেবে ধরলেন। পরে মুসলিম লীগের প্রস্তাবকে ভিত্তি করে আলোচনা হলো। সর্বশেষে গান্ধী নিজস্ব একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। গান্ধীর পরিকল্পনাটি ছিল নিম্নরূপঃ

"ক) কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃক অনুমোদিত একটা মিশন সীমানা নির্ধারণ করবে। নির্ধারিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মতামত সেই অঞ্চলের পূর্ণ বয়স্কদের ভোটের দ্বারা বা অনুরূপ কোন পন্থায় জেনে নিতে হবে।

(খ) পৃথক হবার পক্ষে ভোট হলে এটা অবধারিত হয়ে যাবে যে বৈদেশিক শাসন হতে ভারত মুক্ত হবার পর যত শীঘ্র এই অঞ্চলগুলো মিলিত হয়ে একটা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে গঠন করবে। সুতরাং ভারতবর্ষ দু'টো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

(গ) পৃথক হবার জন্যে সন্ধিপত্র থাকবে। এতে পররাষ্ট্র নীতি, দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীন যানবাহন, শুল্ক, ব্যবসায়-বাণিজ্য থাকবে, কারণ এসব বিষয় চুক্তি কারী পক্ষগুলোর ভিতর তখনও সমাধানের বিষয় বলে পরিগণিত হবে।

৫৮। 'India Wins Freedom, The other side', A. W Khan, page 184.

৫৯। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১৪৮, (দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৮৭)।

www.icsbook.info

(ঘ) দু'টো রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্টদের অধিকার সংরক্ষণের শর্তও এই সন্ধিপত্রে থাকবে।
(ঙ) কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃক এ চুক্তি গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় দল মিলিত ভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এক কর্মসূচী গ্রহণ করবে।" [৬০]

এই ফর্মুলায় গান্ধীজীর নতুন কিছুই বললেন না। রাজা গোপালাচারীর ফর্মুলা থেকে গান্ধীর এ ফর্মুলারটি অনেকটা সংক্ষিপ্ত এবং ভাষাও কিছুটা পৃথক, কিন্তু মুল বিষয়বস্তুর দিক দিযে রাজা গোপালাচারীর ফর্মুলা আর গান্ধীর এ ফর্মুলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যাহোক আলোচনা তিন সপ্তাহ ধরে চলে। আলোচনাটা একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হতো তা তাঁরা একে অপরকে চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিতে। ন) তাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল মূলত দু'টি বিষয়ের উপর। একটি দ্বিজাতিতত্ব ও অন্যটি ভারত বিভাগ পদ্ধতি।

গান্ধী দ্বিজাতিতত্ব অর্থাৎ মুসলমানরা কোন পৃথক জাতি, একথা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। আলোচনার সময় জিন্নাহকে তিনি বলেন, "ধর্মান্তরিত একদল মানুষ ও তাদের বংশধরেরা পূর্ববর্তীদের থেকে স্বতন্ত্র জাতীয়তা দাবী করার নজীর আমি ইতিহাসে খুঁজে পাইনা। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতে যদি একজাতি থেকে থাকে, তাহলে তাদের সন্তানদের বড় একটা অংশ ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও সেই একজাতিই থাকে।"[৬১]এর উত্তরে কায়দে আজম বলেন, "আমরা বলি জাতীয়তার যে কোন সংজ্ঞায় মুসলমান ও হিন্দুরা দু'টো প্রধান জাতি। --- আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট (স্বতন্ত্র) সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ভাষা ও শিল্প ও স্থাপত্য, নাম ও পরিচয়, মূল্যবোধ, আইন ও নীতিমালা, আচার ও পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য, যোগ্যতা ও আকাঙ্খা। --আন্তর্জাতিক আইনের সব নিয়মে আমরা একটা আলাদা জাতি।[৬২] দ্বিজাতিতত্বের আলোচনায় সুবিধা করতে না পেরে গান্ধী ১৯শে সেপ্টেম্বর আলোচনায় বললেন, "দ্বিজাতিতত্বের বিতর্ক বাদ দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকারকে ভিত্তি করে কি সমাধান করতে পারিনা?" [৬৩] জিন্নাহ উত্তর দিয়েছিলেন, "মুসলমানরা আঞ্চলিক ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করেনা, তারা এই দাবী করে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে। সুতরাং দ্বিজাতিতত্বে বাদ দিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।"[৬৪] গান্ধী তার পরিকল্পনায় ভারত বিভাগের প্রতি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, কিন্তু মুসলমানদেরকে জাতি হিসাবে স্বীকার করতে রাজী ছিলেন না। এর মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে লুকিয়ে ছিল গান্ধীর কুটকৌশল। স্বতন্ত্র জাতি স্বীকার করা এবং আঞ্চলিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নেয়ার মধ্যে রয়েছে গুরুতর পার্থক্য। এই পার্থক্যের কারণেই জিন্নাহ মেনে নিতে পারেননি রাজা গোপালাচারীর ফর্মুলা এবং গান্ধীর ফর্মুলাও। গান্ধী ফর্মুলায় 'ভারত বিভাগ

৬০। পাকিস্তান আন্দোলন', নাই উদ্দিন আহমদ (প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৪৫) পৃষ্ঠা ১০১। ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দিন পৃষ্ঠা ৬৭৩, ৬৭৪।

www.icsbook.info

পদ্ধতি' নিয়ে আলোচনা এখানে এসেই ব্যর্থ হয়। বিভাগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে গান্ধীর পক্ষ থেকে তার ফর্মুলার ব্যাখ্যায় বলা হয়, 'যে সকল জেলায় মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্থাৎ অন্তত শতকরা ৭৫ জন মুসলমান রয়েছে। সেগুলি গণভোট ছাড়াই স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হবে। বাকি সকল জেলার অধিবাসীদের গণভোট নিতে হবে।'[৬৫] উত্তরে কায়েদে আযম বললেনঃ যেহেতু মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বিভাগ দাবী করে (অঞ্চলগত দাবীতে নয়), সেহেতু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল (শতকরা ৫০ ভাগের বেশী) ও প্রদেশসমূহের (শতকরা ৫০ভাগের বেশী) সকল অধিবাসীর গণভোট গ্রহণের প্রশ্ন ওঠেনা। (কারণ, স্বভাবতই ঐ সকল অঞ্চলের সংখ্যালঘু অমুসলমানরা বিভাগ দাবী করছে না)।"[৬৬] তাছাড়া জেলাওয়ারী গণভোটের মধ্যে মুসলমানদের জন্যে যে আরেকটা অন্ধকার দিক রয়েছে তার দিকে অংগুলি সংকেত করে জিন্নাহ বললেন, 'জেলাওয়ারী গণভোট গ্রহণের ফলে পাকিস্তান হবে 'পোকায় খাওয়া' অর্থাৎ (পাকিস্তান অঞ্চলের) মাঝে মাঝে হিন্দুস্তান হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান।'[৬৭] গান্ধী ফর্মুলার ভারত-বিভাগ পদ্ধতিতে আরেকটা শর্ত এই ছিল যে, ক্ষমতা হস্তান্তরিত অর্থাৎ বৃটিশ শাসন বিলোপের পর অন্তর্বর্তী সরকার গণভোট গ্রহণ ও বিভাগের ব্যবস্থা করবে। জিন্নাহ এ শর্ত প্রত্যাখ্যান করেন। 'কারণ গান্ধীর প্রস্তাবিত অর্ন্তবর্তী সরকার হবে সম্পূর্ণ হিন্দু প্রভাবিত, তাতে মুসলমানেরা হবে সংখ্যালঘিষ্ঠ। যৌথ দায়িত্ব ভিত্তিক অন্তর্বর্তী সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সকল প্রশ্নের সমাধান হবে বিধায় উক্ত রূপ সরকার ক্ষমতা হস্তগত করার পর নানা পন্থায় বিভাগ প্রস্তাব বানচাল করে দিতে পারে।'[৬৮] বিভাগ-প্রস্তাব বানচাল হওয়া সংক্রান্ত জিন্নার আশংকা যথার্থ ছিল। প্রকৃত পক্ষে বিভাগ প্রস্তাব বানচাল করা যাবে এই আশাতেই গান্ধী ও গোপালাচারী ভারত বিভাগে রাজী হয়ে ঐ সুকৌশল ফর্মুলা পেশ করেছিলেন। তাদের এ ষড়যন্ত্রের কিঞ্চিত প্রকাশ ঘটেছে রাজা গোপালচারীর মানহানির মামলায় মিঃ গুনবর্ধণের সাক্ষ্যে। এ আশংকার কারণেই জিন্নাহ আগে চাচ্ছিলেন বিভাগ, তারপর স্বাধীনতা, আর ঐ ষড়যন্ত্র সফল করার জন্যে গান্ধী চাচ্ছিলেন আগে স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হস্তান্তর তারপর বিভাগ। গান্ধী ফর্মুলায় গণভোট ও দেশ বিভাগের আগেই চুক্তি সম্পাদনের কথা। গান্ধীর সাথে আলোচনায় জিন্নাহ এ ধরনের শর্ত প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "পাকিস্তানের রূপ কি হবে তা জানার পূর্বেই প্রতিরক্ষা, অর্থ, পররাষ্ট্র, বাণিজ্য, শুল্ক, যোগাযোগ, ইত্যাদি বিষয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে। --- এটা স্বাধীনতা নয় এটা এক ধরনের প্রাদেশিক অটোনমি, যাতে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিপুল হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ

৬৫, ৬৬। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দিন পৃষ্ঠা ৬৭৩, ৬৭৪।
৬৭। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৬৭৪, ৬৭৫।
৬৮। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৬৭৪, ৬৭৫।

www.icsbook.info

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এ সকল বিষয়ে দু'টো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র যেভাবে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করে, স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন হিন্দুস্তান সেই ভাবেই চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা করবে।"[৬৯]

দ্বিজাতিতত্ত্ব ও ভারত বিভাগ পদ্ধতি বিষয়ে উপরোক্ত প্রবল মত পার্থক্যের কারণেই জিন্নাহ্ গান্ধীর মধ্যকার আলোচনা ব্যর্থ হলো। আলোচনা শেষে তাঁরা উভয়ে এক যুক্ত ইশতেহারের মাধ্যমে তাদের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করলেন। পরে গান্ধী ১৯৪৪ সালের ২৯ শে সেপ্টেম্বর আলোচনায় ব্যর্থতার জন্যে জিন্নাহকে অভিযুক্ত করে এক সাংবাদিক সাক্ষাতকার দিলেন।[৭০] এর উত্তরে ১৯৪৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জিন্নাহ্ গান্ধীর অভিযোগের জবাব দিলেন।[৭১] আলোচনার পর গান্ধী জিন্নার উপর বিক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ এই হতে পারে যে, গান্ধী জিন্নার সাথে তার আলোচনায় কৌশলগত দিক দিয়ে ঠকে গিয়েছিলেন। গান্ধীর জীবনীকার বি, আর, নন্দের ভাষায় 'এক সময় যে মহাত্মা ভারত বিভাগকে পাপ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন, তিনি পরে (মুসলমানদের) আত্মনিয়ন্ত্রণ এর অধিকার সম্পর্কিত পন্থা নিয়ে আলোচনা করেন। এটা জিন্নার আরেক দফা জয় বলতে হবে।[৭২]

জিন্নাহ গান্ধী আলোচনা ব্যর্থ হবার পর এবং ১৯৪৫ সালের জুনে বৈঠক শুরু হবার আগে আরও দু'টি ঘটনা ঘটে। একটি অদলীয় সম্মেলন, আরেকটি লিয়াকত দেশাই ফর্মুলা উত্থাপন। অদলীয় সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু। দলীয় লীগ কংগ্রেস আলোচনায় যে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না, তা তিনি অদলীয় সম্মেলনের মাধ্যমে করতে চাইলেন। সম্মেলনটি অদলীয় হলেও স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু গান্ধীর আশীর্বাদ[৭৩] নিয়েই তাঁর কাজে হাত দিয়েছিলেন, অথচ এধরনের কোন সাক্ষাত তিনি জিন্নার সাথে করেননি। এই অদলীয় সম্মেলন ১৯৪৫ সালের ৮ই এপ্রিল যে পনেরটি প্রস্তাব পেশ করল তাও কংগ্রেস মত অনুসারেই প্রণীত[৭৪] এবং লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মজার ব্যাপার যাদের সম্মেলনে আহ্বান করা হয় তারা সবাই হয় কংগ্রেস অথবা হিন্দু মহাসভার অন্ধ বিশ্বাসী, নইলে সরকারের দালাল। কমিটিতে

৬৯। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৬৭৪, ৬৭৫।
৭০, ৭১। জিন্নাহ ও গান্ধীর এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হলো।
৭২। 'Mahatma gandhi', B.R. Nanda, page 239.
৭৩। 'পাকিস্তান আন্দোলন', নাইম উদ্দিন আহমদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৭৩।
৭৪। অদলীয় সম্মেলনের ১৫টি প্রস্তাবের সারসংক্ষেপ হলোঃ
ক) ভারত ভাগ করা যাবেনা।
খ) ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে (খসড়া) ১৬০ জন সদস্য সম্বলিত একটি শাসনতন্ত্র তৈরী সংস্থা গঠন করতে হবে।
গ) দেশীয় রাজ্যসমূহকে ইউনিট হিসেবে যোগদান করতে দিতে হবে।
ঘ) বৃটিশ ভারতের কোন প্রদেশকে প্রস্তাবিত ইউনিয়নে যোগদান না করা কিম্বা ইউনিয়ন থেকে বেরিয়া যাবার অধিকার দেয়া হবেনা।
ঙ) পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল করতে হবে।

www.icsbook.info

যে ২/৩জন মুসলিমকে নেয়া হয়েছিল তারাও সরকারের খেতাব ধারী।"[৭৫] ১৯৪৪ সালের ১৯ শে নভেম্বর দিল্লীতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সম্মেলনের স্ট্যান্ডিং কমিটি ১০ই ডিসেম্বর জিন্নার সাথে সাক্ষাতের উদ্যোগ নিল। তাদের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করে জিন্নাহ তাদের জানিয়ে দিলেন, দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমি অদলীয় সম্মেলন অথবা এর স্ট্যান্ডিং কমিটিকে স্বীকার করিনা। তিনি (তেজবাহাদুর সাপ্রু) যেন এটাকে তার প্রতি ব্যক্তিগত অসৌজন্য প্রকাশ বলে মনে না করেন।"[৭৬] বস্তুত অদলীয় সম্মেলন ছিল কংগ্রেসেরই পেছন দরজার একটি পরিকল্পনা। যার জন্যে রাজা গোপালাচারী উৎসাহের সাথে বলেছিলেন, "এ সম্মেলন যে রায়ই দিক না কেন মুসলিমদের তা মেনে নেয়া উচিত।"[৭৭] যা হোক, তেজ বাহাদুর সাপ্রুদের পরিশ্রমই শুধু সার হয়েছিল,সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তারা এক ইঞ্চিও আগাতে পারেননি। ভি.পি. মেননের ভাষায়ঃ "বিশিষ্ট ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও কমিটির প্রচেষ্টা অগ্রগতির সহায়ক হয়নি। একদিকে কমিটিতে প্রথম শ্রেণীর কোন মুসলমান ছিলেন না, অন্যদিক পাকিস্তানের ধারণা এবং পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করায় মুসলিম লীগের মনোভাব অধিকতর বিরোধী হয়।"[৭৮] দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিল ভারতের কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সহকারী নেতা লিয়াকত আলী খান এবং কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা ভুলা ভাই দেশাই এর মধ্যকার জাতীয় সরকার গঠন সম্পর্কিত একটা চুক্তি। চুক্তিতে বলা হয়েছিল,

"বর্তমান শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই কংগ্রেস ও লীগ নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটা সাময়িক জাতীয় সরকার গঠন করতে সম্মত আছেঃ

ক) নতুন একজিকিউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই সমান সংখ্যক আসন পাবে।

খ) এই রূপে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেন্ট অনুন্নত সম্প্রদায় ও শিখদের স্বার্থকে অবহেলা করবেনা।

গ) সামরিক সর্বাধিনায়ক এই কাউন্সিলের একজন এক্স-অফিসিও সভ্য হবেন।

ঘ) নির্বাচিত আইন সভায় অধিকাংশ সভ্য যে প্রস্তাব সমর্থন করবেনা, সেরূপ কোন প্রস্তাব এই কাউন্সিল কার্যে পরিণত করবেনা।

ঙ) গভর্ণমেন্ট গঠন করবার অব্যবহিত পরেই এই নতুন সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বন্দী সভ্য ও অন্যান্য কংগ্রেসীদের মুক্তি দেবেন।

(চ) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট গঠিত হবার পর বর্তমানে যে সমস্ত প্রদেশে ৯৩ ধারা

৭৫। 'পাকিস্তান আন্দোলন', নাইম উদ্দিন আহমদ, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৭৩।
৭৬। 'Speches and Writings of Mr. Jinnah', Vol-ii Jamiluddin Ahmed, page152, 155
৭৭। 'পাকিস্তান আন্দোলন', নাইম উদ্দিন আহমদ, প্রথম প্রকাশ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ৭৪।
৭৮। 'Transfer of power in India', V.P Menon, page 179

www.icsbook.info

প্রচলিত আছে সেই সমস্ত প্রদেশে লীগ-কংগ্রেস যুক্ত সরকার গঠিত হবে।
(ছ) উল্লেখিত নীতির উপর ভিত্তি করে বড়লাটকে ভারতের জন্য নতুন প্রস্তাব পেশ করতে বলা হবে।"[৭৯]

পরবর্তী কালের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, লিয়াকত আলী খান ও ভুলা ভাই দেশাই তাঁদের স্ব স্ব দলের সাথে কোন প্রকার আলোচনা ছাড়াই এই চুক্তি করেছিলেন। অন্তত মুসলিম লীগ এ বিষয়টা জানত না। জিন্নার ভাষায় তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নন এবং যদি কিছু হয়ে থাকে, সেটা লীগের অনুমোদন নিয়ে করা হয়নি।[৮০] অন্যদিকে লিয়াকত আলী খানও বাকায়দা কোন চুক্তি সম্পাদনের কথা স্বীকার করেননি। চুক্তিটি প্রকাশ হলে তিনি এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশাই তাঁর সাথে সাধারণভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে কেন্দ্রে লীগ কংগ্রেস যুক্ত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা উল্লেখ করেছিলেন।[৮১] সব দিকের বিবেচনায় মনে হয় সংসদীয় কংগ্রেস দলের নেতা ভুলা ভাই দেশাই এ পরিকল্পনার প্রণেতা এবং তিনি এটা করেছিলেন গান্ধীর পরামর্শে। ১৯৪৫ সালের ১৩ইং জানুয়ারী ভাইসরয়ের পি,এস এবং ২০ শে জানুয়ারী ভাইসরয় ওয়াভেলকে চুক্তি সম্পর্কে অবহিত করার সময় ভুলা ভাই দেশাই গান্ধীর অনুমোদনের কথা তাকে বলেছিলেন। লিয়াকত-দেশাই পরিকল্পনা খুব বেশীদূর এগোয়নি, তবে এই ফর্মুলা পরবর্তী বৃটিশ ফর্মুলা ও সিমলা আলোচনা ভিত্তি ছিল। এদিক থেকে লিয়াকত দেশাই পরিকল্পনার একটা ঐতিহাসিতক মূল্য আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, কংগ্রেস পরে লিয়াকত - দেশাই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে এবং দেশাই কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। এমনকি অবশেষে দেশাই পর্যন্ত এ ধরনের চুক্তির কথা অস্বীকার করেন।[৮২] মনে করা হয় এই চুক্তির মধ্য দিয়ে যে দ্বিজাদিততত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছিল, সেই ভুল শোধরানোর জন্যেই এই চুক্তি অস্বীকার করা কংগ্রেসের জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় গান্ধী এ ধরনের চুক্তির অনুমোদন দিয়েছিলেন কেন এবং কংগ্রেস নেতা দেশাই এটা প্রণয়ন করে ভাইসরয়ের কাছে হাজির করেছিলেন কেন? এর একটা সুন্দর জবাব পাওয়া যায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সদস্য জনাব নাইম উদ্দিন আহমদের কাছে। তিনি ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে বলেন, "দেশাই-লিয়াকত চুক্তির একটা গোপনীয় কারণও ছিল। এ ব্যাপারটা কংগ্রেসের গত কয়েকমাসের কার্যকলাপ দেখে দিবালোকের ন্যায়

৭৯। 'পাকিস্তান আন্দোলন', নাইম উদ্দিন আহমদ, প্রথম সংস্করণ ১৯৪৫, পৃষ্ঠা ১০২।
৮০। 'Transfer of power in India', V.P. Menon, page176-178.
৮১। 'কায়েদে আযম',আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৬৯৭।
৮২। 'পাকিস্তান আন্দোলন', নাইম উদ্দিন আহমদ, প্রথম প্রকাশ পৃষ্ঠা ৭৫।

www.icsbook.info

পরিস্কার হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন জেলে থেকে কংগ্রেস কর্মীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন। কিন্তু বেরিয়ে আসার উপায় কি? আগস্ট বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে তারা এতবড় গুরুতর অন্যায় ও ভুল করেছিলেন যে, নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করবার কোন উপায় ছিলনা, নিজেদের বিবেকের নিকটেই এরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। একমাত্র লীগের সাথে আপোষ রফার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে রাজী হওয়ার দ্বারাই নেতৃবৃন্দকে জেল হতে বের করে আনা সম্ভব। ---- এই চুক্তির কারণেই ওয়াভেল রাজবন্দীদের মুক্ত করতে শুরু করেন। দেশাইজীর চাল সাফল্য মন্ডিত হওয়ামাত্র কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে সরকার গঠনে লীগকে বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে গেল।"[৮৩]

লীগ-কংগ্রেস সমঝোতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ভারতের বৃটিশ সরকার সমস্যা সমাধানের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করল। ১৯৪৫ সালের প্রথম কোয়ার্টার শেষ হবার আগেই পরিস্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মিত্র শক্তির বিজয়ের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের বিষয়টি আশু হয়ে উঠবে। অন্যদিকে সমঝোতায় পৌঁছার ক্ষেত্রে লীগ কংগ্রেসের বার বার ব্যর্থতায় ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করলেন। এবিষয়ে লর্ড ওয়াভেল লন্ডনে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু পত্রালাপ করার পর ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে লন্ডন গেলেন। লন্ডন থাকার সময় তিনি লিয়াকত-দেশাই চুক্তি সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৮৪] কারণ ব্যক্তিগতভাবে ওয়াভেল চুক্তিটি খুবই পছন্দ করেছিলেন।

জুন মাসে ওয়াভেল ফিরে এলেন ভারতে। ১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন ওয়াভেল সফরের ফল হিসেবে বৃটিশ সেক্রেটারী অব স্টেট এমারি হাউস অব কমন্সে ভারতের আশু রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটা পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন যে, যদি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল সমূহ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকার সাহায্য করতে স্বীকার করে, তাহলে যুদ্ধোত্তর কালীন পুনর্গঠনের কার্য সম্পাদনের জন্য একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে বৃটিশ সরকার প্রস্তুত আছে। জাতীয় সরকার সম্পর্কিত তার ঘোষণায় বলা হলো, "ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহের নেতাদের মধ্য থেকে সদস্য নিয়োগ করে ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল পূনর্গঠন করা হবে। সদস্যদের মধ্যে মুসলমান ও বর্ণহিন্দুদের সংখ্যা সমান থাকবে। ভাইসরয় ও প্রধান সেনাপতি ব্যতীত কাউন্সিলের অন্য সকল সদস্য ভারতীয় হবেন। প্রদেশসমূহ থেকে ৯৩ ধারা প্রত্যাহার করে প্রধান দলগুলির প্রতিনিধি নিয়ে প্রদেশিক মন্ত্রীসভাসমূহ গঠন

৮৩। 'পাকিস্তান আন্দোলন', নাইম উদ্দিন আহমদ, পৃষ্ঠা ৭৫ (তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭০)।
৮৪। 'ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন', বদরুদ্দীন উমর, পৃষ্ঠা ১৪৮।

www.icsbook.info

করা হবে। উপজাতীয় ও সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্য সমস্ত পররাষ্ট্র বিষয় ভারতীয় সদস্যদের অধীনে দেয়া হবে। তবে এই অন্তর্বর্তী পরিবর্তন দ্বারা ভারতের জন্যে এক বা একাধিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে কোন রকম বাধা থাকবেনা।" এই একই তারিখে ভারতে লর্ড ওয়াভেল এক বেতার বক্তৃতার মাধ্যমে বৃটিশ সরকার ঘোষিত এই পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দিলেন এবং এই পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনার জন্যে তিনি ২৫ শে জুন সিমলায় একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন।

এই বৃটিশ পরিকল্পনাটি লিয়াকত -দেশাই ফর্মুলার যে ধারনা তার খুব কাছাকাছি। প্রধান পার্থক্য হলো, লিয়াকত-দেশাই ফর্মুলায় জাতীয় সরকারে লীগ-কংগ্রেস প্যারেটির কথা বলা হয়েছিল, আর বৃটিশ পরিকল্পনায় সেখানে মুসলিম ও বর্ণহিন্দুর মধ্যে প্যারেটির কথা বলা হলো। এতে কংগ্রেস ও লীগ উভয় পক্ষেরই কিছু লাভ-ক্ষতি হলো। লীগ-কংগ্রেস প্যারেটির মধ্যে জাতীয় সরকারে মুসলিম লীগের অংশ সুনির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু এতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি ছিলনা। এতে এক দিকে মুসলিম লীগ লাভ করছিল, অন্যদিকে তার ক্ষতি হচ্ছিল। আর মুসলিম ও বর্নহিন্দুর প্যারেটির মধ্যে দ্বি-জাতিতত্ত্বের প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি মুসলিম লীগ পেল। কিন্তু জাতীয় সরকারে মুসলিম লীগের অংশ সুনির্দিষ্ট হলোনা। যেহেতু কংগ্রেসে কিছু মুসলমান ছিল এবং যেহেতু কংগ্রেস নিজেকে মুসলমানদেরও প্রতিনিধি বলে দাবী করে, তাই কংগ্রেস জাতীয় সরকারে মুসলমানদের ভাগ থেকে একটা অংশ দাবী করতে পারে। এটা ছিল কংগ্রেসের জন্যে বড় লাভের দিক, কিন্তু তার জন্যে ক্ষতির দিক হলো, দ্বি-জাতিতত্ব এর ফলে স্বীকৃতি পেয়ে গেল। বৃটিশ পরিকল্পনায় কংগ্রেসের সবচেয়ে অসন্তোষের দিক ছিলো, এতে কংগ্রেসকে কার্যত বর্ণহিন্দুর সংগঠন বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এ দ্বারা বর্ণহিন্দু থেকে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরকে জাতি হিসেবে বিচ্ছিন্ন করা হলো।

কংগ্রেসের জন্যে ক্ষতিকারক দু'টি বিষয়েরই তীব্র প্রতিবাদ করলো কংগ্রেস। গান্ধী বললেন, "বরঞ্চ কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমতার ব্যাপারটা উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু বর্ণ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সমতার নীতি গ্রহণ করার ফলে 'অপরিবর্তনীয় ধর্মীয় বিভাগ সৃষ্টি করা হবে।"[৮৫] ২১ থেকে ২২ শে জুন তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভাইসরয় আহুত সিমলা সম্মেলনে অংশ গ্রহনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার প্রতিনিধিদেরকে জাতীয় সরকার সম্বন্ধে তিনটি নীতিগত দিক সুনির্দিষ্ট করে দিল। নীতি তিনটি হলোঃ (১) প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অস্থায়ী ধরনের হতে হবে, (২) সাম্প্রদায়িক সমতা নীতি গ্রহণের অযোগ্য, (৩)

৮৫। 'The Struggle for Pakistan', I.H. Qureishi, page 233.

www.icsbook.info

সাম্প্রদায়িক সমতা নীতি প্রাদেশিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, এবং (৪) জাতীয় সরকারে মুসলমান সদস্যগণ কেবল মুসলিম লীগ দ্বারা মনোনীত হবেনা।

কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে তার দ্বিধাগ্রস্ততার ছাপ পরিস্ফুট এবং এটা তার নৈতিক অবস্থান দুর্বল হওয়ারই প্রমাণ। কংগ্রেসের উল্লেখিত চারটি নীতির মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। তৃতীয় নীতির দ্বারা দ্বিতীয় নীতিকে বাতিল করা হয়েছে। আবার চতুর্থ নীতি গ্রহণ করে তৃতীয় ও দ্বিতীয় নীতিকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। এখানে কংগ্রেসের নীতিগত অবস্থানের সারাংশ এই যে, কংগ্রেস দ্বিজাতিতত্ব মেনে নিচ্ছে, কিন্তু জাতীয় সরকারে মুসলমানদের যে ভাগ, তা থেকে কংগ্রেসকে অংশ দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সিমলা কনফারেন্সে কংগ্রেসের এটাই ছিল নীতিগত অবস্থান।

কংগ্রেসের এই মনোভাবের জবাবে দিল্লী থেকে প্রকাশিত মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডন' এ বলা হলো, 'শুধু মাত্র মুসলিম লীগ কর্তৃক মনোনীত মুসলিম সদস্যদেরকেই ভারইসয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে নিতে হবে। কারণ মুসলিম লীগই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান।'

একটা প্রশ্ন, কংগ্রেস জাতীয় সরকারে দ্বিজাতিতত্ব সহ মুসলিম ও বর্ণ হিন্দু প্যারেটির পরিকল্পনার প্রতি এত তাড়াতাড়ি সায় দিল কেন? সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে কংগ্রেস এটা মেনে নেবার কারণ হলো, জাতীয় সরকারে মুসলমানদের ভাগ থেকে একটা অংশ যদি কংগ্রেস হাত করতে পারে, তাহলে জাতীয় সরকারে সে হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরেই সে ভারতের ভবিষ্যত শাসন ও পরিকল্পনায় দ্বিজাতিতত্ব প্রতিরোধের পথ করে নেবে। কংগ্রেসও মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি পেলে এই কাজটা তার জন্যে সহজ হবে। একজন কংগ্রেসী নেতা মিঃ রঙ্গ এর একটি প্রকাশ্য বিবৃতি এ রকম ছিলঃ "সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হোক অথবা সফল হোক কংগ্রেস জিতবেই। কংগ্রেস ওয়াভেল পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে লীগ-বৃটিশ যোগাযোগ নষ্ট করে দেবে। সম্মেলন ব্যর্থ হলেও কংগ্রেস এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে, সরকার লীগকেই এজন্যে দায়ী করবে। সম্মেলন সাফল্যমন্ডিত হলে (পাঞ্জাবের) ইউনিয়নিষ্টদের সহযোগিতায় কংগ্রেস লীগকেই জব্দ করবে। আমরা যদি ইউনিয়নিষ্টদের সহযোগিতা পাই, তাহলে লীগের কণ্ঠ রোধ করা সহজ হবে। --- সরকারী পদগুলো আমরা অধিকার করব। এবং ক্ষমতা হাতে পেলেই লীগকে প্রাণান্ত করে তুলব"[৮৬] ২৫ শে জুন সিমলায় কনফারেন্স শুরু হলো। আলোচনায় অচলাবস্থা দেখা দিল জাতীয় সরকারে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিয়ে। জাতীয় সরকারে মুসলিম সদস্য মনোনয়নের একক অধিকার মুসলিম লীগ দাবী

৮৬। 'পাকিস্তান আন্দোলন', নাইম উদ্দিন আহমদ, প্রথম সংস্করণ ১৯৪৫ (ডিসেম্বর), পৃষ্ঠা ৭৭।

www.icsbook.info

করল। বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল এবং কংগ্রেস এটা মেনে নিতে অস্বীকার করল। কংগ্রেস জাতীয় সরকারে মুসলমানদের ভাগ থেকে একটা অংশ দাবী করল। অচলাবস্থার এক পর্যায়ে এসে ২৯ শে জুন (১৯৪৫) মিঃ জিন্নাহ এক বিবৃতিতে সকলকে জানিয়ে দিলেন, "যে কোন ন্যায় ও যুক্তিসংগত সমঝোতায় আমরা অংশ গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। --- কিন্তু মুসলমানদের জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে কংগ্রেস বা অন্য কোন দল কোন মুসলমান সদস্য নিয়োগ করবে, এ নীতিতে লীগ সম্মত হতে পারেনা। --- ভাইসরয়ের প্রস্তাবিত কাউন্সিল গঠনের যে রূপ প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে মুসলিম লীগ তথা মুসলমান সদস্যগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ হবে এবং যেহেতু কেবিনেট ধরনে (অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী সরকারকে পরিচালনার নীতি) কাউন্সিল গঠনের ইংগিত দেয়া হয়েছে, সেই হেতু মুসলিম লীগ সদস্যগণ কোণঠাসা হওয়ার ও লীগের পাকিস্তান দাবী বানচাল হওয়ার বাস্তব আশংকা আছে। এমনকি, ভাইসরয়ের বিশেষ ক্ষমতাও কার্যকরীভাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারবেনা।"[৮৭] এর পর ৭ই জুলাই জিন্নাহ ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে জানালেন, "(১) একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যগণ একমাত্র মুসলিম লীগ কর্তৃক মনোনীত হতে হবে, এবং (২) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা সদস্যগণ কর্তৃক অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের জন্যে রক্ষাকবচ থাকতে হবে।"[৮৮]

৯ই জুলাই ভাইসরয় ওয়াভেল এর উত্তরে জিন্নাহকে জানালেন যে, দ্বিতীয় দফায় জিন্নাহ যা চেয়েছেন, সে ধরনের কোন নিশ্চয়তা দিতে তিনি অপারগ।' এর একদিনপর ১১ ই জুলাই তারিখে লর্ড ওয়াভেল জিন্নাহেকে জানিয়ে দিলেন, পাঁচ মুসলিম আসনের মধ্যে চারজন তিনি লীগ থেকে নিতে সম্মত আছেন, তবে পঞ্চম আসনে লীগ বহির্ভূত একজন পাঞ্জাবী (ইউনিয়নিষ্ট পার্টির) মুসলমানকে নেয়া হবে।'

কংগ্রেস ওয়াভেলের এ প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল। মুসলিম সদস্যদের একটা আসন কংগ্রেস না পাওয়া সত্ত্বেও এটা মেনে নিয়েছিল। কারণ কংগ্রেস নিশ্চিত ছিল পাঞ্জাবের ইউনিয়নিষ্ট পার্টি থেকে যাকে নেয়া হবে তাকে কংগ্রেসের পক্ষেই পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত এ প্রস্তাবের দ্বারা লীগকে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের একক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, অর্থাৎ মুসলিম শক্তি এর দ্বারা বিভক্ত হবে। এটা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক।

লর্ড ওয়াভেলের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করলেন জিন্নাহ। তিনি ভাইসরয় ওয়াভেলকে জানিয়ে দিলেন, 'ওয়াভেল পরিকল্পনার সাথে লীগ কোন সহযোগিতা করতে পারবেনা।' তিনি সুস্পষ্টভাবে আরও জানালেন, "১৯৪০ সালে লাহোর

৮৭। 'Speches and Writings ofMr. Jinnah', Vol- 1, Jamiluddin Ahmed, page 175-180.
৮৮। 'Quid-I-Azam's correspondence', Shariffuddin peerzada, page 311-319(জিন্নাহ ওয়াভেল পত্রাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য)।

www.icsbook.info

প্রস্তাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; সেই প্রস্তাবের মৌলিক দিক রক্ষা করে লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে প্রস্তুত আছে; এটা প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় শর্ত হলো, যেহেতু মুসলমানরা একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নয়, বরং একটি স্বতন্ত্র জাতি, সেহেতু প্রস্তাবিত কাপিলে মুসলমানরা (তথা মুসলিম লীগ) সমান সংখ্যক আসন দাবী করেছিল। ওয়াভেল প্রস্তাবে এ শর্ত দুটিই নস্যাত করা হয়েছে।"[৮৯]

মিঃ জিন্নার তরফ থেকে অসহযোগিতার জবাব পাওয়ার পরেই ভাইসরয় ওয়াভেল সিমলা আলোচনা ভেঙ্গে দিলেন। ভীষণ ক্রুদ্ধ হলো এতে কংগ্রেস। লীগকে বাদ দিয়েই তারা বৃটিশের সাথে সমঝোতা করে জাতীয় সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখছিল। সুতরাং সিমলা আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে হিন্দু পত্রিকাগুলো জিন্নার উপর খড়গহস্ত হল। তারা জিন্নাহকে ভারতের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক, স্বার্থপর, দাম্ভিক, ইত্যাদি নানাভাবে গালি-গালাজ করতে লাগল। এই সাথে বৃটেনের টাইমস, ডেইলি টেলিগ্রাফ, অবজার্ভার, নিউজ ক্রনিকল প্রভৃতি পত্রিকাও জিন্নার উপর দোষারোপ করতে শুরু করল। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযোগগুলো ছিল উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর শামিল। মুসলিম লীগকে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের অধিকার সম্পূর্ণটা না দেয়া সংক্রান্ত কংগ্রেসের ২১ ও ২২ শে জুনের প্রস্তাবটিই ছিল বিরোধের মূল উৎস। ওয়াভেলও এর সাথে সায় দিয়েছিলেন। তাছাড়া একজিকিউটিভ কাউন্সিলের গঠন শেষ পর্যন্ত এমন করা হয়েছিল যাতে মুসলমান নগণ্য সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছিল। তার উপর যদি আবার একটি মুসলিম আসন কংগ্রেসের অধিকারে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে লীগ কোন ভুমিকাই পালনকরতে পারতো না। এই অবস্থাতেই জিন্নাহকে ভারতের মুসলমানদের স্বার্থে শক্ত ভুমিকা নিতে হয় যা ছিল ন্যায় সংগত। জিন্নার জীবনীকার আকবর উদ্দীন লিখছেন, "সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্যে কায়েদে আযমকে দায়ী করার পূর্বে দুটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, সম্মেলনের আরম্ভে ওয়াভেল বারোজন সদস্য নিয়ে একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করবেন বলেছিলেন। তন্মধ্যে ৫ জন বর্ণ হিন্দু (কংগ্রেস), ৫ জন মুসলমান, ১ জন তফসিলী ও একজন শিখ সদস্য থাকবে। পরে এই সংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে ৫ঃ৫ঃ৩, শেষে ৫ঃ৫ঃ৪ হয়। কায়েদে আযম ভাইসরয়কে জানিয়েছিলেন যে, ১৪জন সদস্যের মধ্যে ৫জন লীগ সদস্য হলেও লীগ বিপদজনকভাবে সংখ্যালঘু হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, আবার এই ৫জনের মধ্যে যদি একজন অ-লীগ পাঞ্জাবী মুসলমানকে নেওয়া হয়, তাহলে লীগ অধিকতর সংখ্যালঘিষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয়ত লীগ বহির্ভূত একজন পাঞ্জাবী মুসলমানকে সদস্য নিয়োগ করার অর্থই হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।"[৯০] যা কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রকে সাহায্য করতো

৮৯। 'Speches and Writings of Mr. Jinnah', Vol-11, Jamiluddin Ahmed, page 185-188.
৯০। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭০৩, ৭০৪।

www.icsbook.info

এবং বিপন্ন করে তুলতো মুসলিম সংগ্রামকে। সিমলা আলোচনা সম্পর্কে ইতিপূর্বে উল্লেখিত হিন্দু নেতা মিঃ রঙ্গ এর বিবৃতি এরই একটা বড় প্রমাণ।

সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার দোষ মুসলিম লীগের উপর চাপিয়ে খুশি হলো বৃটিশ সরকারও। এতে করে তারা কংগ্রেসের কাছে নির্দোষ সাজার একটা সুযোগ পেল। কিন্তু সেই সাথে তারা মুসলিম লীগের গুরুত্ব স্বীকার না করে পারলনা। বৃটিশ সেক্রেটারী অব স্টেট আমেরী ভাইসরয় ওয়াভেলকে লিখলেন, "এবার কংগ্রেস নেতাদের বোঝা উচিত যে, সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হবার কারণ হলো মুসলিম লীগ। বৃটিশ সরকার, আপনি ও আমি কেউ কংগ্রেসের আকাঙ্খার প্রতিবন্ধক নই। --- আগামী শীতের নির্বাচনে মুসলিম লীগ কয়টি আসন পাবে কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে কি না জানি না। তবে নির্বাচনে যদি লীগের জয় লাভ হয়, তাহলে আমরা লীগের দাবীকে অবহেলা করতে পারবোনা।"[৯১] যে যাই বলুক সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতা মুসলিম লীগের জন্যে শাপে বর হয়েছিল। আলোচনায় মুসলিম লীগের ভুমিকা ও জিন্নার দৃঢ়তা মুসলিম লীগকে যেন নতুন জীবন দিয়েছিল। এস, ভি, হাডসনের ভাষায়. "(সিমলা সম্মেলনের) তাৎক্ষণিক ফল ছিল মুসলিম লীগ এবং মুসলিম লীগ নেতার মর্যাদা বৃদ্ধি। সিমলা কনফারেন্সে মিঃ জিন্নাহ যে শক্তি দেখান তা একদিকে মুসলিম লীগকে ধাক্কা দিয়ে বহু সামনে এগিয়ে দেয়, অন্যদিকে তাদের (কংগ্রেস পন্থী) মুসলিম প্রতিদ্বন্দ্বীদের জন্যে ছিল এটা মারাত্মক একটা আঘাত।"[৯২]

সিমলা সম্মেলন সমাপ্তি ঘোষণার মাত্র ১১ দিন পর ২৬ শে জুলাই বৃটেনে নতুন নির্বাচনে চার্চিলের বদলে এটলির সরকার ক্ষমতায় এল। এর ১৯ দিন পর ১৫ই আগস্ট (১৯৪৫) জাপানের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। আর ভাইসরয় ওয়াভেল শীতকালে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে আলোচনার জন্যে ২১ শে আগস্ট বৃটেন গেলেন। ফিরে এলেন ১৬ই সেপ্টেম্বর এবং ১৯ শে সেপ্টেম্বর তিনি শীতকালে সাধারণ নির্বাচন, নির্বাচনের পর শাসনতন্ত্র প্রণয়ন, শাসন পরিচালনার জন্যে একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন ও পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের ঘোষণা দিলেন। ওয়াভেলের ঘোষণায় 'স্বাধীনতা দান' এর কথা না থাকায় কংগ্রেস এবং 'পাকিস্তান' এর উল্লেখ না থাকায় মুসলিম লীগ এর তীব্র প্রতিবাদ করল। পরে বৃটিশ সেক্রেটারী অব স্টেট লর্ড পেথিক লরেন্স আলোচনার মাধ্যমে এসব প্রশ্নের দ্রুত সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটায় লীগ ও কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ গ্রহণে সম্মত হলো।

নির্বাচন মুসলিম লীগের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ মুসলিম লীগই যে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বশীল একমাত্র সংগঠন একথা

৯১। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ১৪৮ (ষ্ট্যানলি ওলপোর্টের জিন্নাহ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৪৫, ২৪৬)।
৯২। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 126, 127.

www.icsbook.info

নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ করলে আর কারো কিছু বলার থাকবেনা।

ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব ও মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তায় এসময় কংগ্রেসপন্থী মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে কংগ্রেস যদি মুসলমানদের মনোভাবের প্রতি সম্মান না দেখায় এবং কিছু ছাড় দিতে রাজী না হয়, তাহলে কংগ্রেস কোন মুসলিম ভোট পাবে না। এই আশংকাতেই কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ এই সময় গান্ধীকে গিয়ে বলেন, "যাতে তারা (মুসলমানরা) নিরাপত্তা বোধ করে, সেই ধরনের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেই তাদের আশংকা দূর করা সম্ভব। --- ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্রে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসিত ইউনিট সমূহের সমন্বয়ে ফেডারেল পদ্ধতির সরকার হবে। --- ভোটার তালিকা এমনভাবে তৈরী করতে হবে যাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব বজায় থাকে। যতদিন না সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস দুর এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে দল গঠিত হয়, ততদিন কেন্দ্রীয় পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় একজিকিউটিভ কাউন্সিলে হিন্দু মুসলিম প্রতিনিধিত্বে সমতা রাখতে হবে। পর্যায়ক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের ভারতীয় ফেডারেশনের প্রধান হওয়ার কথা থাকবে।"[৯৩] মওলানা আজাদের এই প্রস্তাবের সরাসরি উত্তর না দিয়ে গান্ধী বললেন, "কোন সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে না, বুঝতে পারলে ঐক্যবদ্ধ বা অখন্ড ভারতই যে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের সার্বোৎকৃষ্ট পন্থা, এটা তারা উপলব্ধি করবে।"[৯৪] তবে কংগ্রেস তার প্রস্তাবে কিছু সান্ত্বনার কথা বলল। কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে বলা হলো, "কমিটি ঘোষণা করছে যে, কোন অঞ্চলকে তাদের বিঘোষিত ও প্রতিষ্ঠিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীয় ইউনিয়নের সাথে থাকতে বাধ্য করা হবে না। ---- নতুন কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় কিংবা উল্লেখযোগ্য কোন গ্রুপের উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ হয় এমন কোন নীতিগত পরিবর্তন আনা হবে না। একটি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের আওতায় সর্বোচ্চ সাম্ভাব্য স্বায়ত্ত শাসন দেয়া হবে আঞ্চলিক ইউনিট গুলোকে।"[৯৫]

কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে মুসলমানদের নাম করা হয়নি এবং একক একটি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের কথা আবারও উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই প্রথম বারের মত কংগ্রেস -প্রস্তাবে আঞ্চলিক কোন ইউনিটকে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে সরে যাবার বিষয় স্বীকার করা হলো। কংগ্রেসের এই স্বীকৃতির মাধ্যমে, এস,ভি হাডসনের ভাষায়, 'পাকিস্তানের দরজা খুলে গেল যদিও তা পোকা খাওয়া' ধরনের এবং যদিও দরজাটা আবর্তন ধর্মী।"[৯৬] এটুকু দ্বিধাগ্রস্ত নমনীয়তা কংগ্রেস

৯৩। 'Transfer of power in India', V.P Menon, page 221, 222.
৯৪। ঐ, পৃষ্ঠা ২২২।
৯৫। 'The great Divide', S.V Hudson, page 131.
৯৬। ঐ, পৃষ্ঠা ১৩১।

www.icsbook.info

এজন্যেই দেখিয়েছিল যে, মুসলিম ভোট তার চাই, যাতে সে প্রমাণ করতে পারে কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমান সকলের প্রতিনিধি।
মুসলিম ভোট লাভেরও উচ্চাকাঙ্খা কংগ্রেস এসময় করে। পন্ডিত নেহেরুর ভাষায়, "আমরা মুসলমানদের আস্থা অর্জন করবো এবং সম্পূর্ণভাবে তাদের কংগ্রেসে নিয়ে আসবো। কিন্তু আমরা আর কখনো মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে যাব না।"[৯৭]

অন্যদিকে নির্বাচনের কিছু দিন আগে জিন্নাহও বললেন (২৪ শে নভেম্বর, ১৯৪৫) "আমাদের কোন বন্ধু নেই। বৃটিশ অথবা হিন্দুরা আমাদের বন্ধু নয়। আমরা পরিস্কার বুঝতে পারছি যে, এ দুয়ের সাথেই আমাদের সংগ্রাম করতে হবে। এরা উভয়েই যদি আমাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়, তাহলেও আমরা ভীত হবোনা। আমরা তাদের যুগ্মশক্তির বিরুদ্ধে লড়বো এবং ইনশাআল্লাহ পরিণামে আমরা বিজয়ী হবো।"[৯৮] এ বিজয়ের জন্যে এমনকি জিন্নাহ আইন অমান্য, শক্তি প্রয়োগ এবং কোন ত্যাগ স্বীকারকেই বাদ রাখেননি চিন্তা থেকে। তিনি মুসলিম জনতাকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, "আমি যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন বৃথা একবিন্দু মুসলিম রক্তপাত হতে দেবোনা। আমি মুসলমানদের কখনও হিন্দুদের গোলাম হতে দেবনা। ভুলে যাবেননা, ত্যাগ এর সঠিক সময় সম্পর্কে আপনাদের সেনাপতি সম্পূর্ণ অবহিত। সময় যখন আসবে আমি দ্বিধা করবোনা এবং একপদও পিছিয়ে যাবোনা।"[৯৯] কিন্তু শক্তি নয়, ব্যালট যুদ্ধেই জিন্নাহ্ জয়ী হলেন।

১৯৪৫ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচন হলো ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে। ফলও হলো ঐতিহাসিক। হিন্দু বা অমুসলিম কেন্দ্রগুলোতে কংগ্রেস পেল ৯৯.৩ ভাগ ভোট আর মুসলিম কেন্দ্রেগুলোতে মুসলিম লীগ পেল ৮৬.৬ ভাগ ভোট। কেন্দ্রীয় পরিষদে মুসলমানদের জন্যে বরাদ্দ ৩০টি আসনের সব কটিই পেল মুসলিম লীগ। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ১৯৪৬ -এর ফেব্রুয়ারী মাসে। প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে মুসলমানদের জন্যে বরাদ্দ মোট আসন ছিল ৪৯৫ টি, এর মধ্যে মুসলিম লীগ পেল ৪৩৪ টি আসন।[১০০] অন্যদিকে হিন্দু আসনগুলোর প্রায় সবগুলোই দখর করল কংগ্রেস। নির্বাচনের এই ফল কার্যত ভারতকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে দিল। মুসলিম লীগ যেমন নির্বাচনকে 'পাকিস্তান' দাবীর উপর রেফারেন্ডাম হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তেমনি কংগ্রেসও নির্বাচনকে 'পাকিস্তান' বনাম 'অখন্ড হিন্দুস্তান' এর নির্বাচন- যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছিল।[১০১] এই

৯৭। 'The Indian Annual Regiser' Vol-11, page 94.
৯৮। 'Speches and writings of Mr. Jinnah', Jamuluddin Ahmed. Vol-11, page 239
৯৯। এ, পৃষ্ঠা ২৪৩।
১০০। 'Transfer of power in India', E.W.R. Lumby, Page 61
১০১। 'Transfer of power in India', E.W.R. Lumby, Page 63

www.icsbook.info

নির্বাচন যুদ্ধে পাকিস্তানই জয়ী হলো। কারন, 'অখন্ড হিন্দুস্তান' এর পক্ষে কংগ্রেস কোন মুসলিম সমর্থন পেলনা। এছাড়া নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, ভারতের মুসলিম স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন হলো মুসলিম লীগ।

কিন্তু নির্বাচনের এই রায় অনুসারে নয়, ভিন্ন ধারায় চলল বৃটিশ সরকারের চিন্তা। ভাইসরয় ওয়াভেল অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন, শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্যে একটা সংস্থা গঠন এবং প্রদেশসমূহে কোয়ালিশন সরকার গঠনের সুপারিশ করলেন। এই সময় একটি বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল ভারত সফরে এসেছিলেন অবস্থা পর্যবেক্ষনের জন্যে। ওয়াভেলের সুপারিশ এবং এই পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের সফরকে সামনে রেখে মিঃ জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, "সর্বভারতীয় একক শাসনতন্ত্র তৈরীর সংস্থা দ্বারা সংবিধান প্রস্তুতিতে মুসলিম ভারত কিছুতেই সম্মত হবেনা। কারণ এই প্রকার সংস্থার মুসলমানরা হবে অসহায় সংখ্যালঘু এবং এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পূর্বেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া এককেন্দ্রীক ফেডারেল বা অন্য কোন ব্যবস্থাতেও তারা সম্মত হবে না। কারণ, এই ব্যবস্থাতেও মুসলমানরা হবে অসহায় সংখ্যালঘু এবং ফলে তাদের চিরকালের জন্যে হিন্দু প্রাধান্যের অধীনস্থ হয়ে থাকতে হবে। --- এছাড়া পাকিস্তানের দাবী ক্ষুন্নকারী কোনরূপ অস্থায়ী সরকার গঠনেও আমরা সম্মত হতে পারিনা। কারণ, এর দ্বারা হিন্দু ভারত 'জাতীয় সরকার' গঠনের কৌশল অবলম্বন করছে।"[১০২]

বৃটিশ পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল ভারত সফর শেষে দেশে ফিরে গেল। ফিরে গিয়ে তাদের অনেকেই বললেন, "দেশের যেখানেই তারা গিয়েছিলেন

১০০। প্রদেশ গুলোতে মুসলিম আসনে নির্বাচনের ফলঃ

প্রদেশ	মোট মুসলিম আসন	মুসলিম লীগ পায়	প্রদেশ	মোট মুসলিম আসন	মুসলিম লীগ পায়
বাংলা	১১৯	১১৩	উড়িষ্যা	৪	৪
পাঞ্জাব	৮৬	৭৯	যুক্ত প্রদেশ	৬৬	৫৫
সীমান্ত প্রদেশ	৩৮	১৭	বোম্বাই	১৪	১৪
আসাম	৩৪	৩১	মাদ্রাজ	২৯	২৯
বিহার	৪০	৩৪			
সিন্ধু	৩৫	২৮	মধ্যপ্রদেশ	১৪	১৪

সেখানেই তারা শুনেছেন যে, দেশের মুসলমানেরা পৃথক এক পাকিস্তান রাষ্ট্র চায়। তাদের এ দাবীকে অগ্রাহ্য করা যায় না।"[১০৩] এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো

১০২। 'Speches and Writings of Mr. Jinnah', Vot-11, Jamiluddin Ahemd, page 258, 259
১০৩। 'ট্রান্সফার অব পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া', সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৪ (উদৃতঃ স্বাধীনতার অজানা কথা, পৃষ্ঠা ২০৩)।

www.icsbook.info

পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলের সদস্য আর,ভি মোরেনসনের কথা। তিনি বলেন, "ভারতের প্রধান দু'টিদলের সম্বন্ধে আমি এখনো আশাবাদী। --- দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করা এখনও সম্ভব হতে পারে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, সম্ভবত 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' - এর ভিত্তিতে মুসলিম প্রদেশসমূহের স্বতন্ত্র সংরক্ষণ ও সেই সাথে সর্বভারতীয় ব্যপারে পূর্ণ সহযোগিতা সংরক্ষণ দ্বারা একটা উপায় স্থির করা যেতে পারে। --- কংগ্রেস এ পর্যন্ত পাকিস্তান স্বীকার করেছে। সেক্রেটারী অব স্টেট এখন এই সূত্র ধরে কাজ করতে পারেন।"[১০৪]

নিঃসন্দেহে বৃটিশ সেক্রেটারী অব ষ্টেট এই সূত্র ধরেই এগিয়ে ছিলেন এবং এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরী পরিকল্পনা দিয়েই ক্যাবিনেট মিশনকে ভারত পাঠানো হয়।

১৯৪৬ সালে ২৪ শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এলেন। এ শক্তিশালী মিশনের সদস্য ছিলেন স্বয়ং ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য সচিব স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং নৌ-সচিব লর্ড আলেকজান্ডার। ক্যাবিনেট মিশন ভারতে আসার মাত্র ৮দিন আগে ১৫ই মার্চ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী একটা মারাত্মক বিবৃতি দেন। তিনি বলেন,"সংখ্যালঘুদের অধিকার ও তারা যাতে ভীতিমুক্ত হয়ে বাস করতে পারে, সে সম্বন্ধে আমরা সজাগ। কিন্তু আমরা কোন সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠের অগ্রগতিতে ভেটো দেয়ার অধিকার দিতে পারিনা।"[১০৫]

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে লুফে নেন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। গান্ধী ও মওলানা আজাদ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেন এবং ক্যাবিনেট মিশনের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে মিঃ জিন্নাহ বলেন, 'বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলি কংগ্রেসের ফাঁদে পা দিয়েছেন।' তিনি মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীর পুনরুক্তি করে বলেন, 'এটাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।'

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কথায় উজ্জ্বিত হয়ে কংগ্রেস নেতা বল্লভ ভাই প্যাটেল হুংকার ছাড়লেন, "(১) ভারত অনিতিবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর দাবী করছে, (২) সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণের জন্য রক্ষাকবচ দিতে কংগ্রেস রাজী আছে, কিন্তুঃ মিঃ জিন্নার ভারত বিভাগ দাবী কংগ্রেস স্বীকার করে না, এবং (৩) প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে গুরুতর হাঙ্গামার আশংকা কংগ্রেস করে না।"[১০৬]

বল্লভ ভাইয়ের এ বিবৃতির ৮দিন পর কায়েদে আযম ৩১ শে মার্চ রয়টার প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাতকারে এর কড়া জবাব দিলেন। বললেন, "একটা কথা নিশ্চিত, পাকিস্তানের প্রশ্নে কোন আপোশ হবেনা। কারণ এরই উপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। --- আমরা কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল বা অন্য কোন

১০৪। 'Muslim League: Yesterday and Today', A.B. Rajput, page 102,103.
১০৫। 'Transfer of Power in India', V.P Menon, page 234, 235.
১০৬। 'Muslim League: Yesterday and Today', A.B. Rajput, page 106,107.

www.icsbook.info

প্রকার একক ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিরোধী। আমরা বাঁচতে চাই এবং অন্যদেরও বাঁচাতে চাই।"[১০৭]

১৯৪৬ সালের ২৪ শে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন দিল্লী এসে প্রথমে নেতৃবৃন্দের সাথে ঘরোয়া আলোচনা শুরু করল। এই পর্যায়ে তারা আলোচনা করলেন কায়েদে আযম, গান্ধী, আজাদ, নেহেরু, ভূপালের নওয়াব, শ্যামাপ্রসাদ, স্যার তেজ বাহাদুর, জয়াকর, প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে।

কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ ঘরোয়া আলোচনা কালে মিশনকে কংগ্রেসের দাবী সম্পর্কে বললেন, 'কংগ্রেস পূর্ন স্বাধীনতা চায় এবং ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র ভারতীয় গণপরিষদই প্রণয়ন করবে। কিন্তু ভারতীয় সেই সরকার ক্ষমতা গ্রহণের আগে অন্তর্বর্তীকালীন একটা সরকারের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে থাকবে ১৫ জন সদস্য। যার ১১ জন প্রদেশ থেকে আর ৪ জন হবেন সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি। কংগ্রেস ভারতের ফেডারেল সরকার ব্যবস্থায় রাজী, কিন্তু কিছুতেই ভারত বিভাগ মেনে নেবেনা। মিশন যখন মওলানাকে বললেন, এই ফেডারেল ব্যবস্থায় মুসলিম মেজরিটি প্রদেশগুলো যদি তাদের মধ্যে সাব-ফেডারেশন গঠন করেতে চায় তাহলে? প্রথমটায় মওলানা এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু পরে যুক্তির মুখে তিনি স্বীকার করলেন, বিষয়টা চিন্তা করে দেখা যেতে পারে।

এইভাবে জিন্নাহ, গান্ধী, নেহেরু প্রমুখের সাথে প্রথম পর্যায়ের আলোচনা শেষে মিশন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে ব্যবধান দেখতে পেল তা তাদের ভাষায়ঃ "প্রথমে পাকিস্তান গঠন, তারপর ফেডারেশন বা চুক্তির আকারে ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রশ্নটি বিবেচনা, অথবা প্রথমে ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন, তারপর প্রাদেশিক বা তদ্রুপ স্বায়ত্ত শাসনের আকারে পাকিস্তান এর প্রশ্নটি বিবেচনা।"[১০৮] এ দুয়ের প্রথমটি মুসলিম লীগের দাবী এবং দ্বিতীয়টি কংগ্রেসের দাবী।

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যকার এই ব্যবধান দুর করার জন্যে মিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ ই এপ্রিল জিন্নার সাথে দীর্ঘ বৈঠক করলেন। বৈঠকে বৃটিশ সেক্রেটারী অব স্টেট তাকে বললেন, তারা জিন্নার দাবীর গুরুত্ব অনুধাবন করেন, কিন্তু পাকিস্তান দাবী অন্য পক্ষগুলোর কাছ থেকে মানিয়ে নেয়া সম্ভব হবেনা। দাবীকৃত পুরো এলাকা এবং পুরো স্বাধীনতা -সার্বভৌমত্ব, এই দুই জিনিস জিন্নাহ এক সাথে কিছুতেই পাবেন না। তারপর মিশন সমাধান হিসেবে অন্য পক্ষগুলোর গ্রহণ সাপেক্ষে জিন্নার কাছে দু'টি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করলঃ (১) সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাসমূহ এবং কলকাতা বাদে বাংলার মুসলিম সংখ্যাগুরু জেলাসমূহ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত

১০৭। 'Speches an writings of Mr. Jinnah', Vol-11, Jamiluddin Ahmed. page 276, 280.
১০৮। 'The great Divide', S.V. Hudson, page 138.

www.icsbook.info

হবে। এ পাকিস্তানকে অবশিষ্ট হিন্দুস্তানের সাথে একটি চুক্তি ভিত্তিক ইউনিয়নে মিলিত হতে হবে, (২) একটি সর্বভারতীয় ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠিত হবে। এ ইউনিয়নের অধীনে আসামের মুসলিম সংখ্যালঘু অঞ্চল বাদ দিয়ে গোটা আসাম, বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান ফেডারেশন সৃষ্টি হবে। শর্ত থাকবে ইউনিয়নের কোন অংশ বা ফেডারেশন ১৫ বছর কিংবা এ ধরনের একটি সময়ের পর ইচ্ছা করলে ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে।[১০৯] এই দুই বিকল্পের মধ্যে জিন্নাহ দ্বিতীয়টির প্রতি আগ্রহ দেখালেন, তবে তিনি বললেন, বিষয়টি যদি প্রস্তাব আকারে কংগ্রেসের তরফ থেকে আসে তাহলে মুসলিম লীগ এটা বিবেচনা করবে।[১১০] পরে এই দুই বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে মিশনের পক্ষ থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস প্রথমে গান্ধী এবং তারপর নেহেরুর সাথে আলোচনা করলেন। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এ নিয়ে জিন্নার সাথে কোন আলোচনা করতেই রাজি হলেন না।[১১১]

এর ক'দিন পর মিশন মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের কাছে সমস্যার সমাধান হিসেবে একটা ফর্মুলা পেশ করলেন। ফর্মুলাটি এই ঃ (১) কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের নির্বাচিত সদস্যদের থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীনসরকার গঠন, (২) এই সরকারের দায়িত্ব হবেঃ (ক) সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিষয়ক শাসনতান্ত্রিক বিধি প্রণয়নন, (খ) বৃটিশ ভারত দ্বিধা বিভক্ত হবে, না এক থাকবে তা নিরূপন করা, (৩)অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ৩০ দিনের মধ্যে এই কাজ করতে হবে, (৪) তা করতে ব্যর্থ হলে বাংলা, সিলেট, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে গণভোট নিয়ে দেখা হবে সেখানকার মানুষ পাকিস্তান চায় কি না। শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ চাইলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এই প্রস্তাব নেহেরুর কাছে হাজির করলে তিনি সরাসরি এটা প্রত্যাখ্যান করলেন। আর জিন্নাহ বললেন, ঐ এলাকার মানুষ ইতিমধ্যে মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে বলেই দিয়েছে তারা পাকিস্তান চায়।[১১২] অতঃপর মিশন ১৬ই এপ্রিল তারিখে জিন্নার কাছে দ্বিতীয় বিকল্প হিসেবে যে প্রস্তাব পেশ করেছিল, সেই প্রস্তাব নতুন আকারে পেশ করল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কাছে। প্রস্তাবটি হলো, দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগের মত কয়টি বিষয় নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন থাকবে। তার অধীনে থাকবে মুসলিম প্রধান প্রদেশ গুলোর একটি গ্রুপ এবং হিন্দু প্রদেশগুলোর একটি গ্রুপ।

'দুই পক্ষ থেকে চারজন করে প্রতিনিধি নিয়ে ৫ই মে থেকে সিমলায় এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। আলোচনায় থাকল তিন এজেন্ডা (১)

১০৯। ঐ পৃষ্ঠা ১৩৯।
১১০। 'The great Divide', S.V. Hudson page 140.
১১১। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪১।
১১২। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪২।

www.icsbook.info

প্রদেশগুলোর গ্রুপ (২) ইউনিয়ন সরকার ও (৩) শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী ব্যবস্থা। আলোচনা চলেছিল ১২ই মে পর্যন্ত। চারদিন আলোচনার পর এক পর্যায়ে জিন্নাহ মুসলিম প্রদেশগুলোর গ্রুপ স্বীকার করা হলে কেন্দ্রীয় ইউনিয়ন সরকার গঠনে রাজী হলেন।[১১৩] কিন্তু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মওলানা আজাদ কংগ্রেসের পুরানো দাবী নতুন করে উত্থাপন করায় সব কিছু ভন্ডুল হয়ে যাবার উপক্রম হলো। কংগ্রেস সভাপতি লিখিত ভাবে মিশনকে জানালেন, 'কংগ্রেসের দাবী হলো স্বাধীনতা, বৃটিশ সৈন্যের প্রত্যাহার, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে অবাধ অধিকার দান এবং কংগ্রেস প্রদেশগুলো নিয়ে কোন প্রকার গুরুপ গঠনের বিরোধী।' কংগ্রেস আরও বলল, 'সম্মেলনে ভারত ভাগ বিষয়ক কোন আলোচনা আসবেনা। এটাকে যদি আসতে হয় আসবে বর্তমান বৃটিশ শাসন মুক্ত ভারতের গণ পরিষদে।'[১১৪] কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মওলানা আজাদের চেয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গান্ধী মিশনকে পরামর্শ দিলেন যে, মিশনের উচিত মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে কোন এক পক্ষকে বেছে নেয়া এবং তার হতে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করা, যাতে সে তার মত করে কাজ করতে পারে।[১১৫] এছাড়া মিঃ গান্ধী মিশনকে কার্যক্ষম কোন পরিকল্পনা তৈরীর ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলেন। এ চ্যালেঞ্জের জবাব হিসেবেই মিশন ৮ই মে তারিখে একটি পরিকল্পনা কংগ্রেস ও লীগের হাতে তুলে দিলেন। মিশনের সে পরিকল্পনাটি ছিল এইঃ (১) সর্বভারতীয় একটি ইউনিয়ন সরকার ও আইন সভা, যার অধীনে থাকবে দেশরক্ষা, বিদেশ নীতি, মৌলিক অধিকার এবং অর্থব্যবস্থার আবশ্যকীয় অংশ, (২) অন্য সব ক্ষমতা থাকবে প্রদেশের হাতে, (৩) নিজস্ব আইন সভা ও প্রশাসন ব্যবস্থার অধিকার সহ প্রদেশগুলোর গ্রুপ, (৪) ইউনিয়ন আইন সভায় হিন্দু ও মুসলিম প্রদেশ গুলোর গ্রুপ থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে, (৫) ইউনিয়ন সরকারও এই সংখ্যা সাম্য অনুসারে গঠিত হবে, (৬) ১০ বছর পর পর শাসনতন্ত্র পুনর্বিবেচনা, (৭) শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কার্যক্রমঃ প্রাদেশিক পরিষদে বিভিন্ন পক্ষের যে হারে প্রতিনিধিত্ব আছে, সেই হার অনুসারে প্রতিনিধি আসবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী গণপরিষদে। প্রাথমিক কাজের পর গণপরিষদ তিন ভাগে বিভক্ত হবেঃ (১) হিন্দু মেজরিটি প্রদেশ গুলোর গ্রুপ, (২) মুসলিম মেজরিটি প্রদেশগুলোর গ্রুপ এবং (৩) দেশীয় রাজ্যগুলোর গ্রুপ। প্রথম দুইটি গ্রুপ তাদের স্ব স্ব প্রদেশসমূহ এবং চাইলে প্রদেশসমূহের গ্রুপের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। এরপর গ্রুপে থাকা না থাকা প্রদেশগুলোর ইচ্ছাধীন হবে। এর পর গণপরিষদের তিনটি গ্রুপ একত্রে মিলে সর্বভারতীয় ইউনিয়ন সরকারের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। সম্প্রদায়গত

১১৩। 'The great Devide', S.V Hudson, page 143.
১১৪। 'The great Devide', S.V Hudson, page 143.
১১৫। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৩।

www.icsbook.info

কোন প্রশ্নে বিরোধ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের গ্রুপের অধিকাংশ সদস্যের রায় অনুসারে তার সমাধান হবে।[১১৬]

স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এই পরিকল্পনা নিজ হাতে গান্ধীকে দেন এবং গান্ধীর সাথে বসে এই পরিকল্পনা লাইন বাই লাইন পড়া হয়। পড়া শেষে গান্ধী বলেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাছে পরিকল্পনাটি সমস্যা সমাধানের অনুকূলে মনে হচ্ছে।[১১৭] অন্য দিকে লর্ড ওয়াভেল পরিকল্পনাটি নিয়ে জিন্নার সাথে আলাপ করেন। পরিকল্পনার ব্যাপারে জিন্নাহকে খুব উৎসাহী মনে হলোনা। তবে মিশন মনে করলেন, কংগ্রেস পরিকল্পনাটি গ্রহণ করলে জিন্নাহ রাজী হবেন।[১১৮] কিন্তু মিশনের এই আশা পুরণ হলো না। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মওলানা আজাদ লিখিতভাবে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ভাষায় পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করলেন। উপসংহারে তিনি নতুন এই প্রস্তাব দিলেন, "সমঝোতায় যদি পৌঁছা না যায়, তাহলে পরামর্শ দিব যে, নির্বাচিত কেন্দ্রীয় পরিষদের কাছে দায়িত্বশীল একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার অবিলম্বে গঠন করা হোক এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কারী গণপরিষদ নিয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে যে বিতর্ক তা স্বাধীন কোন ট্রাইবুনালের কাছে পেশ করা হোক।"[১১৯] মওলানা আজাদের এই কথার পর জিন্নাহ বলেন যে, এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় আর কোন লাভ হবে না। এরপরও মিশন তাদের ৭ দফা ফর্মুলা নিয়ে ৯ই মে নেহেরুর সাথে আলোচনায় বসলেন এবং প্রস্তাব করলেন যে, দুই পক্ষ এক সাথে বসুক একজন নিস্পত্তিকারীর সামনে। যে পয়েন্টে উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হবে, সে পয়েন্টে নিস্পত্তিকারীর রায় হবে চূড়ান্ত। মিঃ জিন্নাহ এ ধরনের ব্যবস্থার উপর মুসলমানদের ভাগ্য ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলেন।

ক্যাবিনেট মিশনের ২৪ শে মার্চ থেকে ৯ই মে পর্যন্ত আলোচনার সারাংশ দাঁড়াল এইঃ মিঃ জিন্নাহ অর্থাৎ 'মুসলিম লীগ প্রদেশগুলোর হিন্দু ও মুসলিম গ্রুপ ব্যবস্থার সাথে সর্বভারতীয় ইউনিয়ন ব্যবস্থাকেও সমঝোতার স্বার্থে মেনে নিয়েছিল, অন্যদিকে কংগ্রেসও সর্বভারতীয় ইউনিয়ন ব্যবস্থার সাথে প্রদেশগুলোর গ্রুপ ব্যবস্থা মানতে রাজী হয়েছে। তবে বিরোধের বিষয় হলো, মুসলিম লীগ প্রথমে গ্রুপ গঠনের পক্ষপাতী, তারপর ইউনিয়ন গঠন নিয়ে হিন্দু গ্রুপের সাথে আলোচনা করতে চায়, অন্যদিকে কংগ্রেস প্রথমে সর্বভারতীয় ইউনিয়ন গঠনের পক্ষপাতী, তারপর গ্রুপ নিয়ে আলোচনা করতে চায়। জিন্নাহ কিছুতেই কংগ্রেসের ফর্মুলায় একমত হতে রাজী নন, কারণ জিন্নার ভয় হলো, একবার সর্বভারতীয় ইউনিয়ন গঠন হলে এবং সংখ্যাগুরু হিন্দুরা একবার ক্ষমতা হাতে পেলে মুসলমানদের দাবীর প্রতি আর কর্ণপাত করবে না।

১১৬। 'The great Devide', S.V Hudson, page 144.
১১৭। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৪। ১১৮। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৪।
১১৯। 'The great Devide', S.V Hudson, পৃষ্ঠা ১৪৪।

www.icsbook.info

আলোচনা অচলাবস্থায় পৌঁছলে ক্যাবিনেট মিশন ১১ই মে তারিখে কংগ্রেস ও লীগ উভয়কেই সমস্যা সমাধানে তাদের মত লিখিতভাবে পেশ করতে বলল। উত্তরে কংগ্রেস সমঝোতার ভিত্তি হিসেবে যে পরিকল্পনা পেশ করল তা হলোঃ (১) সর্বভারতীয় সরকার ও আইন সভা সম্বলিত ফেডারেল ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে একটি গণপরিষদ গঠন,(২) ফেডারেল ইউনিয়নের অধীনে থাকবে পররাষ্ট্র, দেশ রক্ষা, যোগাযোগ, মৌলিক অধিকার, মুদ্রা, শুল্ক ও পরিকল্পনা, এবং অন্যান্য একান্ত আবশ্যকীয় বিষয়সহ প্রয়োজনীয় অর্থ ও রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার এবং শাসনতন্ত্র ভেঙ্গে পড়া ও জাতীয় জরুরী অবস্থা মোকাবিলার শক্তি, (৩) গণপরিষদ দ্বারা এসব বিষয় নির্ধারিত হয়ে যাবার পর প্রদেশেগুলো অবশিষ্ট বিষয় নিয়ে গ্রুপ গঠন করতে পারে এবং (৪) সর্বভারতীয় শাসনতন্ত্রে সম্প্রদায়গত কোন ব্যাপারে বিরোধ দেখা দিলে তা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নিষ্পত্তি হবে। নিষ্পত্তি না হলে কোন নিষ্পত্তিকারীর রায়ের উপর ছেড়ে দেয়া হবে।[১২০] আর মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে বিরোধ নিষ্পত্তির যে পরিকল্পনা পেশ করা হলো তা এইঃ (১) ছয়টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের গ্রুপ তাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে স্বতন্ত্র গণপরিষদ গঠন করবে, (২) মুসলিম এই গ্রুপের নাম হবে পাকিস্তান ফেডারেশন, (৩) এই পাকিস্তান ফেডারেশন দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্র এবং দেশ রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বভারতীয় ইউনিয়নকে দিয়ে অবশিষ্ট বিষয়সমূহের কোনটি ফেডারেশনে থাকবে, কোনটি ফেডারেশনের প্রদেশগুলোতে যাবে তা নির্ধারিণ করবে, (৪) পরে সর্বভারতীয় ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে হিন্দু প্রদেশগুলোর ফেডারেশন ও মুসলিম প্রদেশগুলোর ফেডারেশন মিলে যৌথ গণপরিষদ গঠন করবে, (৫) এ গণপরিষদ ঠিক করবে সর্বভারতীয় ইউনিয়নের কোন আইন সভা থাকবে কিনা, কিভাবে এর অর্থায়ন হবে, কিন্তু কিছুতেই ট্যাক্স আরোপের কোন ক্ষমতা ইউনিয়নকে দেয়া যাবে না। এবং (৬) বিরোধীয় কোন বিষয়ে ইউনিয়ন সরকার তিন চতুর্থাংশের কম ভোটে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেনা।[১২১]

দুই পক্ষের দুই মতের মধ্যে ব্যবধান এতই মৌলিক ধরনের যে, এই বিষয়ে আর আলোচনা নিরর্থক। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে মিশন ১২ই মে তারিখে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার ঘোষণা প্রকাশ করল এবং বলল যে শীঘ্রই মিশন নিজস্ব পদক্ষেপ ঘোষণা করতে যাচ্ছে। ক্যাবিনেট মিশন তার নিজস্ব পদক্ষেপ হিসেবে ১৬ই মে (১৯৪৬) সুদীর্ঘ বিবৃতি সমেত যে পরিকল্পনা, যা 'ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান'[১২২]

১২০। 'The great Devide', S.V Hudson, page 143.
১২১। 'The great Devide', S.V Hudson, page 143.
১২২। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের পূর্ণ বিবরণ এই গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট আকারে দেয়া হলো।

www.icsbook.info

হিসেবে পরিচিত, পেশ করে তার সার সংক্ষেপ হলোঃ (১) বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের সমন্বয়ে ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া গঠিত হবে। ইউনিয়নের এখতিয়ারে থাকবে পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা যোগাযোগ এবং এই সকল বিষয় পরিচালনার জন্যে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা। ইউনিয়নের একটি প্রশসান ও একটি আইন সভা থাকবে। (২) অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা থাকবে প্রদেশসমূহের হাতে। (৩) প্রদেশসমূহের সরকারও আইন পরিষদ সহ গ্রুপ গঠনের অধিকার থাকবে। যে সব প্রাদেশিক বিষয় গ্রুপের এখতিয়ারে থাকবে, তা গ্রুপ কর্তৃক স্থির হবে। (৪) শাসনতন্ত্র চালু হওয়ার ১০ বছর পর এবং অতপর প্রত্যেক দশ বছর অন্তর যেকোন প্রদেশের শাসনতন্ত্রের পূনর্বিবেচনার দাবী করার অধিকার থাকবে। (৫) শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্যে গণপরিষদের সদস্যদের নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশকে প্রতি দশ লক্ষে একজন প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেয়া হবে; এবং প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের (সাধারণ, মুসলিম ও শিখ) জনসংখ্যার অনুপাত অনুযায়ী প্রাদেশিখ পরিষদসমূহ নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পরিষদ সদস্যগণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে।

(৬) গণ-পরিষদের সাম্প্রদায়িক গঠন নিম্নরূপ হবে

গ্রুপ-ক

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
মাদ্রাজ	৪৫	৪		৪৯
বোম্বাই	১৯	২		২১
যুক্ত প্রদেশ	৪৭	৮		৫৫
বিহার	৩১	৫		৩৬
মধ্যপ্রদেশ	১৬	১		১৭
উড়িষ্যা	৯	০		৯
মোট	১৬৭	২০	-	১৮৭

গ্রুপ খ

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
পাঞ্জাব	৮	১৬		২৮
সীমান্ত প্রদেশ	০	৩		৩
সিন্ধু	১	৩		৪
মোট	৯	২২	৪	৩৫

গ্রুপ -গ

প্রদেশ	সাধারণ	মুসলিম	শিখ	মোট
বাংলা	২৭	৩৩		৬০
আসাম	৭	৩		১০
মোট	৩৪	৩৬		৭০

বৃটিশ ভারতের সর্বমোট প্রতিনিধি সংখ্যা	=	২৯২
দেশীয় রাজ্যসমূহের মোট প্রতিনিধি সংখ্যা	=	৯৩
মোট		৩৮৫

www.icsbook.info

প্রথমে প্রতিনিধিগণ সকলে একত্রে দিল্লীতে মিলিত হয়ে কার্য পদ্ধতি স্থির করার পর উপরোক্ত গ্রুপ অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত হবে, প্রত্যেক গ্রুপ স্বতন্ত্র অধিবেশনে গ্রুপের প্রাদেশিক শাসনতন্ত্র তৈরি করবে এবং সেকশনের সকল প্রদেশের সমন্বয়ে গ্রুপ শাসনতন্ত্র তৈরী করা বা না করার বিবেচনা করবে। যদি এরূপ শাসনতন্ত্র তৈরী প্রয়োজনীয় গণ্য হয় তাহলে এখতিয়ারভুক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। নতুন শাসনতন্ত্র চালু থাকার পর যে কোন প্রদেশের পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসার অধিকার থাকবে।

(৭) ইতিমধ্যে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সমর্থনপুষ্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে।

ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান প্রকাশিত হবার পর প্রথম প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন গান্ধী। তিনি বললেন, "গণপরিষদের ইচ্ছামত পরিকল্পনার যে কোন অংশ উন্নত বা বর্জন করার অধিকার আছে; নতুন গণপরিষদকে সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন সংস্থা আখ্যা দেয়া যায় না। যথা, মিশন কেন্দ্রীয় ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত করার জন্যে কয়েকটি বিষয় নির্দিষ্ট করেছে, কিন্তু গণপরিষদ ইচ্ছা করলে সেগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে। তেমনি গণ-পরিষদ ইচ্ছা করলে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য বাতিল করতে পারে। গ্রুপ সম্বন্ধে কোন প্রদেশকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিশেষ গ্রুপে যোগদানে বাধ্য করা যেতে পারে।"[১২৩] গান্ধী এখানে সরাসরি পরিকল্পনাটি প্রত্যাখ্যান করলেন না, আবার গ্রহণও করলেন না। যা বুঝাতে চাইলেন তা হলো, পরিকল্পনা ঠিকই আছে, তবে ভবিষ্যত গণপরিষদ এটা এইভাবে মেনে নেবে সে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় না। তা করলে গণপরিষদ সার্বভৌম হবে না। অর্থাৎ পরিকল্পনাটি গ্রহণ, বর্জন ও সংশোধনের অধিকার গণপরিষদের থাকবে।"

লীগ প্রেসিডেন্ট জিন্নার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল ২৩ শে মে তারিখে। তিনি বললেন, "মিশন মুসলিম লীগের সার্বভৌম পাকিস্তান দাবী প্রত্যাখ্যান করেছে। একমাত্র পাকিস্তানই ভারতে স্থিতিশীল সরকার এবং উপমহাদেশের জনগনের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।"[১২৪] এরপর তিনি মিশনের প্রস্তাবের কতকগুলি ত্রুট তুলে ধরে বলেন যে, এই সকল প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুতর এবং মুসলিম লীগ

১২৩। 'Transfer of Power in India', V.P. Menon page 269
১২৪। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 151.

www.icsbook.info

কাউন্সিলের আসন্ন অধিবেশনে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তার আগে মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন করা সম্বন্ধে তিনি নিজের মত ব্যক্ত করবেন না।[১২৫]

২৪শে মে তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তার এক দীর্ঘ প্রস্তাবে মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে অনেকগুলো আপত্তি ও প্রশ্ন উত্থাপন করল। যার মধ্যে প্রধান ছিল, প্রদেশ সমূহের গ্রুপিং ও অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রশ্ন। প্রদেশগুলোর গ্রুপিং সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রস্তাবে বলা হলো যে, সংশ্লিষ্ট প্যারাগ্রাফ পড়ে তারা বুঝেছে, গ্রুপ গঠনের আগে প্রথমেই প্রদেশগুলো ঠিক করবে তারা তাদের জন্য নির্ধারিত গ্রুপে যাবে কিনা। তবে কংগ্রেস সব বিষয় তাদের কাছে পরিস্কার না হওয়া পর্যন্ত তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখল।[১২৬]

লীগ প্রেসিডেন্ট জিন্নাহ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির আপত্তি ও প্রশ্নগুলো প্রকাশিত হবার পর ক্যাবিনেট মিশন ও লর্ডওয়াভেল সকলের অবগতির জন্যে প্রকাশিত এক ব্যাখ্যায় বললেন যে, (১) মিশনের পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে হবে, আংশিক গ্রহণ বা বর্জন করা যাবেনা। (২) পরিকল্পনায় বর্ণিত পদ্ধতিতে গণপরিষদ গঠিত হবার পর বৃটিশ সরকার পরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেনা, কিন্তু দু'টি বিষয়ের দিকে তারা লক্ষ্য রাখবে, (ক) সংখ্যালগুদের নিরাপত্তা, (খ) বৃটিশ সরকারের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন। (৩) পরিকল্পনা অনুসারে প্রদেশ সমূহকে নির্দিষ্ট গ্রুপে যোগদান করতেই হবে; শাসনতন্ত্র তৈরী হওয়ার পর জনসধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট গ্রুপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। (৪) অন্তর্বর্তী সরকারের সকল দফতর ভারতীয় সদস্যদের হাতে থাকবে এবং দৈনন্দিন কাজে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের সর্বাধিক স্বাধীনতা থাকবে।[১২৭]

ভি,পি মেননের মতে কংগ্রেস এই সময় ক্যাবিনেট মিশন প্লানের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার চাইতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ফর্মুলার প্রতি বেশী আগ্রহী হয়ে উঠে।[১২৮] অর্থাৎ কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের দিকেই ঝুঁকে পড়ে বেশী। ২৫ শে মে তারিখে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মওলানা আজাদ লর্ড ওয়াভেলের কাছে লিখিত এক পত্রে তাঁর কাছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্পর্কে এ নিশ্চয়তা দাবী করেন যে, (১) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে ভাইসরয় নামমাত্র প্রধান হবে, (২) কার্যত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ডোমিনিয়ন ক্যাবিনেট (স্বায়ত্বশাসিত সরকার রাষ্ট্র)এর মর্যাদা পাবে, এবং (৩) কেন্দ্রিয় পরিষদে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায় দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করণের জন্যেএকটি কনভেনশন আহ্বান করা হবে।[১২৯] অন্ত

১২৫। 'Speches and Writings of Mr. Jinnah,', Vol11, Jamiluddin Ahmed, page 298
১২৬। 'The Great Devide', S.V Hudson, page 152.
১২৭। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৪৭, The Great Divide', S.V.. Hudson, page 152.
১২৮। 'Transfer of Power in India', V.P. Menon, page 276.
১২৯। 'The Great Devide', S.V Hudson, page 153.

www.icsbook.info

র্বর্তীকালীন সরকারকে অবাধ ক্ষমতার অধিকারী করার কংগ্রেসী লক্ষ্য এখানে সুস্পষ্ট। কংগ্রেসের এ দাবীর জবাবে লর্ড ওয়াভেল তাঁর ইতিপূর্বেকার ব্যাখ্যামূলক বিবৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বৃটিশ সরকারের উপর আস্থা রাখার আবেদন জানালেন এবং বললেন যে, ভারতে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতাই দিতে চাই।

৬ই জুন (১৯৪৬) তারিখে মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। এ অধিবেশনে লীগ ঘোষণা করল, পাকিস্তানই লীগের চূড়ান্ত লক্ষ্য তবে উদ্ভূত সংকট বিবেচনা করে, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে এবং যেহেতু মিশন প্রস্তাবিত গ্রুপ ব্যবস্থার 'ক' ও 'গ' সেকশন গঠনের মধ্যে পাকিস্তানের দাবী অনেকখানি পূরণ হয়, তাই লীগ কাউন্সিল ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী গণপরিষদে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করছে। মুসলিম লীগ কর্তৃক ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ অনেককে বিশেষ করে কংগ্রেসকে দারুনভাবে বিস্মিত করলো। 'কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন যে, লীগ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করবেই এবং সেই কারণে তারা অধিকতর সুবিধা আদায়ের জন্যে মিশনের সাথে দরকষাকষি করছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল এ দরকষাকষির ফলে মুসলিম লীগকে বাদ দিয়েই কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে সক্ষম হবে এবং গ্রুপিং সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা কার্যকরী করতে পারবেন।'[১৩০] কিন্তু দূরদর্শী জিন্নাহ ভালো করেই বুঝেছিলেন যে, 'এই সময় মিশনের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যন করলে লীগকে বৃটিশ সরকার ও কংগ্রেস উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। তাতে ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পর কংগ্রেসের যে অবস্থা হয়েছিল, মুসলিম লীগকে তেমনিভাবে একটা ক্ষতিকর অচলাবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।[১৩১] লীগ মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণের পর বেকায়দায় পড়ল কংগ্রেস।

কংগ্রেস এরপর মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ-বর্জন সম্পর্কে কোন কথা না বলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে সর্বোচ্চ সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠল। এটা লক্ষ্য করে জিন্নাহ ৮ই জুন তারিখ ভাইসরয় লর্ডওয়াভেলকে লেখা এক চিঠিতে নিশ্চয়তা দাবী করলেন যে,অন্তর্ববর্তী সরকারে ৫ জন লীগের, ৫ জন কংগ্রেসের, ১ জন শিখ ও ১ জন এ্যাংলো ইন্ডিয়ান অর্থাৎ সব মিলে মোট ১২ জন সদস্য থাকবে – এই মর্মে ভাইসরয় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ঠিক আছে কিনা। ভাইসরয় উত্তরে জানান যে, তিনি এ ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, প্রতিশ্রুতি দেননি। ১২ই জুন তারিখে নেহেরু ভাইসরয়ের সাথে দেখা করলেন এবং দাবী করলেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারে ১৫ জন সদস্য থাকতে হবে। যার মধ্যে ৫ জন হবেন কংগ্রেসী হিন্দু, ৪ জন লীগের, ১ জন লীগ বহির্ভূত মুসলমান, ১ জন

১৩০, ১৩১। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৪৮, ৭৪৯।

www.icsbook.info

অকংগ্রেসী হিন্দু, ১ জন তফসিলি, ১ জন ভারতীয় খৃষ্টান, ১ জন শিখও ১ জন কংগ্রেসী মহিলা। লর্ড ওয়াভেল নেহেরুর এ দাবী মেনে নিলেন না। ১৩ই জুন তারিখেই কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদ লর্ড ওয়াভেলের সাথে দেখা করে জানিয়ে দিলেন, ১২ সদস্যের অন্তর্বর্তী সরকার কংগ্রেস কিছুতেই মেনে নেবে না। কংগ্রেসকে রাজী করানোর স্বার্থে লর্ডওয়াভেল তখন ১৩ সদস্যের অন্তর্বর্তী সরকার প্রস্তাব করলেন। যাতে থাকবেন, ৬ জন কংগ্রেস, ৫ জন মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সদস্য। কংগ্রেস ওয়াভেলের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

এই অবস্থায় অচলাবস্থা দূরীকরণের জন্যে ক্যাবিনেট মিশন ও ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ১৬ই জুন তারিখে অন্তর্বর্তীসরকার গঠনের এক তরফা ঘোষণ প্রকাশ করল। বলা হলো, ১৪ জন সদস্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। যাতে থাকবে কংগ্রেসের ৬জন, মুসলিম লীগের ৫জন, শিখ ১জন, ১জন ভারতীয় খৃষ্টান এবং ১জন পার্সী সদস্য। এই সাথে সদস্যদের নামও ঘোষণা করা হলো [১৩২] এবং জানিয়ে দেয়া হলোঃ "প্রধান দু'টি দল অথবা এদের মধ্যে কোনটি যদি এইভাবে কোয়ালিশন সরকার গঠনে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে ভাইসরয়ের ইচ্ছা যে, তিনি ১৬ই মে ঘোষিত (ক্যাবিনেট মিশন) পরিকল্পনা গ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যতদূর সম্ভব প্রতিনিধিত্বশীল অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করবেন।"[১৩৩]

এই ঘোষণা তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল কংগ্রেসের মধ্যে। ২০ শে জুনের দিকেই পরিস্কার হয়ে গেল কংগ্রেস এ পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করবে। রাজা গোপালাচারী মিশনকে অনুরোধ করলো তারা যেন মওলানা আজাদের হাত শক্তিশালী করেন যাতে তিনি গান্ধীর মোকাবিলা করতে পারেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মওলানা আজাদ অন্তর্বর্তী সরকার পরিকল্পনা গ্রহণে রাজী ছিলেন। আর দীর্ঘমেয়াদী মিশন পরিকল্পনাকে তো মওলানা আজাদ তার নিজের পরিকল্পনা বলেই মনে করতেন।[১৩৪] রাজা গোপালাচারীর কথায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস দেখা করলেন মওলানা আজাদের সাথে। কিন্তু আজাদ তখন মানসিকভাবে এতই ক্লান্ত যে, তিনি অবস্থার উন্নয়নে কিছু করতে পারবেন তা মনে করেন না। এরপর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস দেখা করলেন গান্ধীর সাথে। আলোচনা ব্যর্থ হলো। গান্ধী প্রস্তাবিত অন্তর্বর্তী সরকারকে ভালো কিছু মনে করেন না।[১৩৫]

২৫শে মে তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ভাইসরয় প্রস্ত াবিত অন্তর্বর্তী সরকার পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করল। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত যখন

১৩২। ১৪ জন সদস্যের নামঃ বলদেব সিং, স্যার এনপি, ইঞ্জিনিয়ার, জগজীবন রাম, নেহেরু, জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, হরে কৃষ্ণ মাহতাব, জন মাথাই, মিঃ রাজ গোপালাচারী, রাজেন্দ্র, প্রসাদ, বল্লভ ভাই প্যাটেল, মুহাম্মদ ইসমাইলম খান, খাজা নাজিম উদ্দীন ও আব্দুর রব নিশতার।

১৩৩। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৫২।

১৩৪। 'The Great Devide', S.V Hudson, page 157.

১৩৫। 'The Great Devide', S.V Hudson, page 157.

www.icsbook.info

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মওলানা আজাদ ভাইসরয়কে জানালেন, তখন কিন্তু তিনি এই সাথে লিখলেন, "কিছু বিষয় (যেমন প্রদেশ সমূহের গ্রুপ) সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্য সাপেক্ষে কংগ্রেস ১৬ই মে ঘোষিত মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল।"[১৩৬] বস্তুত এই ঘটনা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মওলানা আজাদকে খুবই বেদনা দিয়েছিল। তিনি লিখেন, "কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কর্তৃক ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গৌরবজ্জল ঘটনা। এর অর্থ এই ছিল যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের একটা কঠিন প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বের মাধ্যমে শেষ না হয়ে আলাপ-আলোচনা এবং চুক্তির মাধ্যমে মীমাংসা হয়ে গেল। ---- কিন্তু তখনও জানতাম না যে ইহা অপরিপক্ক এবং ভবিষ্যতে হতাশা অপেক্ষা করছে।"[১৩৭]

কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করার পর মিশন ও ভাইসরয়ের ১৬ই জুনের ঘোষণা অনুযায়ী কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে মুসলীম লীগ ও অন্যান্যদের নিয়ে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে হয়। কিন্তু ভাইসরয় এই প্রতিশ্রুতি থেকে নগ্নভাবে সরে দাঁড়ালেন। তিনি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন মূলতবী করে তার জায়গায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন। জিন্নাহ এই বৃটিশ ওয়াদা ভংগের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। জবাবে ভাইসরয় ওয়াভেল যে মজার যুক্তি দেখালেন তা এইঃ 'লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই মিশনের পরিকল্পন গ্রহণ করছে (যদিও কংগ্রেস স্বল্প মেয়াদী অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীণ সরকার গঠনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছিল), এমতাবস্থায় কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করতে অস্বীকার করায় স্বল্পকালের জন্যে একটা মুলতুবী রাখা শ্রেয়।' জবাবে জিন্নাহ বললেন, কংগ্রেস কখনই মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস প্রকাশ্যে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাও তারা প্রকৃত অর্থে গ্রহণ করেনি। কারণ, মিশনের পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা শর্তাধীনে গ্রহণ করেছে।

মিঃ জিন্নাহ যে ঠিক বলেছিলেন শীঘ্রই তার প্রমাণ মিলল। ক্যাবিনেট মিশন ভারত ত্যাগ করলো ২৯ শে জুন (১৯৪৬)। ৬ই জুলাই তারিখে বোম্বাইতে কংগ্রেস কাউন্সিলের অধিবেশন বসল। মওলানা আজাদকে বাদ দিয়ে কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হলেন নেহেরু। নেহেরু সভাপতি হয়েই ঘোষণা করলেন, "ক্যাবিনেট মিশনের দীর্ঘমেয়াদী অথবা স্বল্পমেয়াদী কোন পরিকল্পনাই কংগ্রেস গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস মাত্র শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী গণপরিষদে যোগ দিতে চেয়েছে, এর বেশী কিছু নয়। গণপরিষদটি হবে সার্বভৌম এবং প্রদেশগুলোর

১৩৬। 'The Great Devide', S.V Hudson, page 158. 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', ডঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ৩৩৬।
১৩৭। 'India Wins Freeedom', A.K. Azad, page 151.

www.icsbook.info

গ্রুপ ব্যবস্থা কার্যকরী হবে না। ---- তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা ও যোগাযোগ ছাড়াও থাকতে হবে শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রা এবং করারোপের শক্তি।.... সংখ্যালঘু প্রশ্নটি ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, এ ব্যাপারে বৃটিশ সরকার কিংবা বাইরের কোন হস্তক্ষেপ আমরা বরদাশত করবোনা।"[১৩৮] সম্মেলন শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে নেহেরু আরও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, "কংগ্রেস যেটা ভাল মনে করবে সেভাবেই গণপরিষদে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা পরিবর্তন ও সংশোধন করা হবে।"[১৩৯]

জিন্নাহ কংগ্রেসের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করলেন এবং দাবী করলেন, বৃটিশ সরকারের এখন পরিষ্কার বলা দরকার যে, "কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি।" ক্যাবিনেট মিশনের একজন সদস্য স্যার পেথিম লরেন্স ১৮ই জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্টে বললেন, "পক্ষগুলো ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণের পর গণপরিষদে গিয়ে এর অন্যথা করার অধিকার নেই।"[১৪০] কিন্তু কংগ্রেস তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এই অধিকারই ছিনিয়ে নিতে চাইল।

উপমহাদেশীয় সমস্যার এক সংকট সন্ধিক্ষণে কংগ্রেসের এই আচরণ ঘটনাকে জটিল ও সংঘাতমুখর করে তুলল। সমকালীন সব ঐতিহাসিক কংগ্রেসের এই অযৌক্তিক আচরণের নিন্দা করেছে। ঐতিহাসিক ওয়াল ব্যাংক লিখছেন, 'এই ধরনের মন্তব্য দ্বারা ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবগুলো সম্পূর্ণ নস্যাত করে দেয়া হলো। জিন্নার আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়ে গেল। জিন্নার আশংকা ছিল যে, গণপরিষদে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ, লীগ তাতে যোগ দিলে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবসমূহ বাতিল করে দেবে এবং তাদের ইচ্ছানুরূপ সরকার গঠন করবে এবং তাতে মুসলমানদের অধিকারের আর কোন নিশ্চয়তা থাকবেনা।[১৪১] অন্য এক ঐতিহাসিক লাম্বি বলছেন, "নেহেরু ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন এবং ক্ষমতা হস্তগত হওয়ার সময় সন্নিকট দেখে তিনি এই প্রকার উগ্র হয়ে উঠেছিলেন। তিনি (নেহেরু) মনে করেছিলেন, বৃটিশের আসন্ন (ভারত) ত্যাগ নিশ্চিত হয়ে উঠেছে এবং ঐক্যের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছার বন্যায় মুসলিম লীগকে কোণঠাসা করা অথবা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। .... মুসলিম মনোভাবের গভীরতা সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে কংগ্রেস মনে করেছিল যে তার প্রাধান্য অপ্রতিরোধ্য এবং সেই কারণে এই মর্মান্তিক খেলা খেলেছিল।"[১৪২] আরেকজন ইতিহাসকার লিউনার্ড মোজলে লিখেন, "কি বলছেন তা কি নেহেরু বুঝতে পেরেছিলেন? পৃথিবীকে তিনি বলেছিলেন একবার ক্ষমতা

১৩৮। 'The Great Devide', S.V Hudson, page 163.
১৩৯। 'The Great Devide', S.V Hudson, page 163.
১৪০। 'The Great Devide', S.V Hudson, page 163.
১৪১। 'A Short History of India and Pakista, Wallbank, page 224.
১৪২। 'The Transfer of Power in India', E.W.R. Lumby, page 109, 110

www.icsbook.info

হাতে পেলে কংগ্রেস তার কেন্দ্রীয় (সরকারী) ক্ষমতা ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা ইচ্ছামত পরিবর্তন করার জন্যে ব্যবহার করবে। কিন্তু মুসলিম লীগ সমঝোতার খাতিরে পরিকল্পনাটি সুনির্দিষ্টভাবে (অপরিবর্তনীয়) ভাবে গ্রহণ করেছিল। এটা একটা আপোষমূলক পরিকল্পনা, যা পরে কোন পক্ষের অনুকূলে পরিবর্তন করা যায় না। নেহেরুর মন্তব্য সরাসরি পরিকল্পনাকে স্যাবোটাস করেছিল।"[১৪৩] ভারতের একজন ইতিহাসকার এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "বোম্বাই এর এই সাংবাদিক সম্মেলন ছিল নেহেরুর চল্লিশ বছরের রাজনৈতিক জীবনের এক বড় ভুল পদক্ষেপ। বলা হয়, ১৯৩৭ সালে উত্তর প্রদেশের নির্বাচনের সময় নেহেরু লীগের সঙ্গে সহযোগিতা না করে এক ভুল করেছিলেন। এবার তিনি তার দ্বিতীয় ভূল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। ..... দেশের একতা বজায় রেখে দেশ স্বাধীন হবার এই প্লান ছিল ক্যাবিনেট মিশনের শেষ চেষ্টা।"[১৪৪]

সমগ্র ভারতের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কংগ্রেসের এই চেষ্টা এবং বৃটিশ সরকারের নিস্ক্রিয়তা ও নীরবতার মুখে জুলাইয়ের ২৭, ২৮ ও ২৯ তারিখে (১৯৪৬) বোম্বাই এ মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। লীগ সভাপতি বিক্ষুব্ধ মিঃ জিন্নাহ সম্মেলনে বললেন, "মুসলিম লীগের সকল সততা, সদিচ্ছা ও সুবিচারমূলক চেষ্টা, এমনকি আবেদন -নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেসের খপ্পরে পড়েছে। তারা (মিশন) নিজের খেলা খেলছেন। কংগ্রেস মনে করে, ওরা মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারে যেতে পারবে। ইচ্ছা করলে তারা যেতে পারে। তবে আমরা ভীত নই এবং এরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলা কিভাবে করতে হয় তাও আমরা জানি। ..... একমাত্র মুসলিম লীগই পরিস্কারভাবে সততার সাথে কাজ করছে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে মিশন তাদের ওয়াদা খেলাফ করেছে। মিশন ভীত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। .... আমার মনে হয়, আমরা সকল যুক্তি নিঃশেষ করেছি। সাহায্য লাভের জণ্যে অন্য কারো দিকে তাকিয়ে লাভ নেই। যাওয়ার মত কোন বিচারালয় নেই। একমাত্র বিচারালয় হচ্ছে মুসলিম জাতি। আমি মনে করি, সময় এসেছে যখন (যখন কথাটা আমি বার বার বলে আসছি) নিয়মানুবর্তিতা, ঐক্য ও আমাদের জাতির ক্ষমতার উপর আস্থাশীল হওয়া মুসলিম লীগের ও আমাদের উচিত। যদি যথেষ্ট শক্তি না থাকে, শক্তি সৃষ্টি করুন। যদি আমরা তা করি, তাহলে মিশন ও বৃটিশ সরকারকে কংগ্রেস যে অসহযোগিতার ভয় দেখাচ্ছে আমরা তা থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারবো। আসুন আমরাও বলি যে, আমরা তাই করবো (অর্থাৎ অসহযোগিতা করবো)।"[১৪৫]

১৪৩। 'Last Days of the British Raj', Leonard Mosley, page 28.
১৪৪। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২১৬, ২১৭।
১৪৫। এই উদ্বৃতি ও বিষয়গুলো আকবর উদ্দীন লিখিত 'কায়েদে আযম' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৭৫৬

www.icsbook.info

মুসলিম লীগ এই সম্মেলনে দুইটি প্রস্তাব গ্রহণ করলো। প্রথমটি ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা সম্পর্কিত, দ্বিতীয়টি ভবিষ্যত কর্মসূচি সংক্রান্ত। প্রথম প্রস্তাবে বলা হলোঃ "অন্তর্বর্তী সরকার গঠন সম্পর্কে ওয়াভেল প্রথমে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (৫ঃ৫ঃ২) তা বিবেচনা করে কাউন্সিল দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। ক্যাবিনেট মিশন সেই প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেস প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের তাদের কোন অধিকার নাই। পেথিক লরেন্স অথবা ক্রিপস কংগ্রেসের ব্যাখ্যা 'ultravires' এ কথাও বলছেন না। সমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করার পর কোনই সন্দেহ থাকে না যে, এমন অবস্থায় প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র গঠন সংস্থায় যোগদান করা মুসলিম লীগের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সেই কারণে পূর্বে মিশনের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হোল।" দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হোল, "পাকিস্তান অর্জনের জন্যে, তাদের (মুসলমানদের)অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে, তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং বৃটিশের ও বর্ণহিন্দুদের দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা অবলম্বনের সময় এসেছে। ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রত্যক্ষ কর্মপন্থার (Direct Action) পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব দায়িত্ব অর্পণ করা হলো এবং বৃটিশ প্রদত্ত সমস্ত উপাধি বর্জন করার জন্যে মুসলমানদের আহ্বান জানানো হলো।" [১৪৬]

প্রস্তাব গ্রহণের পর লীগ সভাপতি জিন্নাহ বললেন, "আমরা আজ একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। শাসনতান্ত্রিক বৈধপন্থা ব্যতীত মুসলিম লীগ অন্য কোন পন্থায় এতকাল কাজ করেনি। আজ বাধ্য হয়েই আমরা এ পন্থা অবলম্বন করেছি। আজ আমরা সকল শাসনতন্ত্র সংগত পন্থা থেকে বিদায় নিলাম। এখন আর সমঝোতার কোন অবকাশ নেই। এবার আমরা অগ্রসর হবো। আপনারা (কংগ্রেস ও বৃটিশ) যদি শান্তি চান, আমরা সংগ্রাম চাইনা। আর আপনারা যদি যুদ্ধ চান, আমরা দ্বিধাহীনভাবে মোকাবিলা করব।"[১৪৭]

এখানে উল্লেখ্য, মুসলিম লীগের এই কাউন্সিল অধিবেশনের ৪ দিন আগে ২২ শে জুলাই তারিখে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল লীগ প্রেসিডেন্ট জিন্নাহ এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নেহেরুকে গোপন চিঠি মারফত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রস্তাবে কংগ্রেস থেকে ৬ জন, মুসলিম লীগ থেকে ৫ জন এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু থেকে ৩ জন মোট ১৪ জন সদস্য নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছিল। জবাবে নেহেরু একে সংগে সংগেই প্রত্যাখ্যান করেন এবং দাবী করেন যে, অন্তবর্তী সরকারকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে, বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল নামমাত্র একজন প্রধান থাকবেন এবং সংখ্যালঘু সদস্যদের মনোনয়ন বৃটিশ সরকার দিতে পারবেন না।[১৪৮] অর্থাৎ কংগ্রেস

১৪৬, ১৪৭। এই উদ্বৃতি ও বিষয়গুলো আকবর উদ্দীন লিখিত 'কায়েদে আযম' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৭৫৭, ৭৫৮।
১৪৮। 'The Great Divide', S.V Hudson, page 164.

www.icsbook.info

সংখ্যালঘু সদস্যদের মনোনয়নের ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে অন্তর্বর্তী সরকারের পূর্ণ স্বাধীনতাকে ভারতের সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কাজে লাগাতে চায়। অন্যদিকে জিন্নাহ্ লর্ড ওয়াভেলের চিঠির কোন জবাব দেননি। ২৯ শে জুলাই মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শেষ হলে জিন্নাহ তাঁর এক বক্তব্যে এ সম্পর্কে বলেন যে, ওয়াভেলের প্রস্তাবে মুসলমানদের জন্যে অনুকূল বিষয়গুলোকে, অতীতে যা ছিল, প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে,[১৪৯] তাই প্রস্তাবটি মুসলিম লীগের বিবেচ্য নয়।

২৯ শে জুলাই এর মুসলিম লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের পর মজার ঘটনা ঘটল। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান কার্যত প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যে মহা ভুল করেছিল, কংগ্রেসের যে সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের জন্যে 'সাবোটাজ' ছিল এবং কংগ্রেসের 'সাবোটাজ' কার্যক্রম লীগকে ক্যাবিনেট মিশন প্লান প্রত্যাখ্যানে বাধ্য করেছিল, সেই 'ভুল, সেই 'সাবোটজ' এর জন্যে শাস্তির বদলে বৃটিশ সরকার কংগ্রেসকে পুরস্কৃত করলো। লীগের সাথে কোন আলোচনা ছাড়াই লর্ড ওয়াভেল ৬ই আগস্ট তারিখে নেহেরুকে অন্তবর্তী সরকার গঠনের জন্যে আহ্বান জানালেন। এই খবর ওয়াভেল জিন্নাহকে জানালেন ৮ই আগস্ট তারিখের এক পত্রে। এই ৮ই আগস্ট তারিখেই কংগ্রেস তড়িঘড়ি করে তার ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এ ওয়াভেলের সরকার গঠনের আমন্ত্রণকে আনন্দের সাথে স্বাগত জানান। যেহেতু মুসলিম লীগকে টেক্কা দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার কুক্ষিগত করার সুযোগ পাচ্ছে, তাই কোন শর্তের কথা কংগ্রেস তখন মনে করেনি, এমনকি যে শর্ত নেহেরু মাত্র ১৪ দিন আগে আরোপ করেছিলেন ওয়াভেলের ২২ শে জুলাই এর প্রস্তাবের বিপরীতে, সে শর্তও নয়।

সরকার গঠনে আহূত হবার ৬ দিন পর নেহেরু জিন্নাহকে লিখলেন যে, --- অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে যদি এ বিষয়ে আপনি আমার সাথে আলোচনা করতে চান, তাহলে আমি সানন্দে আপনার সঙ্গে বোম্বাই অথবা যেখানেই থাকুন দেখা করতে প্রস্তুত আছি।[১৫০] নেহেরুর এ চিঠির জবাবে জিন্নাহ ১৫ ই আগস্ট এক পত্রে লিখলেন, "ভাইসরয় ও আপনার মধ্যে কি (আলোচনা) হয়েছে আমি কিছুই জানিনা, অথবা আপনাদের কি চুক্তি হয়েছে তাও আমি জানিনা। এইমাত্র জানি, যা আপনি ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি আপনাকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রূপে অনতিবিলম্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব পেশ করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং আপনি তা গ্রহণ করেছেন। ---- এর অর্থ যদি

১৪৯। 'The Great Divide', S.V Hudson, page 165.
১৫০। 'কায়েদে আযম' আকরব উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৬৩, ৭৬৪)।

www.icsbook.info

এই হয় যে ভাইসরয় আপনাকে গভর্ণর জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করার দায়িত্ব দিয়েছেন এবং আপনার পরামর্শ মতো একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করতে আগেই তিনি সম্মত হয়েছেন, তাহলে এই ব্যবস্থা স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ---- যাই হোক হিন্দু মুসলিম প্রশ্ন ও এই গুরুতর অচলাবস্থার সমাধানের জন্যে যদি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনি আমার সাথে সাক্ষাত করতে চান, তাহলে আজ (সন্ধ্যে) ছয়টায় সানন্দে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজি আছি।"[১৫১] এই দিনই নেহেরু জিন্নার এ চিঠির জবাব দিলেন, "--- আমার ও ভাইসরয়ের মধ্যে কিছুই হয়নি এবং আমার নিকট প্রস্তাব করা ও আমার তা গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোন বন্দোবস্ত হয়নি। ---- আমরা সর্বদাই এই বিষয়ে (হিন্দু-মুসলিম সমস্যা) আলোচনা করতে ও পন্থা বের করতে প্রস্তুত আছি। তবে বর্তমানে আমরা অস্থায়ী সরকার গঠনের কথা চিন্তা করছি। ---- অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলে এই বিষয়ে বিবেচনা করার ও এই সমস্যা সমাধানের সুবিধা হবে। বৃহত্তর প্রশ্ন সম্পর্কে আপনার সাথে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার কোন নতুন প্রস্তাব নেই। সম্ভবত আপনি কোন নতুন পন্থা বাতালাতে পারবেন।"[১৫২]

এখানে লক্ষণীয়, নেহেরু সরকার গঠনের আগে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আলোচনা করতে চাননা। এটা কংগ্রেসের পুরানো কৌশল। আগে ক্ষমতা, তারপর সমাধান, যাতে ক্ষমতার জোরে, সমাধানটা ইচ্ছামত করা যায় ও চাপিয়ে দেয়া যায়। আরেকটা লক্ষণীয় বিষয়, এই সমস্যা সমাধানে নেহেরুর কোন চিন্তা নেই, প্রস্তাব নেই। এটাও কংগ্রেসের একটা পুরানো কৌশল। মুসলমানদের তারা কিছু দেবেন না, কিন্তু প্রস্তাব এলে তা প্রত্যাখ্যান করবেন।

নেহেরুর চিঠির জবাব জিন্নাহ ঐ দিনই দিলেন। বললেন, "----আপনি কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এর কতকগুলির সাথে আমি একমত মনে করবেন না। --- যেহেতু আপনি আমার সাথে দেখা করতে চান, সেহেতু আজ সন্ধ্যে ছয়টায় আপনার সাথে সানন্দে সাক্ষাত করতে রাজী আছি।"[১৫৩]

জিন্নাহ-নেহেরু দেখা হলো। দীর্ঘ আলোচনা হলো। হডসনের ভাষায় 'কোন পক্ষই তাদের পূর্ব অবস্থান থেকে নড়লেন না এবং আলোচনা ব্যর্থ হলো।'

১৬ই আগস্ট তারিখে জিন্নাহ-নেহেরু আলোচনা ব্যর্থ হলো। আর এই ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে। ২৯ শে জুলাই এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক এদিন দেশের সর্বত্র মিছিল, মিটিং এবং কোথাও কোথাও হরতালেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। বাংলা ও সিন্ধুতে ছিল মুসলিম লীগের সরকার। বৃটিশ

১৫১, ১৫২। 'Speches and Writings of Mr. Jinnah', Vol-11, Jamiluddin Ahmed. P 333, 336. ('কায়েদে আযম' আকরব উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৬৩, ৭৬৪)।
১৫৩। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 165.

www.icsbook.info

সরকার মুসলিম লীগকে পাশ কাটিয়ে নেহেরুকে সরকার গঠনের জন্যে আহ্বান করলে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, "যদি ভাইসরয় কেন্দ্রে কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠা করেন, তাহলে তিনি (সোহরাওয়ার্দী) বাংলাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ঘোষণা করবেন এবং এ অঞ্চল থেকে কোন রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে না....।"[১৫৪] ১৬ই আগস্ট অর্থাৎ ডাইরেক্ট এ্যাকশনের দিন সোহরাওয়ার্দী সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। এদিন কোলকাতায় হরতালও ডাকা হয়েছিল। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ কর্মসূচী বা ডাইরেক্ট এ্যাকশন কোন অশান্তি সৃষ্টির জন্যে ছিল না, এর লক্ষ্য ছিল এদিন মিছিল, মিটিং ইত্যাদির মাধ্যমে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, মুসলিম লীগের পদক্ষেপ সবাইকে বুঝিয়ে বলা। ডাইরক্ট এ্যাকশন ডের দু'দিন আগে কায়েদে আযম ১৪ই আগস্ট তারিখে সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "আমি মুসলমানদের বলছি, প্রত্যক্ষ কর্মসূচী দিবস কোন সংঘর্ষ সৃষ্টির দিন নয়। তারা যেন মুসলিম লীগের নির্দেশ ঠিক মত মেনে চলে এবং শত্রুর পাতা ফাঁদে পা দিয়ে কোনও প্রকারের গোলযোগের সৃষ্টি না করে বা কোন প্রকারের উচ্ছৃঙ্খল আচরনের আশ্রয় না নেয়।"[১৫৫]

১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ কর্মসূচীর দিন সারা ভারতেই মিছিল-মিটিং অনুষ্ঠিত হলো, কিন্তু ভয়াবহ দাঙ্গা বেধে গেলা বাংলায়। দাংগা চলল ১৬, ১৭, ১৮ই আগস্ট – এই তিনি দিন ধরে। কোলকাতায় স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক 'আয়ান স্টিফেন'-এর ভাষায় "বেসরকারী সুত্রে হতাহতের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। মেনন ও লাম্বী এ সংখ্যা যথাক্রমে ৫ হাজার নিহত, ১৫ হাজার আহত এবং হাজার নিহত, ১০ হাজার আহত বলেছেন। আর স্টেটসম্যান পত্রিকার হিসাব মতে ২০ হাজার অথবা কিছু বেশি হতাহত হয়েছিল।"[১৫৬] এই হতাহতের তালিকায় মুসলমানদের সংখ্যাই ছিল বেশী। আয়ান স্টিফেন লিখেছেন, "প্রথম দিনের লড়াইয়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে নিশ্চয় মুসলমানরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। মুসলমানরা আক্রমণ করবে এই আগাম ধারণায় স্থানীয় হিন্দু প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচন্ড প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। ---- (তবে) হিন্দুদের আক্রমণেও তেমন সুবিধা হয়নি, কিন্তু পাল্লা উল্টে গেল দ্বিতীয় দিনে অপরাহ্নে শিখদের হস্তক্ষেপের ফলে।"[১৫৭] শিখদের সাথে নিয়ে মুসলমানদের মার দেবার কথা কংগ্রেস নেতা কিরণ শংকর রায় ১৪ই আগস্ট তারিখেই ঘোষণা করেছিলেন।[১৫৮] হিন্দুরা যে এজন্যে আগে থেকে প্রস্তুত হয়েছিল, একথা বৃটিশ ভারতে পূর্বাংঞ্চলীয়

১৫৪। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 165.
১৫৫। 'Pakistan in the Formative Stage', Khalid bin Sayed.
১৫৬। 'Pakistan', Lan Stephens, page 106.
১৫৭। 'Pakistan', Lan Stephens, page 106.
১৫৮। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৬৯।

www.icsbook.info

কমান্ডার জেনারেল টাকোকে এভাবে বলেছেন, "হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর এস এস) এর দ্রুত শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছিল। --- বাংলাতে মহাসভা তৎপর হয়েছিল।"[১৫৯] যে মিছিল, মিটিং, বিক্ষোভ, হরতালের মাঠে হিন্দুরা ছিল এককভাবে, সেখানে যাতে মুসলমানরা না আসতে পারে তা নিশ্চিত করাও ছিল হিন্দুদের একটা লক্ষ্য। জেনারেল টাকোর এর ভাষায় "তাদের (হিন্দুদের) ক্রোধের অন্যতম কারণ হচ্ছে, এতকাল হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি জোর করে চাপিয়ে দেয়ার একচ্ছত্র অধিকার ছিল কংগ্রেসের। সুতরাং এক্ষেত্রে অন্য কোন প্রতিযোগীর বিশেষত মুসলিম লীগের মত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের দাবীতে তারা ক্রুদ্ধ হয়েছিল।"[১৬০] ইচ্ছাকৃতভাবে হাঙ্গামার সূত্রপাতও হিন্দুরাই ঘটিয়েছিল। জেনারেল টুকার এর ভাষায় "১৬ই আগস্ট সকাল সাড়ে ৮টায় খবর পাওয়া গেল যে, হিন্দুরা মুসলমানদের মিছিল করে শহরে প্রবেশে বাধা দেয়ার জন্যে টালা ও বেলগাছিয়ার পুলগুলোতে তাদের আটকাবার ব্যবস্থা করেছে। "[১৬১] মুসলমানরা শহরের মিটিং স্থলে আসার সময় এবং সভাশেষে বিশৃঙ্খলভাবে যাবার সময় তাদের উপর আক্রমণ শুরু হয়। মিছিল-মিটিং এ যোগ দেয়ার জন্যে এলে তাদের অরক্ষিত বসতিগুলো আক্রান্ত হলে ক্ষয়ত-ক্ষতি বেশী হয়।[১৬২] কোলকাতার ভয়াবহ দাংগার পর কায়েদে আযম বললেন, "মুসলমানরা শান্তি ভংগের জন্য কোন প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণতো করেই নাই বরং কোলকাতায় তাদের উপর যখন আক্রমণ হয়, তখন তারা আত্মরক্ষা পর্যন্ত করতে সক্ষম হয়নি। .....ভাইসরয় লীগকে উপেক্ষা করে যেভাবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে চলেছেন, তাতে হিন্দুরা উল্লসিত হয়ে মুসলিম লীগ ও মুসলিম মন্ত্রী সভাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই সুপরিকল্পিত পন্থা অবলম্বন করেছিল। যদি কংগ্রেসী শাসকবৃন্দ মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে ও তাদের উপর অত্যাচার করতে থাকে, তাহলে হাঙ্গামা রোধ করা অত্যন্ত কঠিন হবে।"[১৬৩]

দাঙ্গা বিধ্বস্ত কোলকাতা পরিদর্শনের জন্যে লর্ড ওয়াভেল কোলকাতা এলেন। কলকাতার ঘটনা ওয়াভেলের মনকে দারুনভাবে আলোড়িত ও আহত করেছিল। হিন্দু-মুসলিম অনেক নেতার সাথে তিনি দেখা করলেন। দেখা হলো খাজা নাজিমউদ্দীনের সাথেও। আলোচনাকালে ওয়াভেলকে তিনি জানান, "কংগ্রেস যদি ঘোষণা দেয় যে তারা ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাটি মিশনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অনুযায়ী গ্রহণ করেছে, তাদের নিজেদের ব্যাখ্যা অনুসারে নয় এরং সে সঙ্গে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের যদি সুযোগ দেয়। তবে মুসলিম লীগ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করবে কিনা বিবেচনা করতে পারে এবং অন্তর্বর্তীকালীন

১৫৯। 'While Memory Serves', Sir Francis Tucker, page 143.
১৬০। 'While Memory Serves', Sir Francis Tucker, page 143.
১৬১। 'While Memory Serves', Sir Francis Tucker, page 157.
১৬২। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৬৯।
১৬৩। 'Speeches and Writings of Mr. Jinnah', Vol-1, Jamiluddin Ahmed, page 326, 327.

www.iesbook.info

সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেবে।"[১৬৪]

লর্ড ওয়াভেল কোলকাতা থেকে ফিরে এলেন এই ধারণা নিয়ে যে, দুই সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত না হলে দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। তিনি ২৪ শে আগস্ট এক বেতার ভাষণে বললেন, "অন্ত র্বর্তী সরকার গঠনে ৬ঃ৫ঃ৩ সদস্য হার ভিত্তিক প্রস্তাবটি মুসলিম লীগের জন্যে এখনও উন্মুক্ত আছে। মুসলিম লীগ রাজী হলেই অন্তর্বর্তী সরকার পূনর্গঠন করা হবে।"[১৬৫] ওয়াভেল মুসলিম লীগকে সান্তনা দেবার জন্যে আরও বললেন যে, মিশনের পরিকল্পনায় উল্লেখিত প্রদেশগুলোর গ্রুপ ব্যবস্থা আন্তরিকভাবে মেনে চলা হবে, সাম্প্রদায়িক কোন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের মেজরিটির সমর্থন ছাড়া আইন প্রণীত হবে না এবং এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক দেখা দিলে ফেডারেল কোর্ট তার মীমাংসা করবে। কোলকাতার ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর ওয়াভেল সত্যিই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে নেবার জন্যে। লর্ড ওয়াভেল ২৭ শে আগস্ট গান্ধী ও নেহেরুকে ডাকলেন আবার আলোচনার জন্যে। এই দিন গান্ধী -নেহেরুর সাথে ওয়াভেলের যে আলোচনা হয়, তা তখনকার কংগ্রেস রাজনীতি বোঝার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলোচনাটি Leonard Mozeley' এর গন্থ' 'The last Days of Bfitish Raj' থেকে নিচে উদ্ধৃত করা হলোঃ

"ওয়াভেল ঃ আপনারা কি আমাকে এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আপনারা ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন?

গান্ধীঃ ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা যে আমরা গ্রহণ করেছি, তা ইতিপূর্বেই আমরা আপনাকে জানিয়েছি। তবে মিশন যেভাবে এটি তৈরী করেছেন, ঠিক সেভাবেই যে এটিকে আমরা গ্রহণ করব, এরূপ নিশ্চয়তা দেয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। মিশনের প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা রয়েছে।

ওয়াভেলঃ এমনওতো হতে পারে আপনাদের ব্যাখ্যা আর ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য ঘটতে পারে।

গান্ধীঃ অবশ্যই ঘটতে পারে। কিন্তু কথা হলো, ক্যাবিনেট মিশন যা ভাবছে তাঁদের পরিকল্পনায় তার সত্যিকার প্রতিফলন নাও ঘটতে পারে। অথচ অন্তর্বর্তী সরকার যা ভাবছে ঐকান্তিকভাবে তাঁরা তার বাস্তবায়নে আগ্রহী।

ওয়াভেলঃ যেহেতু মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে অংশ গ্রহণ করছেনা, তাই অন্তর্বর্তী সরকারের সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই কংগ্রেসের পক্ষে যাবে। এ অবস্থায় কি করে এই সরকারের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা যায়?

গান্ধীঃ পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। আলোচনার

১৬৪। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', মাহবুবুর রহমান, পৃষ্ঠা ২০৮।
১৬৫। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 168.

www.icsbook.info

আইনসম্মত ভিত্তিটাই হলো আমাদের কাছে মুখ্য। কেননা, নিয়মতান্ত্রিকভাবে বলতে গেলে এ বিষয়টি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের। অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় এলেই কেবল মুসলিম লীগের আকাঙ্খা এবং তাদের অমূলক উদ্বেগ, প্রভৃতি প্রশ্নের সুরাহা করা সহজ হবে। কিন্তু এর আগে কিছু করা যাবে না।

গান্ধীর কথায় ওয়াভেল ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন এবং বলেনঃ আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না এটা স্রেফ একটা কংগ্রেস সরকার। তাদের মধ্যে নিরপেক্ষতা না থাকাই স্বাভাবিক?

নেহেরুঃ কংগ্রেসের গঠন কাঠামো সম্পর্কে আপনার সঠিক ধারণা নেই মাননীয় ভাইসরয়। কংগ্রেস হিন্দু সমর্থকও নয়, মুসলিম বিরোধীও নয়। এই সংগঠন ভারতের সব শ্রেণীর লোকের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং কখনও তা মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবে না।

ওয়াভেলঃ কিন্তু পন্ডিত নেহেরু আপনি কোন মুসলমানের কথা বলছেন? আপনি কি কংগ্রেসী মুসলমানদের ক্রীড়নকদের কথা বলছেন, মুসলিম লীগ মুসলমানদের কথা বলছেন, আপনি কি বুঝতে পারছেন না, এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন আপনারা যে মুসলিম লীগের স্বার্থ নস্যাত করতে যাচ্ছেন না, মুসলিম লীগের মনে সে রকম একটি সংশয়হীন ধারনা সৃষ্টি করা । ভুলে যাবেন না মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির এটাই উপযুক্ত সময় এবং শেষ সুযোগ। সে যা হোক, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা সম্পর্কে কংগ্রেসের কাছ থেকে আমি এমন একটা ঘোষণা চাই, যে ঘোষণা মুসলিম লীগকে সন্তুষ্ট করবে এবং একটা স্থিতিশীল অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দেবে।

এই কথাগুলো বলার পর লর্ড ওয়াভেল তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ টেনে বের করলেন এবং বললেন, আমি যা বলতে চাই এতে তা রয়েছে।[১৬৬]

ঘোষণাপত্রটি গান্ধী (হাতে নেওয়ার পর পড়ে তা) নেহেরুর হাতে দিলেন। আদ্যোপান্ত পড়ে নেহেরু বললেন, এই ঘোষণা মেনে নেয়ার অর্থ কংগ্রেসকে তার নিজের পায়ে শৃংখল পরিয়ে দিতে বলা।

ওয়াভেলঃ কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নিতে হলে এই ঘোষণাটি আপনাদের মেনে নেয়া উচিত। একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিনা যে, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনাটির তাৎপর্য না জেনেই কংগ্রেস প্রথমে এটা মেনে নিয়েছিল। এই পরিকল্পনায় ভারতকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করার কথা

১৬৬। ড্রয়ার থেকে বের করা ঘোষণা পত্রের বক্তব্য এই, "সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে ঘোষিত পরিকল্পনার এই বিষয়টি মেনে নিতে রাজী যে, নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থার আওতায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গঠিত নতুন আইন সভা ১৬ই মে'র বিবৃতির ১৯ (৭) অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হতে না দেয়া পর্যন্ত প্রদেশগুলো তাদের নির্ধারিত গ্রুপ থেকে অন্য কোন গ্রুপে যোগ দিতে বা আলাদা হয়ে যেতে পারবেনা।" 'Transfer of Power in India', V.P. Menon, page 302)

www.icsbook.info

সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে। কাজেই এখন আপনারা কথা ঘুরিয়ে এ কথা বলতে পারেন না যে, মিশনের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য আপনারা অনুধাবন করতে পারেননি।
গান্ধীঃ ক্যাবিনেট মিশনের উদ্দেশ্য ও আমাদের ব্যাখ্যা যে এক হতে হবে এমন কোন কথা নেই।
ওয়াভেলঃ এটা হলো আইনজীবীর কথা। আমি চাই আপনারা সাদা-মাটা ইংরেজীতে আমার সাথে কথা বলুন। আমি একজন সৈনিক। সোজা-সরল কথা আমি বুঝি।
নেহেরুঃ আইনজীবী হয়ে নিশ্চয়ই আমরা কোন অপরাধ করিনি।
ওয়াভেলঃ সে কথা নয়। আমি বলতে চাই, আপনারা আমার সাথে এমন সৎলোকের মত কথা বলুন যারা ভারতের কল্যাণ চায়। বাদ দিন এ প্রসংগ। ক্যাবিনেট মিশনের প্রসংগে আসুন। ক্যাবিনেট মিশনের উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় দিবালোকের মতই স্পষ্ট। সুতরাং এ ব্যাপারে আইনের ব্যাখ্যা চাওয়ার বা বিতর্কে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কংগ্রেসের কাছ থেকে প্রত্যাশিত নিশ্চয়তা পেলে আমি মনে করি মিঃ জিন্নাহ ও মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানে অস্বীকৃতির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে রাজী করাতে পারব। অন্তর্বর্তী সরকারে তাদের প্রয়োজন আমরা বোধ করছি। ভারতেও তাদের প্রয়োজন আছে এবং আপনারা গৃহযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের কথাটি যদি চিন্তা করেন, তাহলে আপনারাও তাদের প্রয়োজন অনুভব করবেন। এ অবস্থায় কংগ্রেসকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের অনুমতি দেয়া হলে সেটা আমার পক্ষে শুধু অবিবেচনার কাজই হবে না, এটা বিপজ্জনাক ঝুঁকিও হয়ে দাঁড়াবে।
গান্ধীঃ কিন্তু আপনি তো ইতিমধ্যেই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। আপনি এখন কথার খেলাফ করতে পারেন না।
ওয়াভেলঃ সে পরিস্থিতি এখন বদলে গেছে। কলকাতার হত্যাকান্ডের ফলে গোটা ভারত এখন একটা গৃহযুদ্ধের মুখে। এটাকে প্রতিহত করা আমার কর্তব্য। মুসলমানদের বাদ দিয়ে কংগ্রেসকে সরকার গঠন করতে দেয়া হলো গৃহযুদ্ধ প্রতিরোধ করা যাবে না। মুসলমানরা তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে একমাত্র পথ হিসাবে বেছে নেবে। নেহেরুঃ অর্থাৎ আপনি মুসলিম লীগের ব্লাকমেইলের কাছে নতি স্বীকার করতে যাচ্ছেন।"[১৬৭]

এইভাবেই ওয়াভেল-গান্ধী-নেহেরু আলোচনা শেষ হয়ে গেল। বিক্ষুব্ধ গান্ধী ওয়াভেলের বিরুদ্ধে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলীর কাছে বার্তা পাঠালেন। তখন বৃটেনে শ্রমিক দল ক্ষমতায়। শ্রমিক দল সব সময় কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল।

১৬৭। 'মুসলিম বাংলার অভ্যুদয়', (মাহবুবুর রহমান) গ্রন্থে উদ্বৃত, পৃষ্ঠা ২০৯, ২১২, 'The Last Days of the British Raj, Leonard Mozeley, page 44, 46.

www.icsbook.info

সুতরাং এটলী সহজেই গলে গেলেন গান্ধীর কথায়। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জানালেন যে, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমঝোতার অভাবে উগ্র ও ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার বিপদ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অবহিত, এদের মধ্যে সমঝোতার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি না করার জন্যে এবং পূর্বঘোষিত অন্তর্বর্তী সরকারকে কার্যভার দেয়ার জন্যে ভাইসরয়কে পরামর্শ দিচ্ছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে ২রা সেপ্টেম্বর নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করলো। ভীষণ খুশী গান্ধী এদিন প্রার্থনা সভা ডেকে বললেন, "দীর্ঘকাল ভারতীয়রা এই দিনের জন্যে লাঞ্ছনা ও কষ্ট স্বীকার করেছে। ....আজ ভারতীয় নেতাদের সাথে মীমাংসার জন্যে তাদের (বৃটিশদের) ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন।"[১৬৮] কিন্তু কংগ্রেস খুশী হলেও তাদের এই রাজত্বে অশান্তি বেড়েই চলল। বোম্বাই ও আহমাদাবাদে হলো গুরুতর দাংগা। তার ঢেউ গিয়ে লাল বাংলাদেশে। নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম অঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটল। এক নোয়াখালিতেই দাংগায় তিন শ'র মত লোক নিহত হলো। এই আস্থার মধ্যে ওয়াভেল গিয়ে ধরলেন জিন্নাহকে। দেশের স্বার্থে মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতেই হবে। জিন্নাহ লিখিতভাবে নয়টি বিষয়ে মতামত ও ব্যাখ্যা দাবী করলেন। এই নয়টি দফার ৮টি অন্তর্বর্তী সরকারের গঠন ও কাজ সম্পর্কে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৯নং দফায় দাবী করলেন, "উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত এবং উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে সমঝোতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রশ্ন মুলতবি রাখতে হবে।"

ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল কিছু মেনে নিয়ে কিছুর ব্যাখ্যা দিয়ে লিখিতভাবে জিন্নার প্রস্তাবের জবাব দিলেন। এরপর প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে এসব দাবী, ব্যাখ্যা ইত্যাদি নিয়ে ওয়াভেল, জিন্নাহ, গান্ধী, নেহেরু, প্রমুখের মধ্যে আলোচনা চলল। অবশেষে ১৩ই অক্টোবর এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ জিন্নাহ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভাইসরয়কে লিখলেন, "মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে, যে ভিত্তি ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ভাইসরয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছেন তা কমিটি অনুমোদন করে না। ... কিন্তু যেহেতু মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পাঁচজন সদস্য মনোনয়নের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, সেই হেতু আমার কমিটি অন্যান্য কারণে সাব্যস্ত করেছেন যে, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক শাসন ব্যবস্থা কেবল কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দেয়া মারাত্মক হবে। এতদ্ব্যতীত, মুসলিম ভারতের আস্থাভাজন নয় এমন ব্যক্তিদের একজিকিউটিভ

১৬৮। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৩১।

www.icsbook.info

কাউন্সিলে নিয়োগ করতে আপনি বাধ্য হতে পারেন এবং পরিশেষে অন্যান্য পরিস্থিতি ও কারণে আপনার ১৯৪৬ সালের ২৪ শে আগস্ট তারিখের বেতার ঘোষণা এবং আমার নিকট আপনার ৪ঠা ও ১২ই অক্টোবর তারিখের দু'টি পত্রের ভিত্তিতে আমরা মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে পাঁচজন সদস্য মনোনীত করতে প্রস্তুত আছি।"[১৬৯] এরপর ১৫ অক্টোবর তারিখে এই পাঁচজন সদস্য হিসেবে লিয়াকত আলী খান, আই, আই, চুন্দ্রিগড়, আব্দুর রব নিশতার, গজনফর আলী খান এবং যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এর নাম জিন্নাহ ভাইসরয়ের কাছে পেশ করলেন। কংগ্রেস তার সদস্যের কোটা থেকে কংগ্রেসপন্থী কোন মুসলমানকে মনোনীত করার কংগ্রেসের যে জেদ, তারই প্রতিশোধ হিসেবে তফসিলী হিন্দুনেতা যোগেন্দ্র মন্ডলকে লীগ তালিকায় নিয়ে জিন্নাহ কংগ্রেসকে বুঝিয়ে দিলেন কংগ্রেস নিম্নবর্ণের তফসিলী হিন্দুদের প্রতিনিধি নয়। এতে কাজ হয়েছিল। গান্ধী দারুণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, একজন হরিজনকে মনোনীত করে লীগ ক্যাবিনেটের মধ্যে লড়াই করতে এসেছে কি না।[১৭০]

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেছেন যে, জিন্নাহ নেহেরুর দাবী স্বীকার করে নিয়ে ক্যাবিনেটে যোগ দেন।[১৭১] একথা ঠিক নয়। ঐতিহাসিক হডসন প্রশ্ন তুলেছেন, 'জিন্নাহ যদি কংগ্রেসের কাছ থেকে কিছুই আদায় করে না থাকে, তাহলে কংগ্রেস ও নেহেরুর মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল কেন মুসলিম লীগ সরকারে আসায়?[১৭২] বস্তুত কংগ্রেস চায়নি মুসলিম লীগ সরকারে আসুক, তাই ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব নিয়ে অযৌক্তিক ভূমিকা পালন করে মুসলিম লীগকে ভয় দেখিয়ে দূরে রাখতে চেয়েছে। কিন্তু কৌশলের যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জিন্নাহ ধীর স্থিরভাবে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে নিজের অবস্থান ঠিক রেখে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করে নিয়ে সরকারে যোগাদান করেছেন। জিন্নাহ সরকারে আসার ক্ষেত্রে এই সুবিধাগুলো আদায় করে নিয়ে সরকারে যোগদান করেছেন। জিন্নাহ সরকারে আসার ক্ষেত্রে সুবিধা আদায় করেন ঃ (১) মুসলিম লীগ নেহেরুর আহ্বানে সরকারে আসে নি, এসেছে ওয়াভেলের আহ্বানে তার সাথে দরকষাকষির করে এবং কংগ্রেসের সমকক্ষ একটা পক্ষ হিসেবে, (২) ক্যাবিনেট মিশনের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা স্থগিত রাখার শর্তে মুসলিম লীগ সরকারে যোগ দেয়। এর ফলে স্বকল্পিত ব্যাখ্যাসহ মিশনের দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ কংগ্রেসের বন্ধ হয়, (৩) মুসলিম সদস্য না নেয়া সম্পর্কিত বিধি-নিষেধ যদি কংগ্রেস না মানে, তাহলে এ ধরনের কোন বিধি-নিষেধ মুসরিম লীগের উপরও থাকবে না। এ বিষয়টা স্বীকার করিয়েই লীগ সরকারে আসে। যার

১৬৯। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৮১।
১৭০। 'Transfer of Power in India', V.P. Menon, page 317.
১৭১। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৩২।
১৭২। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 172.

www.icsbook.info

ফলে মুসলিম লীগ যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে নেয় যা কংগ্রেসের জন্যে মাথা ব্যাথা কারণ হয়েছিল এবং (৪) ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার মুসলিম লীগের অধিকার প্রশ্নাতীত –এ কথা জিন্নাহ কংগ্রেসকে দিয়ে স্বীকার করিয়েছিল।[১৭৩]

মন্ত্রীসভা গঠনের পর দফতর বন্টন নিয়ে বাধল বিরোধ। যেসব পদের সাথে শক্তি ও রাজনৈতিক প্রভাব জড়িত আছে, সেসব পদ, যেমন স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা, কংগ্রেস কিছুতেই মুসলিম লীগকে দিতে চাইল না। ওয়াভলের অনুরোধেও এ তিনটি পদের একটিও কংগ্রেস ছাড়তে রাজী হলো না। দিতে চাইল অর্থ, বাণিজ্য, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও আইনের মত পদগুলো। অবশেষে বৃটিশের মুসলিম আমলা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগকে পরামর্শ দিলেন অর্থ সহ যা দিতে চাচ্ছে তা নেবার জন্যে। এক অর্থ মন্ত্রণালয় দিয়েই কংগ্রেসকে উচিত শিক্ষা দেয়া যাবে।

যে দ্বন্দ্ব ও বৈরিতা নিয়ে মন্ত্রীসভার যাত্রা শুরু হলো, সে দ্বন্দ্ব ও বৈরিতা পরে বেড়েই চলল এবং সরকার ও প্রশাসনকে অচল অবস্থায় পৌঁছে দিল। "প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তর্বর্তী সরকারের দু'টি দলের মধ্যে সহযোগিতা ছিল না। একদল অপর দলের সাথে পরামর্শ করতো না। অর্থ দফতর হাতে থাকায় (অর্থমন্ত্রী) লিয়াকত আলী খানের পক্ষে অন্যান্য দফতরের কাছে বাধা দেওয়ার বিশেষ সুযোগ হয়েছিল। বল্লভ ভাই প্যাটেল ছিলেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। তিনিই সবচাইতে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। একটি নতুন চাকরানী নিয়োগ করতে হলেও অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ দফতেরর মঞ্জুরীর নিয়ম থাকায় লিয়াকত আলী খান অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করতেন। এতদ্ব্যতীত সরকারে দু'টি স্বতন্ত্র দল থাকার ফলে সেক্রেটারিয়েটের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দলাদলি দেখা দিয়েছিল। একদলের কর্মচারী অন্যদলের কর্মচারীদের কোন রকম সাহায্য করতেন না।"[১৭৪] অন্যদিকে দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

সরকারের প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেস সভাপতি নেহেরু কেন্দ্রীয় পরিষদ আহ্বানের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। লীগ প্রেসিডেন্ট জিন্নাহ এর তীব্র বিরোধিতা করলেন। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলও শীঘ্র কেন্দ্রীয় পরিষদ ডাকতে চাচ্ছিলেন। তিনি জিন্নাহকে বুঝিয়ে রাজী করাতে চেষ্টা করলেন। জিন্নাহ্ বললেন, মুসলিম লীগ

১৭৩। গান্ধীর অনুরোধে ভুপালের নওয়াবের মধ্যস্থতায় গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে এই ফর্মুলা স্বাক্ষরিত হয়ঃ "The Congress does not challenge or accepts that the muslim League is now is the authoritative representativeorganization of an overwhelming majority or theMuslims of India. As and in accordance with democratic principles they alone have today an unquestionable right to represent the Muslims of India. But Congress cannot agree that any restriction or Limitation should be put upon the Corgress to choose such representatives as they think proper from amongst the member of the Congress as their representatives." (কায়েদে আযম, আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৮২)।

১৭৪। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৯৪, ৭৯৫।

www.icsbook.info

যেহেতু ২৯ শে জুলাই এর অধিবেশনে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই মুসলিম লীগ কাউন্সিল এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ না করা পর্যন্ত লীগ সদস্য কেন্দ্রীয় পরিষদে যোগ দিতে পারবে না। ওয়াভেল অনুরোধ করলেন শীঘ্র লীগ কাউন্সিল ডেকে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার জন্যে। কিন্তু জিন্নাহ লীগ কাউন্সিল ডাকলেন না। তাঁর দৃষ্টি ছিল কংগ্রেসের তৎপরতার দিকে। ১৭ই নভেম্বর জিন্নাহ ওয়াভেলের কাছে লিখা এক দীর্ঘ চিঠিতে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার সাথে কংগ্রেসের আচরণের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বললেন, "যেহেতু কংগ্রেস পূর্ব সিদ্ধান্তে অনড়, তাই লীগ কাউন্সিল আহ্বানের কোন প্রয়োজন দেখি না। ... আসল প্রশ্ন হচ্ছে, প্রথমে কংগ্রেসকে সুস্পষ্টভাবে মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে স্বীকার করাতে হবে এবং তারপর কংগ্রেস যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরে তাহলে (মিশনের) প্রস্তাবসমূহ কার্যকরী করার পন্থা বৃটিশ সরকারকে স্থির করতে হবে।"[১৭৫]

কিন্তু ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল মিঃ জিন্নাহ উত্থাপিত এইসব বাস্তব দিকের প্রতি কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ না করে এবং মিশনের পরিকল্পনা মানা না মানা সম্পর্কে কংগ্রেসকে একটি কথাও না বলে ৯ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠক আহ্বান করলেন। তিনি অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে ডেকে বললেন, 'মুসলিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ না করলে অন্তর্বর্তী সরকারে লীগ সদস্যদের তিনি রাখতে পারবেন না। সংগে সংগেই লিয়াকত আলী খান বললেন, ভাইসরয় যখনই পদত্যাগপত্র দাবী করবেন, লীগ সদস্যগণ তখনই পদত্যাগ করবে, কিন্তু লীগের শর্তপূরণ না হলে তারা গণপরিষদে যোগদান করবেন না।'[১৭৬]

একদিকে রাজনৈতিক অবস্থা যখন এই, দেশব্যাপী সংঘাত সংঘর্ষের অবস্থা তখন ভয়াবহ। ভারতে বৃটিশ কমান্ডার স্যার ফ্রান্সিস টুকারের মতে পাঞ্জাবে শিখ-মুসলিম হাঙ্গামা বাধলে সারা ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তো ভেঙে পড়বেই, তদুপরি সর্বত্র একটা বিপর্যয়মূলক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হবে। এই অবস্থায় লর্ড ওয়াভেল বৃটিশ সেক্রেটারী অব স্টেটকে জানালেন, "পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হচ্ছে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ্য গৃহযুদ্ধ অতি সন্নিকটে।"[১৭৭] ভাইসরয়ের এই বার্তা যাওয়ার পর সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী বৃটেনে একটা আলোচনা বৈঠক আহ্বান করলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, প্রতিপক্ষের দু'জন করে প্রতিনিধি এ আলোচনা বৈঠকে যোগদান করবেন।

১৭৫। 'Speeches and Writings of Mr. Jinnah, Vol-11, Jamiluddin Ahmed. page 368-370.
১৭৬। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৯৬।
১৭৭। 'Transfer of Power in India', V.P. Menon page 314

www.icsbook.info

লন্ডন যাওয়ার দাওয়াত পেলেন জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, নেহেরু এবং বলদেব সিং। নেহেরু যেতে অস্বীকার করলেন। যুক্তি দেখালেন, মুসলিম লীগের চাপে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা বাতিল অথবা পরিবর্তনের যে আলোচনা লন্ডনে ডাকা হয়েছে, সে আলোচনায় কোন লাভ হবে না।[১৭৮] বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী নেহেরুর কাছে একটা ব্যক্তিগত পত্র লিখে অনুরোধ করলেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের পূর্ণ বাস্তবায়নই তার লক্ষ্য, পরিকল্পিত গণপরিষদকে সফল করার কাজে নেহেরু যেন তাঁকে সুযোগ দেন।[১৭৯] নেহেরু রাজী হলেন লন্ডন যাবর জন্যে। বিষয়টা জিন্নার নজর এড়াল না। তিনি লন্ডন যেতে অস্বীকার করলেন এবং এটলী ও নেহেরুর মধ্যে যে পত্র বিনিময় হয়েছে তার কপি দাবী করলেন, কপি জিন্নাহকে দেয়া হলো এবং সেই সাথে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী জিন্নাহকে লন্ডন আসার জন্যে ব্যক্তিগত অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন। জিন্নাহ রাজী হলেন এরপর।

লক্ষণীয় যে, কংগ্রেসের প্রতি দুর্বল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে নেহেরুর বিশেষ মর্যাদা আদায় এবং আগাম দরকষাকষির প্রতিশোধ হিসেবেই জিন্নাহ লন্ডন যেতে ঐভাবে অস্বীকার করেছিলেন। ঐ সংকট সন্ধিক্ষণে এর প্রয়োজন ছিল। এটলী এর ফলে আবার বুঝলেন, জিন্নাহ নেহেরুর সমান প্রতিপক্ষ। এ মর্যাদা আদায় করেই জিন্নাহ লন্ডন গেলেন।

লন্ডনে আলোচনা শুরু হলো ২রা ডিসেম্বর (১৯৪৬)। জিন্নাহ, নেহেরু লিয়াকত আলী খান ও বলদেব সিং আলোচনায় বসলেন, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীসভার সাথে। আলোচনা চলল চারদিন ধরে। আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের প্রদেশগুলোর সেকশন বা গ্রুপ এবং একক প্রদেশগুলোর ক্ষমতা ও অধিকার। এ ব্যাপারে ক্যাবিনেট মিশনের ব্যাখ্যার সাথে মুসলিম লীগ একমত ছিল, কিন্তু শুরু থেকেই কংগ্রেস এর মনগড়া একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছিল যা ছিল তার জন্যে সুবিধাজনক এবং ক্যাবিনেট মিশন প্লানের উদ্দেশ্যের খেলাফ। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং আইনসভা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যাখ্যাই গ্রহণ করল। ৬ ডিসেম্বর তারিখে বৃটিশ মন্ত্রীসভা আলোচনা শেষে তাদের ঘোষণা প্রকাশ করল। বলা হলোঃ "(১) ক্যাবিনেট মিশন বরাবর এই মত পোষণ করে এসেছে, যে, সমঝোতা না হলে সেকশনের প্রতিনিধিদলের কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। মুসলিম লীগ এই মত গ্রহণ করেছে, কিন্তু কংগ্রেস ভিন্নমত প্রকাশ করেছে। (২) বৃটিশ সরকার আইনগত পরামর্শ নিয়েছেন এবং সেটা হচ্ছে এই যে, ক্যাবিনেট মিশনের মতই ঠিক। এ অংশটি ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ই মে তারিখের বিবৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। গণপরিষদের সকল দলের এই মত স্বীকার

১৭৮। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 176.
১৭৯। 'The Great Divide' পৃষ্ঠা ১৭৬; 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৯৮।

www.icsbook.info

ও গ্রহণ করা উচিত। (৩) ক্যাবিনেটমিশনের বিবৃতির অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে মতানৈক্য উপস্থিত হলে তৎসম্পর্কে যে কোন পক্ষ ফেডারেল কোর্টের বিচার দাবী করতে পারে এবং গণপরিষদ ফেডারেল কোর্টের রায় স্বীকার করবে। (৪) বৃটিশ সরকার আশা করেন যে, কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের মত গ্রহণ করবে। (৫) যদি গণপরিষদ এমন শাসনতন্ত্র তৈরী করে যাতে ভারতের জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব ছিল না, সেক্ষেত্রে বৃটিশ সরকার দেশের অনিচ্ছুক অংশ সমূহের উপর তা বলপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারে না।"[১৮০]

বৃটিশ মন্ত্রীসভায় এ ঘোষণা প্রকাশের সময় জিন্নাহ, নেহেরু, লিয়াকত আলী ও বলদেব সিংকে এক সাথে ডাকা হলো। জিন্নাহ সম্পূর্ণটাই গ্রহণ করলেন, শুধু ব্যাখ্যা দাবী করলেন যে, বিতর্কমূলক বিষয়ে ফেডারেল কোর্টের রায় যদি ক্যাবিনেট মিশনের বিরোধী হয়, তাহলে কি হবে? নেহেরুসহ সকলের উপস্থিতিতেই বৃটিশ সেক্রেটারী অব স্টেট এর জবাবে বললেন, সে অবস্থায় সমগ্র পরিস্থিতি নতুনভাবে পূনর্বিবেচনা করা হবে।[১৮১] নেহেরু এবং বলদেব সিং দু'জনেই বৃটিশ সরকারের এই ঘোষণার সাথে দ্বিমত করলেন। এইভাবে লন্ডন আলোচনা ব্যর্থ হলো। আলোচনা শুধু ব্যর্থ করা নয়, নেহেরু বৃটিশ সরকারকে হুমকি দিলেন, 'ভারত অন্য কারুর কাছ থেকে কোন পরামর্শ-উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। কারণ, নতুন ভারত জন্মগ্রহণ করেছে।"[১৮২]

লন্ডন ঘোষণার কোন তোয়াক্কা না করে, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ না করেই নেহেরু ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের অধিবেশন বসালেন। মুসলিম লীগ গণপরিষদ বয়কট করল। লন্ডন বৈঠকের ১৫দিন পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং ৬ই জানুয়ারী (১৯৪৭) কংগ্রেস কাউন্সিল এক দীর্ঘ প্রস্তাবে একদিকে ক্যাবিনেট মিশন সংক্রান্ত লন্ডন ঘোষণা গ্রহণ করল, অন্য দিক দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করল। প্রস্তাবের একজায়গায় বলল, "উদ্ভুত অসুবিধা দূর করার জন্যে কংগ্রেস প্রদেশগুলোর গ্রুপ সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের লন্ডন ঘোষণার ব্যাখ্যা অনুসারে কাজ করতে সম্মত।" এরপরেই আবার বলল, "যা হোক, এটা অবশ্যই পরিস্কারভাবে বুঝতে হবে যে, "এই সম্মতি অবশ্যই কোন প্রদেশকে বাধ্য করার ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে না।"[১৮৩] এর অর্থ কংগ্রেস কার্যতই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান মেনে নিল না। মুসলিম লীগ কংগ্রেসের এই প্রস্তাবকে শঠতা বলে অভিহিত করলো।[১৮৪] এবং ২৯শে জানুয়ারী মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি তার করাচী

১৮০, ১৮১। 'Transfer of Power in India', V.P. Menon, page 329-330' (উদ্বৃতঃ 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৭৯৯।

১৮২। 'স্বাধীনতার অজনা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৪৩।

১৮৩। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 177-78

১৮৪। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য পৃষ্ঠা ২৪৩।

www.icsbook.info

সম্মেলনে বলল যে, 'কংগ্রেস যেহেতু ক্যাবিনেট মিশন ও লন্ডন ঘোষণা অনুযায়ী প্রদেশ সমূহের গ্রুপ ব্যবস্থা মেনে নেয়নি এবং যেহেতু কংগ্রেস বা শিখ কিংবা তফসিলী হিন্দু সম্প্রদায় কেউই ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করেনি, তাই লীগ কাউন্সিল ডেকে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নতুন করে গ্রহণের আর প্রয়োজন নেই। এই অবস্থায় বৃটিশ সরকারের উচিত প্ল্যানটিকে বাতিল ঘোষণা করা এবং কেন্দ্রীয় গণপরিষদ বাতিল করে দেয়া।[১৮৫]

মুসলিম লীগের এই প্রস্তাবে কংগ্রেস ক্রোধে ফেটে পড়ল। ৫ই ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস সদস্যরা অন্তর্বর্তী সরকার থেকে মুসলিম লীগের বহিস্কার দাবী করে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের কাছে স্মারকলিপি পেশ করলেন। কি করবেন, এ নিয়ে মহা বিপদে তখন ওয়াভেল। তিনি লন্ডনে বৃটিশ সেক্রেটারী অব স্টেটকে লিখলেন, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের গ্রুপ ব্যবস্থা কংগ্রেস যাতে প্রকাশ্যে ও সুস্পষ্টভাবে মেনে নেয়, তার ব্যবস্থা করুন।[১৮৬] কিন্তু লন্ডন কিছুই করতে পারল না। ১৩ই ফেব্রুয়ারী নেহেরু ওয়াভেলকে লিখলেন, "অন্তর্বর্তী সরকারের মুসলিম সদস্যদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যদি এ ব্যাপারে দেরী করা হয় বা অন্যায় কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাহলে কংগ্রেস সদস্যরা তাদের ভূমিকা পুনর্বিবেচনা করবে।[১৮৭] এর দু'দিন পরে প্যাটেল প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, মুসলিম লীগ সদস্যরা যদি অন্তর্বর্তী সরকারে থাকে, তাহলে কংগ্রেস সদস্যরা পদত্যাগ করবে।[১৮৮] কিন্তু লর্ড ওয়াভেলের পক্ষে সরকার থেকে মুসলিম লীগ সদস্যদের বরখাস্ত করা তখন সম্ভব ছিল না। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ তখন উপমহাদেশের মুসলমানদের অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠান। পাঞ্জাবে কংগেস মিত্র খিজির হায়াতের ইউনিয়নিষ্ট পার্টির কারণে এবং সীমান্ত গান্ধী গাফ্ফার খানের কংগ্রেসমুখিতার কারণে এই দুই প্রদেশে মুসলিম লীগের অসুবিধা ছিল, কিন্তু খিজির হায়াত মুসলিম লীগের সাথে আপোশ করতে বাধ্য হওয়ায় এবং সীমান্ত প্রদেশের মানুষ গাফফার খানকে পরিত্যাগ করায় এই অসুবিধা দূর হয়ে যায়। সীমান্ত প্রদেশে গিয়ে নেহেরু জনগণের বিক্ষোভ ও কালো পতাকার স্রোতে মিটিংও করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে নেহেরুর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আর কেন্দ্রীয় পরিষদে বা গণ পরিষদে মুসলিম লীগ না যাওয়ায় এই প্রদেশগুলি বলা যায় কার্যত বিচ্ছিন্নই হয়ে পড়েছিল। একদিকে এই অবস্থা, অন্যদিকে গোটা দেশ হয়ে উঠেছিল ভয়াবহ সংঘাতের মুখোমুখি। কোলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার সে সময়ের সম্পাদক আয়ান স্টিফেনের ভাষায় "১৯৪৬ সালের হেমন্তের শেষ দিকে

১৮৫। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 178
১৮৬। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 179
১৮৭। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 179
১৮৮। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 179

www.icsbook.info

গাঙ্গেয় অঞ্চলের পূর্বাংশের বহুস্থানে চাপা গৃহযুদ্ধ চলছিল। নোয়াখালী অঞ্চল, বিহার ও যুক্ত প্রদেশের কোন কোন স্থানে। এই সময় ভারতে বহুসংখ্যক বেসরকারী সৈন্যবাহিনী গড়ে উঠেছিল। এরা প্রত্যকে উত্তেজনা সৃষ্টি করতো। হিন্দুদের ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, কংগ্রেস সেনাদল, আকালী সেনাদল, শহিদী সেনাদল, শহিদী জাঠা এবং মুসলমানদের ছিল 'মুসলিম ন্যাশণাল গার্ড।'[১৮৯] ভারতের বৃটিশ কমান্ডার জেনারেল বলেছেন, বছরটির (১৯৪৭) জন্ম হলো যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে। ভারতের ব্যারোমিটার পাঞ্জাবে সব ঝড়ের কৃষ্ণতম ঝড় ঘনিয়ে আসছিল। ---- জনসাধারণের জন্যে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে হিন্দু মহাসভা ও এর সংগ্রামী সংস্থা আরএসএস সংঘের ক্রমবর্ধমান তৎপরতা। যুক্তপ্রদেশে এই দলটি অত্যন্ত শক্তি সঞ্চয় করেছিল। সেখানে তাদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক।"[১৯০] ১৯৪৭ সালের শুরুর দিকের পরিস্থিতি সম্পর্কে আরেকজন রিচার্ড সাইমন্ড লিখছেন, "সারাদেশময় হিংস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে। চরম সংগ্রামের জন্যে বেসরকারী সৈন্য বাহিনীর প্রস্তুতি চলছে। সরকারী কর্মচারীদের তীক্ষ্ণ সাম্প্রদায়িকতার জন্যে চরম বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজ কর্মচারীরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছে এবং সত্বর দেশ ত্যাগ করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। বৃটিশ সৈন্যদের আগে থেকেই দেশে ফিরিয়ে নেয়া শুরু হয়েছে এবং ভারতীয় সৈন্যদের মনোভাব অনিশ্চিত।'[১৯১] এই সার্বিক পরিস্থিতিতে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেসের দাবীতে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে লীগ সদস্যদের বহিস্কার করে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটাতে পারেন না। তিনি যেটা পারেন সেটা হলো বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তিনি তাই করে চললেন।

২০ শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) তারিখে মুখ খুললো বৃটিশ সরকার, প্যাটেলের আলটিমেটাম দেয়ার ঠিক পাঁচদিন পর। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী বললেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। যদি এ সময়ের মধ্যে সকলের প্রতিনিধিত্ব সম্পন্ন গণপরিষদ একমত হয়ে শাসনতন্ত্র তৈরী করতে সম্মত না হয়, তাহলে উক্ত তারিখে একক কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অথবা কোন কোন অঞ্চলে বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় বৃটিশ সরকার বিবেচনা করবে। এই ঘোষণার সাথেই প্রধানমন্ত্রী এটলী ওয়াভেলের বদলে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে ভারতের ভাইসরয় নিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন।

এটলীর ঘোষণায় কংগ্রেস খুশী হলো। খুশী হওয়ার কারণ দুইটি, (১) বৃটিশের ভারত ছাড়ার নির্দিষ্ট তারিখ পাওয়া গেল, (২) নেহেরুর বন্ধু লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভাইসরয় হয়ে আসছেন। মাউন্ট ব্যাটেন ও নেহেরুর আলাপ-পরিচয় হয়

১৮৯। 'Pakistan', Ian Stephens, page 141.
১৯০। 'While Memory Serves', Sir Francis Tucker, page 107, 203.
১৯১। 'Making of Pakistan', R. Symonds, page 70.

www.icsbook.info

সিংগাপুরে। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে এলেন ২২শেমার্চ এবং ভাইসরয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ২৪ শে মার্চ, ১৯৪৭।

এটলী কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা এবং মাউন্ট ব্যাটেনের আগমন ভারতের রাজনীতিতে, বিশেষ করে কংগ্রেসের রাজনীতিতে যেন হঠাৎ করেই পরিবর্তন আনল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৮ই মার্চের (১৯৪৭) সিদ্ধান্ত এরই একটা দৃষ্টান্ত। এই তারিখে কংগ্রেস তার প্রস্তাবে বলল, অন্তর্বর্তী সরকারকে সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ডোমিনিয়ন সরকারের পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। এই সাথে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ও তৎসংক্রান্ত বিরোধের বিষয় সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) ব্যাখ্যা গ্রহণ করল এবং মুসলিম লগি সদস্যদের গণপরিষদে যোগদানের আহ্বান জানাল। আরও বলল, পাঞ্জাবকে দুই অংশে ভাগ করে দিতে হবে।[১৯২]

কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে উল্লেখযোগ্য দিক তিনটি। প্রথম, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই ডোমিনিয়ন সরকারের পূর্ণ ক্ষমতা দাবী; দ্বিতীয় ক্যাবিনেট মিশন সংক্রান্ত ৬ই ডিসেম্বরের লন্ডন ঘোষণা কংগ্রেস কর্তৃক মেনে নেয়া এবং (৩) সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাঞ্জাব বিভাগ দাবী।

প্রথমটি কংগ্রেসের পুরনো দাবী। দ্বিতীয় বিষয়টি এর পরিপূরক। ৬ই ডিসেম্বরের লন্ডন ঘোষণা মেনে নিয়ে মুসলিম লীগকে খুশী করে তাকে সাথে নিয়ে, অথবা রাজী না হলে মুসলিম লীগকে দোষ দিয়ে ও তাকে বাদ দিয়ে ডোমিনিয়ন সরকার হাত করা লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সাহায্যে, এই ছিল কংগ্রেসের কৌশল। বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ঠিক করার ফলেই কংগ্রেস এই কৌশল অবলম্বন করেছিল। এই কৌশল অনুসারে মুসলিম লীগ রাজী হলেও ক্ষতি নেই, একবার ক্ষমতা হাতে পেলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মুসলিম লীগকে দেখে নেয়া যাবে। আর যদি মুসলিম লীগ রাজি না হয়, তাহলে তো ষোল আনা লাভ। সেক্ষেত্রে সব দোষ মুসলিম লীগের উপর চাপানো যাবে এবং বৃটিশ সরকারের সাহায্য পাওয়া যাবে। এই কৌশলের অধীনে গান্ধী এমনকি জিন্নাহকে প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে। মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে প্রথম বৈঠকেই (৩১ শে মার্চ) গান্ধী বলেছিলেন, "কংগ্রেস লীগের মধ্যে ঝগড়ার জন্যে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করবার সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা হলো যে, ভাইসরয় জিন্নাহকে তার নিজস্ব লোকদের নিয়ে এক সরকার গঠন করবার সুযোগ দেবেন। ইচ্ছা করলে জিন্নাহ এই সরকার সব মুসলমান কিংবা মুসলমান হিন্দু মিলিয়ে গঠন করতে পারেন। কংগ্রেস এই সরকারকে সমর্থন করবে অবশ্যি যদি জিন্নাহ প্রতিশ্রুতি দেন যে দেশবাসীর স্বার্থ তিনি রক্ষা করবেন।"[১৯৩] জিন্নাহ

১৯২। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা- ৮১৪; 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৫৮
১৯৩। 'জিন্নাহ' ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা ৩১৬, ট্রান্সফার অব পাওয়ার', দশম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৪।

www.icsbook.info

আসার আগেই অবশ্য গান্ধীর এ প্রস্তাব মাঝপথে বানচাল হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো গান্ধীর রাতারাতি এ পরিবর্তন কেন? উত্তর খুব সহজ। জিন্নাহ প্রস্তাব গ্রহণ করলে তার ঘাড়ে চড়ে সর্বভারতীয় একটা ব্যবস্থার কাছে বৃটিশকে ক্ষমতা হস্তান্তর করানো। আর যদি জিন্নাহ গ্রহণ না করে তাহলে কংগ্রেস এর সুযোগ গ্রহণ করবে। এ প্রস্তাবও গান্ধীর ঐ প্রস্তাবে ছিল। কংগ্রেস এসব করেছিল নেহেরুর বন্ধু নতুন ভাইসরয়কে চমৎকৃত করে,তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করার জন্যে।

কংগ্রেসের ৮ই মার্চের প্রস্তাবটির তৃতীয় বিষয়টিই এখানে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। কংগ্রেসের এটা একটা নতুন বিকল্প। সম্প্রদায় ভিত্তিক পাঞ্জাবের বিভক্তি দাবী করে "পরোক্ষ স্বীকার করে নেয়া হলো যে, যদি একটি প্রদেশকে ভাগ করে নেয়া সম্ভব হয় তাহলে দেশভাগ নীতি গ্রহণ করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না।"[১৯৪] এই আপত্তি যে নেই কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে তারও প্রমাণ আছে। "প্যাটেল এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি এই প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, 'মুসলমানরা যদি এই দেশ থেকে চলে যেতে চায় তাহলে কংগ্রেস এবং প্যাটেল কোন আপত্তি করবেন না। কিন্তু ভারতের সে সব প্রদেশ পাকিস্তানে যোগ দিতে বাধ্য করা যাবে না।"[১৯৫] এখানেই শেষ নয়, পাকিস্তান কেমন হবে তার রূপরেখাও প্যাটেল সবার কাছে পরিস্কার করেছিলেন। কংগ্রেসের এ মিটিং এর পর প্যাটেল এই নীতিকে সুস্পষ্ট করে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদের কাছে লিখেছিলেন, "যদি লীগ পাকিস্তান চায় তাহলে সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হলো দেশ ভাগ করা -পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করা। ---- আমি মনে করি না, বৃটিশ সরকার এই নীতি অনুযায়ী দেশ ভাগ করতে রাজী হবে। হয়তো তারা পরে বুঝতে পারবে, দেশের শাসন ক্ষমতা দেশের সবচাইতে শক্তিশালী দলের কাছে তুলে দেয়াই বিবেচকের কাজ। যদি তারা বুঝতে না পারে ক্ষতি নেই। কারণ সমস্ত ভারতকে এক শক্তিশালী (পূর্ববাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তানকে বাদ দিয়ে) কেন্দ্রের অধীনে গঠন করা হবে।"[১৯৬] শুধু প্যাটেল নয়, "নেহেরু নিজেও এই যুক্তির সাথে একমত ছিলেন। .... পরে এই প্রস্তাব (প্যাটেলের প্রস্তাব) গ্রহণ করবার দিন ঠিক করা হয়।"[১৯৭] যা ৮ই মার্চ কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির মিটিং এ পাশ হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, এটলীর ঘোষণার পর এবং মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে আসার পর কংগ্রেসের এই অভাবনীয় পরিবর্তন কেন? প্রধান কারণ হলো, পাঞ্জাবে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া। ৫ই মার্চ (১৯৪৭) থেকে প্রায় দু'সপ্তাহ দাঙ্গা চলে

১৯৪। 'নেহেরু', মাইকেল ব্রেসার, পৃষ্ঠা ৩৪৫; 'দি লাস্ট ডেজ অব দি বৃটিশ রাজ', লিউনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা ৯৮; 'জিন্নাহ', ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা ৩১১।

১৯৫। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য (দে'জ পাবলিশিং হাউজ, কলিকাতা), পৃষ্ঠা ২৫৯।

১৯৬। 'দি লাস্ট ডেজ অব বৃটিশ রাজ', লিওয়ার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯।

১৯৭। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৫৯।

www.icsbook.info

পাঞ্জাবে। 'হিন্দুস্তান টাইমস'-এর ভাষায়, "মুসলমানদের অপেক্ষা শিখেরা অনেক বেশী সংগঠিত ও অস্ত্রসজ্জিত। কিছু কাল যাবত তারা এজন্যে তৈরী হচ্ছিল"[১৯৮] ৪ঠা মার্চ শিখ নেতা তারা সিং হুংকার দেন, "আমাদের মাতৃভূমি আজ রক্ত চাচ্ছে, আমরা রক্তদিয়ে আমাদের মায়ের তৃষ্ণা মেটাবো। আমরা মুগলিস্তান ধ্বস করেছিলাম, এবার পাকিস্তান পদদলিত করবো। .... আমি আকালি বাহিনী পুনঃসংগঠিত করতে শুরু করেছি। আমি শিঙা বাজিয়েছি, মুসলিম লীগকে খতম কর।"[১৯৯] এই তারিখেই আর একজন শিখ নেতা চৌধুরী লেহারী সিং বলেছিলেন, "আমি জাঠ। জাঠরা বেশী কথা বলে না। মুসলিম শাসন খতম করার জন্যেই জাঠরা শিখধর্ম গ্রহণ করেছিল। সেই জাঠরা এবারও প্রাণ দিয়ে লড়াই করবে।"[২০০] হিন্দু ও শিখদের এই প্রস্তুতির উপর ভরসা করে কংগ্রেস সম্ভবত মনে করেছিলো, শক্তির দ্বারা যদি পাঞ্জাবে পাকিস্তানের কবর দেয়া যায়, তাহেল জিন্নাহকে কাবু করা যাবে। কিন্তু কংগ্রেসের এ সাধ পূরণ হয়নি। পেন্ডেরেল মুন এর ভাষায় "বাহাদুরি দেখানোর ফল সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছিল। সমগ্র প্রদেশে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাংগা আরম্ভ হয় এবং তাতে হিন্দু ও শিখদের অনেক বেশী ক্ষতি হয়।"[২০১] যার ফলে মুসলিম লীগকে উৎখাত করতে গিয়ে এবং পাকিস্তানের কবর রচনা করতে গিয়ে কংগ্রেসেরই পাঞ্জাব থেকে উৎখাত হবার যোগাড় হলো। অন্যান্য মুসলিম প্রদেশেও কংগ্রেসের জন্যে এই পরিণতি অপেক্ষা করছে, একথা কংগ্রেস বুঝল। এই উপলব্ধি থেকেই কংগ্রেসের পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের প্রস্তাব। চৌধুরী খালিকুজ্জামান লিখলেন, "লাহোর ও অমৃতসরে শিখদের পরাজয়ে কংগ্রেসী মহল অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন এবং ৮ই মার্চ (১৯৪৭) তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয়।"[২০২]

উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থতাই নেহেরু ও প্যাটেলের মত নেতাদেরকে বাস্তবতা মেনে নেয়ার দিকে ঠেলে দেয়। এর আরেকটা কারণ, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ ঘোষণা কংগ্রেস নেতাদের পাগল করে তুলেছিল ক্ষমতা নামক সোনার হরিণ হাত করার জন্যে। এই ক্ষমতা যদি অখন্ড ভারতে না হয়, তাহলে খন্ডিত ভারতে হলেও অবিলম্বে লাভ করতে হবে। ভি,পি, মেননের এক মন্তব্যেও এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। তিনি প্যাটেলকে বলেছিলেন, 'ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী অবিভক্ত ভারত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তৎপরিবর্তে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্র গঠন করে ভারত বিভাগ করাই যুক্তিযুক্ত। ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে এই দুই রাষ্ট্রের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হতে পারে। প্যাটেল তাকে নিশ্চয়তা দেন যে, যদি ডোমিনিয়ন স্টেটাসের

১৯৮। 'Hindustan Times', March, 5, 1947.
১৯৯, ২০০। Muslim Leage Yesterday and Today; A.B, Rajput, (বিস্তারিত বিবরণ ১৬৫-১৭৬)।
২০১। 'Divide and Quit', Penderel Moon.
২০২। 'Pathway to Pakistan', Khaliquzzaman.

www.icsbook.info

ভিত্তিতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, তাহলে তিনি (প্যাটেল) এই প্রস্তাব গ্রহণের জন্যে কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন।'[২০৩] এই প্রভাবেরই ফল কংগ্রেসের প্রস্তাব। কংগ্রেসের এই মানসিকতার সাথে মাউন্ড ব্যাটেনের চিন্তা মিলে গিয়েছিল। মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে আসার পর সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং "বিভিন্ন নেতাদের সঙ্গে ---- আলাপ-আলোচনা করার পর মাউন্ট ব্যাটেন বুঝতে পারলেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান কাঠামোর ভেতর সব দলের সম্মতি নিয়ে সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। অতএব সমস্যা সমাধান করবার জন্যে অন্য পথ অবলম্বন করতে হবে। আর অন্য পথ হল দেশ ভাগ ও পাকিস্তান গঠন করা।"[২০৪] উভয় পক্ষের মতের এই মিলন আরও সহজ হয়েছিল নেহেরু ও কংগ্রেসের সাথে মাউন্ট ব্যাটেনের গভীর সম্পর্কের কারণে। "নেহেরু এবং কংগ্রেস নেতারা প্রথম থেকেই মাউন্ট ব্যাটেনকে তাদের বন্ধু হিসাবে চিহ্নিত করলেন। এবং নেহেরু হলেন মাউন্ট ব্যাটেনের দরবারে কংগ্রেসের মুখমাত্র।"[২০৫]

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে এই সম্পর্ক ও নির্ভরতার কারণেই মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নাহকে এড়িয়ে চললেন। জিন্নার সাথে প্রথম দিনের আলোচনাতেই তিনি বুঝেছিলেন তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যাবে না। প্রথম দিন দুই দফা বৈঠকের কথা ছিল। কিন্তু একদফা বৈঠক করেই মাউন্ট ব্যাটেন তাঁর এডিসি'কে বলেছিলেন, " উঃ লোকটি একেবারে হিমশীতল, আজই আর একদফা আলোচনা আমি চালাতে পারবোনা।"[২০৬] আলোচনার তারিখ পিছিয়ে দেয়া হয়।

মাউন্ট ব্যাটেন ভারতে আসার দু'সপ্তাহের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর এবং কার্যত দেশ বিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগোলেন। তার পরিকল্পনার বিষয় কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলাপ করেছেন, কিন্তু জিন্নার কাছে গোপন রেখেছেন। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়াতেই মাউন্ট ব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের একটা পরিকল্পনা তৈরী করলেন। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রদেশগুলোর, অথবা যে সকল প্রদেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গ্রুপ গঠন করবে, তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এই পরিকল্পনায় বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের কথাও ছিল। ১৫ ও ১৬ই এপ্রিল ভারতে প্রাদেশিক গভর্ণরদের সম্মেলনে মাউন্ট ব্যাটেনের এ পরিকল্পনা আলোচিত হলো এবং তাদের সম্মতি লাভ করল। ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারত বিভাগের এ পরিকল্পনা নিয়ে মাউন্ট ব্যাটেনের পক্ষ থেকে লর্ড ইসমে ২রা মে তারিখে লন্ডন গেলেন বৃটিশ সরকারের অনুমোদন লাভের জন্যে। 'উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ইচ্ছা করলে এককভাবে স্বাধীন থাকতে পারবে'- এই সংশোধনী যোগ করে বৃটিশ ক্যাবিনেট এ পরিকল্পনা মঞ্জুর করল। ১০ই মে গৃহীত এ

২০৩। 'Transfer of Power in India', V.P. Menon, Page 358-359
২০৪। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৫৮।
২০৫। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', পৃষ্ঠা ২৫২।
২০৬। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দীন, পৃষ্ঠা ৮২৭।

www.icsbook.info

পরিকল্পনা নিয়ে ফিরে এলেন ভারতে। এ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্যে মাউন্ট ব্যাটেন ১৭ই মে ভারতীয় নেতাদের বৈঠক করলেন সিমলায়। মে'র প্রথম সপ্তাহেই মাউন্ট ব্যাটেন পরিবারসহ চলে গেলেন সিমলায় এবং অতিথি হিসেবে নিয়ে গেলেন নেহেরু ও কৃষ্ণ মেননকে। লক্ষ্য ছিল ভারতীয় নেতাদের কাছে পরিকল্পনাটি পেশ করার আগেই মাউন্ট ব্যাটেন নেহেরুকে তা দেখাবেন। তাই হলো। কিন্তু নেহেরু ঐ পরিকল্পনায় যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করলেন। নেহেরু প্রত্যাখ্যান করার পর মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনাটি বাতিল করে দিলেন। লক্ষণীয় যে, লীগ প্রেসিডেন্ট জিন্নাহ্ জানার আগেই পরিকল্পনাটি বাতিল হয়ে গেল। জিন্নার সাথে এ নিয়ে আলোচনারও প্রয়োজন বোধ করলেন না মাউন্ট ব্যাটেন। মতলব হলো, সব ঠিক ঠাক করে তা জিন্নার উপর চাপিয়ে দেবেন।

মাউন্ট ব্যাটেনের প্ল্যান এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবার পর কৃষ্ণ মেননের তৈরী ভারত বিভাগের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। উল্লেখ্য, এই প্ল্যানটি কৃষ্ণ মেনন ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের দিকে তৈরী করেছিলেন। এ প্ল্যান নিয়ে কৃষ্ণ মেনন বল্লভ ভাই প্যাটেলের সাথে দীর্ঘ আলোচনাও করেছিলেন। এ প্ল্যানের সাথে প্যাটেল একমত হয়েছিলেন।[২০৭] আটই মার্চ (১৯৪৭) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের প্রস্তাব করে কার্যত যে দেশ বিভাগের প্রস্তাব দিয়েছিল, সেটা প্যাটেলের এই স্বীকৃতিরই একটা ফল। পরে কৃষ্ণ মেনন তার পরিকল্পনার সারাংশ মাউন্ট ব্যাটেনকেও জানিয়েছিলেন। মাউন্ট ব্যাটেনের পরিকল্পনা.যখন ব্যর্থ হলো তখন মাউন্ট ব্যাটেন কৃষ্ণ মেননে স্মরণ করলেন এবং তার সাথে তার প্লান নিয়ে আলোচনা করলেন। এরপর কৃষ্ণ মেননকে এ নিয়ে আলোচনা করলেন নেহেরুর সাথে। কৃষ্ণ মেননের আলোচনার পর মাউন্ট ব্যাটেন কৃষ্ণ মেননের প্রণীত প্ল্যান নিয়ে আলোচনায় বসলেন নেহেরুর সাথে। মাউন্ট ব্যাটেন নেহেরুকে বললেন যে, কৃষ্ণ মেননের প্ল্যান অনুযায়ী উল্লেখিত "ডোমিনিয়ন স্টেটাসের প্রস্তাবনুযায়ী-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি (প্রদেশ নয়) ভারত থেকে আলাদা করা হবে। তারপর ক্ষমতা দুইটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, একটি 'হিন্দুস্তান' এবং অপরটি 'পাকিস্তান'-এর হাতে তুলে দেয়া হবে। দুইটি দেশের পৃথক গভর্ণর জেনারেল থাকবে। দুইটি দেশের সংবিধান সংসদ দ্বারা রচনা না করা পর্যন্ত দুই ডোমিনিয়ন সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শাসনের কাঠামোয় তৈরী করা হবে। এই প্রস্তানুযায়ী কংগ্রেস ক্ষমতা হস্তান্ত র প্রস্তাব গ্রহণ করতে যদি রাজী থাকে, তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার জন্যে ১ লা জুন, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত দেরী করতে হবে না। এই প্রস্তাবে সবুজ সংকেত দেবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা সম্ভব হবে।"[২০৮]

২০৭। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৭৮।
২০৮। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৭৯, ২৮০,

www.icsbook.info

নেহেরু ভারত বিভাগের ব্যাপারে কোন আপত্তি তুলবেন না। প্রশ্ন তুললেন 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' শব্দ সম্পর্কে। বললেন, 'যদিও আমি স্বীকার করি ডোমিনিয়ন স্টেটাস পূর্ণ স্বাধীনতার সমান, কিন্তু তবু জনগণ এই সূক্ষ্ম পার্থক্য, বিভেদ বুঝতে পারবে না।"[২০৯] উত্তরে মাউন্ট ব্যাটেন বললেন, "প্রয়োজন হলে 'রাজার' পদবী থেকে 'সম্রাট' শব্দটি বাদ দেয়া হবে।"[২১০] উত্তরে নেহেরু বললেন, "অবশ্যি এই ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রস্তাব অনুযায়ী যে কোন সময়ে ভারত কমনওয়েলথের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে।"[২১১] মাউন্ট ব্যাটেন নেহেরুর এই কথার সাথে একমত হলেন। এই আলোচনার ভিত্তিতেই ১১ই মে (১৯৪৭) নেহেরু এবং প্যাটেল আলোচনা করে স্থির করলেন যে, ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে এই দেশে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে।[২১২]

এই স্বীকৃতি বিষয়ে মাউন্ট ব্যাটেন নেহেরুর সাথে আলোচনা করার পর আনন্দে আটখানা হয়ে সংগে সংগেই দিল্লীতে টেলিগ্রাম করে তার স্টাফ প্রধান লর্ড ইসমেকে জানালেন, 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের কাছে নির্দিষ্ট তারিখের আগেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা সম্ভব হবে।'[২১৩]

নেহেরু অনুমোদিত ভারত বিভাগের এ পরিকল্পনা নিয়ে মাউন্ট ব্যাটেন ১৮ই মে, ১৯৪৭ লন্ডন গেলেন। বৃটিশ ক্যাবিনেটে এ নিয়ে আলোচনা হলো এবং পরিকল্পনাটি গৃহীত হলো।

উল্লেখ্য, মাউন্ট ব্যাটেন লন্ডন যাওয়ার পূর্বক্ষণে পরিকল্পনাটির সার সংক্ষেপ জিন্নাহকে দেখিয়েছিলেন। নেহেরু লিখিত পত্র দ্বারা এ পরিকল্পনার প্রতি স্বীকৃতি দিয়ে দিলেন। মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নার কাছেও এটা চাইলেন। জিন্নাহ পরিকল্পনার প্রতি মৌখিকভাবে নীতিগত সমর্থন দান করলেন, কিন্তু পরিকল্পনাটি পুরোপুরি না দেখে লিখিত দিতে অস্বীকার করলেন। মাউন্ট ব্যাটেন ভয় দেখালেন যে, জিন্নাহ যদি এই পরিকল্পনা গ্রহণ না করেন, তাহলে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।' সংগে সংগেই জিন্নাহ তার অকম্পিত জবাবে বললেন, 'যা হবার তাই হবে।'মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নার এই জবাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জিন্নার যুক্তি ছিল যে, তাকে সমগ্র পরিল্পনা দেখানো হয়নি, দেখানো হয়েছিল ৮ দফা Leads of Agrements যা দেখে তিনি পরিকল্পনাটি লিখিতভাবে গ্রহণ করার দায়িত্ব নিতে পারেন না। তাছাড়া মাউন্ট ব্যাটেন নেহেরু ও কংগ্রেস নেতাদের সাথে পরামর্শে মাধ্যমে সব কাজ করায় এবং মুসলিম লীগকে দূরে রাখায় জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ মাউন্ট ব্যাটনের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন।

২০৯, ২১০, ২১১। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৮০।
২১২। 'দি লাস্ট ডেজ অব দি বৃটিশ রাজ', লিওনার্ড মোসলে, পৃষ্ঠা ১২০, 'মাউন্ট ব্যাটে' ফিলিপ জিগলার, পৃষ্ঠা ৩৮৩
২১৩। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৮১।

www.icsbook.info

জিন্নাহ যখন মাউন্ট ব্যাটেনের ভারত বিভাগ পরিকল্পনাকে লিখিত মেনে নিতে রাজী হলেন না, সেই সময় কংগ্রেস ভারত ভাগ করে ক্ষমতা গ্রহণের জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। নেহেরু শুধু লিখিত প্ল্যানটি মেনেই নিলেন না, ১৮ই মে মাউন্ট ব্যাটেন লন্ডন যাবার পর ২১ শে মে তারিখেই কৃষ্ণ মেননকে লন্ডন পাঠালেন এই বার্তা দিয়ে যে, মাউন্ট ব্যাটেনের ভারত বিভাগ কংগ্রেস মেনে নিয়েছে, কিন্তু শর্ত হলো ১৯৪৭ সালেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

প্রশ্ন হলো কংগ্রেসের এই তাড়াহুড়া কেন? অনেকের মতে তারা তাড়াহুড়া করেছে দুইটি কারণে,[২১৪] (১)দেরী করলে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ করা কঠিন হবে (২) বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের মাধ্যমে যদি মুসলিম লীগকে পাকিস্তান দেয়া যায়, তাহলে সে পাকিস্তান টিকবেনা এবং আবার তা আসবে কংগ্রেসের কবলে। "নেহেরু ও কংগ্রেসের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে পাকিস্তান হবে ক্ষণস্থায়ী। কারণ নেহেরু ও কংগ্রেস নেতারা ভেবেছিলেন রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতার কারণ বশতঃ পাকিস্তান জীবিত থাকতে পারবে না।"[২১৫] এমনকি কংগ্রেসের প্রস্তাবেও তাদের এ মানসিকতার প্রমাণ মিলে। কংগ্রেসের একটা প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, When Passion have cooled, a new and stronger unity based on goodwill and co-opertion will emerge."[২১৬] অর্থাৎ আবেগ যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে একটা নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী সম্মিলনী গড়ে উঠবে।' মাউন্ট ব্যাটেন লন্ডন গিয়েও তার ভারত বিভাগ পরিকল্পনার প্রতি জিন্নাহর আপত্তির কথা তুলেছিলেন, বিশেষ করে চার্চিলের সাথে আলোচনা কালে। বলেছিলেন, "নেহেরু ডোমিনিয়ন স্টেটাস গ্রহণ করতে রাজী আছে, কিন্তু জিন্নার আপত্তি আছে।" এর পরিপ্রেক্ষিতেই চার্চিল জিন্নার কাছে বার্তা পাঠিয়েছিলেন, যাতে বলেছিলেন, 'এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটি পাকিস্তানের জীবন মৃত্যুর প্রশ্ন, অতএব এ প্রস্তাব আপনি গ্রহণ করুন।'[২১৭]

ভারত বিভাগ পরিকল্পনায় বৃটিশ সরকারের অনুমোদন নিয়ে মাউন্ট ব্যাটেন ৩১শে মে ১৯৪৭ ভারত ফিরে এলে। ২রা জুন তারিখে মাউন্ট ব্যাটেন মুসলিম লীগের জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, সরদার আব্দুর রব নিশতার এবং কংগ্রেসের নেহেরু, প্যাটেল, কৃপালিনী ও বলদেব সিং -এই সাত নেতাকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন। তাদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে বিভাগের পরিকল্পনা পেশ করলেন। তাদের সবাইকে পরিকল্পনার কপি দিয়ে রাত ১২ টার মধ্যে ওয়ার্কিং

২১৪। কৃষ্ণ মেনন মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে লেখা ২১ শে মের এর চিঠিতে একথা বলেন। দ্রষ্টব্যঃ 'স্বাধীনতার অজনা কথা', পৃষ্ঠা ২৮৩।

২১৫। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা স (ভূমিকা)

২১৬। কংগ্রেস বুলেটিন, ৪ নম্বর ১০ই জুলাই, ১৯৪৭, পৃষ্ঠা ১১ (দ্রষ্টব্যঃ 'স্বাধীনতার অজানা কথা', পৃষ্ঠা x.

২১৭। 'মাউন্ট ব্যাটেন', জিগলার, পৃষ্ঠা ৩৮৫।

www.icsbook.info

কমিটির সম্মতিসহ চূড়ান্ত জবাব চাইলেন। তিনি জানালেন, পরিদিন (৩রা জুন) সন্ধ্যায় তিনি এক বেতার ভাষণের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের সংবাদ সারা বিশ্বকে জানাতে চান। মিঃ জিন্নাহ ও নেহেরু তার পরেই বেতার বক্তৃতা দেবেন। নেতৃবৃন্দের সম্মতিতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত আইন পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনেই পেশ করতে হবে এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর হবে।' তখন বেলা দশটা। নেহেরু মাউন্ট ব্যাটেনকে বললেন, সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত না হলেও কংগ্রেস পরিকল্পনাটি গ্রহণ করছে। বিকেলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মত ভাইসরয়কে তিনি লিখিতবাবে জানিয়ে যাবেন।[২১৮] আর জিন্নাহ বললেন যে, তিনি লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সাথে আলোচনার পর রাত ১১ টার সময় এসে জবাব দেবেন।

মিটিং শেষে মাউন্ট ব্যাটেন মিঃ জিন্নাহকে ডেকে নিয়ে একান্তে বললেন, আমরা কোন নেতিবাচক জবাব শুনতে চাই না। মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নাহকে চার্চিলের বার্তার কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন।[২১৯]

সেদিন (২রা জুন) বিকেলেই নেহেরু ও বলদেব সিং কংগ্রেস ও শিখদের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে ভারত বিভাগ পরিকল্পনার প্রতি সম্মতি জানিয়ে গেলেন। রাত এগারটায় জিন্নাহ এসে মাউন্ট ব্যাটেনকে লীগ ওয়ার্কিং কমিটি প্রদেশ (বাংলা ও পাঞ্জাব) বিভাগের বিরোধী একথা জানালেন এবং বললেন, এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব লীগ কাউন্সিলের। লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের জন্যে সাত দিন সময় প্রয়োজন। মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নাহকে বললেন, ইতিমধ্যেই কংগ্রেস ও শিখদের কাছ থেকে সম্মতি পেয়েছি। লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণ করে কিনা? আপনি নিজে গ্রহণ করবেন কিনা? জিন্নাহ জবাবে বললেন যে, লীগ যাতে এই প্রস্তাবে সম্মত হয় সে চেষ্টা তিনি করবেন।' মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নার কাছে জানতে চাইলেন, আমি কি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে একথা বলতে পারি যে, এ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি আছে? জিন্নাহ হ্যাঁ সূচক জবাব দিলেন।[২২০] লক্ষনীয় যে, মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নার কাছ থেকে এ হ্যাঁ সূচক জবাব আদায় করে নিলেন।

একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো। সেটা হলো ভারতীয় ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ এ সময়ে কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধীর অনুপস্থিতি। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে প্রথম দেখার পর থেকেই গান্ধী দিল্লীর বাইরে বিহার ও বিভিন্নস্থানে অবস্থান করছিলেন। এই ভারত বিভাগ ব্যাপারে তাঁর মত কি ছিল? মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে তাঁর আলোচনার সারকথা কিছুই ছিল না। মে (১৯৪৭) সালের প্রথম সপ্তাহে নেহেরু ও কৃষ্ণ মেনন যখন সিমলায় মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে

২১৮। 'কায়েদে আযম', আকবর উদ্দিন, পৃষ্ঠা ৮৩৩।
২১৯। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য' পৃষ্ঠা ২৮৮।
২২০। 'জিন্নাহ'; ওলপোর্ট, পৃষ্ঠা ৩২৭, 'দি লাস্ট ডেজ অব দি বৃটিশ রাজ', লিউনার্ড মোসলে,পৃষ্ঠা ১৩১।

www.icsbook.info

ভারত বিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত, সে সময় ৬ই মে তারিখে জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে একটা আলোচনা হয়। সে আলোচনায় গান্ধী ভারত বিভাগের বিরোধিতা করনে, কিন্তু কিছু করার জন্যে গান্ধী কোন সক্রিয়তা দেখাননি। অথচ তাঁর অজানা ছিল না যে, নেহেরু, প্যাটেল ও কৃষ্ণ মেননরা কি করছেন। জিন্নার সাথে আলোচনা শেষে গান্ধী ফিরে গেলেন আবার বিহারে। তারপর মাউন্ট ব্যাটেন ভারত বিভাগের সবকিছু পাকাপোক্ত করে লন্ডন থেকে ফিরে এলেন ৩১ শে মে, ১৯৪৭ তারিখে, সেই ৩১ মে গান্ধী দিল্লীতে আবির্ভূত হলেন এবং এক প্রার্থনা সভা আহ্বান করে বললেন, 'এমনকি গোটা ভারত যদি পুড়ে যায়, মুসলমানরা যদি তরবারির সাহায্য নেয়, তবু পাকিস্তান দেব না।' কিন্তু এই অর্থহীন জ্বলে উঠার পরেই তিনি আবার নিভতে শুরু করলেন। ৪ঠা জুন বললেন, 'ভারত বিভাগ বৃটিশের কোন ক্রুটি নয়, এটা হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার ব্যর্থতা।' আর ৭ই জুনের মধ্যে গান্ধী এই পরিমাণ বদলে গেলেন যে, ৭ই জুন তারিখে গান্ধী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত বিভাগ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বললেন।[২২১] অভাবনীয় দ্রুত গান্ধীর এই পরিবর্তন কেন? আসলে গান্ধীর মূল চাওয়া কি ছিল? পরিস্কার জবাব এটাই যে, নেহেরুর সাথে গান্ধীর মতের কোন পার্থক্য ছিল না। তাদের মধ্যে পার্থক্য এটুকুই ছিল যে, নেহেরু দেশ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু গান্ধী পরিকল্পনা অনুসারেই তা গ্রহণ করতে চাননি। চাননি বলেই তিনি এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দিল্লী থেকে বাইরে ছিলেন এবং নেহেরুকে সুযোগ দিয়েছিলেন। "তিনি জানতেন, যদি তিনি দিল্লীতে সরজমিনে উপস্থিত থাকেন তাহলে কংগ্রেসের দেশ ভাগের প্রস্তাবের বিরোধীতা তাঁকে করতে হবে। হয়ত তিনি এই বিরোধিতা করতে চাননি।"[২২২]

প্রশ্ন হলো, যে গান্ধী, যে নেহেরু এবং যে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনে উল্লেখিত মুসলমানদের দাবী প্রদেশগুলোর গ্রুপ ব্যবস্থা মেনে নিল না কেন্দ্র দুর্বল হবে, ভারত দুর্বল হবে, ভারতে অখন্ডতা নষ্ট হবে -এই অজুহাতে, সেই গান্ধী, সেই নেহেরু এবং সেই কংগ্রেস মাউন্ট ব্যাটেন প্ল্যানে ভারত বিভাগে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কেন? অথচ অখন্ড ভারতের দাবীদার কংগ্রেস মুসলমানদের সর্বনিম্ন দাবী প্রদেশ সমূহের গ্রুপ মেনে নিয়ে ভারতকে অখন্ড রাখতে পারতো। কংগ্রেসের এই ভূমিকাকে বিস্ময়কর ডিগবাজী বলে মনে হলেও কংগ্রেস কিন্তু তার পলিসির ব্যতিক্রম কিছু করেনি। সমগ্র ভারত, তা না হলে ভারতের সর্বাধিক অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ছিল কংগ্রেসের লক্ষ্য। কিন্তু ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের গ্রুপ ব্যবস্থা মেনে নিলে কলিকাতাসহ গোটা বাংলা, আসাম এবং গোটা পাঞ্জাবসহ গোটা পশ্চিম ভারত মুসলমানদের অধিকারে চলে যেত এবং মুসলমানরা লাভবান হতো,

---

২২১। 'Pakistan', Ian Stephens, page 206; 'নেহেরু', ব্রেসার, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৭;'মাউন্ট ব্যাটেন', জিগলার, পৃষ্ঠা ৩৮৯।
২২২। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২২৫।

www.icsbook.info

শক্তিশালী হতো ও তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকে যেত। এতে ভারতের অখন্ডতা থাকতো বটে, কিন্তু হিন্দুরা ভূখন্ডগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হতো এবং পাকিস্তান বড় ও শক্তিশালী হওয়ার ভবিষ্যতে এই ক্ষতিপূরনের আর কোন পথ থাকতো না। অন্যদিকে মাউন্ট ব্যাটেন প্ল্যান গ্রহণ করায় ভারত ভাগ হলো বটে, কিন্তু পাকিস্তান হলো খন্ডিত এবং হিন্দুরা ভারতের সর্বাধিক সম্ভব ভূখন্ড লাভ করল। খন্ডিত এই পাকিস্তান দুর্বল হবে এবং শীঘ্রই ভেঙে পড়বে, তার ফলে সমগ্র ভারতকে আবার কব্জায় আনা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হবে, এটা ছিল কংগ্রেসের দৃঢ় ধারণা। শুধু ধারণা নয়, এ আশা নেহেরু ব্যক্তও করেছিলেন। ৩রা জুন (১৯৪৭) মাউন্ট ব্যাটেনের বক্তৃতার পর নেহেরু যে বেতার বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বলেছিলেন, 'হয়ত এই পন্থাতেই অদূর ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠিত হবে।'[২২৩] বস্তুত কংগ্রেসের কাছে ভারত বিভাগ বড় ছিল না, বড় ছিল সমগ্র ভারতকে কব্জায় আনা। এজন্যে তাদের লক্ষ্য ছিল নগদ সুবিধা সর্বাধিক আদায় করে নেয়া এবং ভবিষ্যতের জন্যে নিশ্চিত সুযোগ সৃষ্টি করা। মাউন্ট ব্যাটেন প্ল্যান খন্ডিত পাকিস্তান সৃষ্টি করে কংগ্রেসকে এই দুই সুযোগই দিয়েছিল। এই খন্ডিত পাকিস্তান জিন্নাহ এবং মুসলিম লীগ নিতে চায়নি। কিন্তু এর বিকল্প তাদের কাছে ছিল না। খন্ডিত পাকিস্তান না নিয়ে তাদেরকে সবটা হারানোর ঝুঁকি নিতে হতো। কিন্তু বৃটিশ, হিন্দু এবং শিখ এই ত্রিশক্তির মোকাবিলায় এ ঝুঁকি নেয়া জিন্নাহ সমীচিন মনে করেননি। তিনি বৃটিশের নাড়ী ধরতে পেরেছিলেন। মাউন্ট ব্যাটেন তাঁকে হুমকি দিয়েছিলেন, মুসলিম লীগ প্রস্তাব গ্রহণ না করলে মাউন্ট ব্যাটেন কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। আর স্যার জর্জ অ্যাবেল তো অত্যন্ত নগ্ন ভাষায় বলেছিলেন, 'প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে জিন্নাহ বলে দিন তিনি কি পাবেন। এটা পরিষ্কার বুঝিয়ে না দিলে জিন্নাহ যুক্তি মানবেন না।'[২২৪] সে সময়ের অবস্থা সম্পর্কে জিন্নাহ নিজেই বলেছেন, "কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে, মুসলিম লীগের পক্ষে ৩রা জুনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা ভুল হয়েছে। আমি তাদের বলতে চাই, অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করলে অকল্পনীয় সর্বনাশ হতো"[২২৫] একজন ইতিহাসকার রিচার্ড সাইমন্ডস-এর উক্তিতেও কোন বিকল্পই যে তখন আর অবশিষ্ট ছিল না তা বুঝা যায়। তিনি বলেছেন, "জিন্নাহ নিজে পূর্বে যেটাকে কর্তিত পোকায় খাওয়া পাকিস্তান বলেছিলেন, তাই পরে গ্রহণ করায় মুসলিম লীগের কোন কোন সদস্য লীগের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন কি করে, বুঝা যায় না।"[২২৬]

২২৩। 'Transfer of Power in India', V.P Menon
২২৪। 'Mission with Mount Batten', Campbell Johnson, page 58.
২২৫। 'Speches and Writings of Mr. Jinnah', vol-11, Jamiluddin Ahmed.
২২৬। 'Making of Pakistan', Richard Symods, page 73.

www.icsbook.info

২রা জুন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক মাউন্ট ব্যাটেনের ভারত বিভাগ পরিকল্পনা গৃহীত হবার পর ৩রা জুন বৃটিশ পার্লামেন্টে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এটলী ভারত বিভাগ পরিকল্পনাটি ঘোষণা করলেন। ঘোষিত মূল প্রস্তাবগুলো হলো ঃ যেসব এলাকায় পাকিস্তান গঠিত হবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে জনগণের মতামত যাচাই করা হবে। বাংলা, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে প্রাদেশিক পরিষদ এই প্রশ্ন যাচাই করবে। বাংলা এবং পাঞ্জাবে প্রাদেশিক পরিষদ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যেসব জিলায় মুসলিম সংখ্যালঘু এই দুই শাখা হিসেবে মিলিত হবে এবং প্রতিটি শাখা ভিন্নভাবে স্থির করবে যে তাদের প্রদেশ ভাগ করা হবে কিনা। যদি কোন শাখা তাদের প্রদেশ বিভাগ করতে চায় তাহলে তাদের রায়কে চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য করতে হবে। যদি দুইটি শাখা একত্রে থাকতে চায়, তাহলে তারা স্থির করবে যে, কোন সংবিধানে সংসদে তারা যোগ দেবে। ফ্রন্টিয়ার প্রদেশে জনসাধারণের ভোট গ্রহণ করা হবে। কারণ ঐ এলাকায় জনগণের ইচ্ছার পরিবর্তনের ইংগিত পাওয়া গেছে। আসামের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জিলা সিলেটে সর্বসাধারণের ভোট গ্রহণ করা হবে এবং যদি বাংলা প্রদেশ ভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সিলেট যদি পাকিস্তানে যোগ দিতে চায়, তাহলে সিলেট হবে পূর্ব বাংলার একটি অংশ।"

এটলির ঘোষণার পর ভারতীয় বেতারে ভারত-বিভাগ পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের উপর বক্তৃতা দিলেন মাউন্ট ব্যাটেন। মাউন্ট ব্যাটেনের পর এই ৩রা জুনেই বেতার বক্তৃতা দিলেন নেহেরু এবং জিন্নাহ। নেহেরু বললেন যে, ভারত থেকে কয়েকটি অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তিনি আনন্দ সহকারে সম্মতি দিতে পারছেন না, কিন্তু এটা (পরিকল্পনা) যে সঠিক পন্থা, তাতে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। তিনি আশা করেন যে, হয়তো এই পন্থাতেই অদূর ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠিত হবে।' মিঃ জিন্নাহ তাঁর ভাষণে বললেন, 'কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই পরিকল্পনার সঙ্গে একমত হতে পারছিনা। সম্রাটের সরকারের এই পরিকল্পনা আমরা আপোষ মীমাংসা হিসেবে গ্রহণ করবো কিনা একথা আমাদের বিবেচনা করতে হবে। মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত কি হবে, তা আমি আগে থেকে বিচার-বিবেচনা করতে চাইনা। কারণ আমাদের প্রতিষ। টানের বিধান মতে একমাত্র লীগ কাউন্সিলই এ বিষয়ে চরম সিদ্ধান্ত নিতে পারে। তবে দিল্লীর মুসলীম লীগ মহলের প্রতিক্রিয়া যতটা আমি জানতে পেরেছি তাতে আশাবাদ প্রকাশ করা যায়।"[২২৭]

লক্ষ্য করবার মত যে, দুই নেতার বক্তৃতার ডাইমেনশন দুই ধরনের। নেহেরু ভারত বিভাগের জন্যে আপসোস করেছেন, কিন্তু ভারত বিভাগের পন্থা পরিকল্পনাকে তিনি সঠিক বলেছেন। আবার আশা করেছেন ভারত পুনরায়

২২৭। 'Transfer of Power in India', V.P. Menon, Page 371-376. 'Muslim Leage Yesterday and Today', A.B Rajput, দশম পরিচ্ছেদ।

www.icsbook.info

ঐক্যবদ্ধ হবে। অর্থাৎ নেহেরুর কাছে ভারত বিভাগ একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা এবং কংগ্রেসের ক্ষমতায় যাবার একটা মাধ্যম। বলা বাহুল্য, যে কোন পন্থায় এ ক্ষমতা হাত করার জন্যেই কংগ্রেস এ যাবত অবিরাম চেষ্টা করেছে। আর ভারত বিভাগকে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা মনে করার অর্থ মুসলিম স্বার্থ বিরোধী আক্রমণাত্মক মনোভাব কংগ্রেস ত্যাগ করেনি, যা কংগ্রেসের মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে তার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। কংগ্রেসের এই মনোভাবই ভারত বিভাগের মত ঘটনা সংঘটিত করল। অন্যদিকে জিন্নার বক্তৃতায় ভারত বিভাগ মেনে নেয়া হয়েছে, কিন্তু ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ও পন্থার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন তিনি, তবু গ্রহণ করা হয়েছে পরিকল্পনাটি। এখানে জিন্নাহ বা লীগের ভূমিকা আত্মরক্ষামূলক। আর জাতীয় আত্মরক্ষার এই লক্ষ্য নিয়েই মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। আত্মরক্ষার পথ সন্ধানেই শেষ পর্যন্ত লীগ ভারত বিভাগ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। গত অর্ধশতাব্দী ধরে দুই জাতির আযাদী সংগ্রাম ছিল এই আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সংগ্রাম- সংগ্রাম ছিল হিংস্র নেকড়ে ও দুর্বল খরগোশের মধ্যে। নেকড়ে স্ট্রাটেজী ছিল খরগোশকে থাবার মধ্যে নিয়ে আসা, আর খরগোশের স্ট্রাটেজী ছিল নেকড়ের থাবা পৌঁছতে না পারে এমন একটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান। সে আশ্রয়ই অবশেষে হলো খন্ডিত পাকিস্তান।

৩রা জুনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলা ও পাঞ্জাবের আইন পরিষদ প্রদেশের বিভাগের পক্ষে রায় দিল। সিন্ধু প্রদেশ সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তানে যোগ দানের জন্যে। বেলুচিস্তানের জির্গা এবং সিলেটের গণভোট রায় দিল পাকিস্তানের পক্ষে। কিন্তু খেলা শুরু হলো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিয়ে। সেখানে গণভোটের ইস্যু নির্ধারিত ছিল সেখানকার মানুষ পাকিস্তানে যোগ দেবে, না হিন্দুস্তানে যোগ দেবে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ক্ষমতাসীন লাল-কোর্তা দলের নেতা কংগ্রেসের মিত্র আব্দুল গাফফার খান দাবী করলেন যে, জনগণ স্বাধীন পাখতুনিস্তান চায় কিনা সেটাও রেফারেণ্ডামের ইস্যু হিসেবে যোগ করতে হবে। কংগ্রেস এই দাবীকে সমর্থন করলেন। জিন্নাহ একে 'বিশ্বাসঘাতকতা প্রতারণামূলক' বলে মন্তব্য করলেন। মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে এ নিয়ে দরবার করা হলে তিনি বললেন যে, লীগ ও কংগ্রেস এ ব্যাপারে একমত না হওয়ায় তিনি একে গ্রহণ করতে পারলেন না। এরপর গান্ধী জিন্নাহকে বললেন, নিজেদের স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার সহ সীমান্ত প্রদেশকে পাকিস্তানে যোগ দিতে অনুরোধ করা হোক। এই সময় গাফফার খান বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ পাকিস্তানে যোগ দেয়ার সুযোগ চাইলেন। জিন্নাহ এ দুটি প্রস্তাবই প্রত্যাখান করলেন। মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনায় কোন প্রদেশের এ ধরনের কোন সুযোগ ছিলনা। রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হলো। পাকিস্তানের পক্ষে পড়ল ২ লাখ ৯০ হাজার

www.icsbook.info

ভোট, আর ভারতের পক্ষে ৩ হাজার ভোট। এইভাবে পাকিস্তানকে আরও খন্ডিত করার কংগ্রেসের আরেকটা উদ্যোগ ব্যর্থ হলো।

স্যার সেরিল র‍্যাডক্লিফকে দেয়া হয়েছিল বাউন্ডারি নির্ধারণের দায়িত্ব। তিনি এই দায়িত্ব শেষ করলেন ১৩ই আগস্ট, ১৯৪৭ তারিখে। র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম পেল পাকিস্তান। এটা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন নেহেরু। বললেন যে, এই রায় তিনি মানেন না। মাউন্ট ব্যাটেনকে আরও বললেন, স্থানীয় লোকেরা এটা মানবেনা। প্রয়োজন হলে জোর করেই এ এলাকা ছিনিয়ে নেবে।[২২৮] কিন্তু অবশেষে এই এলাকা পাকিস্তানকেই দেয়া হলো। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই সীমানা বন্টন র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ অনুসারে হয়নি। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান, আসাম ও পশ্চিম বংগের সীমারেখা যদিও র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ অনুযায়ী প্রবহমান নদীকে ধার্য করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, মর্শিদাবাদের সীমান্ত ব্যতীত নদীয়া ও পূর্ব পাকিস্তানের সীমানায় একটা শুষ্ক খাল ছাড়া আর কিছুই নেই। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বীরভূমের রামপুর হাট মহকুমা ও মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানভুক্ত না হয়ে পশ্চিম বাংলায় রয়ে গেল। নদীয়া ও চব্বিশ পরগণাকেবাদ দিয়ে লোক দেখানো ভাবে খুলনা জেলাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হোল। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি সর্বতোভাবে ভংগ করা হোল। পাহাড়ী এলাকাতেও দেখা গেল ছোট ছোট পাহাড়ের শীর্ষদেশগুলি ভারতে পড়েছে, আর নিম্নদেশ পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানে। এমনি কি ছাতকের সিমেন্ট কারখানা পড়েছে পূর্ব পাকিস্তানে, আর কাঁচামাল চুনাপাথরের ডিপো পড়েছে ভারতে। অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে একমাত্র দর্শনা চিনিকল ছাড়া কোন কলকারাখানাই পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়লনা। সেতাবগঞ্জে পড়ল চিনিকল ও গোটা তিনেক কাগজের কল, যার মালিক ছিল হিন্দুরা এবং ঐ কটিই থাকল পূর্ব পাকিস্তানে। টাকার অভাবে সূতা ও তুলার আমদানি সম্ভব হবে না সেকথা জেনেই এ ব্যবস্থা করা হলো। সারা ভারতে হিন্দু জনসাধারণ কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তান আর্থিক সংকটে পড়ে ধ্বংস হবে বলে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।'[২২৯] বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা এল। পাকিস্তান স্বাধীনতা উদযাপন করল ১৪ই আগস্ট, এবং ভারত ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭। স্বাধীনতা অর্জনের এই শেষ মুহূর্তে দেশীয় রাজ্য ও সম্পদ ভাগাভাগি প্রশ্নে পাকিস্তান প্রতারণার শিকার হলো। দেশীয় রাজ্যগুলো যাতে ভারতে যোগদান করে বা যোগদানে বাধ্য হয়, এমন প্রচেষ্টা মাউন্ট ব্যাটেনের পক্ষ থেকে সজ্ঞানেই করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় রাজকোষ থেকে প্রাপ্য নগদ ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেয়া হলোনা, দেয়া হলোনা সোনা রুপার ভাগ। চক্রান্ত করে ডিফেন্স কাউন্সিল আগাম ভেঙে দিয়ে সামরিক সরঞ্জামের শেয়ার থেকে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা

২২৮। 'India Wins Freedom: The Other Side, by A.W. Khan, page 311-336

২২৯। 'উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান', ডাঃ আব্দুল ওয়াহিদ, পৃষ্ঠা ৩৭২, ৩৭৩।

www.icsbook.info

হোল। আর এসব হয়েছিল মাউন্ট ব্যাটেনের সম্মতিতেই। সুতরাং পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হলো বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলা ও চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে। যেন কংগ্রেস জন্মের মুহূর্তেই পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চাইল সবদিক থেকে বঞ্চিত করে। ভারতের বৃটিশ সর্বাধিনায়ক জেনারেল আকিনলেক কংগ্রেসের এই চেহারায় আতংকিত হয়ে ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলেন, "আমি নিঃসংশয় দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, পাকিস্তান ডোমিনিয়ন যাতে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে, বর্তমান ভারতীয় মন্ত্রীসভা সেজন্যে আপোষহীনভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে বদ্ধপরিকর। ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে নতুন ভারতের প্রতিনিধিরা স্বরূপ প্রকাশে বিরত ছিলেন এবং সাধারণভাবে যুক্তি ও সহযোগিতার ভাব দেখিয়েছেন। ...... ১৫ই আগষ্টের পর অবস্থার অবনতি হয়ে চলেছে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ, মন্ত্রীগণ, বেসামরিক কর্মচারীরা এবং অন্যান্যরা সামরিক বাহিনী বিভাগের কাজে অবিরাম বাধা দিয়ে চলেছে।" ভারতীয় নেতৃবৃন্দগণ এটা পেরেছেন মাউন্ট ব্যাটেনের সাহসে। আর মাউন্ট ব্যাটেন এটা করেছেন ভবিষ্যত অখন্ড ভারতের বুনিয়াদ রচনার জন্যে। তিনি জুনের (১৯৪৭) দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লণ্ডনে ইন্ডিয়া অফিসের এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী হোরেস র‍্যামবোল্ডকে বলেছিলেন, "আমি শুধু এক 'অখন্ড ভারত' তৈরীর চেষ্টা করছি এবং দেশ যদি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, স্থায়ী হয়, তাহলে আমরা ভারতের কাছে বন্ধুত্ব পাব।"[২৩০] বলাই বাহুল্য, জেনারেল আকিনলেক ১৫ই আগস্টের পর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও সরকারেরর যে, 'স্বরূপ-প্রকাশ' দেখে আতংকিত হয়েছিলেন, সে স্বরূপ-উপলব্ধি ছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি বা পাকিস্তান দাবীর ভিত্তি, ভারত বিভক্তির কারণ। ভারতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ ভারত ভাগ করেছিলেন, কিন্তু তাদের স্বরূপ সংশোধনে রাজী হননি। সম্ভবত এই আশায় যে, তাদের এই স্বরূপ শক্তিই একদিন তাদের 'অখন্ড ভারত'- এর স্বপ্ন সার্থক করবে। অবাস্তব এই চ্যালেঞ্জ সামনে নিয়েই বাস্তবতা বিজয় লাভ করল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট।

২৩০। 'মাউন্ট ব্যাটেন', জিগলার, পৃষ্ঠা ৪০৮, 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ৩১৩।

www.icsbook.info

৯

বাংলার বিখণ্ডকরণ

১৯০৫ সালে ভাগ হয়ে যাওয়া বাংলা জোড়া লেগেছিল ৭ বছর পর ১৯১১ সালের শেষ দিনটিতে এসে। তারপর বাংলা বিভাগের কথা প্রথম উচ্চারিত হলো ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশনের কণ্ঠে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই এপ্রিল মিশন এক দরকষাকষি বৈঠকে বসেছিল জিন্নার সাথে। তারা বলেছিল, পাকিস্তানের জন্যে দাবীকৃত পুরো এলাকা এবং পুরো স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব - এই দুই জিনিস জিন্নাহ একসাথে কিছুতেই পাবেন না। হয় সর্বভারতীয় ইউনিয়নের অধীনে দাবীকৃত পুরো এলাকা নিয়ে পাকিস্তান ফেডারেশন গঠনে রাজী হতে হবে, নয়তো খন্ডিত বাংলা ও পাঞ্জাব নিয়ে খন্ডিত পাকিস্তানে তাকে রাজী হতে হবে, যা হবে পুরো স্বাধীন ও সার্বভৌম। জিন্নাহ তখন পুরো স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বদলে সর্বভারতীয় ইউনিয়নের অধীনে পাকিস্তান ফেডারেশন গঠনকেই পছন্দ করেছিলেন, তবু বাংলা ভাগে তিনি রাজী হননি।[১] কিন্তু জিন্নাহ রাজী না হলেও বাংলা বিভাগের দাবী উঠল কংগ্রেস ও হিন্দু এলিটদের তরফ থেকে ১৯৪৭ সালের শুরু থেকে। অথচ এই কংগ্রেস এবং এই হিন্দু এলিটরাই ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ হলে স্বরাজ ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশকে বঙ্গভঙ্গ রহিত করতে বাধ্য করেছিল। কারণটা পরিষ্কার। বৃটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু এলিটদের জমিদারী পূর্ববঙ্গকে পায়ের তলায় রাখা এবং তার উপর শাসন শোষণ কায়েম রাখার জন্যে অখণ্ড বাংলার তখন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বৃটিশ শাসণমুক্ত স্বাধীন পরিবেশে এই শোষণ শাসন সম্ভব নয় বলে এবং অখণ্ড বাংলায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে সেই কংগ্রেস ও হিন্দু এলিটরা বাংলা ভাগে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। খন্ডিত পাকিস্তান টিকবেনা- এ ধারণাও তাদের বাংলা বিভাগ দাবীর একটা মৌল কারণ হিসেবে কাজ করে। শরৎ বসু ও কিরণ শংকরের মত দু'একজন হিন্দু নেতা অখণ্ড বাংলার পক্ষে কাজ করেছেন। কিন্তু সেটা ছিল তাদের একান্তই ব্যক্তিগত, তাদের দল ও জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতিনিধিত্ব তাঁরা করেননি। তাই কারও সাহায্য সহযোগিতা তাঁরা পাননি। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে অখণ্ড বাংলা প্রশ্নে কোন মতনৈক্য ছিল না। কিছুটা মতবিরোধ ছিল 'বাংলা

১। 'The Great Divide', S.V. Hudson, page 139২। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 8.

www.icsbook.info

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, না অখণ্ড স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানের অংশ হবে'- এই প্রশ্ন নিয়ে। বলা যায়, অখণ্ড ভারত ও ভারত বিভাগ প্রশ্ন নিয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই দ্বন্দ্বই হিন্দুরা মিনি আকারে সৃষ্টি করেছিল বাংলা প্রদেশে। ফল হিসেবে ভারত বিভাগের মতই বাংলা বিভাগ হয়ে উঠেছিল অপরিহার্য।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলার ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৩টিতে জয়ী হবার পর কংগ্রেস এবং বাংলার হিন্দু এলিটরা দেওয়ালের এ লিখন পড়ল যে বাংলার মুসলিম জনগণের উপর হিন্দু আধিপত্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। এরপর বাংলা সহ ভারতে একটি মুসলিম আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যখন ১৯৪৭ সালের শুরু থেকে একটা অদম্য রূপ পরিগ্রহ করল, তখন বাংলার হিন্দু এলিটরা এবং তাদের সংগঠনগুলো বাংলা ভাগের জন্যে সোচ্চার হয়ে উঠল। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস নেতা ডাঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭, বাংলার গভর্নর ফ্রেডারিক বারোজ-এর সাথে দেখা করে এক বিবৃতিতে বললেন, ভারত যদি ভাগ হয়, তাহলে বাংলাও ভাগ করে হিন্দু সংখ্যাগুরু অঞ্চল আলাদা করতে হবে।[২] এর পক্ষকাল পরে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালনী বাংলা বিভাগ দাবী করে বিবৃতি দিলেন।[৩] ২৯ শে মার্চ, ১৯৪৭ বাংলার রাজা-মহারাজাগণ মিলিত হলেন কলকাতায় যাদের মধ্যে ছিলেন কাশিম বাজারের মহারাজা শিরীষচন্দ্র নন্দী, বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহাতব, মহারাজা প্রবোধচন্দ্র ঠাকুর, মহারাজা কুমার সীতাংশু কান্তা আচার্য চৌধুরী প্রমুখ। তারা বাংলা বিভাগের পক্ষে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করলেন।[৪] তারকেশ্বরে বাংলা প্রাদেশিক হিন্দু মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো ১৯৪৭ সালের ৫ই এপ্রিল। সম্মেলন শ্যামা প্রসাদকে বাংলায় পৃথক হিন্দু আবাসভূমি গড়ার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব দান করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহীত হলো, ৩০ শে জুনের মধ্যেই এই লক্ষ্যে ১ লাখ স্বেচ্ছাসেবক তৈরী করা হবে।[৫] মুসলমানদের মধ্যে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো। বাংলার প্রধানমন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী ৮ ও ৯ ই এপ্রিল পরপর দুইটি বক্তব্য দিলেন। বাংলা-ভাগ দাবীর তীব্র প্রতিবাদ করে। বললেন, আমি অখন্ড ও বৃহত্তর বাংলার পক্ষে।[৬] ঠিক এপ্রিলের এই ৯ তারিখেই বাংলার ভূমি ও জেলমন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা ফজলুর রহমান অখন্ড ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার দাবী করে বললেন যে, এটা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্যে কল্যাণকর হবে। আর যদি হিন্দুরা এভাবে

৩। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 8.(সিরাজ উদ্দীন হোসেন দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক ছিলেন। তার গন্থটি ১৯৭০ সালের অক্টোবর প্রকাশিত হয়)।

৪। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন আহসানুল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১৩৪।

৫। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 9.

৬। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 10.

www.icsbook.info

থাকতে না চায় তাহলে ভারতের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশ, যা হবে কায়েদ আযমের পরিকল্পনা অনুসারে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র, ছেড়ে দিয়ে গোটা ভারত তারা নিয়ে নিক। লোক বিনিময়ের মাধ্যমে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান করা যাবে।[৭] মন্ত্রী ফজলুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা দাবী করার একদিন পর ১১ই এপ্রিল বাংলা থেকে কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের ১১জন হিন্দু সদস্য ভাইসরয় লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে বাংলার পশ্চিম ও উত্তর অংশে দু'টি স্বতন্ত্র প্রদেশ দাবী করে স্মারকলিপি পেশ করলেন।[৮]

একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয়, বাংলার ভূমি ও জেল মন্ত্রী ফজলুর রহমানই প্রকাশ্যে প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার দাবী করলেন। ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাবে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম দুই অংশে দুইটি স্বাধীন মুসলিম আবাসভূমির কথা বলা হয়েছিল। পরে ১৯৪৬ সালের কনভেনশনে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব সংশোধন করে একক একটি মুসলিম আবাসভূমির প্রস্তাব করে। পরবর্তীকালে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একটি গ্রুপ বাংলাকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাখার পক্ষে মত পোষণ করতে থাকেন। এমনকি দিল্লী কনভেনশনে ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে একক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যিনি প্রস্তাবক ছিলেন, সেই সোহরাওয়ার্দীও পরে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের কথা বলেন। যা হোক, মন্ত্রী ফজলুর রহমান এই গ্রুপেরই একজন এবং তিনিই সর্বপ্রথম অখণ্ড স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলার দাবী ঘোষণা করলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার দিল্লী প্রস্তাব অনুসারে লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নাহ এর প্রতিবাদ করার কথা ছিল, কিন্তু এর প্রতিবাদ না করে এর প্রতি সমর্থনই দান করলেন। এপ্রিলের শেষ দিকে জিন্নাহ পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের সরকার গঠন প্রশ্ন নিয়ে মাউন্ট ব্যাটেনের সাথে দেখা করেছিলেন। পাঞ্জাব নিয়ে আলোচনা কালে মাউন্ট ব্যাটেন কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই জিন্নাহকে বললেন, "সুরাবর্দী (সোহরাওয়ার্দী) এবং তার বন্ধুরা 'স্বাধীন বাংলা' গঠন করার চেষ্টা করছে। 'অখণ্ড স্বাধীন বাংলা' সম্বন্ধে আপনার কি মত? অবশ্যি স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানের বাইরে থাকবে।' এর জবাবে জিন্নাহ কোন সংকোনচ না করে বললেন যে, 'বাংলা স্বাধীন হলে আমি খুশী হব। কলকাতা ছাড়া বাংলার মূল্য নেই। তারা (বাঙ্গালীরা) যদি একত্র থাকে এবং অখণ্ড বাংলা গঠন করে, তাহলে তারা নিশ্চয় আমাদের সাথে সদ্ভাব রাখবে।' মাউন্ট ব্যাটেন জিন্নাহকে বললেন, সুরাবর্দী বলেছেন যে বাংলা স্বাধীন এবং অখন্ড পৃথক দেশ হিসেবে কমনওয়েলথের ভেতর থাকতে চায়।' জিন্নাহ জবাব দিলেন, 'নিশ্চয় আমিও পাকিস্তানকে কমনওয়েলথের ভেতর রাখতে চাই।'[৯] এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলা সম্পর্কে জিন্নার চিন্তার সুন্দর, সরল ও সহজ

৭। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 11.
৮। 'Days Decisive', Serajuddin Hussain, page 12.
৯। 'স্বাধীনতার অজানা কথা' বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৮, ২৬৯ ফ্যাক্টস আর ফ্যাক্টস, ওয়ালী খান, পৃষ্ঠা ১১৬, 'দি গ্রেট ডিভাইড' এস, ভি হডসন, পৃষ্ঠা ২৪৬।

www.icsbook.info

অভিব্যক্তি ঘটেছে। তাঁর এই চিন্তা সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, "বাংলা অবিভক্ত, অখন্ড দেশ হিসেবে থাকবে এ কথা জিন্নাহ বিশ্বাস করেছিলেন। এই ব্যাপারে তার সহকর্মী লিয়াকত আলী খানও জিন্নার সঙ্গে একমত ছিলেন। লিয়াকত আলী ভাইসরয়ের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী এরিক মিসয়াভিলকে বলেছিলেন যে, তিনি বাংলা ভাগ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন না। কারণ তিনি জানেন বাংলাকে ভাগ করা হবে না, হয়তো বাংলা এক পৃথক দেশ হবে। .... জিন্নাহ শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলেন যে বাংলা এবং পাঞ্জাবকে অখন্ড রাখতে তিনি পারবেন এবং বাংলা হবে এক "স্বাধীন অখণ্ড দেশ।"[১০]

কিন্তু কায়েদ আযম জিন্নার এ বিশ্বাস বাস্তবায়িত হয়নি। বাস্তবায়িত হয়নি কারণ হিন্দু ভারতের কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মত সংগঠনগুলো এবং বাংলার হিন্দু এলিটরা তা হতে দেয়নি। এমনকি যেসব হিন্দু এলিটকে উদার, মানবতাবাদী এবং বাংলার জনগণের বন্ধু বলে আমরা জাতি, তারাও সেদিন চরম হিন্দুবাদী ও ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালের ২২শে এপ্রিল হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেস নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ দিল্লীতে একটা মিটিং ডাকেন। এ মিটিং এ ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ এক দীর্ঘ ভাষণে সাম্প্রদায়িকতার খতিয়ান হাজির করে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।[১১] আর এক গুচ্ছ হিন্দু ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানী, যাদের মধ্যে ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ শিশির কুমার মিত্র ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায়, বৃটিশ ভারত-সচিব লিষ্টওয়েলের কাছে পাঠানো এক তারবার্তায় বলেন, 'দাঙ্গাজনিত জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাংলার শিক্ষা, বাণিজ্য এবং শিল্প প্রায় ধ্বংসের পথে। বাংলার সাম্প্রদায়িক মন্ত্রীসভা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পূর্ণ অক্ষম। অসাম্প্রদায়িক সরকারের অধীনে জীবনের নিরাপত্তা এবং শিল্প, বাণিজ্য ও শিক্ষার অব্যাহত উন্নতির নিশ্চয়তা বিধানের জন্যে অবিলম্বে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবী জানাচ্ছি। এটা নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে পশ্চিম বাংলার প্রাণ কোলকাতার বিকাশে সাহায্য করবে।"[১২] হিন্দুমহাসভার মত কংগ্রেসও মরিয়া হয়ে ওঠে বাংলা বিভাগের জন্য। বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাংলা বিভাগ দাবী করে একটি স্মারকলিপি ২৯ শে এপ্রিল, ১৯৪৭ ভাইসরয়, নেহেরু ও প্যাটেলের কাছে পাঠায় এবং ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক কালিপদ মুখোপাধ্যায় বাংলা বিভাগের পক্ষে তদ্বির করার জন্যে দিল্লী যান।[১৩] এই ৩০শে এপ্রিল তারিখেই বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স তার এক

১০। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৬৯।
১১। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭২।
১২। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭২।
১৩। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৭১।

www.icsbook.info

বৈঠকে বাংলা বিভাগ দাবী করে। এ সভায় এন, আর, সরকার অখণ্ড বাংলার প্রচেষ্টাকে বিদ্রুপ করে জিন্নাহ ও সোহরাওয়ার্দীর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'বাংলার হিন্দুগণ হিন্দু প্রধান অঞ্চল (কোলকাতা সহ) নিয়ে আলাদা একটি প্রদেশ গঠন করবে যা ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিট হবে।'[১৪] এই সময় আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুই আসামকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবী করেন এবং বাংলার অখন্ড স্বাধীনতার বিরোধিতা করে গান্ধীর কাছে নিম্নলিখিত এস, ও, এস, পাঠানঃ 'বাংলাকে যদি স্বাধীন রাষ্ট্রত্বের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে আসাম কেন্দ্র (দিল্লী) থেকে এবং অন্যান্য সম্মতিদানকারী প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সমুদ্রে তার কোন নির্গমন পথ থাকবে না, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক থেকেই আক্রমণের শিকার হবে। ইউনিয়নের (ভারত রাষ্ট্রের) সাথে আসামকে যোগাযোগ রাখতেই হবে.... সমুদ্রে নির্গমন পথ তাকে পেতেই হবে।"[১৫] ১লা জুন, ১৯৪৭, ভারত বিভাগের যখন চূড়ান্ত মুহূর্ত, কোলকাতায় কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভা, নিউবেঙ্গল এ্যাসোশিয়েশন ও অল ইন্ডিয়া ডিপ্রেসড ক্লাসেস'- একসাথে একটা জঙ্গী সমাবেশের আয়োজন করল। সমাবেশ হিন্দু প্রধান প্রদেশ গঠনের দাবী তুলল। এ সমাবেশে নেতৃত্ব দান করেছিলেন বাংলার খ্যাতিমান ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার। আর কোলকাতায় হিন্দু মালিকানাধীন পত্রিকাগুলো এক বাক্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পৃথক প্রদেশ গঠনের জন্যে জনমত তৈরী করছিল।[১৬]

এক কথায় বাংলার সকল হিন্দু দল ও সংগঠন একযোগে অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার বিরোধিতা করে বাংলা বিভাগ দাবী করল। এর মধ্যে শরৎ বসু, কিরণ শংকরের মত দু'একজন হিন্দু ব্যক্তিত্ব মাত্র অখন্ড ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে কাজ করেছিলেন। তাও কতকটা আধা-গোপন ভাবে। প্রকাশ্যে সভা মিছিল এঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রকাশ্যে বিবৃতিও তারা কম দিয়েছেন। তাদের কাজটা অনেকটা লবী ওয়ার্কের মত ছিল। এ লবী করে তারা বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কিংবা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতা-কারোরই সমর্থন আদায় করতে পারেননি। এদের কাজও শুরু হয় বির্তক শুরু হবার অনেক পরে। বাংলার সোদপুরে গান্ধী এলে শরত বসু তাঁর সাথে দেখা করলেন। এটা ৯ই মে, ১৯৪৭, এর ঘটনা। এসময় গান্ধীর সাথে অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার প্রশ্ন নিয়ে আরো অনেকেই দেখা করেন। এর মধ্যে ১০ই মে শরত বসু ও আবুল হাশিম, ১১ই মে বাংলার মূখ্যমন্ত্রী সোওরাহওয়ার্দী ও ভূমিমন্ত্রী ফজলুর রহমান এবং ১২ই মে মুহাম্মদ আলী ও আবুল হাশিম গান্ধীর সাথে আলোচনা করেন। গভীর আবেগ নিয়েই শরত বাবুরা

১৪। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১৭১।
১৫। 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এস সিদ্দিকী, বার-এট-ল, পৃষ্ঠা ১৪৮।
১৬। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১৭৩।

www.icsbook.info

গান্ধীর সাথে দেখা করেছিলেন। কিন্তু ফল হয়েছিল শূন্য। গান্ধী বাংলা বিভাগের পক্ষে বা বিপক্ষে তার মত গোপন করে বলেছিলেন যে, দেশ (বাংলা) ভাগ হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় তার জন্যে দায়ী থাকবেন এবং সব চাইতে বেশী দায়ী থাকবেন বাংলার মুসলিম লীগ সরকার। .... এক সময় বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সংঘবদ্ধ হয়ে বাংলার একতা রক্ষার উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জনকে তার মত পাল্টাতে বাধ্য করেছিল। সোহ্‌রাওয়ার্দী যদি বাংলা ও বাংগালীর প্রতি গভীর ভালবাসা আপন অন্তরে ধারণ করে থাকেন, তাহলে তার বক্তব্য অবশ্যই হিন্দু মনকে আনন্দিত ও আশ্বস্ত করবে। কারণ হিন্দু মনকে আজ ভীতি ও সন্দেহ আচ্ছন্ন করে আছে।'[১৭] এখানে এই বক্তব্যে গান্ধী তার মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না করলেও হিন্দুদের বাংলা বিভাগের যুক্তি যে সমর্থন করেন, সে বিষয় মোটেই অস্পষ্ট নয়। এই সময়ের আলোচনা কালে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম গান্ধীকে জানিয়েছিলেন, 'হাজার মাইল দূর থেকে পাকিস্তান আমাদের শাসন করবে তা আমাদের জন্যে ঘৃণার ব্যাপার।' এর উত্তরে গান্ধী আবুল হাশিমকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'পাকিস্তান যদি ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্যে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানের সাথে যুক্তরাজ্য গঠনের আহবান জানায় তবে কি স্বাধীন বাংলাদেশ তা প্রত্যাখান করবে? এর উত্তর আবুল হাশিম দিতে পারেননি, চুপ করে ছিলেন। গান্ধী দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি যে বাঙালী সংস্কৃতির কথা বলছেন, তার মূল উৎস উপনিষেদ, বর্তমানকালে রবীন্দ্রনাথ তাকে শুধু বঙ্গদেশীয় নয়, সর্বভারতীয় রূপে প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ কি স্বেচ্ছায় ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য আহবান জানাবে?' আবুল হাশিম এবারও চুপ করে ছিলেন।[১৮] গান্ধীর এ দু'টি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বাংলা সম্পর্কে হিন্দুদের চিন্তাধারার গোটাটাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। হিন্দুরা অখন্ড ও স্বাধীন বাংলা সমর্থন করতে পারেনি কারণ তারা নিশ্চিত ছিল সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুসিত এই বাংলা আসলে হবে মুসলিম বাংলা এবং তার আত্মিক যোগ-সূত্র থাকবে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথেই। গান্ধীর দ্বিতীয় প্রশ্নটাও এই কথাই বলেছে, কিন্তু অন্যভাবে। বাংলার মুসলমানরা বাঙালী হতে পারবে না, তারা মুসলমানই থাকবে। কারণ বাঙালী হতে হলে তাদেরকে হিন্দু উপনিষদ গ্রহণ করতে হবে এবং গঠন করতে হবে ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্র। এটা মুসলমানরা পারবে না। পারবেনা যে আবুল হাশিমের নীরবতাই তার প্রমাণ। আবুল হাশিম নীরব ছিলেন, কিন্তু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহারাওয়ার্দী। গান্ধী সোহরাওয়ার্দীকে বাংলা সংঘটিত প্রতিটি মৃত্যুর জন্যে দায়ী করলে সোহরাওয়ার্দী সমস্ত গোলযোগের স্রষ্টা হিসেবে গান্ধীকে দায়ী করেন এবং পরে বাইরে এসে বলেন, 'কি অদ্ভুত লোক! কি বলছেন তাতে তাঁর

১৭। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৬১।
১৮। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ, পৃষ্ঠা ১৬১, ১৬২।

www.icsbook.info

কোন পরোয়া নেই।'[১৯]

শরত বসুও গান্ধীর সাথে আলোচনায় কোন সুবিধা করতে পারলেন না। পরে ১২ই মে তিনি নিজ উদ্যোগেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলার ছয়দফা নীতিমালা ঘোষণা করলেন। নীতিগুলো হলোঃ ১) বাংলা হবে সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ২) প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্ত্র প্রণীত হবার পর আইনসভার নির্বাচন হবে এবং নির্বাচন হবে যুক্ত নির্বাচন ভিত্তিক, ৩) বাংলার আইনসভা ঠিক করবে অবশিষ্ট ভারতের সাথে তাদের কি সম্পর্ক হবে, ৪) বর্তমান মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা বাতিল হবে এবং অবিলম্বে অন্ত র্বর্তী সরকার গঠিত হবে, ৫) বাংলার প্রশাসন বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত হবে এবং হিন্দু ও মুসলমানের অংশ হবে সমান সমান, ৬) কংগ্রেস থেকে ৩০ এবং মুসলিম লীগ থেকে ৩১ জন সদস্য নিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী সংস্থা গঠিত হবে।[২০]

শরতবাবু তার এই নীতিমালা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ২০শে মে, ১৯৪৭ তাঁর বাসভবনে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। এই আলোচনায় অংশ নিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, মুহাম্মদ আলী (বগুড়া), মন্ত্রী ফজলুর রহমান, কিরণ শংকর রায়, সত্যরঞ্জন বকশী এবং শরতবাবু নিজে। আলোচনা শেষে শরতবাবুর নীতিমালা সামনে রেখে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার জন্যে নতুন একটা ফর্মুলা তৈরী হলো। বলা হলোঃ (১) বাংলা হবে একটা স্বাধীন দেশ। (২) হিন্দু ও মুসলিম জনসংখ্যার অনপাতে তাদের আসন সংখ্যা সংরক্ষণ করে যুক্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে মুক্ত বাংলায় নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। জনসংখ্যা অনুপাতে হিন্দু ও তপশীলি সম্প্রদায়ের মধ্যে আসন সংখ্যা বন্টন করা হবে অথবা তারা নিজেরা যেভাবে মনে করে। নির্বাচন হবে বিতরণমুখী, সংখ্যাধিক্যমুখী নয়। যদি প্রার্থী তার নিজস্ব সম্প্রদায়ের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পান এবং অন্য সম্প্রদায়ের ২৫% ভোট পান, তাহলে তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে। যদি কোন প্রার্থী এরূপ শর্তপূরণে ব্যর্থ হয়ে শুধমাত্র তার সম্প্রদায়ের ব্যাপক ভোট লাভ করেন, তাহলে তাকেও নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে। (৩) স্বাধীন বাংলার এরূপ প্রস্তাব মহামান্য রাজা মেনে নিয়েছেন বা বাংলা ভাগ করা হবে না এরূপ ঘোষণা তিনি করলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হবে এবং সে স্থলে একটি আন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভা সমান সংখ্যক (প্রধানমন্ত্রী বাদে) হিন্দু মুসলিম (তপসিলীসহ) সদস্য নিয়ে গঠন করা হবে। এই মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী হবেন একজন মুসলমান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন একজন হিন্দু। (৪) নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভা ও মন্ত্রীসভা গঠন না হওয়া পর্যন্ত হিন্দু (তপসিলী সহ) ও মুসলিমদের মধ্যে থেকে পুলিশ ও মিলিটারিসহ সমস্ত চাকুরীতে সমান সংখ্যক লোক নিয়োগ করা হবে।

১৯। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II

২০। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ্‌, পৃষ্ঠা ১৬৩।

www.icsbook.info

(৫) ৩০ জন সদস্য নিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কারী গণপরিষদ গঠন করা হবে যার ১৬ জন সদস্য হবেন মুসলমান এবং ১৪ জন হবেন হিন্দু।[২১]

এ ফর্মুলা প্রণীত হবার পর শরৎ বাবু এ বিষয়টি প্রথমেই জানালেন গান্ধীকে একটা চিঠির মাধ্যমে। এখানে লক্ষনীয়, শরত বাবু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করছেন না, যোগাযোগ করছেন গান্ধীর সাথে যিনি তখন কংগ্রেসের দায়িত্বে ছিলেননা এবং তখনকার চলমান ঘটনা প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সাথেও শরতবাবুর আনুষ্ঠানিক আলোচনার কোন খবর পাওয়া যায়নি। যা হোক, শরত বাবু ২৩ শে মে ১৯৪৭, গান্ধীকে যে চিঠি লিখলেন তাতে বলা হলো, "গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় (২০শে মে) আমার বাড়ীতে একটা আলোচনা সভা হয়...... আমরা পরীক্ষামূলক একটা প্রস্তাবে রাজী হয়েছি, এর সাথে তার একটা কপি আপনার বিবেচনার জন্যে পাঠানো হলো। সত্যায়িত করার জন্যে অন্যদের উপস্থিতিতে এতে আবুল হাশিম ও আমি দস্তখত করি। অবশ্য অনুমোদনের জন্য এ প্রস্তাবকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সামনে পেশ করতে হবে। .... যদি আপনার সাহায্য, উপদেশ ও নির্দেশে দু'টি প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলক এগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে একটা চূড়ান্ত মতৈক্যে পৌঁছাতে পারে, তাহলে আমরা বাংলার সঙ্গে আসামের সমস্যার সমাধান করতে পারবো।"[২২]

পরদিন অর্থাৎ ২৪শে মে তারিখে গান্ধী এর জবাব দিলেন। লিখলেন, "খসাড়াটিতে প্রতিশ্রুতিমূলক এমন কিছু নেই যাতে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার দ্বারা কিছু করা যাবে না। সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে থাকতে হবে অন্ততঃপক্ষে হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন। এই স্বীকৃতিও তাতে থাকা উচিত যে, বাংলার রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিধৃত এক অভিন্ন সংস্কৃতি, মূল যার নিহিত আছে উপনিষদের দর্শনে।"[২৩]

লক্ষণীয়, গান্ধী এই চিঠিতে নতুন কিছু বললেন না। কোলকাতায় সোদপুরে তিনি সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিমকে যে কথা বলেছিলেন সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। অর্থাৎ বাংলার মুসলমানদের সংখ্যাগুরুত্বের পাশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তাহীনতা এবং বাংলার মুসলমান কর্তৃক বাংলার অভিন্ন সংস্কৃতি হিসেবে হিন্দুউপনিষদকে গ্রহণ করার প্রশ্নই আবার গান্ধী তুললেন। আর বোধ হয় তিনি চেয়েছিলেন এ দু'টির মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র সৃষ্টি করতে। যেমন,

২১। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১১৬৪, ১৬৫।
২২। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II (উদ্ধৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ সিদ্দিকী বার -এট্-ল, পৃষ্ঠা ১৪৪, ১৪৫)।
২৩। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II (উদ্ধৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ সিদ্দিকী বার -এট্-ল, পৃষ্ঠা ১৪৪, ১৪৫)।

www.icsbook.info

মুসলমানরা বাংলার অভিন্ন সংস্কৃতি হিসেবে যদি হিন্দু উপনিষদকে গ্রহণ করে, তাহলেই হিন্দু সংখ্যালঘুরা মুসলমানদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারে, নিরাপদ বোধ করতে পারে। সোজা কথায়, মুসলমানরা মুসলমান থাকা অবস্থায় হিন্দুরা নিরাপদ বোধ করতে পারে না। গান্ধীর এ এক অসম্ভব শর্ত।

শরতচন্দ্র বোস আবুল হাশিমের সাথে পরামর্শ করে গান্ধীর এ চিঠির জবাব দিলেন। বললেন, 'সরকারের শাসন কার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে অন্ততঃপক্ষে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সহযোগিতা থাকতে হবে- আপনার এই প্রস্তাবের ব্যাপারে শহীদের (সোহরাওয়ার্দীর) সঙ্গে আলোচনা করতে পারিনি। আজ বিকেলে প্লেনে করে সে দিল্লী যাচ্ছে। আমি যদি দিল্লী আসি, সেখানে তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। শহীদ ও ফজলুর রহমান এই শর্তগুলো নিয়ে জিন্নাহ ও তার ওয়ার্কিং কমিটির সাথে আলোচনা করবে। তাদের সাথে আমার যে সব কথাবার্তা হয়েছে, তাতে বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি একটা সমঝোতায় আসতে পারে, তাহলে জিন্নাহ পথের বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না।'[২৪]

কিন্তু শরৎবসু-আবুল হাশিম ফর্মুলাটি কংগ্রেস কমিটি ও মুসলিম লীগ কমিটিতে আলোচনা ও অনুমোদনের জন্যে কখনও পেশ করা হয়েছিল বলে প্রমাণ নেই। বোধ হয় তার আগেই গান্ধীর ঐ শর্ত ফর্মূলাটিকে গলা টিপে মারে। গান্ধীর জীবনীকার পিয়ারী লাল লিখছেন, "যা হোক, মনে হয় শেষ পর্যন্ত মিঃ শরৎ সার্বভৌম বাংলার সিদ্ধান্তসহ সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে যে অন্ততঃপক্ষে হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সহযোগিতা সমর্থন থাকতে হবে- মিঃ গান্ধীর এই প্রস্তাবে মিঃ সোহরাওয়ার্দী বা মুসলীম লীগকে রাজী করাতে পারেনি।"[২৫] গান্ধীর দ্বিতীয় শর্তটি, বাংলার অভিন্ন সংস্কৃতি হিসেবে মুসলমান সমাজ কর্তৃক হিন্দু উপনিষদ গ্রহণের প্রশ্নটি শরত বাবু সম্ভবত সোহরাওয়ার্দী ও মুসলিম লীগের কাছে পেশ করতেও সাহস পাননি।

বস্তুত শরত বাবু এবং তার সাথী কিরণ শংকর, প্রমুখের কোন চেষ্টাই হালে পানি পায়নি। হিন্দু সমাজ কিংবা কংগ্রেস কারো কাছেই তাঁরা জায়গা পাননি। শরত বাবু অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলা সংক্রান্ত তাঁর নিজস্ব ফর্মূলা প্রণয়নের (১২ই মে, '৪৭) তিনদিন পর এবং শরত-হাশিম ফর্মুলা প্রণয়নের (২০ মে, ৪৭) তিন দিন আগে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা বল্লব ভাই প্যাটেল শরৎ বাবুকে সতর্ক করে দিয়ে এই চিঠি লিখেনঃ "আমি দুঃখিত যে, আপনি

২৪। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II (উদ্বৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ সিদ্দিকী বার -এট-ল, পৃষ্ঠা ১৪২, ১৪৩)।
২৫। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II (উদ্বৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ সিদ্দিকী বার -এট-ল, পৃষ্ঠা ১৪৪, ১৪৫)।

www.icsbook.info

সর্বভারতীয় রাজনীতি, এমনকি প্রাদেশিক রাজনীতি থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। আপনি আমাদের সাথে কোন যোগাযোগই রাখছেন না। আমি আশা করি সর্বভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপকতর অংশ গ্রহণে এগিয়ে আসবেন এবং প্রাদেশিক ও সর্বভারতীয় রাজনীতির ব্যাপারে আপনার কার্যাবলী আমাদের অবহিত করবেন।"[২৬] প্যাটেলের এই চিঠিতে শরৎ বসুর বিচ্ছিন্ন ও অসহায় দশার চিত্রই ফুটে উঠেছে এবং প্যাটেল অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, শরৎ বাবুর কার্যাবলীর সাথে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নেই। ২০মে '৪৭ তারিখে অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলা সংক্রান্ত শরৎ হাশিম ফর্মুলা প্রণীত হবার পর অনুরূপ আরেকটা চিঠি সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল লিখেছিলেন কিরণ শংকরকে। সে চিঠিতে বলা হলোঃ "লোক মুখে এবং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এমন কিছু ধুম্রজাল সৃষ্টি হতে দেখছি, যে ব্যাপারে আমরা একদম অন্ধকারে। এসব ধুম্রজালের সাথে আপনার এবং শরৎ বাবুর নাম জড়ানো হচ্ছে। আমি মনে করি আপনাদেরই স্বার্থ এটা দেখা যে, এ ধরণের গুজব-ধুম্রজাল আর বেশী ছড়িয়ে না পড়ে। এখন এক সংকটকাল চলছে এবং দেশ ভাগের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ইস্যু। কংগ্রেসের সকল লোকের উচিত ব্যক্তিগত সকল প্রবণতা পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের দলীয় নীতির পেছনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। ব্যক্তিগত সকল মত দলীয় নীতির সাথে সংগতিশীল হতে হবে এবং এক্ষেত্রে মতানৈক্যের কোন অবকাশ নেই। আমি নিশ্চিত যে, কংগ্রেসের একজন সুশৃঙ্খল সদস্য হিসাবে আপনি আমার এই পরমর্শকে অভিনন্দিত করবেন।"[২৭] প্যাটেলের এই চিঠিটি শরৎ বসুর কাছে লিখা চিঠির চেয়ে অনেক কঠোর এবং স্পষ্ট। এতে পরিস্কার ভাবেই কিরণ শংকর ও শরৎ বসুকে অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলার ধুম্রজাল থেকে বেরিয়ে কংগ্রেসের দলীয় নীতির পেছনে ঐক্যবদ্ধ হতে বলা হয়েছে। অনেকের মতে এই চিঠির পর কিরণ শংকর অখণ্ড বাংলার ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।[২৮] শরৎ বোসের জন্যে গান্ধীর তরফ থেকে আরও বড় আঘাত অপেক্ষা করছিল। সেটা এল ৮ই জুন তারিখে। ৭ই জুন, ১৯৪৭, অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে মাউন্ট ব্যাটেনের ভারত বিভাগ গ্রহণ করে এবং গান্ধীও এর প্রতি সম্মতি জানায়। এ উপলক্ষে গান্ধী ৮ই জুন এক প্রার্থনা সভায় যোগ দেন এবং অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলার বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন। এই তারিখে শরৎ বসুকে লিখা এক চিঠিতে গান্ধী বলেন, "আমি আপনার খসড়া পড়েছি। এবার পণ্ডিত নেহেরু ও সরদার প্যাটেলের সঙ্গে স্কীমটি নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করেছি। উভয়েই তাঁরা এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী এবং তাদের অভিমত এই যে, এটা হিন্দু এবং তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে বিভক্ত করার একটা কৌশলমাত্র

২৬। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১৭৪, ১৭৫।২৭। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১৭৫।
২৮। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১৭৫।

www.icsbook.info

তাদের কাছে এ বিষয়টা সন্দেহ মাত্রই নয়, প্রায় একটা দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁরা এও মনে করেন যে, তফসিলী সম্প্রদায়ের ভোট হস্তগত করার জন্যে মুক্তহস্তে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। ব্যাপারটা যদি তাই হয়, তাহলে অন্ততঃ বর্তমানের জন্য এ সংগ্রাম আপনার পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ দুর্নীতির দ্বারা ক্রয় করা ঐক্য খোলাখুলি বিভক্তির চেয়ে নিকৃষ্টতার হবে, বিভক্তি হোক হৃদয়ের প্রতিষ্ঠিত বিভক্তির এবং হিন্দুদের দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি। এও আমি দেখছি যে, ভারতের দু'টি অংশের বাইরে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন আশা নেই।"[২৯]

গান্ধীর এই চিঠি ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ করল শরৎ বোসকে। ৯ই জুন তারিখেই তিনি একটি টেলিগ্রাম মারফত চ্যালেঞ্জ করলেন গান্ধীকে এই বলেঃ 'অভিযোগ যদি মিথ্যা হয়, তাহলে অভিযোগকারীকে শাস্তি দিন। আর সত্য হলে ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে শাস্তি দিন। [৩০]

শরৎ বোসের এ অসহায় আবেদন অরণ্যে রোদনে পরিণত হলো। তিনি যেদিন গান্ধীকে ঐ টেলিগ্রাম পাঠান, সেদিনই (৯ই জুন) মিঃ জিন্নাহকে তিনি একটা চিঠি লিখেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেসের দিক থেকে হতাশ হয়ে তিনি জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের সহযোগিতা চাইলেন। তিনি লিখলেন, "বাংলাদেশ তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে, কিন্তু এখনও তাকে বাঁচানো যায়। .... যে অনুরোধ আমি আপনার কাছে করছি, তা আমাদের সাক্ষাতকালে আপনি যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন তার অনুসরণেই। কিন্তু আমার প্রতীয়মান হয়ে যে, আপনি যদি আপনার সদস্যদের কাছে শুধুমাত্র আপনার মতামত প্রকাশ করেন, তাহলে পরিস্থিতিকে রক্ষা করা যাবে না।....... বাংলাদেশের আইন পরিষদের মুসলিম সদস্যরা যদি নির্দেশ মত একযোগে ভোট দেন, ... আমি মনে করি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন পরিষদের আরেকটি সভা ডাকতে বাধ্য হবেন, যাতে সামগ্রিকভাবে এই প্রদেশ নিজস্ব সংবিধান পরিষদ পেতে চায় কিনা– এই ইস্যুর উপর সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।"[৩১]

শরৎ বসুর এই চিঠিতে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় ঃ (১) জিন্নাহ অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে ছিলেন, (২) অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার পক্ষে বাংলার আইনসভার হিন্দু সদস্যেরা ভোট দেবেনা, কিন্তু বাংলার মুসলিম সদস্যরা এক যোগে যাতে এর পক্ষে ভোট দেয় সেই দায়িত্ব জিন্নাহকে গ্রহণ করতে হবে এবং (৩) বাংলার মুসলিম সদস্যরা স্বাভাবিকভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলার (পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন) পক্ষে ভোট দেবে না, সুতরাং জিন্নাহকে তাদের রাজী

২৯। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II (উদ্বৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ সিদ্দিকী বার -এট্-ল, পৃষ্ঠা ১৪৯)।

৩০। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II (উদ্বৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ সিদ্দিকী বার -এট্-ল, পৃষ্ঠা ১৫০)।

৩১। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II (উদ্বৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ সিদ্দিকী বার -এট্-ল, পৃষ্ঠা ১৪৮)।

www.icsbook.info

করানোর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু শরৎ বাবু জানতেন না, তাঁর এই ফর্মুলা কার্যকর হবার মত নয়। কারণ, হিন্দু সদস্যরা যদি বাংলা ভাগ করার পক্ষে ভোট দেয়, তাহলে মাউন্ট ব্যাটেনের ভারত বিভাগ পরিকল্পনা অনুসারে মুসলিম লীগ সদস্যদের কোন প্রকার মতামত ছাড়াই বাংলা ভাগ হয়ে যাবে।

জুন, '৪৭-এর এ সময়কালে শরৎ বাবু এবং তাঁর মত দু'একজন ছাড়া কংগ্রেস এবং হিন্দুসমাজের কেউই অখণ্ড এবং স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলার পক্ষে ছিল না। শরৎ বোস গান্ধীকে তার সর্বশেষ (বাংলা বিভাগের আগে) চিঠি লিখলেন ১৪ই জুন, ১৯৪৭। তিনি বললেন, "আমি লক্ষ্য করছি যে, জওয়াহের লাল ও বল্লভ ভাই উভয়েই সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। এটা যে হিন্দু ও তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতাদের মধ্যে বিভক্তি করনের একটা কৌশল মাত্র, তাঁদের এ অভিমতের ব্যাপারে আমি একমত নই। যা হোক, আমাকে বলতেই হবে যে, তফসিলী সম্প্রদায়ের ভোট হস্তগত করার জন্যে মুক্ত হস্তে টাকা ব্যয় করা সম্পর্কে যে সন্দেহ, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।"[৩২]

এরপর শরৎ বোস কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন। কংগ্রেস এবং হিন্দু সমাজের মতেরই জয় হলো, পরাজিত হলেন শরৎ বোস। এক ব্যক্তি একটি জাতি হতে পারেন না, তা আবার প্রমাণিত হলো।

অন্যদিকে বাংলার মুসলমানরা এবং মুসলিম লীগ একবাক্যে অখণ্ড বাংলা দাবী করেছে। এ দাবী তার শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছে। ছোট খাট বিবৃতি দেয়া ছাড়াও ২৭শে এপ্রিল (১৯৪৭) বাংলার প্রধানমন্ত্রী দিল্লী গিয়ে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন অখণ্ড ও সার্বভৌম বাংলার পক্ষে। তিনি বলেন, অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ সার্বভৌম বাংলা হবে একটা মহান দেশ, যা হবে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ও সমৃদ্ধিশালী।' সোহরাওয়ার্দী তার এ বিবৃতিতে বাংলা বিভাগ দাবী করার জন্যে বাংলার একশ্রেণীর হিন্দুর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এটা অসহনশীল হতাশবাদীদের কাজ।'[৩৩] এদিন বিকেলেই সোহওাওয়ার্দী দিল্লীতে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এই তারিখেই খাজা নাজিমুদ্দীন বাংলা ভাগের বিরোধিতা ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার দাবী করে একটি বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, "আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠন মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্যেই কল্যাণকর হবে। একইভাবে বাংলা বিভাগ বাংলার অধিবাসীদের জন্যে হবে মারাত্মক।"[৩৪] এর একদিন পর ৩০শে এপ্রিল তারিখে সর্বভারতীয় লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নার

৩২। 'Mahatma Gandhi', The Last Phase' by Pyarelal, vol-II (উদ্বৃত ঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস', এস, এ সিদ্দিকী বার -এট্-ল, পৃষ্ঠা ১৫০, ১৫১)।

৩৩। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 16.

৩৪। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 18.

www.icsbook.info

একটা বিবৃতি সংবাদপত্রে এল যাতে তিনি বাংলা বিভাগ দাবীর নিন্দা করে বলেনন, "এটা একটা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র।"[৩৫] এই দিনই বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমের একটি দীর্ঘ বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। এ বিবৃতির প্রথম অংশে তিনি অখণ্ড ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করলেন এবং দ্বিতীয় অংশে গিয়ে উপসংহার টেনে বললেন, "লাহোর প্রস্তাব কখনই ভারতে একক একটি মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলেনি।" আবুল হাশিমের বিবৃতির ৪ দিন পর ৫ই মে, ১৯৪৭, বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরাম খান এক বিবৃতিতে বললেন, "কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে কেউ ধারণা করতে পারেন যে, পাকিস্তান প্রশ্নে লীগ হাইকমান্ড এবং বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের মধ্যে প্রবল চিন্তা-বৈষম্য রয়েছে। সম্পূর্ণভাবে এটা ভিত্তিহীন। বাংলা মুসলিম লীগ দৃঢ়ভাবে ১৯৪০ সালের লাহোর রেজুলেশন এবং কায়েদে আযমের পেছনে রয়েছে।....... পাকিস্তান থেকে পৃথক স্বাধীন বাংলার কোন প্রশ্নই উঠে না। ...... যারা হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত বাঙালী জাতি'র কথা বলেন এবং সেই জাতীয়তার ভিত্তিতে যারা স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম বাংলার কথা বলেন, তারা পরিষ্কারভাবে আমাদের শত্রুদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছেন, যারা মুসলিম বাংলাকে স্যান্ডউইচ করার জন্যে বাংলার পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তে দু'টি হিন্দু বাংলা দাবী করছে।"[৩৬]

লক্ষণীয় মুসলিম লীগের দুই নেতা, আকরাম খান ও আবুল হাশিম সম্পূর্ণ দুই বিপরীত কথা বললেন। আসলে সে সময় বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগে যে দুই মত দানা বেঁধে উঠেছিল এটা তারই প্রতিফলন। এই দুই মতের একদিকে ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, মন্ত্রী ফজলুর রহমান, আবুল হাশিম, প্রমুখ কয়েকজন। আর অন্যদিকে ছিলেন বাংলা প্রাদেশিক লীগ সভাপতি আকরাম খান, হাবিবুল্লাহ বাহার, নূরুল আমিন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, তমিজুদ্দিন খান প্রমুখসহ সংখ্যাগুরু লীগ সদস্যগণ। আকরাম খানের এই বিবৃতির মাধ্যমে দুই পক্ষের বিরোধ প্রকাশিত হয়ে পড়ার পর তা বেড়ে চলল। বিশেষ করে ১১ই মে থেকে ১৩ই মে পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান ও মোহাম্মদ আলী গান্ধীর সাথে বার বার দেখা করেন ও আলোচনা করেন। এই আলোচনা মুসলীম লীগের অন্য পক্ষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই বিক্ষুব্ধ হবার একটা কারণ হলো ৯ই মে, ১৯৪৭, মুসলিম লীগ প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটি অখণ্ড বাংলা ও অন্যান্য বিষয়ে হিন্দুদের সাথে আলোচনার জন্যে একটা সাব কমিটি গঠন করে, যার আহ্বায়ক ছিলেন নূরুল আমিন। সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম প্রমুখ এই সব-কমিটিকে পাশ কাটিয়ে গান্ধী ও হিন্দু নেতাদের সাথে আলাপ করেন। এমনকি

৩৫। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 21.
৩৬। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 22.

www.icsbook.info

২০মে শরৎ বসুর বাড়ীতে অখণ্ড ও স্বাধীন বাংলার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় যে মিটিং এ, সেখানে সাব কমিটির আহ্বায়ক সহ অনেকেই হাজির ছিলেন না এবং মুসলিম লীগ প্রাদেশিক কমিটিও এ ব্যাপারে কিছু জানতনা। এসব নিয়ে সংশয় সন্দেহ এবং বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে। লীগ কাউন্সিল সদস্য এম, এন, হুদা ১৩মে'র এক বিবৃতিতে আবুল হাশিম ও অন্যদের এ ধরনের আলোচনা করার অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করেন।[৩৭] এম, এন, হুদার সমর্থনে আবুল হাশিম, প্রমুখের অনধিকার আলোচনাকে চ্যালেঞ্জ করে বিবৃতি দেন হাবিবুল্লাহ বাহার ১৪ই মে তারিখে।[৩৮] আবুল হাশিম এর জবাব দিলেন ১৭ই মে। বললেন, ভালো কাজের জন্যে কোন দায়িত্ব পাওয়ার দরকার হয় না।[৩৯] ১৪ই মে, ১৯৪৭, সোহরাওয়ার্দী দিল্লী গেলেন সম্ভবত কংগ্রেস ও লীগ হাইকমান্ডের সাথে আলোচনার জন্যে। এর ১ দিন পরেই বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি আকরাম খান সহ হাবিবুল্লাহ বাহার, নুরুল আমিন, ইউসুফ আলীও দিল্লী গেলেন। উদ্দেশ্য উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে লীগ হাই কমান্ডের সাথে আলোচনা করা। পাল্টা-পাল্টি এই ব্যাপার কারোরই নজর এড়ায়নি। কিন্তু রেজাল্ট কি হয়েছিল, সুনির্দিষ্টভাবে তার কিছুই জানা যায় নি। কারণ লীগ হাই কমান্ড এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। তবে সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে সোহরাওয়ার্দী বাংলা বিভাগ ঠেকাবার জন্যে জিন্নাহকে অনুরোধ করেছিলেন।[৪০] অন্যদিকে আকরাম খান মিশনের সদস্যরা কোলকাতা ফিরে বলেন ১৯শে মে' তারিখে, তাদের মিশন সফল হয়েছে। কিন্তু সফলতা কি সেটা তাঁদের কাছ থেকে পরিষ্কার জানা গেলনা। আকরাম খন বললেন, "বাংলা বিভাগ নিয়ে মুসলিম লীগের মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ নেই। লাহোর প্রস্তাবের সাথে অসংগতিশীল এমন কোন প্রস্তাবই আমরা মানব না।"[৪১] হাবিবুল্লাহ বাহার বললেন যে, কোন হিন্দু নেতার কোন প্রস্তাব থাকলে তা নিয়ে মুসলিম লীগের কাছে আসুন।"[৪২] ইউসুফ আলী চৌধুরী বললেন, 'কংগ্রেস কিংবা কোন হিন্দু সংগঠনের সাথে যারা আলোচনা করছেন, তাদের কারো একথা ভাবা ঠিক নয় যে, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে তারা দায়িত্বশীল এবং তারা যা করবেন মুসলিম লীগ তা মেনে নেবে।[৪৩] ১৯শে মে' তারিখেই আবুল হাশিম গ্রুপের পক্ষ থেকে মন্ত্রী ফজলুল রহমান তাদের কার্যক্রমের ব্যাখ্যা দিলেন। বললেন, "আলোচনার শুরুতেই আমরা একথা পরিষ্কার করে দিয়েছি, যে সমঝোতাতেই আমরা পৌঁছিনা কেন, তা প্রাদেশিক মুসলিম ওয়ার্কিং কমিটি এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ... আমরা কোন

৩৭। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 28.
৩৮। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 31.
৩৯। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 36.
৪০। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 30.
৪১, ৪২, ৪৩। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 35.

www.icsbook.info

সমঝোতায় এখনো পৌঁছিনি। কায়েদে আযমের মত সম্পর্কে আমরা অবহিত এবং সে অনুযায়ীই আমাদের আলোচনা চলবে। ... মুসলিম লীগ সোহরাওয়ার্দী, নুরুল আমিন, হাবিবুল্লাহ বাহার, হামিদুল হক চৌধুরী, ইউসুফ আলী ও আমাকে সদস্য করে সাব কমিটি গঠন করেছে (আলোচনার জন্যে), কিন্তু কমিটির বাইরে কেউ আলোচনা করতে পারবে না এমন কথা মুসলিম লীগের ঐ রেজুলেশনে নেই।"[৪৪] কিন্তু দুঃখের বিষয় ফজলুর রহমানের এই বিবৃতির পরদিনই শরৎ বসুর অখণ্ড সার্বভৌম বাংলার নীতিমালা প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, সেখানে সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও ফজলুর রহমান গেলেন, কিন্তু আলোচনার জন্য দায়িত্বশীল সাব-কমিটির আহ্বায়কসহ অন্য সদস্যদের সেখানে নেয়া হলো না।[৪৫] তবে আনন্দের ব্যাপার মুসলিম লীগ এর জন্যে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেনি। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে হাবিবুল্লাহ বাহার ২৪শে মে জানালেন, "শরৎ-সোহরাওয়ার্দী ফর্মুলা আশা করা হচ্ছে ২৭মে তারিখে এ বিষয়ের জন্যে দায়িত্বশীল সাব কমিটিতে পেশ করা হবে এবং ফর্মুলাটি অতঃপর প্রাদেশিক মুসিলিম লীগ ওয়াকিং কমিটিতে পেশ করা হবে ২৮শে মে তারিখে।[৪৬]

বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকটি ২৮শে মে তারিখেই অনুষ্ঠিত হলো। ওয়াকিং কমিটির ২৭ জন সদস্যের মধ্যে ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন। অনুপস্থিত ছিলেন সোহরাওয়ার্দী, এম, এ, এইচ, ইস্পাহানি এবং শিক্ষামন্ত্রী মোয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন। মিটিং-এর যে বিবরণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা এই ঃ

"২৮শে মে বুধবার রাত ৮টা থেকে ৫ ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর বাংলার রাজনীতি বিষয়ে মুসলিম লীগের দৃষ্টিভংগী সম্পর্কে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়ঃ

বাংলার শাসনতান্ত্রিক নিস্পত্তি (স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা) বিষয়ক যে প্রস্তাব এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি অথবা গঠিত সাব কমিটির করার কিছুই নেই।

ওয়ার্কিং কমিটি পাকিস্তান দাবীকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে। কমিটি কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করছে এবং ঘোষণা করছে যে, ভারতের মুসলমানদের পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র বিষয়ে আলোচনা ও নিস্পত্তিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে দায়িত্বশীল এক মাত্র তিনিই। বাংলার মুসলমানরা তার সিদ্ধান্তের পেছনে থাকবে।

৪৪। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 38, 39.
৪৫। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 41.
৪৬। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 45.

www.icsbook.info

বাংলার রাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ে আলোচনার জন্যে বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কর্তৃক গঠিত সাব-কমিটিও বাতিল করা হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য গতকাল (২৯শে মে) এক সাক্ষাতকারে জানান, যেহেতু বাংলার মানুষের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্যে দলীয়ভাবে কোন ব্যক্তি বা কমিটিকে দায়িত্ব দেয়নি, তাই লীগের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্যে সাব কমিটিকে অব্যাহত রাখার কোন অর্থ হয় না।"[৪৭]

এইভাবে মুসলিম লীগের মধ্যকার দ্বন্দ্বমান দুটি মতের বিলয় ঘটল তখনকার মত দলীয় সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। তবে মুসলিম লীগের মধ্যে কোন বিতর্ক ছিল না অখণ্ড বাংলার ব্যাপারে। মুসিলিম লীগের উপরোক্ত প্রস্তাবের ২ দিন পরে মুসিলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাবিবুল্লাহ্ বাহার বাংলা ভাগ বিরোধী এক জনসভায় বলেন, "এক শ্রেণীর স্বার্থ শিকারী হিন্দু বাংলা ভাগের জন্যে আন্দোলন চালাচ্ছে। মুসলমান এবং তফসিলী হিন্দুরা বাংলা ভাগের বিপক্ষে।.... অখণ্ড বাংলা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হবে।"[৪৮]

লীগ সভাপতি মিঃ জিন্নাহ বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ছিলেন শেষ পর্যন্ত। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভারত বিভাগ পরিকল্পনা নিয়ে লণ্ডন যান ১৮ই মে, ১৯৪৭। বাংলা বিভাগের বিষয়টা তখন জানতে পেরে জিন্নাহ এর তীব্র প্রতিবাদ করেন মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে।[৪৯] এটুকু প্রতিবাদ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন লণ্ডন যাবার পর জিন্নাহ্ বৃটিশ মন্ত্রীসভার কাছে টেলিগ্রাম করেন বাংলা ভাগের পক্ষে সিদ্ধান্ত না নেবার জন্যে।[৫০] তারপর ২রা জুন ১৯৪৭ কংগ্রেস ও শিখরা যখন ভারত বিভাগ পরিকল্পনার প্রতি লিখিত সম্মতি জানাল, তখন মিঃ জিন্নাহ মাউন্ট ব্যাটেনকে গিয়ে বাংলা ভাগের ব্যাপারে তাঁর তীব্র আপত্তির কথা জানালেন।[৫১]

কিন্তু তবু বাংলা ভাগ হলো। কেন ভাগ হলো? কেউ কেউ বলতে চান, বাংলা স্বাধীন-সার্বভৌম হলে এবং পূর্ব বাংলা পাকিস্তান না হলে বাংলা ভাগ হতো না। এ ধারণা একেবারেই ভুল। বাংলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চলকে ভাগ করে নিয়ে পৃথক হিন্দু প্রদেশ গঠন করার বিষয়টা ছিল হিন্দুদের স্থির সিদ্ধান্ত। পাকিস্তান না হলেও এটা তারা করতো। হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের নেতা ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী দিল্লীর এক জনসভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, "The Septaration must not be dependent on Pakistan. Even if Pakistan is not conceded and some form of a week and loose centre envitage in the Cabinet Mission Scheme is accepted by the Muslim league, we shall demand the cre-

৪৭। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 47, 48.
৪৮। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 50.
৪৯। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৮২।
৫০। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ২৮৩।
৫১। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, পৃষ্ঠা ২৮২।

www.icsbook.info

ation of new province composed of the Hindu majority areas in Bengal." অর্থাৎ এই 'পৃথক হওয়াটা পাকিস্তান হওয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এমন কি যদি পাকিস্তান নাও হয়, কোন প্রকার দুর্বল ও শিথিল কেন্দ্রের ব্যবস্থাযুক্ত ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মুসলিম লীগ গ্রহণও করে,তবু আমরা বাংলার হিন্দু প্রধান অঞ্চল নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ দাবী করব।'[৫২] তাছাড়া কংগ্রেস স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (৪ঠা এপ্রিল, ১৯৪৭) বাংলা প্রদেশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অবশিষ্ট অংশকে ভারতের সাথে একীভূত করার জন্যে। মুসলমানরা তাদের এ সিদ্ধান্তের সাথে একমত হবেনা, তাই বাংলা ভাগ তাদের জন্যে ছিল অপরিহার্য এবং তাই করেছে।

বাংলা বিভাগে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী আহত হয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী। তিনি বাংলা বিভাগকে এবং স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন ভেংগে যাওয়াকে বাংলার পৃষ্ঠদেশে ছুকিাঘাত বলে অভিহিত করলেন। কিন্তু যে হিন্দুদের সাথে একত্রে স্বাধীনভাবে ঘর কারার সাধ তিনি করেছিলেন, শীঘ্রই সে হিন্দুদের যে চেহারা তিনি দেখলেন তা কিছুতেই তাঁর সাধের সাথে সংগতিপূর্ণ হল না। "হিন্দুজনতা তাঁর পাশে গুঞ্জন তুলে বলছিলঃ মুসলমান শুয়র, খুনি ও চোর'। এমন এক চিৎকার তুলেছিল তারা, যা শুধুমাত্র 'ধর্ম নিরপেক্ষ' ভারতেই শোনা যেতে পারেঃ 'এই অধঃপতিত গরু-খোরকে ফাঁশিতে লটকানো হোক।' এই পরিস্থিতিতে প্রশংসনীয় শান্তভাবে আগাগোড়া বসে থাকলেন মিঃ সোহরাওয়ার্দী।"[৫৩]

স্বপ্নভঙ্গ হওয়ার পর সোহরাওয়ার্দী বললেনঃ "যন্ত্রণার অবসান ঘটেছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে এবং বাংলা শীঘ্রই ভাগ হচ্ছে। .... মুসলিম বাংলাকে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, অর্জন করতে হবে সর্বোচ্চ যোগ্যতা। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে এর খাদ্য সরবরাহ হবে প্রচুর। পাটের উৎপাদনকারী হিসেবে বিশ্বকে সে নিয়ে আসতে পারে পায়ের তলায় এবং এর শিল্প ভবিষ্যত নিশ্চিত। ..... পাকিস্তানের আইনসভায় মুসলিম বাংলার থাকবে শক্তিশালী কণ্ঠ, শাসনতান্ত্রিক বিকাশে পারবে সে অবদান রাখতে, অবদান রাখবে সে কৃষির উন্নয়নে এবং পাকিস্তানের সমৃদ্ধি বিধানে।"[৫৪]

৫২। 'অখন্ড বাংলার স্বপ্ন', আহসানুল্লাহ্, পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৩৪, (এই তথ্যটি কোলকতার অমৃতবাজার পত্রিকার ২২ শে এপ্রিল, ১৯৭৪, ১৯৭৪, সংখ্যা থেকে উদ্বৃত) ।৫৩। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 45. (উদ্বৃতঃ 'ভুলে যাওয়া ইতিহাস' এস, এ, সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ১৫২)।

৫৪। 'Days Decisive' Serajuddin Hussain, page 57

www.icsbook.info

১০
পূর্ব পাকিস্তান হলো বাংলাদেশ

পাকিস্তানের জন্মকে ঐতিহাসিক 'একটি জাতির জন্ম' বলে অভিহিত করেছেন। অথচ ভারতের ক্ষেত্রে একথা বলা হয়নি। আসলে ভারত-উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দুই ভূখন্ড নিয়ে পাকিস্তানের জন্মকে একটা রাষ্ট্রের জন্ম বলার চাইতে একটা জাতির জন্ম বলাই যুক্তিযুক্ত। দুইটি ভূখন্ড মাঝখানে হাজার মাইলেরও বেশী ভিন্ন রাষ্ট্রের দেয়াল নিয়ে একটা রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম লাভ করার দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে নেই। হাজার হাজার মাইল ব্যবধান নিয়ে ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এলাকা মুল মার্কিন ভূখন্ড থেকে বহুদূরে। কিন্তু আলাস্কা ক্রয় সূত্রে এবং হাওয়াই দখলি সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্টের জন্ম তাদেরকে নিয়ে হয়নি। বৃটেন এবং ফ্রান্সের অনেক দূরবর্তী ভূ-খন্ড রয়েছে। কিন্তু সেগুলো উপনিবেশ, মূল রাষ্ট্র নয়। মালয়েশিয়ার মূল ভূ-খন্ড ও তার সারাওয়াক অঞ্চলের মধ্যে অনেক ব্যবধান, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন ভিন্ন রাষ্ট্রের দেয়াল নেই। সুতরাং ভারত উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দুই ভূ-খন্ড নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলাভ একেবারেই অনন্য একটা ঘটনা। এই অনন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দুই ভূ-খণ্ডের মানুষের এক জাতিত্বের ধারনা থেকে। বৃটিশ ভারতের 'ভারতীয়'রা হিন্দু এবং মুসলিম দুই পরিচয় নিয়ে দুইটি রাষ্ট্রের পত্তন করল। ভারত উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দুই ভূ-খন্ড নিয়ে মুসলমানরা গঠন করল পাকিস্তান রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হলো উপমহাদেশে মুসলমানদের একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে নতুন জন্মলাভের ফলেই। অতএব জাতির জন্মটাই এখানে মূখ্য। এ কারনেই পাকিস্তানের জন্মকে একটা রাষ্ট্রের জন্ম না বলে একটা জাতির জন্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় যখন ভাষা ও অঞ্চল ভিত্তিক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের বন্যা বয়ে চলছে, সেই সময় মুসলিম জাতি ভিত্তিক ভারত বিভাগ এবং রাষ্ট্র গঠন আধুনিক বিশ্বের এক নজীর বিহীন ঘটনা। এই জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গড়ার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুসলমানরা অনন্য এক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল।

কিন্তু রাষ্ট্রটি টিকলনা আড়াই যুগও। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির ২৫তম স্বাধীনতা দিবস আসার আগেই ভেঙ্গে পড়ল রাষ্ট্রটি। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে

www.icsbook.info

স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তান স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ পরিণত হলেও ৪৭-এর ভারত বিভাগের দর্শন অক্ষুন্নই থাকল। পূর্ব পাকিস্তান যেমন ছিল মুসলিম আবাসভূমি, বাংলাদেশও সেই পরিচয়কেই গ্রহণ করল। বাংলাদেশ এ পরিচয়কে বড় করে না দেখলে আঞ্চলিক স্বার্থ সুযোগ ও ভাষার ঐক্যকে সামনে রেখে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে মিশে যাওয়াই তার জন্যে যুক্তিযুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগ টিকেনি কেন? টিকেনি কারণ, বিভাগটা ছিল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনা প্রসূত। এর বিরুদ্ধে কলকাতাইয়ারা শক্তিশালী যক্তি উত্থাপন করেছিল অখণ্ড বাংলার, অখণ্ড বাঙালী ও অখণ্ড বাঙালী জাতিসত্তার। শেষে এই যুক্তিই জয়ী হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বঙ্গ বিভাগের প্রশ্নে এ যক্তি উঠেছিল। বলা হয়েছিল বাংলার অখণ্ডত্বের কথা। কিন্তু হিন্দু জনগোষ্ঠি ও তাদের সংগঠন এর সাথে একমত হয়নি। না হওয়ার কারণ ভারত বিভক্তিটা ছিল জাতিগত বিভাগ। হিন্দুরা গোটা বাংলাকে মুসলমানদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি। বরং তারা বঙ্গমাতাকে এভাবে কেটেছিল যাতে পূর্ব পাকিস্তান একটা পোকায় কাটা রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং যাতে অবশেষে মুসলিম স্বতন্ত্র আবাসভূমিটি না টেকে- মুসলিম জাতি সত্তা বিসর্জন দিয়ে যেন আবার মিলিত হয় হিন্দু ভারতের সাথে। এ উদ্দেশ্যের মধ্যেও ছিল জাতিগত বিদ্বেষ। এই জাতিগত মানস-বিভাগের কারণেই হিন্দুদের ঐ দুরাশা সফল হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান যখন স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ-এ পরিণত হলো তখনও বাংলাদেশ ৪৭-এর দেশ বিভাগের দর্শনকে বিসর্জন দিয়ে পশ্চিম বংগ তথা ভারতের সাথে এক হয়ে যায়নি। সুতরাং স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি পৌণে এক শতাব্দীর সংগ্রামে গড়ে উঠা ৪৭-এর ভারত বিভাগ ভিত্তিক রাজনৈতিক দর্শনে কোন পরিবর্তন নিয়ে এলনা। পরিবর্তন যা হলো সেটা আকৃতিগত। পাকিস্তান ভেঙে এক অংশ স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিণত হলো, অপর অংশ পাকিস্তানই থাকল।

কিন্তু পাকিস্তান ভাঙার এই কাজটা হলো রক্তক্ষয়ী। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে দুই আঞ্চলিক শক্তির বিজয় হলো। পূর্ব পাকিস্তানে বিজয় লাভ করল শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি। গণতন্ত্রের বিধান অনুসারে সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট শেখ মুজিব সরকার গঠন করার কথা। কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময়কাল এবং শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক তুলে জাতীয় পরিষদ আহ্বানও করা হলো না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরও হলো না। তার বদলে শুরু হলো ভুট্টো-সামরিক কোটারী-পাঞ্জাবী স্বার্থের কুৎসিত ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্র যুক্তির বদলে শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করল এবং সামরিক শক্তি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দমন

www.icsbook.info

করতে চাইল। এই পরিস্থিতিই ডেকে নিয়ে এল রক্তক্ষয়ী সংঘাত। এই সংঘাতেই ভেঙে গেল পাকিস্তান এবং সৃষ্টি হলো স্বাধীন বাংলাদেশের। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা।

এই ঘটনা অনেক ঘটনার পরিনতি। ভারতে বৃটিশ রাজত্বের সমাপ্তি পর্বে জাতি হিসেবে মুসলমানদের নতুনভাবে রাজনৈতিক অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং তারা পাকিস্তান নামক একটা রাষ্ট্রের মালিক হয়েছিল। কিন্তু এর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের উপর যে পবিত্র দায়িত্ব এসে বর্তায়, তা পালন করার মত ইসলাম নির্ধারিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতিনিষ্ঠা তাদের মধ্যে ছিল না। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রেই এর নগ্ন প্রকাশ ঘটেছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ভারতের ক্ষমতাসীন মহলের ষড়যন্ত্র। যার লক্ষ্য ছিল ৪৭-এর ভারত বিভাগের মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া স্বাধীন মুসলীম আবাসভূমির যেভাবে পারা যায়, যতটুকু পারা যায় ক্ষতি করা।

শুরু থেকেই পাকিস্তানে গণতন্ত্র অনুশীলনের সুযোগ হয়নি। আর বলা যায়, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেও মুসলিম লীগে গণতন্ত্রের অনুশীলন বড় বেশী দেখা যায়নি। কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মনে-প্রাণে গণতন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সমকক্ষ কোন নেতা মুসলিম লীগে না থাকায় স্বাভাবিক ও সংগতভাবেই মুসলিম লীগে তাঁর একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ ৩০ বছর তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন। অথচ পাশাপাশি হিন্দু কংগ্রেসে প্রায় প্রতি বছরই সভাপতি পরিবর্তন হতো। ফলে কংগ্রেসে সমমানের বহু নেতৃত্বের বিকাশ যেভাবে ঘটেছিল মুসলিম লীগে তা হয়নি। মুসলিম লীগের সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হতো, কিন্তু কায়েদে আযমের অভিমতের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। এক সেট সমমানের নেতৃত্ব না থাকার কুফল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। কায়েদে আযম ছিলেন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট, নতুন রাষ্ট পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন তিনি, সেই সাথে তিনি ছিলেন গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রী সভার বৈঠকে তিনিই সভাপতিত্ব করতেন। লিয়াকত আলী খান প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু শীর্ষ নির্বাহী দায়িত্ব কায়েদে আযমকেই পালন করতে হতো। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের অভিভাবক পর্যায়ে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ক্ষমতার এই এককেন্দ্রিকতা অপছন্দ করেছিলেন এবং বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[১] কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালীন সংকট, জটিলতা, ইত্যাদি কারণে কায়েদে আযমের পক্ষে নিছক গভর্নর জেনারেলের আরাম কেদারায় বসে থাকা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া কায়েদে আযম এজন্যে যথেষ্ট সুযোগও পাননি। স্বাধীনতা লাভের এক বছর উনত্রিশ দিনের মাথায় তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু যে শূন্যতার সৃষ্টি

১। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, Page 252.

www.icsbook.info

করল তা পূরণ করার কেউ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনকে নিয়ে এসে বসানো হলো গভর্নর জেনারেলের আসনে। মুসলিম লীগের সভাপতির জন্যে লোক খোঁজাখুজি করে অবশেষে তা প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাঁধেই অর্পণ করা হলো। লিয়াকত আলী খান ও খাজা নাজিম উদ্দীনের মধ্যে সম্পর্ক সব সময়ই ভাল ছিল। সুতরাং তাদের আমলে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পত্তন হবার খুবই সুযোগ ছিল। কিন্তু নানা কারণে সে সুযোগ হয়নি, সে সময়ও পাওয়া যায়নি। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে লিয়াকত আলী খান নিহত হলেন। এই হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের আকাশে যে অশুভ কালো মেঘ দানা বেঁধে উঠছিল তা শীঘ্রই স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করল। অশুভ কালো মেঘটি দানা বেঁধে উঠছিল পাকিস্তানের ক্ষমতার আসনকে কেন্দ্র করে। পাকিস্তানে সম্পদ ও ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব। প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে তাদেরই ছিল একাধিপত্য। কিন্তু পাকিস্তানের মূল নেতৃত্বে তখন পাঞ্জাবীরা ছিল না। কায়েদে আযম ছিলেন পাকিস্তান এলাকার বাইরে থেকে আশা রিফুজী। লিয়াকত আলী খানও তাই। আর নাজিম উদ্দিন ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। এই নেতৃত্বের অধীনে যে শাসনতন্ত্র প্রণীত হচ্ছিল, তাতে পাঞ্জাবের একাধিপত্য খর্ব হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। এই আশংকাকে কেন্দ্র করে যে অশুভ চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠছিল, তারই ছোবলে প্রাণ দিলেন লিয়াকত আলী খান।[২] আর এ চক্রান্তেরই শেষ ছোবল ছিল ১৯৭১ সালে শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা না দেয়া এবং পাকিস্তান ভেঙ্গে দিয়ে হলেও ক্ষমতা পাঞ্জাবের হাতে কুক্ষিগত রাখা।

লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর নাজিম উদ্দীন হলেন প্রধানমন্ত্রী এবং পাঞ্জাবের অভিজ্ঞ বৃটিশ আমলা ও পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ বসলেন গভর্নর জেনারেল আসনে। গোলাম মোহাম্মদের কোন রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না, তিনি ছিলেন মনে প্রাণে আমলা। আর ছিলেন পাঞ্জাব এবং সিভিল ও মিলিটারী আমলা স্বার্থের প্রতীক।[৩] সুতরাং আমলা গোলাম মোহাম্মদ এবং রাজনীতিক নাজিম উদ্দিনের দৃষ্টিভংগির মিল হলো না। পাঞ্জাবী স্বার্থের অশুভ থাবার কাছে সুশিক্ষিত নাজিম উদ্দিন নতি স্বীকার করতে চাইলেননা। মন্ত্রী সভায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হতে লাগল। পাঞ্জাবী গ্রুপ সেখানে সুস্পষ্টভাবেই মাথা তুলল।[৪] খাজা নাজিম উদ্দিন নতি স্বীকার করলেন না, কিন্তু হারালেন প্রধানমন্ত্রীর পদ। ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বরখাস্ত করলেন নাজিম উদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে। প্রধানমন্ত্রীর পদ দেয়া হলো বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে। নতুন প্রধানমন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব

২। 'Friends not Master', Field Marshall Ayub Khan, page 41.
৩। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, Page 262, 263.
৪। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, Page 266.

www.icsbook.info

পরিত্যাগ করে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্য মেনে নিয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রশ্নে আপোশ করলেন। বাংলা ও উর্দুকে যৌথভাবে রাষ্ট্রভাষা করার ব্যাপারেও ঐকমত্য হলো। এই সমঝোতা ১৯৫৩ সালের অক্টোবরে পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলো। এরপর প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় বলা হলো যে, ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করার জন্যে খসড়া শাসনতন্ত্র পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হবে। কিন্তু এই আপোশমূলক ফর্মূলাও পাঞ্জাবের স্বার্থবাদী মহলটিকে সন্তুষ্ট করতে পারলোনা। তারা মনে করল পাকিস্তান ৫ ইউনিটে বিভক্ত হওয়ায় তাদের স্বার্থ বিপন্ন হবে পূর্ব পাকিস্তানের মোকাবিলায়। এই স্বার্থেরই ক্রীড়নক ছিলেন গবর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পরপরই তিনি শাসনতন্ত্র পাশ হওয়ার পথ রুদ্ধ করার জন্যে ১৯৫৩ সালের ২৪শে অক্টোবর মন্ত্রীসভা বাতিল করলেন এবং গণপরিষদ ভেঙ্গে দিলেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করা হলো। সুপ্রীম কোর্ট আদেশটিকে বৈধ ঘোষণা করল, তবে তার রায়ে বলল, রাষ্ট্র প্রধান কোন শাসনতন্ত্র জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে অবশ্যই সাবেক গণপরিষদ যেভাবে নির্বাচিত হয়েছিল, সেভাবে একটি গণপরিষদ নির্বাচিত করতে হবে। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফল হিসেবেই ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

পাকিস্তানের শাসক মহলের এবং প্রভাবশলী চক্রের এই অগণতান্ত্রিকতা পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক বিকাশ শুধু ব্যাহত করেনি, রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যকার সম্পর্ককেও বিষাক্ত করে দিয়েছিল। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে এটা হয়েছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এখানে মুসলিম লীগের একটা গ্রুপ আরেকটা গ্রুপের সাথে আচরণ করছিল শত্রুর মত। বাংলায় মুসলিম লীগের মধ্যে দুইটি গ্রুপ বিভাগ-পূর্ব অর্থাৎ পাকিস্তান পূর্ব কালেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মূখ্যত স্বাধীন ও অখণ্ড বাংলার প্রশ্ন নিয়ে তখন মুসলিম লীগের দুইটি ধারা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

এই গ্রুপ বিভক্তির একদিকে ছিল বাংলার প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী, মন্ত্রী ফজলুর রহমান, আবুল হাশিম, প্রমুখ, অন্যদিক মাওলানা আকরম খান, নুরুল আমিন, নাজিম উদ্দিনসহ মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় পনর আনা সদস্য। এই শেষোক্ত গ্রুপের অভিযোগ ছিল সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিমরা স্বাধীন বাংলার নামে খেয়াল-খুশী ও স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেন। শেষোক্ত এই ধারাটিই মুসলিম লীগের মূলধারা ছিল এবং দেশ বিভাগ অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগের এই অংশটিই ক্ষমতা হাতে পায়। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন অন্য গ্রুপটি দেশ বিভাগের পরও কোলকাতায় থেকে যাওয়ায় এই সুযোগ তারা

www.icsbook.info

আরও বেশী হারায়। মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীন ধারাটি ক্ষমতায় বসার পর যে উদারতা ও গণতান্ত্রিকতার পরিচয় দেয়া উচিত ছিল তা তারা দেয়নি। বরং শত্রুতামূলক আচরণে অবতীর্ণ হয়। দেশ বিভাগের পরপরই অখণ্ড বাংলার মুসলিম লীগ ভেঙে দেয়া হয় এবং সোহরাওয়ার্দী, ভাসানীসহ তাদের গ্রুপের লোকদের বাদ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কমিটি গঠিত হয়। এমনকি মুসলিম লীগের সাধারণ সদস্যপদ গ্রহণের পথও সোহরাওয়ার্দী গ্রুপের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। আতাউর রহমান খানের মত লোকও বারবার ধর্ণা দিয়েও মুসলিম লীগের প্রাথমিক সদস্যপদের রশীদ বই পাননি।[৫] এই অবস্থায় 'মুসলিম লীগ কর্মীরা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রথম নারায়ণগঞ্জে ও পরে টাঙ্গাইলে কর্ম সম্মেলন করে নেতাদের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করে এবং মুসলিম লীগের দরজা খুলে দেবার দাবী জানায়।[৬] এই দাবীর প্রতি কোন কর্ণপাত করা হয়নি। ফল হিসেবে গঠিত হলো পাল্টা মুসলিম লীগ। নাম দেয়া হলো আওয়ামী মুসলিম লীগ। ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকার 'রোজ গার্ডেন'-এর হল কামরায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মওলানা ভাসানীকে সভাপতি ও টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটা কার্যকরী কমিটি গঠিত হলো।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন মুসলিম লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে ভয়ানক শত্রুতার সৃষ্টি করল। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগের বিরোধিতাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরোধিতা হিসেবে অভিহিত করল। সোহরাওয়ার্দীকে 'হিন্দুস্তানের লেলিয়ে দেয়া পাগলা কুত্তা' বলে অভিহিত করা হলো। উল্লেখ্য, দেশ বিভাগের পর কোলকাতায় থাকা অবস্থায় সোহরাওয়ার্দী উভয় বাংলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্যে দেবতোষ দাসগুপ্ত, দেবনাথ সেন, সুব্রত রায়, প্রমুখ হিন্দুনেতাদের শামিল করে একটি শান্তিবাহিনী গঠন করেছিলেন এবং বাংলাদেশ সফরের আয়োজন করেছিলেন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সোহরাওয়ার্দীর এই উদ্যোগকে সন্দেহের চোখে দেখে এবং বলে যে, শান্তি বাহিনীর বাংলাদেশ সফর এটাই প্রমাণ করার জন্যে যে, বাংলাদেশে হিন্দু বিরোধী দাঙ্গা-হাঙ্গামা আছে। সোহরাওয়ার্দীকে শুধু মুসলিম লীগ থেকে বাদ দেয়া নয়, তার পার্লামেন্ট সদস্যপদও বাতিল করা হয়। অবশেষে বাধ্য হয়েই সোহরাওয়ার্দী 'পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী মুসলীম লীগ' গঠন করেন। ১৯৫৩ সালের ২১শে এপ্রিল সোহরাওয়ার্দীর 'পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী লীগ' ও ভাসানীর নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগকে' একত্রিত করে পাকিস্তান ভিত্তিক 'পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' গঠনের জন্যে সোহরাওয়ার্দীকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়।

৫। 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', আবুল মনসুর আহমদ, পৃষ্ঠা ৩৭।
৬। 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', আবুল মনসুর আহমদ, পৃষ্ঠা ৩৮।

www.icsbook.info

এইভাবে মুসলিম লীগের ক্ষমতাসীন গ্রুপের অসহনশীলতা ও অগণতান্ত্রিকতার কারণে মুসলিম লীগ দুই ভাগ হয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দুই দ্বন্দ্বমান দলে রূপ নিল। আর এর অনেক আগেই বাংলার জনপ্রিয় নেতা শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তাঁরও ছিল একটা স্বতন্ত্র দল। ১৯৫৪ সালের ১০ই মার্চের নির্বাচনকে সামনে রেখে শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হকের পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টি, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও ভাসানীর আওয়ামী মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, গণতন্ত্রী দল ও খেলাফতে রব্বানী পার্টির সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয় ১৯৫৩ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হলো।[৭] পাকিস্তানের সে প্রথম নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগের ১৪৩টি আসন, কৃষক শ্রমিক পার্টির ৪৮টি আসনসহ যুক্তফ্রন্ট পেল মোট

৭। বিখ্যাত ও বহুল আলোচিত ২১ দফা ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ

"নীতি ঃ কোরআন ও সুন্নাহর মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে।

৩। পাট ব্যবসার জাতীয়করণ, পাটচাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য দান, মুসলিম লীগ আমলের পাট কেলেংকারীর তদন্ত।

৪। সমবায় কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন, সকল কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন।

৫। পূর্ব পাকিস্তানের লবণ শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, লবণ কেলেংকারীর জন্য দায় মুসলিম লীগ মন্ত্রী সভার সদস্যদের শাস্তি বিধান।

৬। খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও খরার হাত হইতে রক্ষা।

৭। পূর্ব পাকিস্তানকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত, কৃষিকে যুযোগপযোগী করিয়া দেশকে শিল্প ও খাদ্যে স্বাবলম্বী করা I.L.O এর বিধান অনুসারে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৮। শিল্পী ও কারিগর মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা।

৯। প্রাথমিক, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায়সংগত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা।

১০। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের মধ্যকার পার্থক্য দূর করা, শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ভাতার ব্যবস্থা।

১১। 'ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন' বাতিল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসন দান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সহজলভ্য ও ছাত্রাবাসকে অল্প ব্যয়সাধ্য করা

১২। শাসন ব্যয়হ্রাস, উচ্চ বেতন কমিয়ে, নিম্ন বেতন বাড়িয়ে সামঞ্জস্য বিধান, যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের ১ হাজার টাকার বেশী বেতন না দেয়া।

১৩। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ রিশওয়াত বন্ধ করা, ১৯৪০ সালের পরবর্তী পিরিয়ডের জন্যে সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারী ও ব্যবসায়ীদের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ এবং অবৈধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।

১৪। 'জন নিরপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স' প্রভৃতি কালাকানুন বাতিল, বিনাবিচারে মুক্তি দেয়া এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতির অধিকার নিরংকুশ করা।

১৫। বিচার ও শাসন বিভাগকে পৃথক করা।

১৬। যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের বদলে কম বিলাসের বাড়ীতে বাস করবেন।

১৭। ভাষা শহীদদের শাহাদাতের স্থানে শহীদ মিনার স্থাপন ও শহীদ পরিবারের ক্ষতিপূরণ।

১৮। ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ও সরকারী ছুটি ঘোষণা।

১৯। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের পূর্ব পাকিস্তানকে স্বশাসিত ও সভরিণ করা হইবে, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি ও মুদ্রা ছাড়া সব বিষয় পূর্ব পাকিস্তানের হাতে থাকবে, নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে থাকবে, অস্ত্র তৈরীর কারখানা স্থাপনসহ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হবে।

www.icsbook.info

২২৩টি আসন। অন্যদিকে মুসলিম লীগ পেল মাত্র ১০টি আসন। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানে তখন মুসলিম লীগই ক্ষমতায় ছিল। পূর্ব পাকিস্তান পার্লামেন্টের ৪০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৪০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হলো পাকিস্তান গণপরিষদ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য। বিধান অনুসারে এই পরিষদ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর পরিণত হবে আইন পরিষদ বা জাতীয় পরিষদে এবং গঠন করবে শাসনতান্ত্রিক সরকার।

এইভাবে পাকিস্তান নতুন এক শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ে প্রবেশ করল এবং জাতির সামনে গণতন্ত্রের একটা সোনালী দিগন্ত উন্মোচিত হলো। সে সোনালী দিগন্তে গণতন্ত্রের সূর্য উদিতও হয়েছিল। কিন্তু স্বার্থপরতা, ষড়যন্ত্র, অগণতান্ত্রিকতা ও অসহনশীলতার কালো মেঘ গণতন্ত্রের নির্মল সে সূর্যালোক মানুষকে দেখতে দেয়নি। গণপরিষদের একমাত্র কাজ ছিল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। গণপরিষদের তিন প্রধান গ্রুপ, মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ ও যুক্তফ্রন্ট। এর মধ্যে মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট একমত হয়ে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে শাসনতন্ত্রের খসড়া পার্লামেন্টে উত্থাপন করল এবং তা পার্লামেন্টে পাশ হলো ১৯৫৬ সালের ২৯ শে ফেব্রুয়ারী। স্বাধীনতার প্রায় ৯ বছর পর জাতি একটা শাসনতন্ত্র পেল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল শাসনতন্ত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন নিয়ে। প্রেসিডেন্ট তখন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। তিনি বললেন, তিনি শাসনতন্ত্রে দস্তখত করবেন, যদি তাঁকে পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৮] ইস্কান্দার মির্জা শুধু এ দাবী আদায় করেই ছাড়লেন না, কেন্দ্রীয় সরকারকে কুক্ষিগত করারও ব্যবস্থা করলেন। তার ষড়যন্ত্রে মুসলিম লীগ দ্বিধা বিভক্ত হলো এবং ভাগ হয়ে যাওয়া অংশটি রিপাবলিকান পার্টি নাম পরিগ্রহ করল। ফলে শাসনতন্ত্র পাশকারী মুসলিম লীগ-যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রে ছয়মাসের বেশী টিকলনা। এরপর সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করে আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান জোটের সরকার গঠিত হলো। কিন্তু এ সরকারও এক বছরের বেশী টিকলনা। আসন্ন নির্বাচনের ভয়ে ভীত হয়ে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা নির্বাচন বানচালের জন্যে সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগে বাধ্য করলেন এবং আই আই চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বে গঠিত হলো নতুন মন্ত্রীসভা। দুইমাসেই এ মন্ত্রী সভা ভেঙে পড়ল। এরপর গঠিত হলো ফিরোজ খান নুন মন্ত্রীসভা। এ মন্ত্রীসভা যখন ১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সাধারণ নির্বাচনের কর্মসূচী নিয়ে সামনে এগুচ্ছিল, এই সময় ১৯৫৮

২০। যুক্তফ্রন্ট কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের মেয়াদ বাড়াবে না, মেয়াদ শেষ হবার ছ'মাস আগে মন্ত্রীসভার পদত্যাগ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা।

২১। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার আমলে পরিষদের কোন সদস্যপদ খালি হলে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা, পর পর ৩টি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রীসভার স্বেচ্ছায় পদত্যাগ। (অলি আহাদের 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫ গ্রন্থ থেকে (পৃষ্ঠা ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫) (সংক্ষিপ্ত)।

৮। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, page: 361.

www.icsbook.info

সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পার্লামেন্ট, কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকার বাতিল করলেন এবং জারি করলেন সামরিক শাসন। কিন্তু ইস্কান্দার মির্জার আশা পূরণ হলো না। জেনারেল আইয়ুব খান ষড়যন্ত্রের নটরাজ মির্জাকে সরিয়ে পাকিস্তানে ক্ষমতা হাতে নিলেন।

কেন্দ্রে যখন গণতন্ত্রের দেহ নিয়ে শকুনের ঐ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তখন পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদেও গণতন্ত্রের দেহ ব্যবচ্ছেদ চলছিল। চলছিল অস্থিরতা, অসহশীলতা অগণতান্ত্রিকতার সয়লাব। প্রদেশের রাজনীতি যেমন কেন্দ্রে পৌছল, তেমনি কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র ও প্রদেশকে ক্লেদাক্ত করল।

১৯৫৪ সএলর ১০ ই মার্চের নির্বচনের দুই মাস পাঁচ দিন পর যুক্তফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতাদ্বন্দ্বেরএকটা পর্যায় শেষে শেরে বাংলার নেতৃত্বে যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হলো, কেন্দ্রের সেই গোলাম মোহাম্মদের তরফ থেকে আসা ৯২ ক ধারা শীঘ্রই তার কণ্ঠরোধ করল। শুধু মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া নয়, শেরে বাংলাকে 'দেশদ্রোহী' অ্যাখ্যা দেয়া হলো এবং বিদেশ সফররত মাওলানা ভাসানীকে দেশে ফিরতে দেয়া হলো না। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়া এবং ৯২ ক ধারা প্রত্যাহারের পর 'দেশদ্রোহী' বলে আখ্যায়িত শেরে বাংলার সাথে আপোশ করে তার দলের আবু হোসেন সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্য মন্ত্রী করে সরকার গঠন করা হলো ১৯৫৫ সালের জুনে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পর কেন্দ্রে হাওয়া বদলের প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সরকারের পতন ঘটল এবং আরেক দফা দল বদলের মধ্যে দিয়ে ১৯৫৬ সালে ৬ই সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হলো আতাউর রহমানকে মুখ্য মন্ত্রী করে। এই সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ বছর দেড়েক নিরাপদে রাজত্ব করার সুযোগ পায়। কিন্তু সুখ যেন আমাদের রাজনীতির ধাতে নেই। ১৯৫৭- এর মাঝামাঝির দিকে আওয়ামী লীগের ৩০ জন সংসদ সদস্য দল ত্যাগ করে ন্যাপে যোগ দেন। ফলে আওয়ামী লীগ সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায়। প্রাদেশিক গভর্নর শেরে বাংলা ফজলুল হক সুযোগ পেয়ে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা বাতিল করে স্বদলীয় এবং যুক্তফ্রন্ট নেতা আবু হোসেন সরকারকে সরকার গঠনের জন্যে আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগ তখনও কেন্দ্রে ক্ষমতায়। সুতরাং কেন্দ্র শেরে বাংলার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করলো না, বরং গভর্নর শেরে বাংলাকেই পদচ্যুত করা হলো এবং আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা পূনর্বহাল হলো। কিন্তু সংসদে আস্থা ভোটে পরাজিত হলো আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা। এদিকে আবু হোসেন সরকারের যুক্তফ্রন্ট সরকারও ক্ষমতায় থাকতে পারলো না ন্যাপের চরম সুবিধাবাদী আচরণের কারণে। তাদের এই আচরণের কারণে এক সপ্তাহে পূর্ব পাকিস্তানে দুইটি মন্ত্রীসভার পতন ঘটল। এই

www.icsbook.info

অরাজক অবস্থায় প্রেসিডেন্টের শাসন জারি করা হোল সংকট উত্তরণের জন্যে। দুইমাস পরে প্রেসিডেন্টের শাসন প্রত্যাহারের পর আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা পুনর্বহাল করা হয় এবং সেপ্টেম্বরে (১৯৫৮) ডাকা হলো পূর্ব পাক পরিষদের অধিবেশন। অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে। অধিবেশনে দ্বন্দ্বমান গ্রুপের সংঘাতকালে নিহত হলেন ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী। এই ঘটনার মাত্র ১৩ দিন পর ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পার্লামেন্ট ও শাসনতন্ত্র বাতিল করে জারি করা হলো সামরিক শাসন।

এরপর ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সামরিক শাসন এবং নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের যুগ। ১৯৬৯ সালে ২৩ শে মার্চ আইয়ূব খান পদত্যাগ করলে জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করে শাসনতন্ত্র ও পার্লামেন্ট বাতিল করেন। ইয়াহিয়ার অধীনেই পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং অতীতের মত সে নির্বাচনও বাতিল করা হয়। তারই পরিনতিতে আসে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা।

সুতরাং পাকিস্তানের একটা কোটারী স্বার্থের স্বেচ্ছাচারিতা ও ষড়যন্ত্রের হাতে পণবন্দী ছিল পাকিস্তানের জনগণ। এই জনগণেরই একটা অংশ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অবশেষে এর হাত থেকে মুক্তির যে সংগ্রাম শুরু করে, তাই-ই ছিল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।

এই মুক্তির চেতনাকে আরো কয়েকটি বিষয় সাহায্য করে, তার মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় অর্থনৈতিক বঞ্চনার অনুভূতি।

পূর্ব পাকিস্তান ভূ-খণ্ড ছিল বৃটিশ ভারতের সবচেয়ে বঞ্চিত এলাকা। বৃটিশ বেনিয়াদের সবচেয়ে বেশী শোষণের শিকার হয়েছে এই অঞ্চল। ছিয়াত্তর এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের হৃদয়বিদারক ঝড় বয়ে গিয়েছিল এই অঞ্চলের উপর দিয়ে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার এই অঞ্চলে কোথাও এক তৃতীয়াংশ, কোথাও অর্ধেক লোক মারা যায়। বৃটিশ আমলের শেষ পর্যন্ত এই বাংলাদেশ অঞ্চলের ভাগ্যের কোন উন্নতি হয়নি। বৃটিশ যুগে আধুনিক শিল্প-অর্থনীতির যে বিকাশ ঘটেছিল, তার কোন ছাপ পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলে লাগেনি। এই অঞ্চলের সর্ববৃহৎ শহর ঢাকা একটি জেলা শহরের বেশী কিছু ছিল না। লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ১ লাখের মত।[১] তৎকালীন বিশ্বের পাট সম্পদের ৭৫ ভাগ উৎপাদিত হতো বাংলাদেশ অঞ্চলে, কিন্তু একটিও পাটকল এখানে গড়ে উঠেনি। সব পাটকলের অবস্থান ছিল কোলকাতায়। নামকাওয়াস্তে দুইটি বস্ত্রকল ছিল গোটা বাংলাদেশে। বৃটিশ আমলের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ অঞ্চল ছিল কৃষিপণ্য ও কাঁচামালের সরবরাহের ক্ষেত্র।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে একটা জেলা শহর ঢাকা যেমন প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদায় উন্নীত হলো, তেমনি

১। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, page: 327.

www.icsbook.info

বাংলাদেশেও উন্নয়নের ছোয়া লাগল। ৪৭ থেকে ১৯৭০ সাল -এই দুই দশকের মধ্যে পাট কলের সংখ্যা শূন্য থেকে প্রায় ৭০ টিতে উন্নীত হলো। আর বস্ত্রকলের সংখ্যা ২টি থেকে ৪৩টিতে গিয়ে পৌঁছল। এইভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সবক্ষেত্রেই উন্নয়নের যাত্রা শুরু হলো। কিন্তু শত শত বছরের অবহেলিত, বঞ্চিত এ অঞ্চলের উন্নয়নের যে দাবী ছিল তা পুরণ হলো না, বঞ্চনা থেকে যে মুক্তি এ অঞ্চলের জনগণের কাম্য ছিল, তা এলো না। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত শিল্প-কারখানার সংখ্যা বাড়ল বটে অনেক, কিন্তু তাতে এ অঞ্চলের মানুষের অংশগ্রহণ আশানুরূপ ছিলনা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় পাট শিল্পের শতকরা ৬৬ ভাগ ও বস্ত্র শিল্পের ৪৭ ভাগ স্থায়ী মূলধন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ২৫ লাখ টাকার বেশী মূলধন- বিশিষ্ট শিল্প সমূহের ৬টি ব্যতীত বাকী সব কয়টির মালিকানা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা নয় এমন ব্যক্তিদের হাতে।[১০]

এই সাথে চাকুরী-বাকুরীসহ অন্যান্য অকৃষিজ অর্থকরী ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অঞ্চলের মানুষ ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পর যেভাবে সামনে এগুবার কথা ছিল তা পারলনা। এর একটা বড় কারণ ছিল এ অঞ্চলের মানুষের যুগ-যুগান্তের কৃষি নির্ভরতা এবং নতুন শিল্প-কারিগরী-ব্যবসার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ ও অনভিজ্ঞতা। কিন্তু স্বাধীনতার প্রাক্কালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধজনিত অভাব-দারিদ্র থেকে উদ্ভূত প্রয়োজনের তাকিদ এ অঞ্চলের মানুষকে প্রথমবারের মত শহরমূখী এবং শিল্প ব্যবসায়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলছিল। স্বাধীনতার পর হিন্দু শিল্প-ব্যবসায়ীরা ব্যাপকহারে হিন্দুস্তানে চলে যাবার পর এই ক্ষেত্র তাদের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এ সুযোগ তাদের কপালে জুটলনা। কাজী আনওয়ারুল হক[১১] লিখছেন, "কয়েক বছর ধরে ভারত থেকে রিফুজী আসায় সমস্যা জটিলতর হয়েছিল। রিফুজী যারা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল তারা ছিল শহুরে। পেশায় ছিল ব্যবসায়ী, দোকানদার, কারিগর, আধা-দক্ষ শ্রমিক, ইত্যাদি।.... আর হিন্দু যারা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারত চলে গিয়েছিল তারা ছিল বিভিন্ন চাকুরে, ব্যবসায়ী ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই এদের রেখে যাওয়া শূন্যস্থান ভারত থেকে আসা ঐ মুসলিম রিফুজীরাই পূরণ করেছিল।"[১২] এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল একটা বিদঘুটে অবস্থা। ভারত থেকে আসা রিফুজীদের অধিকাংশই ছিল অবাঙ্গালী। শিল্প ব্যবসায়ে এদের সরব উপস্থিতি সমাজে এদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।[১৩] সেই সময়ের পরিস্থিতিতে এই অবস্থাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু এ অবস্থা থেকে কি সংকটের সৃষ্টি হতে পারে

১০। 'Nationalisation of Industries in Bangladesh: Background and Problems', Rehman Sobhan.

১১। কাজী আনোয়ারুল হক পূর্ব পাকিস্তানের একজন শীর্ষ আমলা। ১৯৩৩ সালে তিনি পুলিশ সার্ভিসে যোগ দেন। ইনি পুলিশের আইজি, পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী এবং জিয়াউর রহমান সরকারের মন্ত্রী ছিলেন।

১২। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, page: 329, 330.

১৩। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, page: 330.

www.icsbook.info

তা আঁচ করতে রাজনীতিকরা ব্যর্থ হন। যার ফলে অনুসৃত হতে থাকল ভুলনীতি, যা সৃষ্টি করল বাঙালী ও অবাঙালীদের মধ্যে আস্থা ও সমঝোতার সংকট।[১৪] পূর্ব পাকিস্তানের একজন শীর্ষ আমলা এবং পরবর্তীকালে রাজনীতিক কাজী আনওয়ারুল হকের ভাষায়, "পূর্ব পাকিস্তানে নতুন সমাজ বিন্যাসে দু'টি ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। একদিকে অধিকাংশ জনসমষ্টি সম্বলিত বাঙালী জনগন, অন্যদিকে ছিল ক্ষুদ্র সংখ্যার অবাঙালী। বাঙালী জনগণ প্রধানতঃ কৃষির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল, আর অবাঙালীরা হিন্দুদের দেশত্যাগের ফলে শূন্য হয়ে পড়া শিল্প-বাণিজ্যের স্থান এসে পূরণ করল। প্রধানতঃ কৃষির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়া বাঙালীদের উন্নয়ন হলো স্থবিরতায় আক্রান্ত, অন্যদিকে স্বাধীনতা-উত্তর শিল্প বাণিজ্যের নতুন বিকাশ অবাঙালীদের দ্রুত সমৃদ্ধি দান করল।[১৫] এইভাবেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে জনতার কাতারে একই দেশের নাগরিকদের মধ্যে একটা শ্রেণী বৈষম্য গড়ে উঠল। যা মুহাজির ও আনসার (অবাঙালী ও বাঙালী) দের মধ্যে সখ্যতার বদলে সৃষ্টি করল বিদ্বেষ, সমন্বয়-সম্মিলনের পরিবর্তে বিভেদ। এই বিভেদ বিদ্বেষই উত্তরকালে প্রধান রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়াল বাংলাদেশ অঞ্চলের বাঙালী জনগণের জন্যে যা পূর্ব পাকিস্তানকে পরিণত করল স্বাধীন বাংলাদেশ।

পাকিস্তানী শাসক মহলের অবিবেচনা ও স্বৈরতার আরেকটি বড় দৃষ্টান্ত হলো পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনগণের মুখের ভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করা এবং তাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দিয়ে পাকিস্তানের কারও ভাষা নয় এমন ভাষা উর্দূকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা করা। এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সচেতন সব মানুষ।'৪৭ সালে যে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা ১৯৫২ সালে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলো বরকত, সালাম জব্বার, প্রমুখ দেশের অমর সন্তানদের শাহাদাতের মাধ্যমে। শুধু দাবী করে যে ন্যায্য অধিকার অর্জন করা যায়নি, রক্তদানের মাধ্যমে তা অর্জিত হলো। বাংলা ভাষা পেল রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা।

পাকিস্তানের তদানীন্তন শাসকবর্গের রাজনৈতিক চরিত্রে যেমন গণতন্ত্র ছিলনা, তেমনি দেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত সমূহের মধ্যে কোন সুবিচার ছিল না। '৪৭ এর স্বাধীনতার পর যুগ-যুগান্ত ধরে শোষিত বঞ্চিত অবহেলিত বাংলাদেশ অঞ্চলের জনগণের প্রতি যে বিশেষ নজর দেয়ার প্রয়োজন ছিল ঐ শাসকরা তা দেয়নি। এতো গেল একদিক, অন্যদিকে সরকারের গৃহীত পুঁজিবাদী, অগণতান্ত্রিক ও কোটারী স্বার্থপীড়িত দৃষ্টিভংগী রাজনৈতিক ক্ষেত্রের স্বেচ্ছাচারিতার মতই পূর্ব পাকিস্তানের উপর জুলুম হিসেবে চেপে বসল।

১৪। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, page: 330.
১৫। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, page: 331.

www.icsbook.info

"শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাদির ভিতরও এমন কোন বিধান সন্নিবিষ্ট করা হয়নি যার ফলে বাধ্যতামূলকভাবে দুই বিচ্ছিন্ন অংশের সমানভাবে সকল ক্ষেত্রে উন্নতি করা সম্ভবপর হয়। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের মধ্যে শাসনতন্ত্রে বলা হয়েছে বটে যে, দেশের প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় অংশের সমান অধিকার দেয়া হবে। কিন্তু কিভাবে সে ব্যবস্থা কার্যকরী করা হবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন নির্দেশনা ছিল না। এমনকি এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান অনুযায়ী কাজ চলছে কিনা সেটাও পর্যবেক্ষণ করার জন্যে কোন বিশিষ্ট অফিস বা কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে দুই প্রদেশের ভিতর শাসনতান্ত্রিক সুবিধাদি সমীকরণের যে সদিচ্ছা তা প্রায় কাগজে কলমেই পর্যবসিত হয়েছে।"[১৬] এরই ফল হিসেবে দুই প্রদেশের মধ্যে গড়ে উঠল বৈষম্যের পাহাড়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে এই বৈষম্যের পাহাড় ছিল নিম্নরূপঃ[১৭]

চাকুরীর ক্ষেত্র	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিয়েট	৮১ শতাংশ	১৯ শতাংশ
দেশ রক্ষা	৯১.৯ শতাংশ	৮.১ শতাংশ
শিল্প	৭৪.৩ শতাংশ	২৫.৭ শতাংশ
স্বরাষ্ট্র	৭৭.৫ শতাংশ	২২.৫ শতাংশ
তথ্য	৭৯.৯ শতাংশ	২০.১ শতাংশ
শিক্ষা	৭২.৭ শতাংশ	২৭.৩ শতাংশ
স্বাস্থ্য	৮১.০০ শতাংশ	১৯.০০ শতাংশ
কৃষি	৭৯.০০ শতাংশ	২১.০০ শতাংশ
আইন	৬৫.০০ শতাংশ	৩৫.০০ শতাংশ

শিল্প ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও এই ধরনের পীড়াদায়ক বৈষম্য বিরাজমান ছিল। ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত মূলধন ও বিনিয়োগ বাবদ পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় ২৭৮ কোটি টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তানকে দেয়া হয় প্রায় ৪৪৫ কোটি টাকা। এই সময়কালে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় ঋণ বাবদ পায় ১৬১ কোটি টাকা, আর পশ্চিম পাকিস্তান পায় ২৯৩ কোটি টাকা।[১৮] কতিপয় কর যেমন শুল্ক, বিক্রয়কর,আবগারী ও আয়কর সেই সময়ের বিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করতো এবং তার একটা অংশ প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে বন্টন হতো। এই বন্টনের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিশেষ নজর দেবার চেষ্টা করা

১৬। 'আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা', ওয়াজেদ আলী সরকার, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার ঢাকা, প্রকাশ ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ৯৪।

১৭। 'আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা', ওয়াজেদ আলী সরকার, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার ঢাকা, প্রকাশ ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ৯৪,৯৫।

১৮। 'আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা', ওয়াজেদ আলী সরকার, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার ঢাকা, প্রকাশ ১৯৬৮, পৃষ্ঠা ৯৭।

www.icsbook.info

হয়, কিন্তু পরে পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা করে বৈষম্য দৃষ্টি অনুসরণ করা হতে থাকে। নীচের দৃষ্টান্ত থেকে এর প্রমাণ মিলবে ঃ[১৯]

সন	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৮-৪৯	২.৪৯ কোটি টাকা	১.৯০ কোটি টাকা
১৯৫০-৫০	৫.৩৯ কোটি টাকা	৩.৬৭ কোটি টাকা
১৯৫০-৫১	৬.৬৮ কোটি টাকা	৫.২৮ কোটি টাকা
১৯৫১-৫২	৯.৩৬ কোটি টাকা	৭.৭২ কোটি টাকা
১৯৫২-৫৩	৯.৬৬ কোটি টাকা	৯.২২ কোটি টাকা
১৯৫৩-৫৪	৮.৮৪ কোটি টাকা	৮.৬৩ কোটি টাকা
১৯৫৪-৫৫	৯.০৬ কোটি টাকা	১০.০৪ কোটি টাকা
১৯৫৫-৫৬	১১.২৭ কোটি টাকা	১১.৫১ কোটি টাকা
১৯৫৬-৫৭	১০.৭৪ কোটি টাকা	১৪.৪১ কোটি টাকা
১৯৫৭-৫৮	১০.৮৩ কোটি টাকা	১৪.৬৩ কোটি টাকা
১৯৫৮-৫৯	১৪.৯৮ কোটি টাকা	২০.০৪ কোটি টাকা
১৯৫৯-৬০	১৩.২১ কোটি টাকা	১৬.৬৮ কোটি টাকা
১৯৬০-৬১	১৪.৬৮ কোটি টাকা	২৩.০২ কোটি টাকা
১৯৬১-৬২	১৫.৯২ কোটি টাকা	২২.৫১ কোটি টাকা

আন্তঃ আঞ্চলিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পূর্ব পাকিস্তান বঞ্চনার শিকার হয়। পূর্ব পাকিস্তান শিল্প-কারখানার দিক দিয়ে অনুন্নত থাকায় এবং পশ্চিম পাকিস্তান এই ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে লেন-দেনের ভারসাম্য ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান বার্ষিক গড় পড়তা ৮৫ কোটি টাকার জিনিস কিনতো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, আর পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান থেকে কিনতো বার্ষিক গড়ে ৩৭ কোটি টাকার জিনিস।[২০] অনুরূপ বৈষম্য ছিল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের ক্ষেত্রে। পূর্ব পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতো বেশি, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান এ মুদ্রা ব্যয় করতো বেশি। ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা আয়-ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ[২১]

	বৈদেশিক মুদ্রা আয়	বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়
পূর্ব পাকিস্তান	১৩০৫ কোটি টাকা	৭৮৯ কোটি টাকা
পশ্চিম পাকিস্তান	৯৯৩ কোটি টাকা	১৮৮৪ কোটি টাকা

১৯। 'আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা', ওয়াজেদ আলী সরকার পৃষ্ঠা ৯৮, ৯৯।
২০। 'আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা', ওয়াজেদ আলী সরকার পৃষ্ঠা ১০৯।
২১। 'আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা', ওয়াজেদ আলী সরকার পৃষ্ঠা ১০৯।

www.icsbook.info

পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ উন্নয়নেও নজর দেয়া হয়নি। পাট পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান অর্থকরী ফসল। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতো। কিন্তু ৪৭-এর স্বাধীনতার পর পাটের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ কোন নজর দেয়া হয়নি। স্বাধীনতার সময়ে পাটের উৎপাদন ছিল ৬৯ লাখ বেল। ভারত ১৯৪৭ সালের পর তার পাটের উৎপাদন ১৭ লাখ বেল থেকে ১৯৬৩ সালে ৭২ লাখ বেলে উন্নীত করে, আর বাংলাদেশ অঞ্চলে পাটের উৎপাদন ৬৯ লাখের অংক কখনই অতিক্রম করেনি, বরং উৎপাদন কমেছে। পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের মোট পাট উৎপাদনের নিম্নোক্ত তুলনামুলক চিত্র থেকে বিষয়টি সকলের কাছে পরিস্কার হবেঃ[২২]

বৎসর	পূর্ব পাকিস্তানে পাট উৎপাদন	ভারতে পাট উৎপাদন	বিশ্বের চাহিদা
১৯৪৭-৪৮	৬৯	১৭	৮৮
১৯৪৮-৪৯	৫৬	২৩	৯২
১৯৪৯-৫০	৪৩	৩১	৭৭
১৯৫০-৫১	৬১	৩৩	১০১
১৯৫১-৫২	৬৬	৪৭	৯৩
১৯৫২-৫৩	৬৮	৫৩	৯২
১৯৫৩-৫৪	৩৬	৩৭	১০১
১৯৫৪-৫৫	৪৬	৪৩	১১৪
১৯৫৫-৫৬	৬৫	৫৪	১৩১
১৯৫৬-৫৭	৫৯	৫৮	১৩০
১৯৫৭-৫৮	৬১	৬০	১৩৯
১৯৫৮-৫৯	৬২	৬৮	১৫৮
১৯৫৯-৬০	৫৫	৫৭	১৬৬
১৯৬০-৬১	৪৫	৫৯	১৬৪
১৯৬১-৬২	৬৩	৬৩	১৬৯
১৯৬২-৬৩	৬৪	৬৬	১৭৮
১৯৬৩-৬৪	৬৩	৭২	

উপরের চিত্র প্রমাণ করছে যে পাট পূর্ব পাকিস্তানের মনোপলি ছিল, সে মনোপলি স্বাধীনতার অর্ধযুগের মধ্যেই ধসে পড়ল। যে পাটের উপর ভরসা করে সোহরাওয়ার্দী ১৯৪৭ সালে বড় আশা করে বলেছিরেন, "পাটের উৎপাদনকারী

২২। 'আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা', ওয়াজেদ আলী সরকার, পৃষ্ঠা ৫০, ৫১।

www.icsbook.info

হিসেবে বিশ্বকে সে (পাকিস্তান) নিয়ে আসতে পারে পায়ের তলায় এবং এর শিল্প ভবিষ্যত নিশ্চিত", সেই পাট-ভাগ্য গিয়ে অন্যের ঘরে উঠল।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দুর্দশার পাশাপাশি তার এই অর্থনৈতিক দুর্দশা কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের মানুষের বিক্ষোভ-বিতৃষ্ণাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এই বিক্ষোভ-বিতৃষ্ণা পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্যের বুনিয়াদকে দ্রুত দূর্বল করে তুলছিল, অবশেষে তা ধসে পড়ে ১৯৭১ সালে। ভেঙ্গে যায় পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান রূপান্তরিত হলো স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশে।

যে অন্যায়, অবিচার, জুলুম ও বৈষম্য নীতির ফল হিসেবে পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষন-বঞ্চনার সৃষ্টি হয় তার মূলে ছিল জাতীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার অভাব এবং তজ্জনিত জাতিপ্রেম ও দেশ-প্রেমের অনুপস্থিতি। দুর্ভাগ্যের বিষয় মুসলিম জাতিসত্তার প্রতি যে ভালোবাসা এবং মুসিলম জাতিসত্তা রক্ষার যে প্রবল আকাঙ্খা থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি হলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম জাতিসত্তার প্রতি সেই ভালোবাসা এবং তাকে রক্ষার সেই আকাঙ্খা যেন হঠাৎ করেই উবে গেল শাসক মহল থেকে।

বলা হয়, কায়েদে আযমের হাতেই পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ বা আদর্শ বিবর্জিত রাজনীতির যাত্রা শুরু হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কায়েদে আযম ধর্মীয় নামে কোন দল রাখার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি নাকি চেয়েছিলেন মুসলিম লীগও না থাকুক। এই জন্য নাকি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ছয়মাস পর্যন্ত মুসলিম লীগের কোন মিটিং তিনি দেননি।[২৩] কায়েদে আযমের আরেকটি বক্তব্যকে কায়েদে আযমের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, যে বক্তব্য তিনি রেখেছিলেন ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট পাকিস্তান গণপরিষদে। এ বক্তব্যে তিনি বলেন, "এই মৌল নীতি নিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি যে, আমরা সকলে একটি রাষ্ট্রের মালিক। সকলে সমান নাগরিক। এখন আমি ভাবছি, আমাদের এই আদর্শকে আপনারা সামনে রাখুন এবং আপনারা দেখবেন এক সময় হিন্দু আর হিন্দু থাকছে না, মুসলমান আর মুসলমান থাকছে না, কারণ এগুলো প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার, রাজনৈতিকভাবে আমরা সকলেই একই রাষ্ট্রের নাগরিক।"[২৪] একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই বক্তব্যে কায়েদে আযম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে হিন্দু মুসলমানের পরিচয়ের কথা বলছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির কথা বলেননি। পরবর্তীকালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই নীতির কথা সুস্পষ্টভাবেই তিনি উল্লেখ করেছেন। ১৯৪৮ সালে মার্কিনীদের

২৩। 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', আবুল মনসুর আহমদ, পৃষ্ঠা ৩৮, ৩৯, ৪০।
২৪। 'Pakistan from Jinnah to Zia?', Muhammed Munir, Document Press. New Delhi-110048, Page : 53.

www.icsbook.info

উদ্দেশ্যে এক ভাষনে কায়েদে আযম বলেন, "আমি জানিনা পাকিস্তানে অবশেষে কি ধরনের শাসনতন্ত্র প্রণীত হতে যাচ্ছে, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তা হবে গণতান্ত্রিক যার মূলে থাকবে ইসলামের মৌল নীতিমালা। ইসলামের এই নীতিমালা ১৩০০ বছর আগে যেমন ছিল, এখন তেমনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম এবং তার আদর্শবাদই আমাদেরকে গণতন্ত্র শিখিয়েছে। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে সাম্য, সুবিচার এবং সকলের প্রতি সু-ব্যবহারের নীতিমালা। আমরা ইসলামের এই মহান ঐতিহ্যের উত্তরসূরী এবং আমরা যারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করছি তাদে মধ্যে এই বোধ জীবন্ত।"[২৫]

কায়েদে আযমের এই উক্তির মধ্যে তাঁর চিন্তাধারা পরিস্কার এবং এর মধ্যে শাসনতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষতার সামান্য চিহ্নও লক্ষণীয় নয়। তিনি ১৯৪৭ সালের ১৯শে অক্টোবর পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে করাচীতে বলেন, "আমরা মুক্ত মানুষ হিসাবে জীবন যাপন করব এবং এ জীবনের আমরা বিকাশ ঘটাব আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুসারে যার মূলে থাকবে ইসলামের সুবিচার ও সু-ব্যবাহরের আদর্শ।"[২৬] ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ কায়েদে আযম বলেন, "ইসলাম এটাই আমাদের শিক্ষা দেয় এবং আপনারা আমার সাথে একমত হবেন যে, আপনি যা ভাবুন, যাই হোন আপনি মুসলমান। আপনারা এখন একটা জাতি। আপনারা একটা রাষ্ট্রের পত্তন করেছেন-বিশাল রাষ্ট্র। এটা আপনাদের। এটা পাঞ্জাবীদের নয়, সিন্ধীদের নয়, বাঙালীদের নয়; এর মালিক আপনারা মুসলমানরা। পাকিস্তান 'থিয়োক্রাটিক' বা 'ধর্মরাজ্য' ধরনের রাষ্ট্র নয়। ইসলাম আমাদের কাছে অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা দাবী করে এবং অন্য বিশ্বাস ও ধর্মের যারা আছে তাদেরকে আমরা আমাদের বিশিষ্ট সহযোগি হিসাবে স্বাগত জানাব।"[২৭] এখানেও কায়েদে আযম পাকিস্তানকে ইসলামের নীতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রই বলেছেন। 'পাকিস্তান থিয়োক্রাটিক' বা 'ধর্মরাজ্য' ধরনের রাষ্ট্র নয়' কায়েদে আযমের এই কথায় ভুল বুঝা-বুঝির কোন অবকাশ নেই। এখানে কায়েদে আযম 'থিয়োক্রাটিক' রাষ্ট্র বলতে মধ্যযুগীয় ইউরোপের যাজকতন্ত্রীয় রাষ্ট্রের কথা বলেছেন, যেখানে অন্য ধর্ম ও অন্য বিশ্বাসের কোন স্থান ছিল না, যেখানে যাযকরা রাষ্ট্রনায়কদের মাথায় স্বেচ্ছাচারিতা ও সুবিধাবাদের রাজত্ব কায়েম করেছিল, যার সাথে প্রকৃত ধর্মের কোনই সম্পর্ক ছিল না। পাকিস্তান ইসলামের আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র এবং সব ধর্ম ও সব বিশ্বাসের লোক মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সহযোগি হিসেবে থাকতে পারবে, কায়েদে আযম এখানে এই কথাই বলেছেন।

২৫। 'Pakistan : from Jinnah to Zia', Muhammed Munir, Page : 54.
২৬। 'Pakistan from Jinnah to Zia', Muhammed Munir, Page : 54.
২৭। 'Pakistan : from Jinnah to Zia', Muhammed Munir, Page : 54, 55.

www.icsbook.info

কায়েদে আযম পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সুযোগ পাননি। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর উত্তরসূরী মুসলিম লীগ নেতারাও ইসলামের শ্লোগান দিতেন। অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরেও ইসলাম ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবী জোরদার হয়ে উঠেছিল। এরই ফল ছিল শাসনতন্ত্রের 'মৌল নীতি হিসেবে গণপরিষদে 'আদর্শ প্রস্তাব' পাশ হওয়া। প্রস্তাবটি ছিল প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের একটা অংশ, যাতে বলা হলো, "সমগ্র বিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি পাকিস্তানী জনগণের মাধ্যমে যে দায়িত্ব পাকিস্ত ান রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করেছেন তা পবিত্র আমানত হিসেবে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুসারে বাস্তবায়িত করতে হবে।"[২৮] আদর্শ প্রস্তাবটিতে আরও বলা হয়, "মুসলমানরা যাতে কোরআন-সুন্নাহর বিধান অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।"[২৯] মনে করা হলো, আদর্শ প্রস্তাবের এ দাবী পূরণ করার জন্যে শাসনতন্ত্রকে ইসলামী চরিত্র দান করা হচ্ছে।

কিন্তু শাসনতন্ত্রই তৈরী হলো না। ফলে আইন, শাসনতন্ত্র ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে ইসলামী নীতি ও আদর্শের বাস্তবায়ন সম্ভব হলো না। অবশেষে ১৯৫৬ সালে যে শাসনতন্ত্র তৈরী হলো, তাতে পাকিস্তানের নাম 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' রাখা হলো বটে, কিন্তু শাসনতন্ত্রে এমন কোন বিধান রাখা হলো না যার দ্বারা আইন ও ব্যবস্থাপনার ইসলামীকরণ সম্ভব হতে পারে। আইন ও আচরণের ক্ষেত্রের এই লক্ষ্যগত শূন্যতার ফল হলো মারাত্মক। সৃষ্টির কোথাও শূন্যতা বলতে কোন জিনিস নেই। শূন্যতা পূরনের জন্যে ভালো কোন জিনিস যদি না রাখা হয়, তাহলে খারাপ ও বিজাতীয় জিনিস সে শূন্য স্থান পূরণ করবেই। পাকিস্তানে এই ঘটনাই ঘটেছিল। এ বিষয়টাকে কাজী আনওয়ারুল হক সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। তিনি লিখছেন, "মুসলমানদের নিজস্ব আবাসভূমি সৃষ্টিকারী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগ নেতৃত্ব স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নতুন -জাতির সমাজ গঠনের জন্যে প্রয়োজনীয় আদর্শকে সমুন্নত করে তুলতে ব্যর্থ হলেন। অন্যদিকে স্বাধীনতার পর সৃষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘ সংগ্রাম ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব লাভকারী জাতির জীবন গঠনের জন্যে কোন নীতি-আদর্শ যে প্রয়োজন, তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথাই দেখায়নি। ক্ষমতা ও পদের তীব্র লড়াইয়ের মধ্যে জনগণের অভিভাবক বলে পরিচিত এবং জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে জনগণকে দিক-নির্দেশনা দিতে সমর্থ আলেম সমাজও খুব অসহায় হয়ে পড়ে। -----এই হতাশাব্যঞ্জক পরিবেশে নব্য স্বাধীন সমাজ পরিমন্ডলে বিজাতীয় আদর্শ ও নীতি তরুণ বুদ্ধিজীবিদের মন-মানসে অনুপ্রবেশ করতে শুরু করল যা জাতিকে লক্ষ্যচ্যুতি ও পরিচয় বিকৃতির দিকে ঠেলে দিল। ------ কম্যুনিস্টরা নিঃসন্দেহে তাদের লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত

২৮, ২৯। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, Page 264.

www.icsbook.info

প্রাণ। তারা সমাজ-শৃঙ্খলা ধ্বংস করতে খুবই সিদ্ধহস্ত। তাদের অভিজ্ঞতা ও কাজ সবই তারা বিরোধীদলের পক্ষে নিয়োগ করেছিল সরকারকে হেনস্থা করার জন্যে। তাদের বিক্ষোভ, অপপ্রচার এবং চাপ সৃষ্টি -কৌশল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক চরিত্রই পাল্টে দিয়েছিল।"[৩০] একদিকে আদর্শিক শূন্যতা, অন্যদিকে বামপন্থীদের অপপ্রচার মানুষের উপর বিশেষ করে তরুন মনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বাম ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের আদর্শিক ভিত্তি ইসলামের বিরোধিতা করা। এই বিরোধিতাকে কার্যকর ও যৌক্তিক করার জন্যে তারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্যায়-অব্যবস্থাপনাকে বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল, কিন্তু তারা যেভাবে যতটা বলতো, ব্যাপারটা সেরকম ছিল না। আমরা যদি পেছন ফিরে তাকাই, তাহলে দেখব, '৪৭ থেকে '৭০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে যে শিল্প স্থাপন হয়েছিল, মূলত তার উপরই বাংলাদেশ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন তখন যা ছিল, এখন তার চেয়ে বাড়েনি। অথচ তখন প্রচার শুনলে মনে হতো, পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের টাকায় সব হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে।[৩১] এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের কিছুই হয়নি, পূর্ব পাকিস্তানের অংগুলি সংকেত করে রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেনঃ

"বৃটিশরা যেমন এদেশের সম্পদ লুটে এদেশের মুসলিম সমাজকে ধ্বংস করে তাদের সম্প্রাজ্যের পত্তন করেছিলেন এবং ইংল্যান্ডে এক নতুন বিত্তবান সমাজের উত্থানের পথ সুগম করেন, তেমনি এদেশ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে তারা এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটান। সরকারী হিসেবে এই মন্বন্তরে ৩০ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। এবং সরকারী কমিশন বলেছিল যে, এই দুর্ভিক্ষ ছিল ম্যানমেড (কৃত্রিম)। এই বিধ্বস্ত অঞ্চলই '৪৭ সালের ১৪ই

৩০। 'Under Three Flags', Kazi Anwarul Haque, Page 264.

৩১। 'ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি শহরকে আধুনিক অর্থে কেউ শহর বলতোনা। -------- এই ঢাকাই হলো আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীরা লাহোর এবং করাচীর মতো দু'টো শহর পেলো। এ দু'টি শহরই ছিল দু'টো প্রদেশের রাজধানী। কিন্তু হঠাৎ করে একজন বিখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তাঁকে '৪৪ সাল থেকেই চিনতাম। আমি যখন ইসলামিয়া কলেজের লেকচারার, শেখ মুজিবুর তখন সেখানে ছাত্র এবং আমাদের মতো তিনিও এককালে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনিই বললেন, স্যার দেখেছেন এলফিনস্টোন রোডের সমস্ত চাকচিক্যের মূলে রয়েছে পূর্ববঙ্গের পাট, আমি বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলাম এ নতুন তথ্য তিনি আবিস্কার করলেন কোথা থেকে? এ রাস্তাটির বয়সও যেমন কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাট বছর তেমনি দোকানগুলিও প্রাক-পাকিস্তান যুগের। কিন্তু তিনি (শেখ মুজিব) তখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সবকিছুর মূলে রয়েছে বঞ্চিত, অবহেলিত, শোষিত পূর্ব পাকিস্তানের দান। কিন্তু এই যুক্তি আমরা কিভাবে স্বীকার করি? অথচ '৭১ সালে যে বিস্ফোরণ ঘটে, তখন লাখ লাখ বাঙালী তরুণ এই বিশ্বাস নিয়েই সংগ্রামে নেমে ছিলো যে, পাকিস্তান থেকে তারা শোষণ ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করতে পারে না।" (একাত্তরের স্মৃতি', ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন (রাজশাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, পৃষ্ঠা ৩১)।

www.icsbook.info

আগস্ট রূপান্তরিত হয়েছিল স্বাধীন পূর্বপাকিস্তানে। অথচ ৪৮ সাল থেকেই আবার শুনতে আরম্ভ করি যে, আমাদের সমস্ত দুর্দশার কারণ করাচীস্থ তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা, উপেক্ষা এবং শোষণ। পাঞ্জাব বা সিন্ধু অঞ্চলে যেমন যুদ্ধের সময় কোন দুর্ভিক্ষ হয়নি, তেমনি ১৭৫৭ সাল থেকে উনিশ শতাব্দীর শেষ অবধি পর্যন্ত যে নির্যাতন বাংলার মুসলমানদের সইতে হয়েছে তার নজীর পশ্চিম পাকিস্তানের ইতিহাসে নেই। হান্টার সাহেবের সে বিখ্যাত বইয়ের কথা এখানে উল্লেখ করার হয়তো দরকার নেই। তিনি বলেছিলেন যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পূর্বে যারা ছিলেন বাংলার সম্ভ্রান্ত সমাজ তারাই পরিণত হলেন কাঠুরিয়া আর ভিস্তির শ্রেণীতে। আগে যেমন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের পক্ষে দারিদ্রের কবলে পতিত হওয়া অসম্ভব ছিল তেমনি ১৮৫৭ এর পর কারো পক্ষে সচ্ছলতা রক্ষা করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই বিধ্বস্ত সমাজকে নিয়ে ১৯৪৭ সালে আমাদের যাত্রা শুরু। ৪৩ সালে যে দুর্ভিক্ষের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি তার ভয়াবহতার চিত্র আমার বয়সী কোন লোকের মন থেকে মুছে যাওয়ার কোন সম্ভবনা ৭১ সালে ছিল না। জাপানীরা তখন বার্মা দখল করেছে। আরাকান পর্যন্ত থাবা বাড়িয়েছে। কোলকাতায় বোমা পড়ছে এবং যে কোন মুহূর্তে তারা আসাম ও বাংলার একটা অংশ দখল করে নিতে পারে। এই আশংকায় বৃটিশ সরকার পোড়ামাটি বা SCORCHED EARTH নীতি অবলম্বন করে। জেলে ও কৃষকদের নৌকা ধ্বংস করে ফেলা হয়, ধ্বংস করা হয় ক্ষেত খামারের ফসল। একেতো তখন বার্মা থেকে চাল আমদানী বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, অন্যদিকে এ অঞ্চলে উৎপাদিত চাল সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে ক্রয় করে উত্তর ও মধ্য ভারতে চালান দেয়া হয়। দুঃখের বিষয় এই প্রক্রিয়ায় কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ মুসলমান রাজনীতিবিদও জড়িত ছিলেন। মাড়োয়ারীদের সাথে যোগ-সাজশে এঁরা চাল পাচার করতেন। এ নিয়ে একটা মামলাও হয়। এই মামলার তথ্য উদঘাটন করতে গেলে এমন সব নাম আবিস্কৃত হবে যা শুনলে বর্তমান জেনারেশন রীতিমত আঁৎকে উঠবে। কারণ এরা এঁদেরকে জাতীয় বীর হিসেবে চেনে। .... ১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তখনো আমরা দুর্ভিক্ষের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সেই দুর্ভিক্ষের সময় প্রবর্তিত রেশনিং প্রথা ৪৭ সালের পরও চালু ছিল। কিন্তু '৪৭-এর আগস্টের পর '৭১ সাল পর্যন্ত অভাব-অভিযোগ হলেও ব্যাপক দুর্ভিক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের কোনো এলাকায়ও হয়নি। যে মিথ্যা ইতিহাস রচনা করে পাকিস্তানের আদর্শের বিরুদ্ধে এ দেশের যুবসমাজকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল, সেটাই হলো পাকিস্তানের পতনের কারণ। .... আমি আগেই বলেছি যে, এই অভিযোগ শুরু হয় পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই। সুতরাং পাকিস্তানে যা কিছু ঘটেছে তার বিচার আমরা করেছি জন্ডিস

www.icsbook.info

রোগাক্রান্ত চোখ দিয়ে। উন্নয়ন যা হয়েছে প্রথম থেকেই বলা হতো যে প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল একান্তই অপর্যাপ্ত। যেনো দু'তিন বছরের মধ্যেই আমরা আগেকার দু'শ বছরের অনগ্রসরতা অতিক্রম করে পাঞ্জাবের সমান হতে পারি। দেশ গড়তে যে সময় লাগে, বিশেষ করে একটা উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে না উঠলে যে এ অঞ্চলের পক্ষে সমানভাবে পাঞ্জাবের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিলোনা, সে কথা ভুলেই বসেছিলাম বা সে কথা চাপা দেয়া হচ্ছিল যেনো অল্প শিক্ষিত একজন কবিরাজকে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের পদে বসিয়ে দিলে তিনি সুচারুরূপে তাঁর দায়িত্ব নিষ্পন্ন করতে পারবেন।"[৩২]

দেশ পরিচালনায় জাতীয় আদর্শ, জাতীয় লক্ষ্য ও নীতিবোধের অনুপস্থিতি যেমন দেশের শাসকদের রাজনৈতিক অবিচার ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, তেমনি তা বামপন্থী ও ধর্মনিপেক্ষতাবাদীদের সংখ্যাবৃদ্ধিসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গণকেও কলুষিত করে তুলেছিল। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে স্বকীয়তার ছাপ দেশ বিভাগের আগে যতটুকু ছিল, এইসব ক্ষেত্রে রেনেসাঁ যতটুকু সৃষ্টি হয়েছিল, পাকিস্তান হওয়ার পর তা যেন উবে যেতে লাগল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাঁর স্মৃতিকথায় এ সম্পর্কে লিখেছেন,[৩৩] "পাকিস্তান পূর্ব যুগে এখানকার মুসলমানদের মনে জাতীয় রেনেসাঁর বাণী যেরূপ জোরদার হয়েছিল, পাকিস্তান উত্তর যুগে দেখা যাচ্ছে তা যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। এটা নিশ্চিত দুঃসংবাদ। আবার বিদেশী ও বিজাতীয় সম্মোহন পাকিস্তানী তরুণ মুসলিম মানসে মায়াজাল বিস্তার করছে দেখতে পাচ্ছি। তার ফলে যে আত্মস্থতার স্ফুরণ হয়েছিল জাতীয় জীবনে, তা ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার অন্ধ গতানুগতিকতার সম্মোহন আমাদের জাতীয় জীবনকে কোন্ অন্ধকারের অতল গর্ভে ঠেলে দেয়ার আয়োজন করছে। মনে হচ্ছে নেপথ্য থেকে গত যুগের একদল ছিটকে পড়া সম্মোহিত পান্ডিত্যাভিমানী এ অপচেষ্টার পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছেন।"[৩৪]

১৯৫৮ সালে আবুল কালাম শামসুদ্দিন যে আশংকার কথা ব্যক্ত করেছিলেন, তার মাত্র একযুগের মাথায় তা একেবারে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে সামনে চলে এল। সে সময় পর্যন্ত পৌছতেই বিশেষ করে তরুণ ও অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মন-মানস থেকে জাতীয় স্বাতন্ত্র, সংস্কৃতি ও রেনেসাঁর চিন্তা একদম মুছে গিয়েছিল। এরই ফল ছিল বাংলাদেশের রাজনীতির একটা বড় অংশের বাম ও ধর্ম নিরপেক্ষমুখিতা।

৩২। 'একাত্তরের স্মৃতি', ডৎ সাজ্জাদ হোসায়েন, পৃষ্ঠা ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬।

৩৩। আবুল কালাম শামসুদ্দিন সাহেবের এই মন্তব্য তাঁর একটি বক্তৃতার অংশ। এ বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে। এ সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে আবুল মনসুর আহমদ ও মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ। আবুল কালাম শামসুদ্দিন এক অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন।

৩৪। 'অতীত দিনের স্মৃতি', আবুল কালাম শামসুদ্দিন, পৃষ্ঠা ২৭৭।

www.icsbook.info

সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের এই বাম ও ধর্মনিরপেক্ষমুখিতা দেশের ভাষা, সাহিত্য ও রাজনীতিকে বিদেশমুখী ও পরজীবি অন্যকথায় কোলকাতামুখী করে তুলল। এ সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দিন তার স্মৃতিকথায় দুইটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একটি ১৯৫৪ সালে ঢাকার কার্জন হলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলন, অন্যটি ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত মওলানা ভাসানির কাগমারী সম্মেলন। কার্জন হলের সাহিত্য সম্মেলন সম্পর্কে তিনি বলেন, "১৯৫৪ সালে ঢাকার কার্জন হলে 'বাঙলা সাহিত্য সম্মেলনের' এক অধিবেশন হয়। তাতে আমাকে মনন সাহিত্য শাখার সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। যারা এ সম্মেলনের উদ্যোক্ত ছিলেন, খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারা গেল, তাদের অধিকাংশই ছিলেন 'বাঙলা সাহিত্য এক ও অভিভাজ্য' নীতির পরিপোষক এবং পাক-বাঙলা সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের স্বীকৃতি দানের বিরোধী। তাছাড়া এ কথাও শোনা গেল, 'বাঙলা সাহিত্য এক ও অভিভাজ্য' -এই নীতির জয় ঘোষণার জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তারা নাকি পশ্চিম বংগের কয়েকজন প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিককেও আমন্ত্রণ করেছেন। যাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তাঁদের মতামত আগে থেকেই আমার জানা ছিল। তারা শুধু বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অবিভাজ্যতা সম্পর্কে নয়, বাংলাদেশের অবিভাজ্যতা সম্পর্কেও দৃঢ়মত পোষণ করতেন।"[৩৫] আর কাগমারী সম্মেলন সম্পর্কে তিনি বলেন, "আমাদের সাহিত্যিক দুর্যোগ যে কেটে যায় নাই, বরং অধিকতর বেড়ে গিয়েছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল পরবর্তী আরেকটি সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনে। সে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় টাংগাইল জেলার কাগমারীতে। মওলানা ভাসানী ছিলেন এ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। বাঙলা সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য এ বাণী প্রচারকল্পে এবারও পশ্চিম বাঙলা থেকে পাকা প্রবীণ সাহিত্যিক আমদানির চেষ্টা অব্যাহত ছিল। ফলে আমন্ত্রিত হয়ে এ সম্মেলনে যারা যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ঔপন্যাসিক প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয়ও ছিলেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ উদগীরণে তাঁর অপূর্ব দক্ষতার কথা এখান থেকেও আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। তাছাড়া তাঁর সম্পাদিত 'পদাতিক' মাঝে মাঝে এখানেও ছিটকে এসে পড়ত। তাতেও চোখে পড়ত 'নরহত্যা', 'নারীধর্ষক', 'পশু প্রকৃতি' পাকিস্তানীদের লোমহর্ষক বর্ণনা। তাছাড়া সম্মেলনের উদ্যোক্তারা বাঙলাদেশের (দুই বাংলার) অবিভাজ্যতা প্রতিপন্ন করার জন্যে কিংবা অন্য কোন কারণে জানি না, সম্মেলন স্থানের বহির্দেশে অসংখ্য গেট করেছিলেন, এবং তাদের মধ্যে অনেকগুলোর নাম করা হয়েছিল ভারতীয় নেতাদের নামে, যেমনঃ গান্ধী গেট, জওহর গেট, সুভাষ গেট, ইত্যাদি। সম্মেলনের কার্যবিবরণী সম্পর্কে যে খবর

৩৫। 'অতীত দিনের স্মৃতি', আবুল কালাম শামসুদ্দিন, পৃষ্ঠা ২৭৫।

www.icsbook.info

পাওয়া গেছিল, তার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের ভাষণগুলি ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাতে নাকি দেশ ভাগের জন্যে যথেষ্ট অশ্রুপাত করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, দেশভাগ হলেও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য কখনও ভাগ হতে পারে না, হয় নাই - এক সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালী জাতিত্ব কখনো বিভক্ত হতে পারে না ইত্যাদি।"[৩৬]

অর্থাৎ আদর্শিক শূন্যতা এবং বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি প্রভাবশীল হবার ফলে পাকিস্তান সৃষ্টির এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে পাকিস্তানের বুনিয়াদ নড়বড়ে হয়ে উঠল এবং বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীরা কোলকাতা ও দিল্লীমুখী হয়ে উঠল। এর সাথে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কোটারীর রাজনৈতিক নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য সোনায় সোহাগা হিসেবে কাজ করল। পরবর্তী দেড় দশকের মধ্যেই ভেঙে পড়ল পাকিস্তান। এই ভেঙে পড়ার পিছনে আদর্শিক দেউলিয়াত্বই মৌল কারণ ছিল, যা কারণ ঘটিয়েছিল রাজনৈতিক নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যেরও।

এই কারণগুলোকে ভারত সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিল পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করার জন্যে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে ভারতের গোপন হস্তক্ষেপ পাকিস্তানের পতনের একটা বড় কারণ। ইতিহাস বলে, অবস্থার চাপে ভারতের হিন্দু নেতৃবৃন্দ দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিল এই আশায় যে, পাকিস্তান আসলেই টিকবেনা। এ সম্পর্কে একজন ভারতীয় ইতিহাসকার বলেছেন, "বিশেষ কারণে (নেহেরুর বক্তব্য অনুযায়ী) নেহেরু দেশ বিভাগকে এক আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছিলেন। নেহেরু এবং কংগ্রেস ও দেশবাসীর বদ্ধ ধারণা ছিল যে, পাকিস্তান হবে ক্ষণস্থায়ী। কারণ নেহেরু ও কংগ্রেস নেতারা ভেবেছিলেন রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতার কারণ বশতঃ পাকিস্তান জীবিত থাকতে পারবে না।"[৩৭] কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি'র প্রস্তাবেও এই কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়। প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, "When Passion have cooled, a new and a stronger unity based on good will and co-operation will emerge. [৩৮] অর্থাৎ 'আবেগ' যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার উপর ভিত্তিশীল একটা নতুন ও অধিকার শক্তিশালী ঐক্য সামনে এসে দাঁড়াবে।'

কিন্তু নেহেরুদের আকাঙ্খা অনুযায়ী পাকিস্তান যখন রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামরিক কারণে ভেঙে পড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না এবং 'আবেগ ঠান্ডা হলেই ভারত আবার জোড়া লেগে যাবে' – এই আশাবাদ যখন বাস্তবরূপ

৩৬। 'অতীত দিনের স্মৃতি', আবুল কালাম শামসুদ্দিন, খোশরোজ কিতাব মহল, ১ম সংস্করণ ১৯৬৮, ২য় সংস্করণ ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২৭৬।
৩৭। 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, ভূমিকা পৃষ্ঠা x
৩৮। কংগ্রেস বুলেটিন, চার নম্বর পৃষ্ঠা ১১ এবং 'স্বাধীনতার অজানা কথা', বিক্রমাদিত্য, পৃষ্ঠা ভূমিকা x.

www.icsbook.info

নিল না, তখন ভারত উদ্যোগী হয়ে কলকাঠি নাড়তে শুরু করল। ভারতে একটি পত্রিকা তার মূল্যবান অনুসন্ধানী রিপোর্টে লিখেছে, "Bangladesh was the result of a 10 year long promotion of dissatisfaction against rulers of Pakistan. The real seeds of discontent in East Pakistan were sown by the arrogant, power crazed Punjabi ruling elite from West Pakistan. When the simmering disnchantment of two decade began to boil over. India grabbed the opportunity. Raw's successes included winning over Mujib-ur-Rahman, funding his election, training, and arming the Mukti Bahini."[৩৯] অর্থাৎ বাংলাদেশ পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পরিবর্ধনের দশ বছর ব্যাপী চেষ্টার একটা ফল। পূর্ব পাকিস্তানে অসন্তোষের বীজ প্রকৃতপক্ষে বপন করেছিল পশ্চিম পাকিস্তানের দুর্নীতি ও ক্ষমতালোভী পাঞ্জাবী শাসক চক্র। যখন পূর্ব পাকিস্তানের দুই যুগের অসন্তোষ টগবগিয়ে উঠল, তখন সে সুযোগকে লুফে নিল ভারত। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর বড় সাফল্য হলো মুজিবর রহমানকে জয় করা, তার নির্বাচনের খরচ যোগানো এবং মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়া ও অস্ত্র সরবরাহ করা।' ভারতের 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া' পত্রিকার একটি বক্তব্যেও আমরা এই যার স্বীকৃতি পাই। বলা হয়েছে, "One of the most glorious chapters in the history of RAW, and in the career of Kao[৪০], was the operation leading to the creating of Bangladesh. That country would never, have been born but for the operation carried out by RAW for several years before the Indian army action. The first meeting between IB operatives and Shaikh Mujib had taken place as early as in 1963 and after RAW was set up in 1968, it anticipated virtually every major political and military development that took place in what are, then East Pakistan."[৪১] অর্থাৎ 'র' এর ইতিহাসে এবং 'কাও' এর জীবনের সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায় হলো 'র' এর সেই তৎপরতা যা সৃষ্টি করেছিল বাংলাদেশ। সেই দেশটির জন্ম কখনই হতো না যদি ভারতীয় সেনাবাহির অভিযান শুরুর আগের বছরগুলোতে 'র' কাজ না করতো। ভারতের আই,বি ডিপার্টমেন্টের গোয়েন্দা এজেন্টের সাথে শেখ মুজিবের প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয় ১৯৬৩ সালে এবং ১৯৬৮ সালে 'র' প্রতিষ্ঠিত হবার পর পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলীর পেছনে এই সংস্থার হাত তৎপর ছিল"। ভারতের সাথে শেখ মুজিবের এই ধরনের যোগাযোগের কথ আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাকও বলেছেন। তাঁর কথা "তিনি (শেখ মুজিব)

৩৯। "Raw : Top-Secret Failures', Gentleman, November, 1985 (India).

৪০। 'Kao' -এর পুরো নাম 'রামেশ্বর নাথ কাও'। তিনি একযুগের বেশিকাল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা- 'Raw' এর শীর্ষ নেতা হিসেবে কাজ করেছেন।

৪১। 'Exite : The Spymaser', Alex Leamus, The Illustrated Weekly of India, December 23, 1984.

www.icsbook.info

তখনই আমাদের বললেন ভারতের সাথে তার একটা লিংক আপ আগে থেকেই ছিল-১৯৬৬ সাল থেকে। তারা তাদের সবরকম সাহায্য করবে। তুই ওই ঠিকানায় দেখা করবি। তখন উনি চিত্তরঞ্জন সুতারের সাথে দেখা করতে বলরেন। সেই প্রথম বঙ্গবন্ধুর সাথে ভারতের সংযোগ করিয়ে দেয়। তবে ১৯৬৯ সালে জেল থেকে বেরিয়ে বঙ্গবন্ধু লন্ডন যান। সেখানে সুতার ও অন্যান্য ভারতের লোক লন্ডনে তাঁর সাথে দেখা করেন। সেখানে বঙ্গবন্ধুর সাথে ভারতের সহযোগিতায় ব্যাপারটি চূড়ন্ত হয়।"[৪২]

আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক তাঁর সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, "আমরা ভারতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করছি স্বাধীনতার জন্যে অন্য কোন কারণে নয়।"[৪৩] আব্দুর রাজ্জাকের এই উক্তি অনেকের ক্ষেত্রে ঠিক হলেও, সবার ক্ষেত্রে ঠিক নয়। ১৯৬৩ কিংবা ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার কথা ভাবেনি, শেখ মুজিবও নন। আর আব্দুর রাজ্জাক সাহেবরা তো তখন ছাত্র মাত্র। আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিব যে তখন স্বাধীনতার কথা ভাবেননি, তার বড় স্বাক্ষী শেখ মুজিবের নিজস্ব জবানবন্দী। আগরতলা মামলায় তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হলে তিনি আদালতের দেয়া এক হলপ করা জবানবন্দীতে বলেন, "স্বাধীনতার -পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতে আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে আমাকে আমার লেখা-পড়া পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগনের আশা-আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এর ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওর্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও ছিল এবং এখনও সেইরূপ একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান। ---- সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তাহারা পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে এবং দেড় বছর কাল বিনা বিচারে আটক রাখে। আমাকে এইভাবে আটক রাখাকালে তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। কিন্তু আমি ঐ সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি।------অতঃপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে যখন আমার নেতা মরহুম শহীদ সোহরাওর্দীকে গ্রেফতার করা হলো, তখন আমাকেও জননিরাপত্তায় অর্ডিন্যান্স বলে কারান্তরালে নিক্ষেপ করা হয় এবং ৬ মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোওরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পূনর্জীবিত করা হয় এবং সম্মিলিত বিরোধীদের অংগদল হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি। ------১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে অনুষ্ঠিত

৪২। আব্দুর রাজ্জাকের সাক্ষাতকার নিয়ে সাপ্তাহিক মেঘনার প্রচ্ছদ কাহিনী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭।
৪৩। আব্দুর রাজ্জাকের সাক্ষাতকার নিয়ে সাপ্তাহিক মেঘনার প্রচ্ছদ কাহিনী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭।

www.icsbook.info

সর্বদলীয় সম্মিলনীর বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান ছয়দফা কর্মসূচী উপস্থিত করি। ছয়দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশের জন্যই আঞ্চলিক সায়ত্তশাসনের দাবী করা হইয়াছে। অতঃপর আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকূলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয়দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সরকারী প্রশাসনযন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়', 'গৃহযুদ্ধ', ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে একডজনেরও অধিক মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে আমি যখন খুলনায়, একটি জনসভা করিয়া যশোর হইয়া ঢাকা ফিরিতেছিলাম, তখন তাহারা যশোরে আমার পথ অবরোধ করে এবং আপত্তিকর বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত এক গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে এইবারের মতো আমাকে গ্রেফতার করে। ---- কেবলমাত্র আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্যে এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনোবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় মিথ্যা জড়িত করা হইয়াছে। -------- আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাহার একটি সুনির্দিষ্ট, সুসংগঠিত নীতি ও কর্মসূচী রহিয়াছে। আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নহি। ----- বর্তমান মামলা উল্লিখিত নিস্পেষন ও নির্যাতন নীতির পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নহে। আমি কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে কোন কিছু করি নাই কিংবা কোন দিনও এই উদ্দেশ্যে কোন স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন কর্মসূচীর সংস্পর্শে কোন ষড়যন্ত্রমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করি নাই।------আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।"[৪৪]

এই জবানবন্দীতে শেখ মুজিব নিজেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের একজন ত্যাগী কর্মী, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে পেশ করেছেন এবং বিচ্ছিন্নতা বা স্বাধীনতা তিনি চান তা অস্বীকার করেছেন। প্রকৃতই বিচ্ছিন্নতা বা স্বাধীনতা চাইলে তিনি এইভাবে মিথ্যা কথা বলতেন না। কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী এইভাবে মিথ্যা কথা বলে না, বলতে পারে না। বস্তুত শেখ মুজিব বিচ্ছিন্নতা বা স্বাধীনতা অর্জনের কোন তৎপরতায় তখন জড়িত ছিলেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কিছু অবহিতও ছিলেন না। আওয়ামী লীগ পন্থী বুদ্ধিজীবী জনাব কামরুদ্দিন আহমদ এ সম্পর্কে লিখছেন, ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে আমার 'Socio-politicial history of Bangladesh' প্রকাশিত হয়। বইটি হঠাত এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, ছয়মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। ঐ বছর ডিসেম্বর

৪৪। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেক মুজিবুর রহমানের লিখিত বিবৃতি', বিচিন্তা, ২৫শে অক্টোবর, ১৯৮৭।

www.icsbook.info

মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ করা হয়। ঐ পুস্তকখানি প্রকাশিত হবার পরপরই সিরাজুল আলম খান ও আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘণিষ্ঠতর রূপ নেয়। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ওরা দু'জন আমার অফিসে যেত আমার সঙ্গে বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা জন্যে। সিরাজুল আলম খান তখন মুখে বাংলার স্বাধীনতার কথা না বললেও স্বাধীনতা লাভের জন্যে শেখ মুজিবের অজ্ঞাতে আওয়ামী লীগের কিছু কর্মী নিয়ে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় গুপ্ত সংস্থা গঠন করেছিলেন। ঐ সংগঠন সমূহের জন্যে প্রচারপত্র লিখা হতো ও তাদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। এই সংগঠনের কথা আওয়ামী লীগ নির্বাহী কমিটির কেউ এমনকি শেখ সাহেবও জানতেন না।"[৪৫] আব্দুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খানেরা যে এই ধরনের গোপন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন, তার স্বীকৃতি আব্দুর রাজ্জাকও দিয়েছেন। তাঁর উক্তি ঃ "১৯৬৪ সালে আমরা কয়েকজন যুবক দেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। তখন আমি, সিরাজুল আলম খান ও কাজী আরেফ আহমদ 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' গড়ে তুলি। এই পরিষদকে ইংরেজীতে বলা হতো বিএলএফ ----------।"[৪৬] উল্লেখ্য, আব্দুর রাজ্জাকদের গোপন আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা।[৪৭] এই আন্দোলনের সাথে ভারতের যোগাযোগ থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং ভারত তার স্বার্থে এদেরকে ব্যবহার করার ব্যাপারটা খুবই সংগত। তবে রাজ্জাক আরেফদের এই বামপন্থী আন্দোলনের সাথে শেখ মুজিবের কোন সম্পর্ক ছিল না এবং তাদের পরিকল্পিত স্বাধীনতা'র সাথেও নয়।

সুতরাং ১৯৬৩ সালে বা ৬৪ সালে কিংবা ৬৯ সালে ভারতের সাথে শেখ মুজিবের যে সংযোগ বা সাক্ষাত হয় তার লক্ষ্য শেখ মুজিবের কাছে স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতা ছিল না। আর আগরতলার ষড়যন্ত্র কালীন আগরতলায় যে ষড়যন্ত্র বৈঠক হয়, সেখানে শেখ মুজিব নয়, বলা হয়েছে মুজিব-পন্থীরা ছিলেন। এ মুজিব পন্থীরা আব্দুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খানের মত লোকরাই হবে যারা শেখ মুজিবকে পাশ কাটিয়ে সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলার কথা ভাবতেন এবং এজন্য ভারতের সাথে যোগাযোগও রাখতেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় মজলুম ও ক্ষমতা লোলুপ নেতা হিসেবে শেখ মুজিব ক্ষমতায় যাবার সহায় হিসেবে সাহায্য সহযোগিতার জন্য ভারতের সাথে যোগাযোগ করলে করতেও পারেন এবং ভারতকে ব্যবহারের সুযোগ নিতে পারেন। শেখ মুজিবের দিক থেকে এটাই লক্ষ্য কিন্তু ভারতের লক্ষ্য ছিল ভিন্ন। শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগকে ভারত সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করেছিল তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। স্বার্থটা ছিল পাকিস্তানকে খন্ড-বিখন্ড করা এবং এইভাবে গোটা ভারতকে আবার মুঠোয় আনা।

৪৫। 'স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর', কামরুদ্দিন আহমদ পৃষ্ঠা ১০৪।
৪৬। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ' গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসবে আব্দুর রাজ্জাকের উক্তি। দৈনিক দেশ, ১২ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।

www.icsbook.info

ভারতের উদ্দেশ্য যাই হোক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় হস্তক্ষেপ ও সাহায্যের ছিল ইতিবাচক অবদান। এতে বাংলাদেশ উপকৃত হয়েছে, স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়লাভ হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। এতে ভারতের পাকিস্তান ভাঙার উদ্দেশ্য সফল হলেও বাংলাদেশকে কুক্ষিগত করে ভারতের পূর্বাঞ্চলকে জোড়া লাগানোর কিংবা বাংলাদেশের মুসলিম চরিত্র পাল্টানোর উদ্দেশ্য তার পূরণ হয়নি। বাবু বসন্ত চ্যাটার্জীর ভাষায় ঃ "বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে আমাদের দেশের এমনকি সর্বোচ্চ পদাধিকারীও নির্লজ্জের মত দাবী করে আসছেন যে, এই ঘটনা (বাংলাদেশের স্বাধীনতা) দ্বি-জাতিতত্ত্ব ধ্বংস করে দিয়েছে। এই কপটাচারীদের জিজ্ঞাসা করা উচিত, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ধ্বংসের পর বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের একটিও সু-যুক্তি তারা দিতে পারেন কিনা। তাঁদের দাবীকৃত তত্ত্বটি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তার একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ পরিণাম হওয়া উচিত ভারতের সাথে বাংলাদেশের পুণসংযুক্তি, বাংলাদেশী হিন্দুদের যা যথার্থ কাম্য। যারা সবসময় দ্বি-জাতিতত্ত্বের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদের ঢাক পিটাচ্ছেন তারা কি প্রস্তাব দিতে পারেন যে, ১৯৪৭ সালে যে তত্ত্বের উপর দেশ-বিভক্তি হয়েছিল তা যেহেতু আর অস্তিত্ববান নয়, তাই দেশটি কোলকাতার অনুগ্রহ নির্ভর সেই পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে যাওয়াই ভাল?"[৪৮] বসন্ত বাবু যে প্রস্তাব আহবান করেছেন, সে প্রস্তাব দেয়ার মত লোক ভারতে অবশ্যই আছে এবং বেশি পরিমাণে আছে, কিন্তু সে প্রস্তাব শোনা ও মানার মত কোন দেশপ্রেমিক বাংলাদেশীকে পাওয়া যাবে না। অবশ্য ১৯৭১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিশেষ তিনজন সংখ্যালঘু নেতা দিল্লীতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করে বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করে নেবার প্রস্তাব দেন।[৪৯] এরা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশী নয়। বাংলাদেশে বাস করলেও এদের শেকড় ভারতে। এ কারণেই তারা বাংলাদেশকে ভারতের শামিল করার প্রস্তাব দিতে পেরেছিল। বাংলাদেশ বা কোন একজন বাংলাদেশীও এদের সাথে নেই। বস্তুত: ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয়েছে, পতাকা পাল্টেছে, জাতীয় সংগীত পাল্টেছে, কিন্তু '৪৭ এর দেশবিভাগ ঠিক আছে, তার ভিত্তিও টিক রয়েছে। ব্যাপারটা নাম পাল্টানোর মত পরিচয় এবং চরিত্র পাল্টানো নয়। আর পাল্টানো সম্ভবও নয়। জাতি হিসেবে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বের গ্যারান্টি। অন্যকথায় দ্বি-জাতিতত্ত্বই বাংলাদেশ।

৪৮। `Inside Bangladesh Today', Page 150.

৪৯। আওয়ামী লীগের এমপি এবং আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ের স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী এক সাক্ষাতকারে এই তথ্য দেন। ১৯৭১ সালের ঐ সময় জনাব চৌধুরী দিল্লীতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি ঐ তিন হিন্দুনেতার একজনের নাম বলেন এবং তিনি হলেন আওয়ামীলীগ নেতা চিত্তরঞ্জন সুতার। [দ্রষ্টব্য: 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের 'র' এবং সিআইএ এর ভূমিকা'- মাসুদুল হক মজুমদার, মৌল প্রকাশনি, বাংলা বাজার, পৃষ্ঠা - ১২৩, ১২৪।

www.icsbook.info

১১
স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতি

উনিশ শ' একাত্তরে পাকিস্তান ভেঙেছে এবং তার ফলে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে কিন্তু দ্বি-জাতিতত্ত্ব ধ্বংস হয়নি। এই দ্বি-জাতিতত্ত্ব ধ্বংসের পুরান রাজনীতি নতুন করে শুরু হয়েছে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ ঘিরে। স্বাধীনতার পর সাড়ে তিন বছর দ্বি-জাতিতত্ত্ব, মুসলিম জাতি-স্বাতন্ত্র ধ্বংসের চেষ্টা চলে। '৪৭ এর দ্বি-জাতিতত্ত্ব ভিত্তিক স্বাধীনতার চেতনা এবং '৭১ এর মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনাকে পদদলিত করে ভারতের পোশাকি রাষ্ট্রনীতির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্রকে সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর দ্বারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রূপ ও পরিচয় পাল্টানোর চেষ্টা করা হয়। অথচ এর কোন অধিকার ছিল না সংবিধান প্রণেতাদের। সংবিধান প্রণেতারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে জনগণের ম্যান্ডেট পূরণের জন্যে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও সংবিধান রচনা করেছিলেন। জনগণ তাদেরকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ম্যান্ডেট দেয়নি কিংবা স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষনায় স্বাধীনতা ঘোষণার কারণ বা উদ্দেশ্যের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের নামগন্ধ ছিল না। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীনতার যে আনুষ্ঠানিক ঘোষনা দেয়া হয়, তাতে স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে যুক্তি বা কারণ হিসেবে ৯টি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। যার সারকথা হলো. "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও দেশ শাসনের জন্যে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দান করেছিল, কিন্তু আওয়ামী লীগকে অন্যায়ভাবে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। উপরন্তু স্বাধিকারকামী জনগণের বিরুদ্ধে হামলা পরিচালনা করা হয়েছে এবং গণহত্যা চালানো হচ্ছে। এই অবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে একত্রে বসা এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে বীর জনগণ আগ্রাসনের মোকাবেলা করে দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।" এই সব কারণ ও যৌক্তিক ভিত্তি সামনে রেখে জনপ্রতিনিধি হিসেবে 'জনগণের দেয়া ম্যান্ডেটের সম্মান প্রদর্শনের জন্যে 'পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে' 'পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে' স্বাধীনতা ঘোষনা করা হয়েছে। স্বাধীনতার লক্ষ্য হিসেবে ঐ ঘোষণায় 'বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত

www.icsbook.info

করার কথা বলা হয়েছে।[১] উল্লেখ্য, পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্য-নীতি দুষ্ট কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের এই অধিকারগুলোই ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতার এই লক্ষ্যগত ঘোষণায় কোথাও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ও সমাজতন্ত্রের' কথা বলা হয়নি। আর এমন কথা বলার ম্যান্ডেটও জনগণের পক্ষ থেকে তাদের দেয়া হয়নি।

বস্তুত বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক যাত্রার শুরুতেই তদানীন্তন সরকার ৪৭-এর দেশবিভাগ ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দু'পায়ে পিষ্ট করলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার, অত্যন্ত নগ্ন ও নির্লজ্জভাবে জনগণের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের মূলোচ্ছেদ শুরু হলো। 'সরিমুল্লাহ মুসলিম হল'-এর নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি কেটে ফেলে নামকরণ করা হলো 'সলিমুল্লাহ হল।' অনুরূপভাবে 'জাহাঙ্গির নগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়' এর নাম থেকে 'মুসলিম' এবং কবি নজরুল ইসলাম কলেজ' থেকে 'ইসলাম' শব্দ ঝেটিয়ে বিদায় করা হলো। এইভাবে 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' সূচক সবকিছু মুছে ফেলার প্রচন্ড এক অভিযান শুরু হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম শিক্ষার আবেদন সূচক কোরআনের আয়াত উৎকীর্ণ ছিল। কোরআনের সে আয়াত তুলে ফেলে মনোগ্রামকে নতুনরূপ দেয়া হলো। আর শাসনতন্ত্রে এমন বিধান রাখা হলো যাতে 'ইসলাম' নামের 'মুসলিম' নামের কোন রাজনৈতিক দল দেশে গড়ে উঠতে না পারে, কাজ করতে না পারে। তারা যদি পারতো তাহলে মুসলিম জনগণের হৃদয় থেকে তাদের 'ঈমান' উপরে ফেলা হতো। কিন্তু তা পারা সম্ভব ছিল না।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের মত বাংলাদেশের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব মুছে ফেলারও প্রক্রিয়া জোরে-সোরে চলছিল। ভারতের প্রাচীন ও বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা কোলকাতার 'দেব সাহিত্য কুটির' ১৯৭৩ সালে তাদের বিখ্যাত Student Favourite Dictionary' (A. T. Dev লিখিত)-এর একটি সংশোধিত সংস্করণ বের করে। এই ডিকশনারী ম্যাপসহ বাংলাদেশ-এর পরিচয় পাঠকদের জন্যে তুলে ধরে। যাতে বাংলাদেশকে ভারতের একটা প্রদেশ হিসেবে দেখানো হয়। এতে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ফলে বাংলাদেশ সরকার ডিকশনারীটি বেআইনি এবং এর সকল কপি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার একটা গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশ করে। গেজেট নোটিশের ভাষা খুবই মজার এবং এতে প্রমাণ হয় বাংলাদেশ সরকার স্বাধীন রাষ্ট্রের মত করে কথা বলতে ভয় পান। গেটে নোটিশটি নিম্নরূপঃ

১। স্বাধীনতা ঘোষনার লক্ষ্যগত এই দিনটি হুবহু ইংরাজী বাক্যটা হলো ঃ In order to ensure for the people of Bangladesh, equalitv, human dignitv and social justice" (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঃ দলিলপত্র, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫)।

www.icsbook.info

"No. 1130-sec (111) 15th November, 1973-Wheareas the Govt. is satisfied that the book styled `Students' Favourite Dictionary in English to Bengali edited by Ashu Tosh Dev and Published by S. C. Mazumdar, Dev Sahitya Kutir Private Ltd. 21, Jhamapuker Lane, Calcutta and Printed by N.C. Mazumdar at B.P.M's Printing Press (revised and Idnlarged deition, January, 1973) contain matter which tend to influence a section of the citizens of Bangladesh in a manner likely the Prejudicial to safety of Bangladesh which tend to advocate the curtailment or abolition of the Sovereignty of Bangladesh Now therefore the govt. is pleased to declare all copies of the book aforesaid to be forfeted to govt.

এই গেজেট নোটিশে, এ,টি,দেব-এর ডিকশনারী ম্যাপ বাংলাদেশের এক শ্রেণীর মানুষকে প্রভাবিত করবে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ এ বিষয়টি আহত ও বিক্ষুব্ধ করার কথা প্রতিটি বাংলাদেশীকে এবং বাংলাদেশ সরকারকেও। কিন্তু গেজেট নোটিশে বাংলাদেশ সরকার সেই ভাষায় কথা বলেননি। অথবা বলতে সাহস পাননি। বলেননি এটাই বোধ হয় সত্য। কারণ জাতির স্বাতন্ত্র যার কাছে বড় নয়, তার কাছে জাতীয় রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র বড় হবে কেমন করে? মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র মুছে ফেলার ক্ষেত্রে ভারতের চেয়েও অগ্রণী হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর সরকার। ভারতে এখনও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু বাংলাদেশে জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে পারেনি। কেটে দেয়া হয়েছে এর নামের 'মুসলিম' শব্দ।

এ,টি,দেব-এর ডিকশনারীর মতই আরেকটা কাজ করল কোলকাতার দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। ১৯৭৪ সালের ১৮ই মে তারিখের 'সম্মাদকীয়' India and Bangladesh শীর্ষক নিবন্ধে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে The Chief Minister of Bangladesh' বলে অভিহিত করা হয়। ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ভারত রাষ্ট্রের প্রাদেশিক প্রশাসনিক প্রধানকে 'চীফ মিনিস্টার' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলাদেশকে ভারতের একটা প্রদেশ মনে করেন।

লক্ষণীয়, দেব সাহিত্য কুটির কিংবা অমৃতবাজার পত্রিকা কেউই তাদের জঘন্য কাজের জন্য মাফ চাওয়া তো দুরে থাক সামান্য দুঃখ প্রকাশও করেনি। এর অর্থ তারা ভুল করেছে বলে মনে করেনা।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ সরকারের রাজনীতি ছিল, ১৯৭৫ সালের

www.icsbook.info

১৫ই আগস্ট পর্যন্ত, ভারতীয় স্বার্থের পরিপূরক। এই রাজনীতি অর্থনৈতিকভাবেও দেশকে দেউলিয়ায় পরিণত করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশ থেকে যে সম্পদ লুট করেছিল তার পরিমাণ তখনকার বাজার মূল্য অনুসারে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা।[২] এই সাথে বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল ভারতীয় পণ্যের বাজার। এর সাথে সকল নীতি-নৈতিকতার বাধনমুক্ত শাসক মহল ও শাসকদল নিমজ্জিত হয়েছিল সীমাহীন দুর্নীতি ও দুরাচারমূলক কাজে।[৩] ক্ষমতাসীন সরকারের এই রাজনীতি দেশের মানুষকে ডুবিয়ে দিয়েছিল দুর্ভাগ্যের অতল তলে। ফলে 'জাতির পিতা', বঙ্গবন্ধু' বলে পরিচিত শেখ মুজিব পরিণত হলেন সবচেয়ে 'অবাঞ্ছিত' মানুষে। লন্ডনের সানডে টাইমস-এর অন্থনী মাসকারেন-হাস লিখেন, "১৯৭২ সালে নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সম্বর্ধণা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যূত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন। দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক' বছরে তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। ----- মুজিবের ট্র্যাডেজি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চ মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ দুশমনে পরিণত হলেন।[৪]"

শেখ মুজিবের পতনের মাত্র কিছুকাল আগে উপমহাদেশে একটা বড় ধরনের ঘটনা ঘটে যা বাংলাদেশের মানুষকে আতংকিত করে তোলে। সে ঘটনা হলো ভারত কর্তৃক সিকিম দখল। ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে ভারত সিকিম দখল করে নেয়। সে সময় বাংলাদেশে উপস্থিত একজন বিদেশী সাংবাদিক এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়ার চিত্র এঁকেছেন এইভাবে ঃ "সিকিমের ঘটনার খবর বাংলাদেশের রাজধানীতে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ভারতীয় 'সম্প্রসারণবাদের' তীব্র প্রতিবাদ করে। ----বাংলাদেশের অধ্যাপকরা এক প্রতিবাদপত্রে লিখলেন, "সিকিমকে ভারতের অংগরাজ্যে পরিণত করার আইনকে আমরা সিকিমের সার্বভৌমত্বের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে মনে করি। এ ধরনের সম্প্রাসারণ নীতি ভারতের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির প্রতি এক মারাত্মক হুমকি। ----" বাঙ্গালীরা সিকিমের কোন গুরুত্ব দেয়না। কিন্তু তাদের ভয় সিকিমের ভাগ্যে যা ঘটেছে বাংলাদেশের ভাগ্যেও মোটের উপর তাই রয়েছে', বললেন পশ্চিম দেশীয় একজন কূটনীতিবিদ। অপর একজন বললেন, ১৯৭১ সালে যখন নয়াদিল্লী বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিল, তখন থেকেই বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গেছে।

২। মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক 'হক কথা'য় উল্লিখিত ভারত কর্তৃক লুণ্ঠিত দ্রব্যের মূল্যমান অনুযায়ী।
৩। স্বয়ং শেখ মুজিব বলেছিলেন তাঁর চারদিকে রয়েছে চাটার দল।
৪। এন্থনী মাসকারেন-হাস, সানডে টাইমস, লন্ডন, ১৭ই আগস্ট, ১৯৭৫।

www.icsbook.info

সেদিন খুব দূরে নয় যখন বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে ভারত মুখ হাঁ করে এগিয়ে আসবে এবং যখন মুখ বন্ধ করবে তখন বাংলাদেশ ভারতের পেটের ভেতরে। - বাংলাদেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাকের বত্রিশ বছর বয়স্ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন বললেন, সিকিমে যেমন করেছে তেমনি বাংলাদেশেও ভারত আভ্যন্তরীণ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এবং সেই সমস্যার অজুহাতে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে।"[৫]

বিদেশী কূটনীতিক ও বাংলাদেশী জনগণের এ আশংকা যে খুবই বাস্তব তার ইংগিত ভারতীয় পত্রিকাও তখন দিয়েছিল। ভারতীয় একটি পত্রিকা তখন একটা কার্টুন ছেপেছিল যা ছিল খুবই দুশ্চিন্তার। কার্টুনটিতে দেখানো হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সিকিমকে ট্রলিতে চড়িয়ে ভারতীয় পার্লামেন্টে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন, আর অদূরে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দ বাচ্চাদের মত ন্যাপকিন গায়ে জড়িয়ে 'মাসী'কে পরের বার তাদেরকে ট্রলিতে তুলে নিতে অনুরোধ করছেন।[৬]

ভারতীয় পত্রিকার এই রসসৃষ্টি এবং প্রতিবেশীদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি এই বিদ্রুপবাণ ভারতের অন্যান্য প্রতিবেশীর চাইতে বাংলাদেশকেই বেশী আহত ও আতংকগ্রস্ত করেছিল। ভারতঘেষা বলে পরিচিত শেখ মুজিব ও শেখ মুজিবের সরকারকেও বাংলাদেশের মানুষ তখন আতংকের চোখে দেখছিল। তাই 'মাসী' ইন্দিরা গান্ধী'র ট্রলি 'পরের বার' ফিরে আসার আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট যখন শেখ মুজিব নিহত হলেন এবং তার সরকারের পতন ঘটল, তখন বাংলাদেশের মানুষ কোন দুঃখ নয়, প্রবল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

বস্তুত ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্রবাদী ও ভারতঘেরা রাজনীতি ও শাসন কর্তৃত্বের পতন ঘটল। ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব তার পরিবারবর্গসহ মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার একদিন পর একজন বিদেশী সাংবাদিক লিখেছিলেন ঃ "তাঁর (মুজিবের) বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানতঃ তিনটি উপকরণ মিশে আছে। প্রথমতঃ সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা করতেন। ---------সামরিক অফিসারদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কোন সুযোগ তিনি ছাড়তেন না। স্পষ্টতই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরী চালাতেন। --- মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত, ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে, বেতনে-ভাতায়, ব্যয়ে-বরাদ্দে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশী প্রাধান্য

৫। 'হিউস্টন পোস্ট', হিউষ্টন, টেক্সাস, ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৪ (উদ্ধৃতঃ 'বাংলাদেশ ট্রাজেডি ঃ বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে', নিশান পাবলিকেশনস, ২৪ হার্মভিল রোড, লন্ডন, মার্চ ১৯৭৭)।
৬। 'হিউস্টন পোস্ট', হিউষ্টন, টেক্সাস, ৩রা নভেম্বর, ১৯৭৪ (উদ্ধৃতঃ 'বাংলাদেশ ট্রাজেডি ঃ বিদেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিতে', নিশান পাবলিকেশনস, ২৪ হার্মভিল রোড, লন্ডন, মার্চ ১৯৭৭)।

www.icsbook.info

দেয়া হতো। উভয়ের স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন। ------- মুজিবের পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবনয়ন অনিশ্চয়তা সূচক প্রমাণিত হয়েছে। 'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালীরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশি ধর্মানুরাগী। অপরদিকে বাঙ্গালী মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিলেন বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। এই পশ্চাদভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগনের বৃহত্তম অংশকে আহত করেছিল। তাই নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে রাতারাতি জনসমর্থন লাভ করেছেন। গত শুক্রবার জুমা'র নামাযের জন্য কারফিউ উঠিয়ে দিলে মসজিদে এই জনসমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে।"[৭] শাসনতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষমুখী পরিবর্তন শেখ মুজিবের জন্যে কাল হয়ে দাঁড়ায়, আরও অনেক বিদেশী পর্যবেক্ষক একথা বলেছেন। শেখ মুজিব নিহত হবার পরপরই লন্ডনের সানডে টেলিগ্রাফ লিখে ঃ "বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হলো শহরের বাসিন্দা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সমর্থনই মুজিবকে নেতা বানিয়েছিল, ক্ষমতায় বসিয়েছিল। কিন্তু শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে মুজিব তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন এবং সেদিন থেকেই নিজেকে অতীতের পাতায় তুলে দিয়ে ছিলেন।"[৮] "১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীনতার পর থেকে ১২ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড বিদেশী সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির অবক্ষয় কমেনি। কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের অনেকেই আওয়ামী লীগের চাঁই। ----- শেখ মুজিবের সাম্প্রতিক রাজনীতি মধ্যবিত্তশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। মুজিবের মৃত্যুর নির্মম পরিহাস যে, পাকিস্তানীরা তাকে হত্যা করেনি, তাঁর দেশবাসীরাই তাকে হত্যা করেছে। এতে বুঝতে পারা যায় যে, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার উচ্চ শিখর থেকে হতাশা ও নৈরাজ্যের অতল গহ্বরে নেমে এসেছিল। -------- তাছাড়া আদর্শগত প্রশ্নও ছিল। ------আওয়ামী লীগের ভেতরে ও বাইরে প্রাচীনপন্থী মুসলমান বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, নতুন শাসকরা বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষনা করেছেন।"[৯]

আগস্ট বিপ্লবের পর দেশের রাজনীতি আবার স্বাধীন ও জাতীয় চেতনায় ফিরে এল। শাসনতন্ত্রের মৌল ভিত্তির আসন থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও

৭। এন্থনী মাসকারেন-হাস, সানডে টাইমস, লন্ডন, ১৭ই আগস্ট, ১৯৭৫।
৮। অমিত রায়, সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ১৭ই আগস্ট, ১৯৭৫।
৯। গার্ডিয়ান, লন্ডন, ১৬ই আগস্ট, ১৯৭৫।

www.icsbook.info

সমাজতন্ত্রকে বিদায় করা হলো এবং তার জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হলো সংবিধানের শীর্ষে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। ধর্মীয় নামে অর্থাৎ 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' পরিচয় সম্বলিত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার উপর যে বিধি-নিষেধ শাসনতন্ত্রে ছিল, তার বিলোপ সাধন করা হলো। এছাড়া শাসনতন্ত্রে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার যে বিধান ছিল, তারও উচ্ছেদ সাধন হয়ে গেল।

এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে জাতি অসহনীয় ও অশরীরি এক বন্দীদশার হাত থেকে মুক্তি পেল, অনুভব করল স্বাধীনতার স্বাদ। সংবাদপত্র থেকে রাজনীতি, শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই একটা শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ ফিরে এল। বিলোপ ঘোষিত সংবাদপত্রগুলো আত্মপ্রকাশ করলো, রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধতার কবল থেকে মুক্তি পেল। সবচেয়ে বড় কথা হলো ধর্মভিত্তিক দলগুলো সাড়ে তিন বছরের বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করল। প্রকাশ্যে কাজ শুরু করতে পারল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, ইত্যাদিসহ ইসলাম ও মুসলিম নাম-পরিচয় সম্বলিত রাজনৈতিক দল।

এইভাবে ১৯০৬ সালে উপমহাদেশে যে মুসলিম রাজনীতির নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল, যে রাজনীতির দান মুসলিম আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ভূখন্ড, সেই রাজনীতি আবার ফিরে এল বাংলাদেশে। অন্যকথায় বাংলাদেশ ফিরে এল তার স্বরূপে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বিপ্লবের ঘোষণাকালে বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এই ঘোষণাকে পরে রক্ষা করা হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের পর বিএনপি ও জাতীয় পার্টি দল দুটি দেশ শাসন করেছে। এ দু'টি দল ধর্মনিরপেক্ষ নয়, শাসনতন্ত্রের মতই এদু'টি দল 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাখে এবং ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণের কথা বলে, তবু বাংলাদেশ ইসলামী রিপাবলিক হয়নি কিংবা সরকারের আইন ও আচরনের উৎস কোরআন এবং সুন্নাহকে গ্রহণ করা হয়নি। অবশ্য জাতীয় পার্টির শাসনামলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে 'ইসলাম'কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার ফলে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' এবং বাংলাদেশের রাজনীতি নীতিগতভাবে ইসলাম ভিত্তিক হয়েছে। কিন্তু কার্যত বাংলাদেশ এখনও ইসলামী রাষ্ট্র হয়নি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিও ইসলাম ভিত্তিক হয়নি। বাংলাদেশে বর্তমানে চার ধরনের রাজনীতি আছে। এবং তা হলোঃ ধর্মীয় জীবন বিধান বিরোধী রাজনীতি, ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি, ধর্ম পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। ধর্মীয় জীবন বিধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে সাবেক কম্যুনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক দলসমূহ। ধর্মীয় নীতি-আদর্শ ও বিধি-বিধান দ্বারা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি পরিচালিত হোক, তা এরা চাচ্ছে না। ধর্ম নিরপেক্ষ দল হলো আওয়ামী

www.icsbook.info

লীগ। এই দল ঘোষিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু কার্যত নীতি ও আচরণের দিক দিয়ে ধর্মীয় জীবন বিধান বিরোধী দলগুলোর সাথে এর কোনই পার্থক্য নেই। ধর্ম-পরিচয় ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো হলো বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি। মুসলিশ লীগকেও এই দলেই ফেলা যায়। এই দলগুলো ইসলামের কথা বলে, ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলে, ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষার কথা বলে এবং ধর্মাচরণমূলক কাজও অনেক করে, কিন্তু ইসলামী নীতি-নিয়ম ও বিধি-বিধান দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হোক এবং সকল আইনের উৎস হোক কোরআর ও সুন্নাহ, এ বিষয়টি তারা এড়িয়ে চলে। এক্ষেত্রে তাদের আচরণ ঠিক ধর্মনিরপেক্ষদের মতই। ধর্ম ভিত্তিক দলগুরোর মধ্যে রয়েছে জামায়াতে ইসলামী, নেজামী ইসলামী পার্টি, খেলাফত মজলিশ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, প্রভৃতি। এদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীই প্রধান এবং ৭৫ উত্তর সবগুলো সংসদেই তাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল। ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী গঠিত হয়। তখন এর নাম ছিল জামায়াতে ইসলামী হিন্দ। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর নাম হয় জামায়াতে ইসলামী। এখন বাংলাদেশে এর নাম জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দল চার শ্রেণীর হলেও রাজনৈতিক ধারা মূলত দুইটি। এর একটি হলো ইসলামী জীবন বিধান ও স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসত্তা বিরোধী ধারা, অন্যটি ইসলাম ও স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসত্তা ভিত্তিক ধারা। প্রথম ধারাটির আদর্শিক নেতৃত্ব দিচ্ছে সাবেক বাম ও সমাজতন্ত্রী দলগুলো। এই ধারাকে সহায়তা দিচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ এবং এই ধারার রাজনীতির যা পুরস্কার তা ষোল আনাই আওয়ামী লীগ ভোগ করছে। ১৫ দলীয় জোট, ৮ দলীয় জোট, নির্বাচনী জোট, ইত্যাদির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ এই রাজনীতির ফল কব্জা করে আসছে। অন্যদিকে দ্বিতীয় ধারার রাজনীতির আদর্শিক নেতৃত্বে রয়েছে জামায়াতে ইসলামী। বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি তাদের ক্ষমতায় যাওয়া অথবা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু এই রাজনীতিকে সহায়তা দান করে আসছে এবং এই রাজনীতির সুফল তারাই ভোগ করছে। প্রথম ধারার রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের যে ভূমিকা, দ্বিতীয় ধারার রাজনীতিতে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির সেই ভূমিকা। শুধু তাদের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু যে, প্রথম ধারার রাজনীতির প্রতি আওয়ামী লীগ আন্তরিক, কিন্তু দ্বিতীয় ধারার রাজনীতির প্রতি বিএনপি ও জাতীয় পার্টি ততটা আন্তরিক নয়, যতটা আন্তরিক হলে ইসলাম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টির একটা মজার মিল রয়েছে। সেটা হলো, প্রথম ধারার রাজনীতির সাথে আওয়ামী লীগ সার্বিকভাবে একাত্ম হয়ে যেতে পারে না জনগনের ভয়ে, ভোটের গরজে, অন্যদিকে বিএনপি জাতীয় পার্টিও দ্বিতীয় ধারার রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না ঐ জনগণের ভয়ে, জনগণকে সাথে রাখার গরজে। এ থেকে এ সত্যটি আবারও বেরিয়ে আসছে যে, এদেশের

www.icsbook.info

জনগণ ধর্মভীরু এবং রাষ্ট্র, সংবিধান ও রাজনীতির সাথে ধর্মের বিচ্ছিন্নতা তারা পছন্দ করেনা। রাজনীতির এই মেরুকরণ থেকে আরও একটা সত্য এখানে বেরিয়ে পড়ে। তা হলো, জামায়াতে ইসলামী স্বতন্ত্র মুসলিম জাতি সত্তা ভিত্তিক ইসলামী রাজনীতির আদর্শিক নেতৃত্বদানকারী হিসেবে এদেশের ধর্মভীরু মানুষের আশা-আকাংখা ও আবেগ-অনুভূতির সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করছে। এ সত্যটি অবশ্য এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠির কাছে স্পষ্ট নয়, জামায়াতে ইসলামী তার এ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হলেও সে যা জনগণকে এখনও তা সে বুঝাতে পারেনি। নির্বাচনগুলোকে জামায়াতের প্রাপ্ত ভোটই এর প্রমাণ। রাজনীতির এই মেরুকরণ থেকে আরও একটা সত্য বেরিয়ে আসে, সেটা হলো, প্রথম ধারা ও দ্বিতীয় ধারার রাজনীতির সংঘাতে দ্বিতীয় ধারার রাজনীতিতে কোন ঐক্য নেই। জামায়াতে, বিএনপি, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফত আন্দোলন, খেলাফত মজলিশ, প্রভৃতি দলের মধ্যে অনৈক্য, অসহযোগিতাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। অন্যদিকে প্রথম ধারার রাজনীতি তার পক্ষের সকলের ছাড়াও মাঝে মধ্যে বিএনপি ও জাতীয় পার্টিরও সহযোগিতা, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে, লাভ করে থাকে। প্রথম ধারার রাজনীতির অন্তর্ভূক্ত ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির পূর্বাপর রাজনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এ বিষয়টি পরিস্কার বোঝা যাবে। প্রথম ধারার রাজনীতি দেশের বাইরে থেকেও বড় ধরনের সহযোগিতা পাচেছ। অথবা বলা যায় প্রথম ধারার সাম্প্রতিক রাজনীতি বাংলাদেশের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বিরোধী বাইরের রাজনীতির একটা অংশ মাত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা - উত্তর বিশেষ করে পঁচাত্তর-উত্তর রাজনীতিতে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়।

স্বাধীনতার পর পঁচাত্তরের বিপ্লব-পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি ছিল ভারতের প্রভাবাধীন। স্বেচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক শেখ মুজিবের সরকারকে এটা মেনে নিতে হয়েছিল।[১০] অন্যদিকে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে অধীনস্থ একটা প্রদেশের বেশী মর্যাদা দেয়া হতো না। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের বিপ্লবের পর ভারতীয় এই প্রভুত্বের অবলুপ্তি ঘটে এবং বাংলাদেশের রাজনীতি স্বাধীন হয় এবং স্বরূপে ফিরে আসে। এই অবস্থায় ভারতের স্বার্থবাদী

১০। শেখ মুজিব সরকারের ভারতমুখিতা সম্পর্কে মওলানা ভাসানীর উক্তি ঃ "পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি আমাদের আসে নাই, কেননা আগেকার প্রাদেশিক গভর্ণর ও মন্ত্রীদের চাইতে অধিকতর নগ্নভাবে বাংলাদেশের মন্ত্রীরা নয়াদিল্লীতে সপ্তায় সপ্তায় গমন করেন, সেখান হইতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, ভারতীয় কিসিঞ্জার বাংলাদেশের অসরকারী প্রধানমন্ত্রী ডিপি ধর (হালে ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত হাত পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ বাবুরা) আসিয়া যে নির্দেশ দিয়া যান, ঠিক সেভাবেই দেশ চালানোর এন্তেমাল হইতেছে। বাংলাদেশের বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দিল্লীর অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যায় না, বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার নাম করিয়া অর্থমন্ত্রী নয়াদিল্লীর প্রভুদিগকে উন্নয়ন পরিকল্পনা খসড়া দেখাইয়া আনেন। সবচাইতে লজ্জার ব্যাপার হইল, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জনগণের পবিত্রতম সনদ শাসনতন্ত্রটিও খসড়া হইবার পর জনগণের কাছে প্রকাশের আগে দিল্লী পাঠানো হইয়াছে। জুন মাসে (১৯৭২) আইনমন্ত্রী কামাল হোসেন শাসনতন্ত্রের খসড়া বগলদাবা করিয়া বিলাত যাইবার নাম করিয়া দিল্লীর প্রভুদের খেদমতে হাজির হইয়াছেন। মৎস বিভাগ এমনকি সমবায়ের মত অনুল্লেখযোগ্য দপ্তরের মন্ত্রীরাও এদেশের প্রধানন্ত্রীর নির্দেশ লইবার আগে নয়াদিল্লী কোলকাতা বোম্বাই দৌড়াইয়া ভারতীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নির্দেশ ও ফরমায়েশ লইয়া আসেন।" (আওয়ামী লীগের কথা ও কাজ ওয়াদাভঙ্গের এক নজির', মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। মওলানা ভাসানীর এই বক্তব্যটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত ১৯৭২ সালে জুলাই মাসে। জনৈক 'মোহাম্মদ হোসেন'-এর ব্যবস্থাপনায় ও তত্ত্বাবধানে পুস্তিকাটি 'শান্তি প্রেস' থেকে ছাপা হয়) এর অংশ বিশেষ প্রকাশিত হয় দৈনিক মিল্লাতের ১৫ই আগস্ট' ৯১ -এর বিশেষ ক্রোড়পত্রে।

www.icsbook.info

মহল ধীরে ধীরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও বাংলাদেশের স্বতন্ত্র জাতি-সত্তা বিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক তৎপরতায় নানাভাবে ব্রতি হয়।

ভারতের এই তৎপরতা সম্পর্কে কিছু বলার আগে ভারতের ঐ মহলটির বর্তমান রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। ইতিহাস স্বাক্ষী, ভারতীয় হিন্দু রাজনীতির ব্রাহ্মনবাদী স্বার্থপরতা ও একগুয়েমীর কারণেই ভারত বিভক্ত হয়। স্বাধীনতার পর ভারত নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করে। কিন্তু ভারতে কোন সময়ই ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না এবং এখনও নেই। এর কারণ ভারতে রাজনৈতিক দলগুলোর উৎকট সাম্প্রদায়িক আচরণ। স্বাধীনতার পর সে আচরণ আকারে এবং প্রকারে বেড়ে যায়। স্বাধীনতার আগে হিন্দুমহাসভা ও আর এমএস-এর মত যে দলগুলোকে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছে মুসলমানদের মাথা ভাঙ্গার জন্যে, স্বাধীনতার পর এই দলগুলো আর লাঠি থাকে না, স্বাধীন হয় এবং সংখ্যাতেও বেড়ে যায়। তার সাথে সাথে বর্ধিত হতে থাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী জাগরণ। ভারতীয় রাজনীতির শক্তিকেন্দ্র উত্তর ভারত তথা হিন্দী বেল্ট এই জাগরণের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। অযোধ্যার বাবরী মসজিদ নিয়ে তারা গন্ডগোল বাধায় স্বাধীনতার পরপরই। অবস্থা তখন এমন দাঁড়িয়েছিল যে নেহেরু পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, "সাম্প্রদায়িক দিক দিয়ে যুক্তপ্রদেশের অবস্থা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। যুক্ত প্রদেশকে এখন আমার কাছে অচেনা মনে হয়। অযোধ্যার মসজিদ ও ফায়জাবাদের হোটেল নিয়ে যা ঘটল তা খুবই খারাপ। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, আমাদের নিজেদের লোকেরাই একে সমর্থন করছে এবং তারা এটা করতেই থাকবে।"[১১] মিঃ নেহেরু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে একথাগুলো বলেছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রতিবিধানের জন্যে কিছুই করেননি। ভারতীয় একজন সমীক্ষকের ভাষায় "No action followed and indeed the multifold and intensifying consequences of official impassity and week-ness in ayodhya are with us still."[১২] অর্থাৎ প্রতিবিধান কিছুই করা হয়নি এবং সেই দূর্বলতা ও স্থবিরতার বহুমুখী ও বর্ধনশীল প্রতিফলন এখনও আমরা অযোধ্যায় ভোগ করছি।' এই ব্যর্থতার স্বীকৃতি নেহেরুর কাছ থেকেও পাওয়া যায়। তাঁর ভাষায় 'সত্য এই যে, অনেক অহংকার সত্ত্বেও আমরা আমাদের নিজেদেরকে পশ্চাৎমুখী প্রমাণ করেছি।[১৩]' এই ব্যর্থতার স্বাক্ষ্য অনেকেই দিয়েছেন। যেমন Statesman লিখছে, "১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্ত ান্তরের পর নেহেরু-গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তাদের ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে কিছুই করেনি।[১৪]" অনেকে গান্ধীর জন্যে হা-হুতাশ করেন। তাদের কথা শুনলে মনে হয় স্বাধীনতার পরপরই গান্ধী নিহত না হলে তিনি ভারতকে সব ধর্মের স্বর্গ বানাতেন। তাদের একথা ঠিক নয়। ভারতে গান্ধী মিষ্টার নয়, মহাত্মা।

১১। Nehru to Pant, April 17, 1950, Nehru papers.
১২। 'Introduction' chap, Anatomy of a Confrontation, Survepalli Gopal, page 16
১৩। Nehru to Pant, April 17, 1950, Nehru papers. (উদ্ধৃত, ঐ).
১৪। 'Congress Legacy', Samaresh Roy, The Stateman, April 2, 1993১৬- 'Hindu Politics', Satyabrata Rai Chaudhury, Statesman, March 19 1993.

www.icsbook.info

ভারতে তার ভাবমূর্তি রাজনীতিকের নয়, বরং তিনি সেখানে গুরুজী, ধর্মনেতা। এই ভাবমূর্তি তিনি সৃষ্টি করেছিলেন স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী, বাল গঙ্গাধর তিলকদের মতই ভারতের হিন্দু 'জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং কংগ্রেসের পেছনে তাদের সমবেত করার জন্য। আজ 'রাম'কে নিয়ে ভারতে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে তার আধুনিক সূত্রপাত ঘটিয়েছেন মহাত্মা গান্ধী নিজে। সমরেশ রায় তার এক নিবন্ধে বলছেন, "গান্ধীর প্রার্থণা সভাগুলো এবং রামের স্তুতিবাচক তার গানের আসর তাকে হিন্দু জাতীয়তাবাদীতে পরিণত করে। তার এ পদ্ধতি কংগ্রেসকে ভারতে গণভিত্তি রচনায় সাহায্য করে যা তার ছিলনা এবং গান্ধীও পরিণহত হন জননেতায়।"[১৫] কংগ্রেস বরাবর এই নীতিই অনুসরণ করে এসেছে এবং স্বাধীনতা-পূর্ব কালের মতই হিন্দু মহাসভা ও আরএসএস এর মত দলগুলোকে আশ্রয় দিয়েছে, পালন করেছে এবং সামনে এগিয়ে দিয়েছে। বরাবরের এই নীতি ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতিকে শক্তি ও মর্যাদা দান করেণে এবং শিক্ষিত তরুণ ও যুবকদেরও এর প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সত্যব্রত রায় চৌধুরীর ভাষায়, "সামাজিক বিকাশ গণ হিন্দুবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানকে সাহায্য করেছে। জনতা সরকার ক্ষমতায় (১৯৭৭-৭৯) আসার আগের বছরগুলোতে এবং ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় আসার সময় হিন্দুবাদী

১৫। সমরেশ রায়ের 'Congress Lagacy' শীর্ষক এই লিখাটি ষ্টেটসম্যান এ ছাপা হয় ২রা এপ্রিল '৯৩ তারিখে। ১৯শে এপ্রিল '৯৩ তারিখে এই ষ্টেটসম্যান-এ উক্ত প্রবন্ধের উপর একটা চিঠি ছাপা হয়। চিঠির লেখক সমরেশ রায়ের প্রবন্ধের সাথে কিছু কথা যোগ করেন। 'Gandhi's Hindu Hindi Dream '-শীর্ষক চিঠিটি এইঃ

Sir-To supplement Samaresh Roy's article 'Congress Lagacy (April 2-3), Mahatma Gandhi was the first leader to fing out that the Hindi belt was India's political nerve centre. He also know that the Hindu belt could not be consolidated without invoking Hindu sentiments. Gandhi revealed his true colours after the 1937 elections. Cliques were organized in different provinces to prevent non-Hindu and non-Hindi speaking leaders from reaching the top of the provincial Governments which were to be set up. In Bihar Dr. Sri Krishna Singh was made Premier (no Provision for chief Ministers then) overriding the legitimate claims of a Muslim leader. By all known rules of the game, Veer Nariman should have been Premier of Bombay Presidency. But that was not to be. The process of selecting a leader was manipulated by Patel in such a manner that B. G. Kher was made Premier. Nariman was both a non-Hindu and non-Hindi speaking, but Kher was at least a non-Hindu. The Central Province and Berar had its capital at Nagpur where Marathi-speaking leaders dominated. So in keeping with Ghandhi's ``Hindu-Hindi" model Pandit Ravi Shankar Shukla was installed.

Ghandhi's ``Hindu-Hindi" obsession had alienated not only Muslims but also the parsis 'After the 1937 experience, they ceased to take any active interest in Indian Politics. For the same reason Gandhi promoted Nehru over the head of patel who was a stronger statesman but not a 'yes' man.

After subhash Bose's victory. Gandhi said "Pattabhi Sitaramaya's defeat is my defeat", But he did not mean what he said, He climinated a South Indian by a Bengali who was subcquently replaced by a Hindi-Speaking Hindu president. His apologists may say that patel was the brains behind these machinations. But he could not have done anything without Gandhi's approval Ironically it is not the Congress but the BJP that will now strive to realize Gandhi's Hindi-Hindu Dream. -Yours, etc. B. C. GUPTA, Calcutta, April 4.

www.icsbook.info

রাজনীতির ভিত্তি ছিল উত্তর ভারত ও মহারাষ্ট্রের শিক্ষিত ও হিন্দু জাতীয়তাবাদিতায় লালিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। কিন্তু ভারতে সত্তরের দশক থেকেই স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগের পর সৃষ্ট গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত নতুন প্রজন্ম হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের প্রতি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সেখানে এমন একটা সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে যাতে এই নতুন প্রজন্ম হিন্দুবাদের অনুসরণ এবং একে সহযোগিতাদানকে মর্যাদা ও অস্তিত্বের স্মারক বলে মনে করছে।"[১৬] এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে আর্য সমাজ ও হিন্দু মহাসভার উত্তরসূরী বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শিবসেনা, বজরং দল, আরএসএস, প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্যবাদী সংগঠনগুলো শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং এদের রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) প্রবল প্রতাপ নিয়ে ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভূত হলো। সুকুমারী ভট্টাচার্যের ভাষায় "১৯২০ সালে 'হিন্দু মহাসভা'র গঠনে যার সূত্রপাত, ৬ ডিসেম্বর বাবরী মসজিদ ধ্বংসে ১৯৯২-এ তার ক্রান্তিকাল। শাখায় পল্লবে বিস্তারিত হয়ে 'জনসংঘ', ভারতীয় জনতা পার্টি, 'বজরং দল', শিবসেনা', 'আমরা বাঙালী', সন্তানদল', ইত্যাদি নামে ও আকারে একটি বীভৎস দানবিকতা বিকট রক্তাক্ত নখদন্ত মেলে আজ ভারতবর্ষের মানসিকতাকে গ্রাস করতে উদ্যত। ----কথায় ও লেখায় প্রায়ই শোণা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে মুসলমানরা বহিরাগত, ভারতবর্ষে নেহাৎই যদি তারা থাকতে চান তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ও অভারতীয় সঙ্গ বহন করে চলতে হবে। ---- হিন্দুই একমাত্র খাঁটি ভারতীয়। বছর দশেক আগে প্রথম বিশ্ব-হিন্দু পরিষদের যে বিরাট সমাবেশ হয় দিল্লীতে, তখন চার পাঁচ হাত লম্বা অক্ষরে দিল্লীর ইতস্ততঃ বিরাট দেওয়াল জোড়া বিজ্ঞপ্তি (ইংরেজীতে) দেখা যায় ঃ সকল অহিন্দুই অভারতীয়।[১৭]" সম্প্রতি শিবসেনা নেতা এর চেয়েও বড় কথা বলেছেন। মুসলমানরা ভারতবর্ষ না ছাড়লে লাথি মেরে তারা মুসলমানদের ভারতছাড়া করবেন। বাবরী মসজিদ ধ্বংস এবং ভারতের মুসলিম বিরোধী দাঙ্গার ভাষা এটাই।

হিন্দুবাদের এই রূপকে অনেকেই হিন্দু মৌলবাদ বলে অভিহিত করছেন। এবং একে মুসলিম মৌলবাদের সাথে সমার্থক করছেন। এই দৃষ্টিকোন থেকেই ভারতের বিজেপি, শিবসেনা, হিন্দুমহাসভা ইত্যাদির সাথে জামায়াতে ইসলামীকে তুলনা করা হয়। কিন্তু এই তুলনা কি ঠিক? এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো, হিন্দুধর্মে মূল বা মৌল কিছু নেই, তাই মৌলবাদ নেই, তাই কেউ মৌলবাদীও হতে পারে না। অন্যদিকে ইসলামে মূল আছে, মৌল আছে। একে যদি মৌলবাদ বলা হয়, তাহলে মৌলবাদ আছে। ইসলামের কোরআন, সুন্নাহই এই মৌলবাদ। হিন্দুধর্মে কোন মৌলবাদ নেই, এ সম্পর্কে সুন্দর কথা বলেছেন

১৬। Hindu Politics Satyabrata Rai Chaudhury, Statesman, March 19, 1993

১৭। 'ভারত বর্ষে আগন্তুক মুসলমান', সুকুমার ভট্টাচার্য, একালের রক্তকবরী, শারদসংখ্যা, কোলকাতা ১৪০০ সাল।

www.icsbook.info

অমিয়কুমার বাগচী তার Predatory Commercialization and Communalism in India' প্রবন্ধে। তিনি বলছেন, "হিন্দুবাদ একক তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল কোন ধর্ম নয় অথবা হিন্দুধর্মে কর্তৃত্বের একক কোন উৎস নেই। হিন্দু ধর্মেল পবিত্র বানী ও বক্তব্য সমূহের শুধু যে বহুমুখী ব্যাখ্যা আছে তাই নয়, বরং প্রতিটি কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে ধর্মের জন্যে নতুন পবিত্র বিধি-বিধান এবং বানী ও বক্তব্য সৃষ্টি করা হয়।"[১৮] অথচ ইসলামের রয়েছে কর্তৃত্বের একক উৎস আল্লাহ। আল্লাহর এ কর্তৃত্ব এসেছে তাঁর বার্তাবাহক রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যমে আল-কোরআন এর আকারে। এবং ইসলামের তত্ত্বীয় ভিত্তি আল-কোরআন ও তদনুযায়ী 'সুন্নাহ' যেমন পরিবর্তন হয়নি, তেমনি পরিবর্তনীয়ও নয়। এ কারণে ইসলামে মৌলতা আছে যা হিন্দুধর্মে নেই। হিন্দু মহাসভা, আরএসএস, বিজেপি'রা হিন্দুধর্মের নামে যা বলছে তা ধর্মের পোশাক পরা একটা রাজনৈতিক তত্ত্ব কৌশলমাত্র। এর আধুনিক জন্ম শিবাজীর রাজনীতিতে, যা স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী, বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রী অরবিন্দ, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, প্রমুখের মাধ্যমে আজ আরএসএস, বিশ্ব হিন্দুপরিষদ, বিজেপি, শিবসেনাদের রাজনীতি আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদের এই অমৌলবাদী অর্থাৎ স্বেচ্ছাচারী ও অধার্মিক রাজনীতির সাথে জামায়াতে ইসলামীদের ইসলামের মৌলনীতি ভিত্তিক রাজনীতির কোন তুলনা হতে পারে না।

বিজেপি, আরএসএস ও হিন্দু মহাসভাদের রাজনীতি মূলহীন, অধার্মিক যাই হোক, তাদের ব্রাহ্মনবাদী রাজনীতি আজ ভারতে ব্যাপক প্রভাবশীল। তাদের দলীয় বিস্তার ও শক্তি ক্রমবর্ধমান। ১৯৮৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি ভারতের লোকসভায় আসন পেয়েছিল মাত্র ২টি, পরবর্তী নির্বাচনের পায় ৮৮টি আসন। ১৯৯১-এর অন্তর্বর্তী নির্বাচনে আসন পায় ১১৯টি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিজেপি জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু বিজেপি'র কোয়ালিশন সরকার টেকেনি। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে বিজেপি একাই ১৮২ আসন পায় এবং জোটসহ পায় ৩০৩টি আসন। বিজেপি'র কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ২০০৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি মোট ১৯২ আসন পেয়ে হেরে যায়। বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার যে দায় মাথায় নিয়ে বিজেপি নির্বাচন করেছে, তাতে বলতে গেলে বিজেপি আশাতীত ভাল ফল করেছে।

আর বিজেপি যদি ভারতীয় রাজনীতিতে আরও পেছনে হটে যেতো, কিংবা যায়, তাতে ভারতীয় রাজনীতির কোন হেরফের আমরা দেখিনা। কংগ্রেস ও বিজেপি'র মধ্যে কার্যত কোন পার্থক্য নেই। বিজেপি যে কথা প্রকাশ্যে বলে,

---

১৮। 'Predatory Commercialization and Communalism in India', Amya Kumar Bagchi, Anatomy of Confrontater, page 214 (Penguin Book, 1991).

www.icsbook.info

সে কথাটা কংগ্রেস সযতনে গোপন রেখে সে অনুসারেই কাজ করে। পার্থক্য শুধু এইটুকু। তাছাড়া আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যাই হোক, বাংলাদেশ নীতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। দেশ বিভাগ পর্যন্ত হিন্দুমহাসভা ও আরএসএস যেমন রাজনৈতিক ব্যাপারে, বিশেষ করে মুসলমানদের স্বার্থ সম্পর্কিত রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাথে সার্বিকভাবে একাত্ম ছিল, তেমনি তারা এই ব্যাপারে আজও একাত্ম রয়েছে। কংগ্রেস ও হিন্দুবাদী বলে পরিচিত দলগুলোর সর্বসম্মত এই বাংলাদেশ নীতিটা কি?

শ্রীলংকার সাথে রাজীব গান্ধী বহু প্রতীক্ষিত চুক্তি সম্পাদনে সমর্থ হবার পর সমীক্ষক সুনন্দা কে, দত্ত রায় মন্তব্য করেছিলেন, "Now Srilanka appears to have accepted that its foreign policy, defence strategy and even domestic social and political programmes must be governed by the requirements of the government of India's security------- Jowaharlal Nehru tried to use his stature, experience and mastery of statecraft to awe the region into submission------- Mrs. Gandhi hoped to do the same through the brute force at her command. Her son (Rajib Gandhi) has neither his grandfather's prestige nor his mother's strength, but has succeeded where both failed. "[১৯] অর্থাৎ শ্রীলংকা রাজী হয়েছে যে, তার বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা কৌশল এবং এমনকি তার আভ্যন্তরীণ সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ন্ত্রিত হবে ভারতের নিরাপত্তার প্রয়োজনকে সামনে রেখে। জওহরলাল নেহেরু তার ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা ও রাষ্ট্রনীতির দক্ষতা দ্বারা এই অঞ্চলকে ভয় দেখিয়ে অনুগত রাখতে চেয়েছিলেন। আর মিসেস গান্ধী চেয়েছিল তার শক্তির নগ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে। তাঁর ছেলে রাজীব গান্ধীর মাতামহের মত প্রভাব ছিল না, আবার মা'র মত শক্তিও ছিল না, তবু তিনি সফল হলেন যা করতে তারা ব্যর্থ হয়েছিলেন।' শ্রীলংকাকে এইভাবে অনুগত করার মধ্য দিয়ে গোটা অঞ্চলকে ভারতের প্রতি আনুগত্যের শৃংখলে বাঁধার মাতামহ ও মাতার ইচ্ছার পূর্ণতা দান সম্পর্কে বলতে গিয়ে সুনন্দা দত্ত উল্লেখ করেছেন, 'Rajib Gandhi's success has to be viewed in the context of traditional relation with neighbours. Sikim was Swallowed up 12 years ago. Bangladesh, Nepal and Bhutan are uneasy prisoner of geograhpy, their treaties and even more, the tone and substance of political and commercial exchanges reflecting varying degree of dependence."[২০] অর্থাৎ প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের যে ঐতিহ্য ভারতের, রাজীব গান্ধীর সাফল্য তারই একটা অংশ। সিকিমকে ১২ বছর আগে

১৯। 'India's Monroe Doctrine', Sunanda K. Datta Ray, Holiday, September 4, 1987.
২০। 'India's Monroe Doctrine', Sunanda K. Datta Ray, Holiday, September 4, 1987

www.icsbook.info

ভারত গ্রাস করেছে। বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভুটান তাদের ভৌগলিক, চুক্তিসমূহ, এমনকি তাদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে ভারত-নির্ভরতার অসহায় নিগড়ে বন্দী। ভারতের সাথে সম্পর্কের এ দিকটা এতই প্রকাশ্য যে তা কাউকে বলে দেবার প্রয়োজন নেই।' কিন্তু বাংলাদেশকে ঘিরে ভারতের তৎপরতা শুধু এটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই আজ। এই শতকের প্রথম দশকে এবং তৃতীয় দশকে হিন্দু রাজনীতির যে সংহার মূর্তি দেখা গেছে এবং '৪৭ পর্যন্ত তারা অখন্ড ভারতের শ্লোগানের আড়ালে সমগ্র উপমহাদেশ কুক্ষিগত করার যে রাজনীতি অনুসরণ করেছে, সেই রাজনীতিই এখনও ভারতে মুখব্যাদান করে রয়েছে। ১৯৭৫ সালের আগষ্ট বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারত অনেকটা ক্লাইভের ভূমিকা পালন করেছে। এসময় পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশে তার শোষণ জারি রাখাসহ বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রদেশসুলভ আনুগত্য আদায়ে ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু আগষ্ট বিপ্লবের পর ভারতের এই রাজনীতি বাংলাদেশে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর চলে দীর্ঘ কূটনৈতিক যুদ্ধ এবং চাপ প্রয়োগের রাজনীতি। ফারাক্কা, তিন বিঘা করিডোর, দক্ষিণ তালপট্টি, পার্বত্য চট্টগ্রামের তথাকথিত শান্তিবাহিনী সমস্যা, পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া, ইত্যাদির মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করা হয় বাংলাদেশের উপর। কিন্তু পঁচাত্তরের আগষ্ট-পূর্ব সেই দিন ভারতের আর ফিরে আসেনি। অবশেষে নব্বই-এর দিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হওয়া এবং অবাধ বাক স্বাধীনতার সুযোগে বাংলাদেশে একটি মহলের মধ্যে ভারতের স্বার্থের কণ্ঠ শ্রুত হতে থাকে। কেয়ারটেকার সরকারের আমলে এই কণ্ঠ আরও শক্তিশালী হয়। স্রোতের মত বের হতে থাকে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর অনেকগুলোতে এবং একশ্রেণীর রাজনীতিক ও সংস্কৃতিসেবীদের কণ্ঠে ভারতীয় রাজনীতির কথা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। ভারতীয় এ রাজনীতির মূলকথা হলো দ্বি-জাতিতত্ত্ব অবাস্তব ও জিন্নার ষড়যন্ত্র ছিল এটা এবং ভারত বিভাগ ছিল বিরাট এক ভুল। এই ভুল নিরসনের জন্যে অখন্ড ভারত গঠন অর্থাৎ '৪৭ পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাবার জন্যে তাদের তরফ থেকে আহবান করা হচ্ছে। এই আহবান ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় আজ খোলাখুলিই জানানো হচ্ছে। Statesman ভারতের ৮৪ বছর বয়সের একটা দায়িত্বশীল দৈনিক। এই দৈনিকে Reunion of India' শীর্ষক নিবন্ধে সম্প্রতি বলা হয়ঃ "--------- Now is the time of work for a united states of India with the merger of this country Bangladesh and -----"[২১] অর্থাৎ বাংলাদেশ ইত্যাদিকে ভারতের সাথে মিলিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের এটাই সময়।' কোলকাতার যে আনন্দবাজার গ্রুপের পত্রিকা 'দেশ' বাংলাদেশকে 'তথাকথিত' বলে আখ্যায়িত করে এর স্বাধীন অস্তিত্বের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, সেই আনন্দাবাজার গ্রুপেরই পত্রিকা দৈনিক টেলিগ্রাফ `Bangladesh are voting against with their feet' শীষর্ক নিবন্ধে বাংলাদেশী হাজার হাজার

২১।'Reunion of India', M. Roy, Statesman, Vol-CXXIV, No. 258012

www.icsbook.info

মুসলমানের ভারত চলে যাবার কল্পিত কাহিনীর উল্লেখ করে লিখে, "তারা (বাংলাদেশী মুসলমানরা) ভারতে সাথে পুনর্মিলিত হচ্ছে। কারণ যখন তারা তাদের সন্তানের চোখ দিয়ে অবলোকন করেছে, দেখেছে ধ্বংস এবং জীবন বিনাশী হতাশা। তারা ভালোভাবেই বুঝে পাকিস্তান স্বপ্ন ছিল না, ছিল আগুন বর্ষণকারী দানব। পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা ১৯৭১ সালে। এখন দ্বিতীয়বার তারা প্রত্যাখ্যান করছে দেশ-বিভাগকে। পাকিস্তান ছিল প্রথম স্বপ্ন, দ্বিতীয় স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদ যা রূপ পেয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রে। এই দ্বিতীয় স্বপ্ন বাংলাদেশকেও তারা আজ প্রত্যাখ্যান করছে।"[২২]

ভারতের রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবি ও পত্র-পত্রিকাগুলো একদিকে 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র' -এর নাম মুছে ফেলে ভারতে বুকে একে লীন করার কসরত ও প্রচার-প্রপাগান্ডা চালাচ্ছে, অপরদিকে হিন্দু ধর্মকে মুসলমানদের জন্যে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে একে 'সুগার-কোটেড' করে কখনও 'শান্তিবাদী', মানবতাবাদী', আবার কখনও সর্বরোগহরা 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী' করার আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছে। এই লক্ষ্যে ইতিহাস পাল্টে দেয়া হচ্ছে এবং ইতিহাসের চরম সাম্প্রদায়িক লোকদেরকে মানবতাবাদী রূপ দিয়ে সামনে আনা হচ্ছে। কোলকাতার দৈনিক 'Statesman' লিখছে, "বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন প্রকৃত হিন্দু কখনও গোঁড়া ও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। কংগ্রেসের জন্মের অনেক আগে 'মনের পবিত্রতা'য় বংকিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, মানুষের প্রতি ভালোবাসা এবং মনের শান্তি-এই তিনি নিয়ে হিন্দুবাদ গঠিত।[২৩]" এই 'Statesman' ই আবার লিখেছে, "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে যদি আমরা জিততে চাই, তাহলে রামমোহন রায়, বংকিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যকে পুররুজ্জীবিত করতে হবে যা আমাদেরকে ধর্ম ও গোত্র-চিন্তার ক্ষুদ্র গন্ডীর উর্ধ্বে উঠতে শিক্ষা দেয়।[২৪]" স্টেটসম্যান-এর এই দুই উদ্ধৃতিতে বংকিমচন্দ্র, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ যা নন সেই রূপ তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে এবং হিন্দুধর্মকে দেয়া হয়েছে শান্তিবাদী ও মানবতাবাদী রূপ, যা ইতিহাস এবং বাস্তবতা উভয়েরই পরিপন্থী। শুধু বংকিম-রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ নয়, গোটা ইতিহাসকেই পাল্টে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং মুসলমানদের নির্মূলকামী শুদ্ধি আন্দোলনের নেতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ও তার আর্য সমাজকেও 'সুগার-কোটেড' করার চেষ্টা চলছে। বলা হচ্ছে "৪৭ পর্যন্ত সংগ্রামকে হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ বলা যাবে না, বলতে হবে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের

২২। 'Bangladeshis are Voting against partition with their feet, The Telegraph, October 25, 1992
২৩। 'Reunion of India', M. Roy, Statesman, Vol-CXXIV, No. 258012
২৪। 'Secular Order', Subrata Mukherjee, Statesman, July 2, 1993

www.icsbook.info

দ্বন্দ্ব, আর্য সামাজীদেরকেও হিন্দু সংগঠন নামে অভিহিত করা যাবে না, তারা যে 'হিন্দুবিপ্লব' ঘটাতে চেয়েছিল তাও মুখে উচ্চারণ করা যাবে না। বলতে হবে এসব মৌলবাদি প্রচারণা।'[২৫] অর্থাৎ আর্য সমাজ এবং স্বামী দয়ানন্দদেরকেও ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ পরানো হচ্ছে। অথচ ইতিহাস স্বাক্ষী, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রমুখ হিন্দু নেতাদের 'আর্য সমাজ' হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক যতটা বিচ্ছিন্ন করেছে, যতো সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে এদেশের শান্তি শৃংখলা নষ্ট করেছে, আর কোন হিন্দু সংগঠন ততটা পারেনি। আর্য সমাজ শুদ্ধির মাধ্যমে মুসলমানদের হিন্দুকরণ করার যে অভিযান চালিয়েছিল তার একটা দৃষ্টান্ত উদাহরণ হিসেবে আনন্দবাজার পত্রিকা থেকেই তুলে ধরা যায়। ৭০ বছর আগে আনন্দবাজার পত্রিকা খবর দিয়েছিল, 'আর্য সমাজীদের চেষ্টায় আগরার শিকারা গ্রামের ৬০০ মুসলমানকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে। অন্যান্য গ্রামের ২০০ (দুই শত) শুদ্ধি কার্যে যোগ দিয়েছে।"[২৬] ইতিহাসের এই জ্বলজ্যান্ত সাক্ষ্যগুলোকে চাপা দিয়ে সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্মকে এবং এর সাম্প্রদায়িক নেতাদেরকে মানবতাবাদী, শান্তিবাদী রূপে দাঁড় করানো হচ্ছে।

এইভাবে একদিকে ভারত-বিভাগকে ভূল বলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে ভারত-রাষ্ট্রের বুকে লীন করার চেষ্টা চলছে, অন্যদিকে দ্বি-জাতিতত্ত্বকে অবাস্তব অবাঞ্ছিত অভিহিত করে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে সরিয়ে এনে 'ধর্মনিরপেক্ষ', 'মানবতাবাদী', 'শান্তিবাদী'র পোশাক পরিয়ে হিন্দুধর্মের সাথে লীন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। একেই বলে 'Final Solution' বা 'শেষ সমাধান'। এই 'শেষ সমাধানের'ই চেষ্টা করছে ভারতের রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবিরা'। এই 'শেষ সমাধান' এর জন্য 'শেষ যুদ্ধও' [২৭] শুরু করা হয়েছে। ভারতের শাসকদল কংগ্রেস কথিত এই 'শেষ যুদ্ধ' সম্পর্কে কিছু বলার আগে এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতির স্বরূপ সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলা দরকার।

ভারত কেন্দ্রিক এই রাজনীতির দু'টি দিক লক্ষ্য করার মত। এর একটি হলো ভারত ভিত্তিক কিছু সংগঠন যারা বাংলাদেশের অখন্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে রত। ভারত ভিত্তিক এই সংগঠনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো 'বঙ্গভূমি আন্দোলন', 'সোনার বাংলা', 'আমরা বাঙালী', ইত্যাদি। এদের ষড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় খবর বেরিয়েছে সেদেশের এবং এদেশের পত্র পত্রিকায়। এসবের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ বিরোধী তাদের ষড়যন্ত্রের প্রকৃতি এবং সে ষড়যন্ত্রের সাথে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার বিষয় সকলের সামনে এসেছে। কোলকাতার দৈনিক আজকাল ১৯৮৯ সালের ২২, ২৩ ও ২৪শে এপ্রিল

২৫। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয়, ১৬ই জুলাই, ১৯৯৩ (কোলকাতা)।
২৬। 'আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৩০ (১৯২৩) সালের ২রা আষাঢ় সংখ্যা।
২৭। এই 'শেষ যুদ্ধ'-এর কথা বলা হয়েছে ভারতের শাসক দল কংগ্রেসের পূর্বাঞ্চলীয় কমিটির এক বৈঠকে।

www.icsbook.info

বাংলাদেশের ৬টি জেলা নিয়ে হিন্দুদের আলাদা বাসভূমিক 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' প্রতিষ্ঠার ভারতীয় চক্রান্তের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ৩টি ধারাবাহিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। ষড়যন্ত্রের প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্যে এই রিপোর্টই যথেষ্ট। 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' শীর্ষক রঞ্জিত শূর-এর লেখা রিপোর্টটি এইঃ
"বাংলাদেশের দু'টুকরো করে হিন্দুদের জন্য আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য জোর তৎপরতা চলছে। বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ ২০,০০০ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' গঠনের উদ্যোগ আয়োজন চলছে অনেকদিন ধরে। এতদিন ব্যাপারটা সামান্য কিছু লোকের উদ্ভট চিন্তা বা প্রলাপ বলেই মনে হত। কিন্তু সম্প্রতি দেশী-বিদেশী নানা শক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে ব্যাপারটা বেশ দানা বেধে উঠেছে। ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' সরকার। রাষ্ট্রপতি পার্থ সামন্ত। রাজধানী সামন্তনগর (মুক্তি ভবন)। সবুজ ও গৈরিক রঙের মাঝে সূর্যের ছবি নিয়ে নির্দিষ্ট হয়েছে জাতীয় পতাকা। জাতীয় সঙ্গীতঃ ধনধান্যে পুষ্পে ধরা, আমাদের এই বসুন্ধরা। সীমানা ঃ উত্তরে পদ্মা, পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে ভারত, দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর। প্রস্তাবিত সীমানার মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশের ছয়টি জেলাঃ খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল এবং পটুয়াখালী। এই ছয়টি জেলা নিয়েই ২৫ মার্চ ১৯৮২ ঘোষিত হয়েছে তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' রাষ্ট্র। স্বাধীন বঙ্গভূমিকে বাস্তাব রূপ দেওয়ার সমস্ত উদ্যোগই চলছে কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ থেকে। নেপথ্য নায়করা সবাই জানেন এই রাজ্যেই বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর বিভিন্ন জেলা–২৪ পরগনা, নদীয়া এবং উত্তর বাংলায় চলছে ব্যাপক তৎপরতা। অভিযোগ, ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রাপ্ত দুই বাংলাদেশী নেতা কাদের (বাঘা) সিদ্দিকি এবং চিত্তরঞ্জন ছুতোর মদত দিচ্ছেন হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে। প্রবক্তাদের যুক্তি বাংলাদেশে মুসলমানদের শাসন চলছে। হিন্দুদের জীবন ও সম্পত্তি তাদের হাতে নিরাপদ নয়। বিশেষত বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র ঘোষণার পর ঐ দেশের হিন্দুরা পরাধীন জীবন যাপন করছে। তাই প্রয়োজন হিন্দুদের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র-বঙ্গভূমি।
বঙ্গভূমি আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সংগঠক নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ। ১৯৭৭ সালের ১৫ আগষ্ট কলকাতায় এই সংগঠনটির জন্ম হয়। জন্ম উপলক্ষে ১৫৯ গরফা মেইন রোডের সভায় নাকি উপস্থিত ছিলেন একজন আইএএস অফিসার অমিতাভ ঘোষ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ কালিদাস বৈদ্য (এমবিবিএস ডাক্তার), সুব্রত চট্টোপাধ্যায় (বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার), নীহারেন্দ্র দত্ত মজুমদার (পশ্চিম বাংলার প্রাক্তন আইনমন্ত্রী) এবং শরৎচন্দ্র মজুমদার (বাংলাদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী)। অন্য সূত্রের খবর চিত্তরঞ্জন ছুতোরও ঐ সভায় হাজির ছিলেন। ১৭ সেপ্টেম্বর সংস্থা গোলপার্কে সভা করে প্রথম প্রকাশ্যে

www.icsbook.info

'হোমল্যান্ড' দাবী করে। এরপর থেকেই মাঝে মধ্যে সভা-সমাবেশ হত। এর মধ্যেই নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘে ভাঙন ধরে। ১৯৭৯ সালে হয় দু'টুকরো। ডাঃ কালিদাস বৈদ্যের নেতৃত্বাধীন নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের ঠিকানা ঃ গরফা মেইন রোড। সুব্রত চ্যাটার্জির নেতৃত্বাধীন নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের ঠিকানা ঃ ৮০ ধনদেবী মান্না রোড, নারকেলডাঙ্গা। এদের থেকে বেরিয়ে আর একটি অংশ তৈরী করে বঙ্গদেশ মুক্তি পরিষদ। ঠিকানা মছলন্দপুর। আরও একটি অংশ তৈরী করে সংখ্যালঘু কল্যাণ পরিষদ। চলে চিত্ত ছুতোরের ভবানীপুরের বাড়ি থেকে। পরস্পরের বিরুদ্ধে চাপান উতোরের মধ্যেই ঢিমেতালে চলছিল 'বঙ্গভূমি'র পক্ষে প্রচার। কিন্তু ১৯৮২ সালে বঙ্গভূমি আন্দোলন একটা গুরুত্বপূর্ণ মোড় নেয়। ঐ বছরের ২৫শে মার্চ ঘোষিত হয় স্বাধীন বঙ্গভূমি রাষ্ট্র। তৈরী হয় 'সৈন্য বাহিনী' বঙ্গসেনা। সেনাধ্যক্ষ ডাঃ কালিদাস বৈদ্য। সুব্রত চ্যাটার্জীর গ্রুপ ঐ ঘোষণা না মানলেও বঙ্গভূমি দখলের জন্য ঐ বছরেই তৈরী করে 'অ্যাকশন ফোরাম' বাংলা লিবারেশন অর্গানাইজেশন (বিএলও) । আরও পরে বঙ্গদেশ মুক্তি পরিষদ তৈরী করে 'সৈন্য বাহিনী' লিবারেশন টাইগার্স অব বেঙ্গল (বিএলটি)। নেতা রামেশ্বর পাশোয়ান একজন বিহারী, থাকেন গরফার রামলাল বাজারে। এরপর বিভিন্ন সংগঠন মাঝে মাঝেই বঙ্গভূমি দখলের ডাক দেয়। সীমান্ত অভিযান করে। কিন্তু কখনই ব্যাপারটা এদেশের মানুষের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। '৮৮র জুলাই থেকে অবস্থাটা ধীরে ধীরে পাল্টাতে শুরু করে। ঐ বছর ২২ জুলাই 'বঙ্গসেনা' একটি সম্মেলন করে। এরপরই শুরু হয় একের পর এক কর্মসূচী। সীমান্ত জেলাগুলোতে চলতে থাকে পর পর এক সমাবেশ মিছিল মিটিং। ২৩ নভেম্বর 'বঙ্গভূমি' দখলের জন্য বনগাঁ সীমান্ত অভিযানে ৮/১০ হাজার লোক হয়।২২-২৩ জানুয়ারী বনগাঁ থেকে বঙ্গ 'সেনা'র মহড়া হয়। ২৪ মার্চ ও ২৫ মার্চ হয় আবার বঙ্গভূমি অভিযান। ৭ এপ্রিল রাজীব গান্ধীর কলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে সিধু কান ডহরে বিএলও এক জমায়েতের ডাক দেয়। প্রত্যেকটা কর্মসূচীতে ভাল লোক জড়ো হয়। বাংলাদেশে গেল গেল রব উঠে। এপারের সংবাদ মাধ্যমগুলো এই প্রথম গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করে খবর প্রচার করে। দেশে-বিদেশে 'বঙ্গভূমি'র দাবি এবং দাবিদার নিয়ে কম-বেশি হৈচৈ শুরু হয়। আবার ২২ জুলাই অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে বঙ্গভূমি দখলের জন্য কালিদাস বৈদ্যের দাবি ঐ দিন এক লক্ষ লোক জমায়েত হবে।

স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের নেপথ্য নায়কদের আসল পরিচয় কি? কি তাদের আসল উদ্দেশ্য? কে এই 'রাষ্ট্রপতি' পার্থ সামন্ত? কি ভূমিকা নিচ্ছেন ভারত সরকার? এসব তথ্য জানার জন্য অনুসন্ধান চালাই তাদের কর্মস্থলগুলিতে। দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলি ডাঃ কালিদাস বৈদ্য, সুব্রত চ্যাটার্জি, রামেশ্বর পাশোয়ার, কে

www.icsbook.info

পি বিশ্বাস, রাখাল মন্ডল প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে। অনুসন্ধানের সময় বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে চিত্ত ছুতোরের নামাবার বার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কিন্তু কিছুতেই দেখা করতে বা কথা বলতে রাজি হননি। এই দীর্ঘ অনুসন্ধানে এটা স্পষ্ট হয়েছে, 'স্বাধীন' হিন্দুরাষ্ট্র তৈরীর চেষ্টা আজকের নয়। পঞ্চাশের দশকেই হয়েছিল এর ব্লুপ্রিন্ট। "বঙ্গভূমি ও বঙ্গসেনা" পুস্তিকায় ডাঃ কালিদাস বৈদ্য নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ১৯৫২-তে তাঁরা তিনজন যুবক কলকাতা থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যান এবং 'সংখ্যালঘুদের মুক্তির জন্য ব্যাপক কর্মতৎপরতা' চালান। 'গোপনে স্বাধীনতা ও তার সঙ্গে স্বতন্ত্র বাসভূমির কথাও' প্রচার করেন। ঐ তিন যুবক হলে কালিদাস বৈদ্য, চিত্তরঞ্জন ছুতোর এবং নীরদ মজুমদার (মৃত)।

বাংলাদেশে বেশ কিছু কাগজে লেখা হয়েছে "বঙ্গভূমি আন্দোলন ভারতেরই তৈরী।" ৮৮ সালের জুলাই থেকেই বঙ্গভূমি আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বাধতে শুরু করে। এটা কি নেহাৎই কাকতালীয়? ১৯৮২ সালে যখন 'স্বাধীন বঙ্গভূমি সরকার' ঘোষণা করা হয়েছিল, বাংলাদেশের কাগজগুলিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মূল সুর ছিল, ইন্দিরার মদতেই এসব হচ্ছে। সাম্প্রতিক 'বঙ্গভূমি' আন্দোলনের পেছনে নাকি ভারত সরকারের হাত আছে। প্রথমত আন্দোলনের মূল হোতা ডাঃ কালিদাস বৈদ্য এবং রহস্যময় চরিত্র চিত্ত ছুতার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে বহুকাল ভারতের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টির পিছনেও ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বস্তুত ভারতীয় এজেন্ট হিসেবেই এই দু'জন এবং নীরদ মজুমদার তৎকালীন পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। চিত্তবাবু ওখানে রাজনৈতিকভাবেও বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন মূলত তার ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। সংসদের সদস্যও হয়েছিলেন। ডাঃ বৈদ্য এতটা পারেননি। পরবর্তীকালে দু'জনের মধ্যে বিরোধও হয়। ডাঃ বৈদ্য ভারত সরকারের সমর্থন হারান। কিন্তু মুজিব সরকারের ওপর প্রভাব খাটাবার জন্য চিত্ত ছুতারকে ভারত সরকার চিরকালই ব্যবহার করেছে। এখনও ভারত সরকারের তরফে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন চিত্তবাবু। অনেকেই বলে, তাঁর সোভিয়েত কানেকশন নাকি প্রবল। চিত্তবাবু ভাবনীপুরের রাজেন্দ্র রোডের বিশাল বাড়িতে সপরিবারে অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। কোথা থেকে আসে ঐ টাকা? ভারত সরকার কেন তাকে জামাই আদরে পুষছেন? তার বসতবাড়িটাও দুর্ভেদ্যও। পাহারা দেন বেশ কিছু শক্ত সমর্থ যুবক। যারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ করত। বনগাঁ লাইনে 'বঙ্গভূমি' সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার যে, ঐ বাড়িটাই 'বঙ্গসেনা'র ঘাঁটি। ভারত সরকারের মদদের আরও প্রমাণ, রাজীব গান্ধীর বিবৃতি। তিনি একাধিকবার বিবৃতি দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

www.icsbook.info

বাড়ছে অনুপ্রবেশ। আকাশবাণী থেকেও একাধিকবার প্রচার হয়েছে। যেমন, ১৭ জানুয়ারী 'বঙ্গভূমি' পন্থীরা বাংলাদেশ মিশন অভিযান করলে ঐ খবর আকাশবাণী প্রচার করে। ১৮ জানুয়ারী রাজীব গান্ধী অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দেন। এছাড়াও বলা যায়, এতদিন ধরে বঙ্গভূমি জিগির চলছে, বারে বারে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে লোক নিয়ে গিয়ে সীমান্তে গন্ডগোল ছড়ানো হচ্ছে তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানো হচ্ছে, 'সৈন্যবাহিনী' ঘোষণা করছে, প্রতিবেশী দেশের এলাকা নিয়ে পাল্টা সরকার ঘোষিত হয়েছে-তবুও পুলিশ তাদের কিছু বলে না কেন? সীমান্তে সমাবেশ বা ওপারে ঢোকার চেষ্টা হলে পুলিশ তুলে নিয়ে কয়েকশ' গজ দূরে ছেড়ে দেয়। নেতাদের গ্রেফতারও করা হয় না। ভারত সরকারের মদদ না থাকলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে গভীর যোগাযোগ না থাকলে, এটা কি সম্ভব হত?

ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের কথা ডাঃ বৈদ্যও অস্বীকার করেননি। তিনি বলেন, "মদদ নয় প্রশ্রয় দিচ্ছে বলতে পারেন। তবে মদদ দিতেই হবে। আমরা জমি প্রস্তুত করছি।' তিনি বলেন, "আমি ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি, কিভাবে রাখছি, কার মাধ্যমে রাখছি বলব না। আমার বক্তব্য ক্রমাগতই তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছি। সত্যিই যদি যথেষ্ট লোকজন জড় করতে পারি, তবে ভারত সরকারকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করতেই হবে। আমার একটা সরকার আছে। সৈন্যবাহিনী আছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী 'বঙ্গসেনা' নামেই ঢুকবে বাংলাদেশে। আমরা সেই পরিস্থিতি তৈরী করার চেষ্টা করছি।" কিভাবে? বঙ্গসেনা, বিএলও, বিএলটি সবার সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছি সেটা এরকমঃ 'বঙ্গভূমি' পন্থীরা চান বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর বাংলাদেশ সরকার ব্যাপক অত্যাচার চালাক। যাতে তারা দলে দলে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে শুরু করে। শরণার্থীদের বোঝা বইতে হবে ভারত সরকারকে। ফলে বাধ্য হয়েই তাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশে ঢাকাসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরে কিছু অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তাদের আরও একটা ইচ্ছা, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগুক, ব্যাপক হিন্দু নিধন হোক, যাতে এদেশের সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সেন্টিমেন্টকে খুশি করার জন্য ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়। 'বঙ্গভূমি'র ফেরিওয়ালাদের স্পষ্ট বক্তব্য ঃ ভারত সরকারকে বেছে নিতে হবে দু'টোর একটা। তারা দেড় কোটি হিন্দু শরণার্থীর দায়িত্ব নেবেন, নাকি 'স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র' 'বঙ্গভূমি' তৈরী করে দেবেন, যে বঙ্গভূমি একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সিকিমের মত ভারতের অঙ্গরাজ্যে রূপান্তরিত হবে?

ঘোষণা অনুযায়ী স্বাধীন 'বঙ্গভূমি' রাষ্ট্রের রাজধানী সামন্তনগর (মুক্তিভবন)। বাংলাদেশের পত্রিকাগুলি জানিয়েছে, ওদেশে সামন্তনগর বলে কোন জায়গা নেই,

www.icsbook.info

মুক্তিভবন বলে কোন বাড়ী নেই। পার্থ সামন্ত স্বাক্ষরিত অধিকাংশ ইস্তেহারই প্রকাশিত হয়েছে মধুমতি প্রেস কুষ্টিয়া থেকে। বাংলাদেশী পত্রিকাগুলি লিখেছে ঐ নামে কুষ্টিয়ায় কোন প্রেস নেই। ২২ জুলাই আবার বঙ্গভূমি অভিযানের ডাক দিয়ে যে ইস্তেহার প্রচারিত হবে তার খসড়া কালিদাস বৈদ্য এই প্রতিবেদককে পড়ে শোনান। কোথা থেকে ছাপা হবে? এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান ডাঃ বৈদ্য। নিশ্চিত পার্থ সামন্তের নামে এ রাজ্যের কোথাও থেকে ছাপা হবে। প্রেস লাইনে কিন্তু থাকবে মধুমতী প্রেস, কুষ্টিয়া। কে এই স্বঘোষিত 'রাষ্ট্রপতি' পার্থ সামন্ত? বাংলাদেশের একাধিক কাগজে লেখা হয়েছে, চিত্তরঞ্জন ছুতোরই হল আসলে পার্থ সামন্ত। এই প্রতিবেদক কিন্তু নিশ্চিত যে, কালিদাস বৈদ্যই হলেন পার্থ সামন্ত। কিভাবে এই সিদ্ধান্তে এলাম? প্রথমত, বঙ্গভূমি আন্দোলনের প্রথম দিককার সংগঠকদের সঙ্গে কথা বলে, যাঁরা ঐ সময় কালিদাস বাবুর সঙ্গে ছিলেন। দ্বিতীয়ত, কালিদাস বৈদ্য এই প্রতিবেদককে পার্থ সামন্তর একটি ব্লক করা স্বাক্ষর দেখিয়ে বলেন, এই স্বাক্ষর দিয়েই প্রমাণ হবে কে পার্থ সামন্ত। ঐ স্বাক্ষরের সঙ্গে কালিদাস বাবুর অসতর্কভাবে 'পার্থ সামন্ত' লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি হুবহু এক। তৃতীয়ত, কালিদাস বাবু এই প্রতিবেদকের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় বার বার উত্তেজিত হয়েছেন। যখনই উত্তেজিত হয়েছেন, বলেছেন 'আমার একটা সরকার আছে। সৈন্যবাহিনী আছে।' পর মুহূর্তে আবার সতর্ক হয়ে বলেছেন, পার্থ সামন্ত র সরকার, পার্থ সামন্তর সৈন্যবাহিনী। চতুর্থত, দীর্ঘ আলোচনায় কালিদাস বাবুর কথায়, হাব-ভাবে আচরনে এবং কয়েকদিন ধরে বহু জায়গায় অনুসন্ধান করেই এই প্রতিবেদকের নিশ্চিত ধারণা ডাঃ কালিদাস বৈদ্যই পার্থ সামন্ত।

চলছে সশস্ত্র হওয়ার চেষ্টা? বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এবং বনগাঁ, বগুলা ও গোবরডাঙ্গা কলেজের যুব-ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার হয়েছে। বঙ্গভূমির মুক্তির জন্য অস্ত্রশিক্ষা চলছে। অস্ত্রশিক্ষার দুটো দিক। একটি অংশকে শেখানো হচ্ছে কিভাবে বাংলাদেশের ভিতর ঢুকে অন্তর্ঘাত করতে হবে। অন্য অংশকে মিলিটারি ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। কারা দিচ্ছে? প্রচার, আনন্দমার্গ, চাকমাদের শান্তিবাহিনী এবং একটি ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। 'সেনাধ্যক্ষ' কালিদাস বৈদ্য ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, আগে যথেষ্ট লোকজন হোক। দেশে - বিদেশে প্রচার হোক। অস্ত্র এবং সৈন্যবাহিনী তো ভারত সরকারই দেবে। বিএলটির রামেশ্বর পাশোয়ান ও কেপি বিশ্বাস এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হননি। ওটা গোপন। তাঁরা বলেন, দেখুন আমরা কী করি। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে বিএলটি অবিলম্বে অন্তর্ঘাতমূলক কিছু কাজ করবে বাংলাদেশে, বনগাঁ লাইনে ব্যাপক প্রচার যে, বিএলটি নেতা সুব্রত চ্যাটার্জি। তিনি জানান, আনন্দমার্গ ও 'আমরা বাঙ্গালী' নেতা অমলেশ ভট্টাচার্য বিএলটি-র সাথে

www.icsbook.info

যোগাযোগ রাখেন। সুব্রত বাবু জানান, তাদেরও দুজন গিয়েছিল আনন্দমার্গের কাছে ট্রেনিং নিতে কিন্তু তন্ত্র-মন্ত্র হচ্ছে দেখে চলে এসেছে। অন্যদিকে ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় বিএলও-কে নাকি ট্রেনিং দিচ্ছে চাকমাদের শান্তিবাহিনী। বিএলও-র অন্যতম উপদেষ্টা হলেন চাকমা রাজগুরু অগবনশা মহাথেরো। সুব্রত বাবু এ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলেন, তাঁরা কিছু 'টেররিস্ট' গ্রুপ তৈরীর চেষ্টা করছেন। তবে গণ কাজই হবে আসল।

উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলির ভূমিকা ঃ বঙ্গভূমির আন্দোলনের চারটি গ্রুপের প্রত্যেকেই একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, অন্যরা আরএসএস ও আনন্দমার্গের আজ্ঞাবাহী। তাছাড়া ভারত সেবাশ্রম সংঘ ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নানভাবেই বঙ্গভূমি আন্দোলনে মদদ দিচ্ছে। আছে সন্তান দলও। কালিদাস বাবু বলেন, তিনি প্রত্যেকের কাছেই গিয়েছিলেন তবে কেউই বিশেষ সাহায্য করেনি। তবে ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী বিজয়ানন্দ মহারাজ বিভিন্ন সভায় এসে তাঁদের আশীর্বাদ করেছেন। আনন্দমার্গ আমরা বাঙালীর মাধ্যমে কাজ করছে বঙ্গভূমির পক্ষে। কালিদাস বৈদ্য জানান, চিত্ত ছুতোরের মাধ্যমে আরএসএস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বাংলাদেশে 'বঙ্গভূমি' সংগঠকদের কাছে টাকা পাঠাচ্ছে। আর এস এস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠক ডাঃ সুরঞ্জিত ধর এ ব্যাপারে চিত্ত ছুতোরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। সুব্রত চট্টোপাধ্যায় জানান, বাংলাদেশে 'হিন্দু লীগ' গড়া হয়েছে তাঁদেরই পরামর্শে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের সাথে যোগাযোগ আছে। তবে ডাঃ ধর চিত্ত ছুতোরের পারিবারিক চিকিৎসক মাত্র। তাঁদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক নেই। ডাঃ ধরের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে সাধারণভাবে আর এস এস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বঙ্গভূমির দৃঢ় সমর্থক বলে বঙ্গভূমি আন্দোলনের কর্মী ও সমর্থকদের বিশ্বাস। বিএলও নেতা সুব্রত চট্টোপাধ্যায় জনসংঘের পশ্চিবঙ্গ ইউনিটের সভাপতি। বিভিন্ন জায়গায় তিনি হিন্দু সম্মেলন করে থাকেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বিজেপি এবং জনসংঘ অনুপ্রবেশ নিয়ে কিছুদিন ধরে যে হল্লা শুর করেছে সেটাও বঙ্গভূমিওয়ালাদের হাতকেই শক্ত করছে।

ঐক্য প্রচেষ্টা ঃ বঙ্গভূমির দাবীদার বিভিন্ন গ্রুপগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। লক্ষ্য, আন্দোলনকে জোরদার করা। এ ব্যাপারে কয়েকটা সভাও হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে চিত্ত ছুতোরই নাকি বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছেন। তবে চিত্ত বাবুর বাড়িতে বসেই তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ অনুগামী জানান, এসবের মধ্যে চিত্ত বাবু নেই। টেলিফোনে একই কথা বলেন চিত্ত বাবুর স্ত্রী মঞ্জুশ্রী দেবী। কালিদাস বাবু এবং সুব্রত বাবু কিছু না বললেও, বিএলটি নেতারা জানিয়েছেন, চিত্ত বাবুর মধ্যস্থতায় অন্তত একটি 'সমন্বয় কমিটি' করার জন্য তাঁরা বিশেষ চেষ্টা

www.icsbook.info

চালাচ্ছেন। উদ্দেশ্য বাংলাদেশকে, বাঙালীকে আরেকবার ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করা" দৈনিক আজকাল কোলকাতা, ২২, ২৩, এবং ২৪ শে এপ্রিল, ১৯৮৯

কোলকাতার দৈনিক আজকালের এই রিপোর্ট এতই সুস্পষ্ট যে, ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। এই রিপোর্ট থেকে কয়েকটা বিষয় পরিস্কারভাবে জানা গেল ঃ (১) বাংলাদেশ বিরোধী এক সক্রিয় ষড়যন্ত্র সীমান্তের ওপারে দানা বেঁধে উঠছে, যার সাথে জড়িত আছে ভারতের নামকরা রাজনীতিক ও পলিটিশিয়ান, (২) এই ষড়যন্ত্রকে প্রত্যক্ষ সহযোগিত করছে আর এস, এস, বিশ্ব-হিন্দু পরিষদ, বিজেপি, আনন্দমার্গ ও ভারত সেবা সংঘ এবং পরোক্ষভাবে এর পেছনে রয়েছে ভারতের ক্ষমতাসীন দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল, (৩) এই ষড়যন্ত্রকারীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা, আনন্দমার্গ এবং চাকমাদের শান্তিবাহিনী, (৪) এই ষড়যন্ত্রের আশু লক্ষ্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করা, আর দূরবর্তী লক্ষ্য হলো অসন্তোষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে একটা গন্ডগোল সৃষ্টি করে ভারতীয় বাহিনীকে ডেকে আনা, এবং (৫) বাংলাদেশের কিছু দল ও ব্যক্তির সাথে এই ষড়যন্ত্র অথবা ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশ ঘিরে ভারতীয় রাজনীতির এই হলো একটা দিক। আরেকটা দিক হলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দ্বি-জাতিতত্ত্ব বিরোধী ও অখন্ডভারতপন্থী আন্দোলন সৃষ্টি করা।[ক] ১৯৯০ সালে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর অবাধ বাক-স্বাধীনতা এবং অঢেল পত্র-পত্রিকার প্রকাশের সুযোগ নিয়ে এই ক্ষেত্রেও ভারত কেন্দ্রীক ধ্বংসাত্মক রাজনীতি অনেক দূর এগিয়েছে। আশির দশকের শেষ পর্যন্ত যে কথাগুলো প্রকাশ্যে বলা ও লিখা অসম্ভব ছিল, তা এই সময় বলা শুরু হয়েছে। মনে পড়ে'৯১ সালের সম্ভবত নভেম্বরের দিকে একটা পুস্তিকা আমার হাতে আসে। একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা (যিনি ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ ও জাসদের নেতা ছিলেন এবং মুজিব বাহিনীর শীর্ষ কয়েকজনের একজন ছিলেন) পরিচালিত একটি সাপ্তাহিকের নির্বাহী সম্পাদক বলে পরিচয়দানকারী জনৈক ব্যক্তি আরেকজন সহ এসে ঐ পুস্তিকাটি আমাদের দিয়েছিলেন। পুস্তিকাটির নাম `A Heretic', যার অর্থ 'ভিন্নমতাবলম্বী' বা 'বিদ্রোহী'। প্রকাশক হিসেবে নাম আছে জনৈক সৈয়দ ফয়জুর রহমানের আর প্রকাশের স্থান ৪ নং নিউ সার্কুলার রোড। পুস্তিকাটিতে অখন্ড ভারতের পক্ষে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে অনেক কথার সাথে বলা হয়েছে, "এই উপমহাদেশই আমাদের দেশ এবং আমরা এই উপমহাদেশের নাগরিক হিসেবেই বাঁচতে চাই। কেটে বিচ্ছিন্ন করা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

ক। ষড়যন্ত্রের তৃতীয় আরেকটা ফ্রন্টও খোলা হয়েছে। সেটা হলো 'যুক্তবাংলা'র ষড়যন্ত্র। দিল্লি থেকে পশ্চিম বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে এই 'যুক্তবাংলা'র কথা কোলকাতায় নয়, বাংলাদেশেই ছড়ানো হচ্ছে। এরও গোপন লক্ষ্য বাংলাদেশে ভারতীয় হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করা।

www.icsbook.info

সমূহ পুনঃসংযোজিত করার সক্রিয় আন্দোলনই আমাদের প্রত্যাশা পূরণের পথ রচনা করতে পারে।" এই ঘটনার কিছুদিন পর ১৯৯১ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ঢাকার কাকরাইল এলাকার একটা চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট একটা অভূতপূর্ব সাংবাদিক সম্মেলন হলো। এ ধরনের কোন সাংবাদিক সম্মেলন '৪৭-উত্তর কালে বাংলাদেশে হয়নি। সাংবাদিক সম্মেলনকারী সংগঠনটির নাম হলো 'Continent Resurrection Movement' বা 'উপমহাদেশ পুনর্জীবন আন্দোলন'। তারা আহুত সাংবাদিকদের মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়িত করে সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে জানালেন, তাদের লক্ষ্য উপমহাদেশের অখন্ডতা। তাঁরা '৪৭ এবং '৭১-এর বিভক্তি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন।'[২৮] এই সাংবাদিক সম্মেলনের মাত্র একদিন পর ৩১শে ডিসেম্বর '৯১ তারিখে ঢাকা পিজি হাসপাতাল মিলনায়তনে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।[২৯] সেমিনারের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ, জাসদ সভাপতি কাজী আরেফ আহমেদসহ আরও অনেকে। ভারত থেকে কংগ্রেস সমর্থক মওলানা আসাদ মাদানী এ সেমিনারে যোগদান করেন। সেমিনারে মূল বক্তব্য ছিল দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করা এবং মুসলিম লীগ ও কায়েদে আযমের উপর ভারত-বিভাগের দায় চাপানো। যেমন মওলানা আসাদ মাদানি বলেন, "মুসলিম লীগের পাশ্চাত্যায়ন ও বৃটিশ আনুগত্য অনুসারী নেতৃবর্গ লাহোর সম্মেলনে 'পাকিস্তান' নামে মুসলমানদের জন্যে পৃথক ভূ-খন্ডের দাবী তোলেন। ------- এভাবেই মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে।"[৩০] আর জাসদ সভাপতি কাজী আরেফ আহমদ বলেন, "বাংলাদেশের জনগণকেও দ্বি-জাতিতত্ত্বকে বাদ দিয়ে নতুন আদর্শে চিন্তা ভাবনা করতে হবে।"[৩১] পিজি সেমিনারের ৩০ দিন পর সাপ্তাহিক বিচিন্তা 'উপমহাদেশের

২৮। 'দৈনিক বাংলা', ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৯১।

২৯। 'দৈনিক বাংলা', ১লা জানুয়ারী, ১৯৯১।

৩০। কংগ্রেসী নেতা মওলানা আসাদ মাদানী এদেশবাসীকে উল্টো কথা শুনিয়েছেন। কংগ্রেসের অপরাধ আড়াল করা এবং অখন্ড ভারত গড়ার আন্দোলনকে ভারতের জন্যে যৌক্তিক করার জন্যেই তিনি মিথ্যাচার করেছেন। এ মিথ্যাচারের জবাব সে সময়ের ইতিহাস। এখানে শুধু মহাত্মা গান্ধীর বন্ধু পন্ডিত সুন্দর লাল-এর একটা বক্তব্য মাত্র তুলে ধরছি। তিনি তাঁর `who was responsible for the partition of India' প্রবন্ধে লিখেছেন, "হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভারত বিভাগের চিন্তা সর্বপ্রথম করেন লালা লাজপত রায়। কিন্তু ভয়ে প্রকাশ্যে এ দাবীর পক্ষে কথা বলতে পারেননি উচ্চ বর্ণের নেতারা। তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এমন কৌশল অবলম্বন করেন যাতে ভারত ভাগও হয় এবং তার দোষটা গিয়ে মুসলমানদের উপর পড়ে। বর্ণবাদী হিন্দু নেতারা তাদের কাজের দ্বারা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন যাতে মুসলমানরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হন যে, ভারত বিভাগের মধ্যেই তাদের মঙ্গল নিহিত (The congress encouraged the Muslim League......by action that the League feel that in a free (united) India Muslim interest would not protected.)" হিন্দু কংগ্রেস এবং ভারতের বর্ণবাদী নেতারা একাজটি কোন লক্ষ্যে কোন যুক্তিতে করেছিলেন তাও পন্ডিত সুন্দরজী প্রকাশ করেছেন। মিঃ সুন্দরজীর ভাষায় সেই যুক্তিগুলি ছিল ঃ"দেখ এই সুযোগ হারিও না। আর না আসতে পারে সহজে এই সুযোগ। দু'টো অংশকে কেটে ফেল-একটি পূর্বে একটি পশ্চিমে। অবশিষ্ট বড় ও মূল অংশটি আমাদের হাতে থাকবে। কোন অহিন্দু আমাদের অংশে থাকতে সাহস করবে না, থাকলেও আমাদের মত হয়ে থাকবে। ভারতের যে দু'অংশ দু'পাশে থাকল, আমরা শক্তি অর্জন করার পর ঐ দু'টোকে পরে আমরা দেখে নেব।" (Rediance, Delhi, August 13, 1967).

৩১। 'দৈনিক বাংলা', ১লা জানুয়ারী, ১৯৯২৩৩। "বাংলা বাজার পত্রিকা", ২৩শে আগস্ট, ১৯৯৩

www.icsbook.info

মানচিত্রের আসন্ন পরিবর্তন' শিরোনামে একটি প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ করে।[৩২] এ কাহিনীতে রয়েছে 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন' -এর উপর একটি রিপোর্ট এবং এ আন্দোলনের নেতার একটি সাক্ষাৎকার। রিপোর্ট এবং সাক্ষাৎকার দু'টিতেই দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরোধিতা এবং অখন্ড ভারতের পক্ষে কথা বলা হয়েছে। 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন'-এর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে রিপোর্টে বলা হয় ঃ "অযৌক্তিক এবং অন্যান্য বিভক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং সক্রিয় ছিলেন উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু রাজনীতিক। .....এসব জ্যেষ্ঠ প্রজন্মের রাজনীতিকরা আবার নতুন করে তাদের রাজনৈতিক এবং ভৌগলিক স্বপ্ন নিয়ে এগোতে চাইছেন।......... এ প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন"। এই পটভূমি বর্ণনা করার পর বাংলাদেশে এই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের পরিচয় দেয়া হয়েছে। এঁরা প্রায় সকলেই আওয়ামী লীগ ও জাসদ করতেন। এছাড়াও বলা হয়েছে, ",,,,,,,,,,,, তাঁদের পেছনে জাতীয় পর্যায়ের অনেক প্রভাবশালী রাজনীতিকও রয়েছেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জাসদ-এর সর্বোচ্চ দু'জন নেতা এই প্রক্রিয়ার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।" এছাড়া উক্ত প্রচ্ছদ কাহিনীতে 'উপমহাদেশ পুনরুজ্জীবন আন্দোলন'-এর নেতার যে সাক্ষাতকার নেয়া হয়েছে তাতে উক্ত নেতা বলেছেন, "ঠিক '৪৭-এর আগস্টের পূর্বে ভেঙ্গে যাবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে চাই। .... আমরা পুরো উপমহাদেশকে ভাষাভিত্তিক একটি ফেডারেশনে বাঁধতে চাই। দু'পাঞ্জাব আর দিল্লী নিয়ে একটি, আরাকান-কাচীন নিয়ে একটি, শ্রীলংকার তামিল আর মাদ্রাজ নিয়ে একটি, আসাম-মেঘালয় বাংলাদেশ নিয়ে একটি, বেলুচদের নিয়ে একটি।........... ভারতের আগ্রহেই এটা হচ্ছে।"

দ্বি-জাতিতত্ত্ব মুছে ফেলা এবং অখন্ড ভারত গঠনের লক্ষ্যে সাহিত্য-সিনেমা ক্ষেত্রেও ভারতে কাজ হচ্ছে। এ লক্ষ্যে অনেক উপন্যাস-কাহিনী গড়ে উঠেছে। তার ভিত্তিতে চলচ্চিত্রও তৈরীর চেষ্টা চলছে। একটা দৃষ্টান্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাস। এই উপন্যাসে বিভক্ত দুই পারের মর্ম-যাতনা দেখানো হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে অখন্ডত্বের একটা আবেদন বিমূর্ত হয়ে উঠে। এ উপন্যাসের ভিত্তিতে সীমান্তের দুই পারের যৌথ উদ্যোগে চলচ্চিত্র নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। সুনীল বাবুরা ঢাকায় এসে এ লক্ষ্যে একটা উদ্বোধনী সাংবাদিক সম্মেলনও করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবাদের মুখে সম্ভবত উদ্যোগটাকে স্থগিত রাখা হয়েছে। দ্বি-জাতিতত্ত্ব বিরোধী কাজ বাংলাদেশে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও হচ্ছে। একশ্রেণীর নবজাত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও ম্যাগাজিন প্রকাশ্যে দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে অব্যাহত প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

৩২। ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৯২ তারিখে 'বিচিন্তা'-র এ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

www.icsbook.info

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দ্বি-জাতিতত্ত্ব বিরোধী এবং ভারতের পক্ষের এই তৎপরতাগুলো, আগেই বলা হয়েছে, ভারত যে রাজনীতি চর্চা করছে তারই একটা রূপ। এ বিষয়টা প্রকাশও পেয়েছে ঐ সব তৎপরতার মধ্য দিয়ে। এই প্রকাশের মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ সেই '৪৭ থেকে ভারত যা চাচ্ছিল তাই সে করছে। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার এখানে দুইটি। একটি হলো, হঠাৎ করে'৯১ সাল থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্বি-জাতিতত্ত্ব বিরোধী ও অখন্ডভারতমুখী তৎপরতা মাথা তুলে দাঁড়ানো। দ্বিতীয়টি এই তৎপরতার সাথে আওয়ামী লীগ ও জাসদের একটা অংশ সংশ্লিষ্ট হওয়া। অবশ্য গভীরভাবে একটু চিন্তা করলে এ বিস্ময় আর থাকে না কারণ বাংলাদেশে প্রথম ধারার যে ধর্মবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি, তার কাছে দ্বি-জাতিতত্ত্ব একটি অসার বস্তু এবং সেই হেতু মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্থাৎ বাংলাদেশ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এ কারণেই এই ধারার রাজনীতির পক্ষ থেকে উপরোক্ত রাজনৈতিক তৎপরতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উত্থিত হয়নি। দ্বিতীয়ত '৯১ থেকে দ্বি-জাতিতত্ত্ব বিরোধী ও ভারতের অখন্ডতামুখী তৎপরতা মাথা তুলেছে গণতন্ত্রের মাধ্যমে অবাধ বাক-স্বাধীনতা ও বিপুল সংখ্যায় পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সুযোগে।

একানব্বই থেকে দ্বি-জাতিতত্ত্ব বিরোধী এবং ভারতের অখন্ডতামুখী রাজনীতি বাংলাদেশে মাথা তোলার পর থেকে এখানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির কারণ হলো, বাংলাদেশে নবোত্থিত এই রাজনীতি সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে। ধর্মীয় চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং এসবের পাহারাদার ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মূলোৎপাটন না করলে দ্বি-জাতিতত্ত্বের মূলোচ্ছেদ করা যায় না বলেই এই অভিযান। এই অভিযান শুরু করলে প্রথম ধারার রাজনীতির সাথে স্বাভাবিকভাবেই সংঘাত বেধেছে দ্বিতীয় ধারার ধর্মভিত্তিক রাজনীতির। দ্বিতীয় ধারার ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আদর্শিক নেতৃত্ব দিচ্ছে, যা আগেই বলেছি, জামায়াতে ইসলামী এবং ঘটনাক্রমে এই জামায়াতে ইসলামী ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে মুক্তিযুদ্ধকে মুসলমানদের স্বাধীনতা বিরোধী ভারতের একটি তৎপরতা বলে অভিহিত করে। এ বিষয়েটা প্রথম ধারার ধর্ম বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির জন্যে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'কে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এই অস্ত্র দিয়ে জামায়াতে ইসলামী তথা দ্বিতীয় ধারার ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মুন্ডুপাত করার মোক্ষম সুযোগ করে নিয়েছে। এই লক্ষ্য তারা অর্জন করতে পারলে, তারা মনে করছে, শুধু জামায়াতে ইসলামীর মুন্ডুপাত হবে না, মুলোচ্ছেদ হবে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির, মুলোৎপাট ঘটবে দ্বি-জাতিতত্ত্বের এবং সেই সাথে স্বতন্ত্র-স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশেরও। এর অর্থ বাংলাদেশে দ্বিতীয় ধারার ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এবং এ ধারার রাজনীতির আদর্শিক নেতৃত্বদানকারী জামায়াতে

www.icsbook.info

ইসলামী শুধু ধর্মীয় চেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ নয়, শুধু দ্বি-জাতিতত্ত্ব নয়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বেরও একটা গ্যারান্টি।

বাংলাদেশে প্রথম ধারার ধর্ম বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি এবং দ্বিতীয় ধারার ধর্মভিত্তিক রাজনীতির মধ্যেকার এই সংঘাতকেই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় কংগ্রেস 'বাংলাদেশের শেষ যুদ্ধ' বলে অভিহিত করেছে। ১৯৯৩ সালের ২২শে জুন নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে ভারতের ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বয় কমিটির ৮ম বিশেষ সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে রাজনৈতিক মূল্যায়নে বলা হয়, "বাংলাদেশে দুই শক্তির মধ্যে যুদ্ধ চলছে। সম্ভবত এটাই শেষ যুদ্ধ। একদল চাইছে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অপর দল চাইছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অধ্যায় মুছে ফেলতে এবং প্যান ইসলামিক স্রোতের সাথে মিশে যেতে। অশুভ মৌলবাদী শক্তিগুলো সুপরিকল্পিত লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। ... একটি আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসেবে বাংলাদেশের প্রগতিশীল শক্তির পতাকা সমুন্নত রাখতে ভারতের নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে।"[৩৩]

ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় শাখার মূল্যায়ন রিপোর্টকে ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ৪৭ পৃষ্ঠা ব্যাপী রিপোর্ট দিল্লীতে পাঠানো হয়েছে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে। কংগ্রেসের এই রিপোর্টে বাঙালী জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল শক্তি বলতে বাংলাদেশের প্রথম ধারার রাজনীতি অর্থাৎ ধর্মবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ধারাকে বুঝানো হয়েছে। আর জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ধারা বলতে বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ধারাকে বুঝানো হয়েছে। কংগ্রেসের এই রিপোর্টেও জামায়াতকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, ঠিক যেমন বাংলাদেশের প্রথম রাজনৈতিক ধারাটি জামায়াতে ইসলামীকে অভিযুক্ত করে থাকে। কংগ্রেসের এই রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, বাংলাদেশে উল্লেখিত দুই ধারা বা পক্ষের সংঘাতকে 'বাংলাদেশের শেষ যুদ্ধ' বলে অভিহিত করা এবং এই শেষ যুদ্ধে ধর্মবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ ধারার পক্ষ নেয়াকে ভারতের জন্যে নৈতিক দায়িত্ব বলা। কংগ্রেস তার এই বক্তব্য দ্বারা নতুন করে জানিয়ে দিল, বাংলাদেশের ধর্মবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ধারাটির সাথে শুধু আরএসএস বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বিজেপি, শিবসেনা নয় কংগ্রেসসহ গোটা ভারতই শ্যামল রয়েছে। তবে এ কথা না বললেও চলতো। কারণ কারো অজানা নয় যে, কংগ্রেসীরা এ যুদ্ধে আগে থেকে শামিল রয়েছে। বরং উপরের গোটা আলোচনায় এ বিষয়টা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠে যে, বাংলাদেশের এ যুদ্ধটা ভারতেরই যুদ্ধ।

তবে কংগ্রেস ঐভাবে কথা বলে একদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ধর্মবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ধারাটির মর্যাদাকে যেমন ভূলুণ্ঠিত করেছে, অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক দ্বিতীয় ধারাটির আদর্শিক নেতা জামায়াতের মর্যাদাকে আকাশচুম্বী করে দিয়েছে। কংগ্রেসের রিপোর্ট বলে দিয়েছে,

৩৩। বাংলা বাজার পত্রিকা ২৩শে আগষ্ট ১৯৯৩।

www.icsbook.info

বাংলাদেশে ধর্মরোধী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ধারাটি যথেষ্ট নয়, তাদের সহযোগিতার জন্যে ভারতকেও যুদ্ধে নামতে হচ্ছে। এর দ্বারা কংগ্রেস না চাইলেও এবং বাংলাদেশের ধর্মবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ ধারাটি না চাইলেও বাংলাদেশের দ্বিতীয় ধারা অর্থাৎ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ধারাটি। বাংলাদেশী মুসলিম জনগণের ত্রাতায় পরিণত হয়েছে এবং তার স্বাধীনতার সংরক্ষণকারীর স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় এই ধারার আদর্শিক নেতৃত্বে রয়েছে জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলাম পন্থিরা এবং এই ধারার প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হলো বিএনপি। বিএনপির স্থপতি মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদও মুসলিম স্বাতন্ত্র ও ইসলামী জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম স্বাতন্ত্র ও ইসলামী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক। বিএনপির এই বৈশিষ্টই দ্বিতীয় ধারার রাজনীতিতে ইসলামপন্থী দল ও বিএনপি'র জোটবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। এই রাজনৈতিক মেরুকরণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে যেমন শক্তিশালি করেছে, তেমনি দেশের স্বাধীনতার শত্রুদের করেছে দিশেহারা। এ কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা - সার্বভৌমত্বের বিরোধীরা রাজনীতির এই জোটগত মেরুকরণ ভাঙার জন্যে করিয়া।

একটা বিষয় কিন্তু অস্পষ্ট থাকছে, বাংলাদেশের উপরোক্ত রাজনৈতিক সংঘাতকে ভারতের কংগ্রেস 'বাংলাদেশের শেষ যুদ্ধ' বলছে কেন? তাহলে কি কংগ্রেস বাংলাদেশের আয়ু জেনে ফেলেছে? জেনে ফেলেছে যে, এই যুদ্ধের পর বাংলাদেশ থাকছে না? এর অর্থ কি এই যে, কংগ্রেস ধরে নিয়েছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংঘাতে ধর্মবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা জয়লাভ করবে এবং তার ফলে দ্বি-জাতিতত্ত্বের কবর রচিত হবে এবং বাংলাদেশ নামক কোন স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র থাকবে না? বাংলাদেশ না থাকলে বাংলাদেশে আর কোন যুদ্ধেরও প্রশ্ন উঠবে না। সুতরাং এটাই হয়ে দাঁড়াবে বাংলাদেশের শেষ যুদ্ধ। সন্দেহ নেই কংগ্রেস হয়তো এভাবেই চিন্তা করেছে।

কংগ্রেসের এই চিন্তা ঐতিহাসিক ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার চিন্তার অনুরূপ। ফ্যান্সিস ফুকুয়ামা পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ দেখতে পেয়েছেন এবং এর মাধ্যমে ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে বলে ভবিষ্যতবাণী করেছেন।[৩৪] ফুকুয়ামার মতে সেই যুদ্ধটা সংঘটিত হবে ধর্মীয় আদর্শবাদের সাথে পশ্চিমী 'উদার নৈতিক গণতন্ত্রের', যা ভৌগলিক জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। ফুকুয়ামা বলেছেন, এই শেষ যুদ্ধে উদার নৈতিকতাবাদ জয়লাভ করবে, যা ভৌগলিক জাতীয়তার সীমা অতিক্রম করে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবে এবং ইতিহাস পরিপূর্ণতা লাভ করবে। অনেক ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই ফুকুয়ামার প্রতিবাদ করেছেন।[৩৫] বলেছেন সমাজ ও

৩৪। 'The End of History', Francis Fukuyama, The National Interest, Summer, 1989.
৩৫। 'The Return of History' নিবন্ধে Flora Lewis (Sais Review-summer 1990), Responses to Fukuyama' প্রবন্ধে Allan Bloom (The National Interest, Summer 1989), 'More Responses to Fukuyama' প্রবন্ধে Timothey Fuller * The National Interest, Summer, 1989),' 'The errors of Endisim' প্রবন্ধে Samuel p. Huntington (The National Interest, 1989) এবং 'Huntington's 'fault lines' and Fukuyama's end of History' : An appraisal' প্রবন্ধে Tujul Islam Hashmi (Holiday, Dec. 31, 1993) এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত ও আকর্ষণীয় আলোচনা করেছেন।

www.icsbook.info

সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণকারী বিষয় ও উপাদানগুলোকে ফুকুয়ামা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ফুকুয়ামার সমাজ-সভ্যতার সরলীকরণ তত্ত্বটা একেবারেই অবাস্তব। ফুকুয়ামা যা চেয়েছেন তেমন শেষ যুদ্ধও যেমন সামনে নেই, তেমনি ইতিহাসের গতিও রুদ্ধ হচ্ছে না। ভারতীয় কংগ্রেসের 'শেষ যুদ্ধ' সম্পর্কেও এই একই কথা। বাংলাদেশে ধর্মবিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি যত বড় আশাই করুক, একশ্রেণীর ভারতীয়দের বিশেষ রাজনীতি এর প্রতি যতই সাহায্যের হাত বাড়াক, বাংলাদেশের জনগণ এবং জনগণের আদর্শের শক্তির চাইতে তা বড় হবে না। '৯৬ সালে এই রাজনীতির বিজয় হয়েছিল, কিন্তু ২০০১ সালে এসেই সে রাজনীতির পরাজয় ঘটেছে। জনগণ সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হলেও ধর্মবিরোধী, সন্ত্রাসী ও স্বেচ্ছাচারী রাজনীতির চেহারা তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। সুতরাং কোন যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ নয় এবং বাংলাদেশে কোন শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে না।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিদেশাগত উপাদান বাদ দিলে এখানে বৈপরীত্যের চেয়ে সমন্বয়ের উপাদানই বেশী। শুধু বেশী নয়, সমন্বয়ের এই উপাদানগুলিই মৌল প্রকৃতির। বাংলাদেশের ধর্মবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ধারাটি প্রকৃতপক্ষে বিদেশাগত বিজাতীয় অনুপ্রবেশের ফল। কিন্তু এ ধারাটির যারা ধারক তাদের হৃদয় ধর্মীয় আদর্শবাদমুক্ত নয়, মুক্ত করাও সম্ভব নয়। তাইতো আমরা দেখি, ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতি যারা করেন তাদের অনেকেই এমনকি তাহাজ্জুদগোজারও।[৩৬] এছাড়া রয়েছে জনগনের চাপ। ধর্মবিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি যারা করছেন, তারা কিন্তু তাদের পরিচয় জনগণকে বলতে সাহস পান না। বরং তারা 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহু, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ' শ্লোগান নিয়ে জনগণের কাছে হাজির হন। সুতরাং দেশের শিক্ষার হার আরও বাড়লে, জনগণ আরও সচেতন হলে এবং দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলে দেশে ধর্মবিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি আর থাকবে না এবং দেশের রাজনীতিতে আদর্শিক প্রশ্নে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এ সুদিনের আগমন কতদূরে তা নির্ভর করছে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদীদের নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় রাজনৈতিক ধারাটির ইতিবাচক ও স্বাধীন রাজনীতির সংহতি ও শক্তিবৃদ্ধি এবং সার্বিক সচেতনতা ও গণজাগরণের উপর।

৩৬। আওয়ামী লীগ, ন্যাপ-এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় বিধি বিধান মেনে চলেন, তাদের অনেকে তাহাজ্জুদ নামাজও পড়েন। এমনকি কম্যুনিষ্ট বলে পরিচিত লোকরাও আজান হলে অনেকে মসজিদে দৌড়ান। তাদের হৃদয় যে ঈমান দগ্ধ এটা তারই প্রমাণ। আমি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার ড্রইং রুমে যেদিন কোরআন দেখলাম, জায়নামাজ দেখলাম, সেদিন সত্যিই আমার বুকটা এক অনাস্বাদিত গৌরবে ভরে গিয়েছিল। এই ঈমান তাদের রাজনীতির চেয়ে বড়, সময় এলেই তার প্রমাণ তারা দেবে। এমনও হতে পারে দ্বিতীয় ধারার যে রাজনীতি, সে রাজনীতির প্রধনা শক্তি তারাই হয়ে দাঁড়াবে।

www.icsbook.info

১২
পরিশিষ্ট

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিবাজী উৎসব' কবিতা।

২। ১৯৪৩ সালের এপ্রিলে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিশ লীগের বার্ষিক অধিবেশনে কায়েদে আযমের ভাষণ।

৩। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে জিন্নাহ-গান্ধীর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা ব্যর্থ হবার পর উভয়পক্ষের সাংবাদিক সাক্ষাতকার।

৪। ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানের পূর্ণ বিবরণ।

www.icsbook.info

পরিশিষ্ট - ১

শিবাজী উৎসব
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে
নাহি জানি আজি
মারাঠার কোন শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে ব'সে,
হে রাজা শিবাজী,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল -----
এক ধর্মরাজ্যপাশে খন্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।'
সেদিন এ বঙ্গদেশে উচ্চকিত জাগেনি স্বপনে,
পায়নি সংবাদ---
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গনে
শুভ শঙ্খনাদ --
শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল নির্মল
শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লী সন্তানের দল
ছিল বক্ষে করি।।
তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
তব বজ্র শিখা
আঁকি দিগদিগন্তে যুগান্তরের বিদ্যুৎবহ্নিতে
মহামন্ত্রলিখা।
মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয় প্রদোষে
পক্কপত্র যথা--
সেদিনও শোনেনি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কী ছিল বারতা।
তার পরে শূন্য হল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লীরাজশালা--
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের উর্ধ্বংস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা-মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকাখে
হল তার সীমা।
সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্য বিপনীর একধারা
নিঃশব্দচরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসান।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে-
বণিকের মানদন্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদন্ডরূপে।
সেদিন কোথায় তুমি হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি,
কোথা তব নাম!
গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধুলায় হল মাটি
তুচ্ছ পরিণাম?
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে-
তব পূন্যচেষ্টা যত তস্করের নিস্ফল প্রয়াস,
এই জানে সবে।
অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ
অগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন'-পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না
ত্রিদিবে,
নিশ্চয় সে জানি।
হে রাজতপস্বী বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভান্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ, স্বদেশলক্ষীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন,
কে জানিত, হয়ে গেছে চিরযুগযুগান্ত তরে
ভারতের ধন?
অখ্যাত অজ্ঞাত রহি দীর্ঘকাল হে রাজবৈরাগী
গিরিদরীতলে,
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদারিয়া উঠে জাগি
পরিপূর্ণ বলে,
সেইমত বাহিরেলে বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে
যাহার পতাকা

www.icsbook.info

অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র, হয়ে
কোথা ছিল ঢাকা।।
সেইমত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব-ভারতে
কী অপূর্ব হেরি,
বঙ্গের অঙ্গনদ্বারে কেমন ধ্বনিল কোথা হতে
তব জয়ভেরি।
তিন শত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তের আজি নবতর কী রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার।
মরে না, মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে-
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে।
যারে ভেবেছিল সবে কোনকালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্মপরপারে,
এল সেই সত্য তব পুজ্য অতিথির ধরি বেশ
ভারতের দ্বারে।
আজও তার সেই মন্ত্র-সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যতের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কি দৃশ্য মহান,
হরিছে কে জানে।
অশরীরী হে তোপস, শুধু তব তপোমূর্তি লয়ে
আসিয়াছ আজ-
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ বয়ে,
সেই তব কাজ।
আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল
অস্ত্র খরতর
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
'হর হর হর'।
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হতে এল নামি,
করিল আহবান...
মুহূর্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল হে স্বামী
বাঙালির প্রাণ।
এ কথা ভাবেনি কেহ, এ তিন শতাব্দকাল ধরি.
জানেনি স্বপনে....
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ মারাঠারে এক করি
দিবে বিনা রণে,
তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন বাণী রুপে আনি দিবে নতুন পরান-
নূতন প্রভাত।
মারাঠার প্রান্ত হতে একদিন তুমি ধর্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে
রাজা ব'লে জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে।
তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
যে ঘোর দুর্যোগদিনে না বুঝি রুদ্র সেই লীলা
লুকানু ভরাসে।
মৃত্যুসিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমর মুরতি-
সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার
দিব্যরজ্যোতি
কভু কোনোকালে।
তোমারে চিনেছি আজ চিনেছি চিনেছি হে রাজন
তুমি মহারাজ,
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ।
সেদিন শুনি নি কথা-আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিব সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরীবসন--
দরিদ্রের বল
'একধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙালি, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পূরব
দক্ষিনে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব
এক পূর্ণ নামে।

www.icsbook.info

পরিশিষ্ট-২

১৯৪৩ সালের এপ্রিলে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে কায়েদে আযমের ভাষণঃ

সমাগত ডেলিগেট ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

পুনরায় আপনারা যে আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই সম্মান ও মর্যাদা যে কোনও লোকেরই কাম্য। আশা করি, আগামী বৎসর আমি আপনাদের সহযোগিতায় ও সমর্থনে নিখিল ভারত মোছলেম লীগের নীতি ও কার্যক্রম পরিচালনে সক্ষম হইব। আমি নিখিল ভারত মোছলেম লীগের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর একটা হিসাব দিতে চাই।

বাংলার ঘটনাবলী

মোছলেম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনের পর এক বৎসরে মোছলেম লীগ যে ভারতের সর্বত্র অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই (হর্ষধ্বনি)। আপনারা জানেন, গত ১৬ মাস বাংলায় আমাদের উপর গজব নাজেল হইয়াছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের নিজেদের লোকই মোছলেম স্বার্থের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা প্রদর্শন করিয়াছে। আমি মনে করি এই কয়মাসে বাংলার মুছলমানগণ এমনভাবে নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ করিয়াছে যাহার নজীর বাংলার ইতিহাসে নাই (হর্ষধ্বনি)। তাহারা যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। আমি বাংলার মুছলানদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি (শুনুন, শুনুন)। এই ব্যাপারে বাংলার মোছলেম যুবকদের এই কৃতিত্ব অনেকখানি। তাঁহারাই অত্যাচারীর দফা-রফা করিয়া দিয়াছেন (শুনুন, শুনুন ও হর্ষধ্বনি)। কয়েক মাস পূর্বে নাটোর নির্বাচনে ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা যে প্রার্থী দাড় করাইয়াছিলেন তাঁহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। প্রত্যেক উপনির্বাচনেই আমরা জয়লাভ করিয়াছি। উচ্চ পরিষদের গত নির্বাচনে আমরা সবগুলি আসনই দখল করিয়াছি। ন্যায়-নিষ্ঠার প্রাথমিক নীতি পদদলিত করিয়া ফজলুল হক গবর্নমেন্ট স্বৈরাচার, নির্যাতন, ছল-চাতুরী ও কলা কৌশল নীতি অবলম্বন কলিয়াছিলেন বলিয়া বাংলায় আমরা অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছি।

বাংলা এই রূপে প্রমাণ করিয়াছে যে, সেখানে ছল চাতুরী করার আর উপায় নাই। বাংলা এক দৃষ্ঠান্ত স্থাপন করিয়াছে। উহা হইতে অন্যেরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে (শুনুন, শুনুন ও উচ্ছ উল্লাসধ্বনি)। লীগ এক্ষণে জনমতের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিল্লাতের কর্তৃত্ব এক্ষণে লীগের উপরই অর্পিত হইয়াছে। মোছলেম

www.icsbook.info

জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইলেও ইহার নিকট আপনাদের শির নত করিতে হইবে (পুনঃ পুনঃ হর্ষধ্বনি)।
যদিও আনন্দে আত্মহারা হওয়ার মত কিছু ঘটে নাই, আমি আনন্দিত যে, মুছলিম লীগ পার্টির নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা পরিচালিত হইতেছে। অভ্যর্থনা-সমিতির চেয়ারম্যান সত্যই বলিয়াছেন যে, আসামে লীগ মন্ত্রীসভা, কিংবা লীগ পার্টির প্রভাবান্বিত মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। এইরূপে বাংলা, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবেও লীগ মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে। আমরা ইহা অভিনন্দিত করিতেছি। কিন্তু আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা হইয়াছে, আমরা যেন কখনও এরূপ ভাব পোষন না করি। ইহা সূচনা মাত্র (উল্লাসধ্বনি)। আমরা মন্ত্রীদের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিব না পরন্তু মন্ত্রীগণই আমাদের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করিবেন (উচ্চ হর্ষধ্বনি)। এই মন্ত্রীগণ যতদিন পর্যন্ত লীগের মুলনীতি মানিয়া চলিবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সমর্থন করিব কিন্তু আমি পুনরায় সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিতে চাই যে এক্ষণে আমরা এমন এক স্তরে আসিয়া পৌছায়াছি যে, প্রয়োজন হইলে যে কোন মন্ত্রীসভার সমর্থনে আমরা বিরত থাকিতে দ্বিধাবোধ করিব না (হর্ষধ্বনি)।

মোছলেম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহ

মোছলেম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহের কথা ভুলিয়া যাইবেন না। মোছলেম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহ যখন আঁধারে সমাচ্ছন্ন ছিল তখন মোছলেম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহই তথায় আলোক বিকীরণ করে। মোছলেম সংখ্যালঘু প্রদেশসমূহ মোছলেম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের উন্নতির জন্য, উপকারের জন্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন। শুধু মোছলেম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলি দুঃখ কষ্টের ভূমিকায় অভিনয় করিলেই চলিবে এইরূপ ধারণা কখনও মনে স্থান দিবেন না (হর্ষধ্বনি)। সংখ্যালঘু প্রদেশের মুছলমানেরা বহু নির্যাতন ভোগ করিয়াছে এবং উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সাড়ে সাত কোটি মোছলেম ভ্রাতার স্বাধীনতার জন্য আমরা যে কোন পরিণতির সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছি।

মোছলেম জাতির লক্ষ্য ও আদর্শ

আমাদিগকে অনেক কিছু করিতে হইবে। আমরা কি জন্য সংগ্রাম করিতেছি তাহা অবশ্য এক্ষনে পরিস্কার হইয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা বুঝে না বলিয়া ভান করে, তাহাকে কি নামে অভিহিত করিব? হয় সে আহমক, না হয় কপট। আমাদের আদর্শ ও দাবী পরিস্কার। আমরা কি চাই? আমাদের নিজস্ব আবাস ভূমিতে এবং যেখানে আমাদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে সেখানে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। অন্য কথায়, যে সমস্ত অঞ্চলে হিন্দুদের সংখ্যাধিক্য ও মুছলমানদের সংখ্যাল্পতা

www.icsbook.info

রহিয়াছে সে সমস্ত অঞ্চলের সহিত আমরা মিশিয়া যাইতে চাই না। এক্ষণে আমি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি।

অতীত ঘটনাবলীর উপর আলোকসম্পাত

প্রথমতঃ ১৮৬১ সনের এবং পরে আইনে বড়লাটের তথাকথিত কাউন্সিলে অতি সামান্য পরিমাণ প্রতিনিধিত্বই দেওয়া হইয়াছিল। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল, লোকাল কাউন্সিল, মিউনিসিপাল বোর্ড, লোকাল বোর্ড অথবা জেলা বোর্ড সমূহে তখন অল্প সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধি প্রেরিত হইতেন। তখন কোন মুসলমানের পক্ষে নির্বাচিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তারপর আসে মিন্টোমর্লে প্রস্তাব। এই প্রথম প্রকৃত প্রস্তাবে নির্বাচন নীতির সম্প্রসারণের চেষ্টা করা হয়। ১৮৮৪ সন হইতে১৯০৭ সন পর্যন্ত মুছলমানেরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাহারই ফলে ঐ সময় পৃথক নির্বাচনের দাবী উত্থাপন করে। তখন আমার বয়স খুব অল্প। মহান হিন্দু নেতা গোখলে ও দাদাভাই নৌরজী কতকগুলি নীতি Imbibe করেন। তন্মধ্যে একটি হইতেছে যে, সমানাধিকারের ভিত্তিতে দেশের এই দুইটি প্রধান জাতির মধ্যে যাহাতে বুঝাপড়া হয় তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ। ঐ সময় মিঃ৮গোখলে মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করেন। তিনি ছিলেন উদার ও উন্নতমনা রাজনীতিক এবং তাহার প্রতিভাও ছিল বিরাট। ১৯০৭ সনে গোখলে ঘোষণা করেন ঃ "হিন্দুরা সংখ্যায় অত্যধিক বলিয়া মুছলমানেরা স্বভাবতঃই আশঙ্কা করিতে পারে যে ব্রিটিশ শাসনের অবসানে তাহারা হিন্দুদের দাসে পরিণত হইতে পারে। তাহাদের এই আশঙ্কা উপহাসের বস্তু নহে। সংখ্যার দিক দিয়া হিন্দুদের অবস্থা যদি মুছলমানদের ন্যায় হইত তবে তাহারাও কি এইরূপ সংশয়ে পতিত হইত না? নিঃসন্দেহে আমাদের মনেও এইরূপ আশঙ্কার উদ্রেক হইত এবং মুছলমানেরা আজ যে নীতি অবলম্বন করিতেছে আমরাও সেই নীতিই অবলম্বন করিতাম।"

মিঃ বিপিন পালের স্বপ্ন

হিন্দু ও মুছলমানের মধ্যে ন্যায় ও যুক্তসঙ্গত শর্তে মিটমাট হইবে, দাদাভাই নৌরজীর ন্যায় মহান ব্যক্তি এইরূপ আশা দ্বারা আমাগিদকে অনুপ্রাণিত করেন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, ঐ সময়ও এমন একদল লোক ছিলেন যাঁহারা হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। বিশিষ্ট হিন্দুনেতা মিঃ বিপিন চন্দ্র পালের একটা উক্তি আমি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। ১৯১৩ সনে মিঃ পাল ঘোষণা করেনঃ "আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্রের ভিত্তি শুধু আঞ্চলিক পার্থক্য অথবা রাজনৈতিক কিম্বা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপরই প্রতিষ্ঠিত নহে, এই স্বাতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতির উপর। মোছলেম আমলে হিন্দু ও মুছলমান সকলেই একই শাসনাধীনের ছিল কিন্তু তাহার ফলে হিন্দুর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়

www.icsbook.info

নাই। মুসলমান প্রতিবেশিগনের অনেক আচার পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করিয়াছি; এবং তাহারাও আমাদের অনেক আচার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ভাবের রীতিনীতির এই আদান প্রদানে আমাদের কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় নাই। জাতীয়তা বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝি; তাহার মান হইতেছে এই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। ইহা শুধু একটি রাজনৈতিক আদর্শ বা ভাবধারাই নহে। ইহা এমন একটা জিনিস, যাহা আমাদেরই সমষ্টিগত জীবন ও কার্যক্ষেত্রের প্রত্যেক স্তরকে স্পর্শ করে। ইহা আমাদের পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক, সামাজিক এবং আমাদের অর্থনৈতিক আচার-পদ্ধতির সহিত ওতঃপ্রতভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। জাতীয়তা সম্পর্কে আমাদের মনে যো ধারণা রহিয়াছে, কোন কোন দিক দিয়া রাজনীতিই হইতেছে ইহার মধ্যে সর্বেপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইউরোপের তথাকথিত রাজনৈতিক ভাবধারা অনুসরণে আমাদের প্রকৃত জাতীয় জীবনের উন্মেষ, তো হইবেই না, বরং তাহাতে বাধার সৃষ্টি হইবে।"

তিনি আরও বলেনঃ"ভারতের জাতীয় আন্দোলন মূলতঃ হিন্দু আন্দোলন। ইহা (১) আদর্শগতভাবে (ক) হিন্দুজাতীয়তা (খ) যুক্ত আন্ত র্জাতিকতা ও (গ) বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের পরিপোষক, (২) কার্যতঃ ইহার উদ্দেশ্য (ক) হিন্দু সংস্কৃতি ও এছলামিক সংস্কৃতি পর্যালোচায় উৎসাহ দান, পারস্পরিক বুঝাপড়া ও সহযোগিতার মনোবৃত্তি জাগরিত করিয়া তোলা, (৩) বৃটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় ক্রমে ক্রমে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র গড়িয়া তুলিয়া তাহা মারফৎ বৃটিশের সহিত সম্পর্ক রাখা এই ফেডারেশনের ভারত, মিছর, আয়ারল্যান্ড ও বৃটিশ উপনিবেশসমূহসহ গ্রেট-ব্রিটেনের সম অংশীদার হইবে এবং (৪) বিশ্ব ফেডারেশন গঠনে সহায়তা করা।

ইহার মতলব কি? হিন্দু জাতীয়তা নয় কি? কিন্তু আমি আশা ছাড়ি নাই। ১৯১৩ সনে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের পর দ্বিগুন উৎসাহে কাজে লাগিয়া যাই। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করা। হিন্দু এবং মুছলমানের মধ্যে আরো অনেকে এ বিষয়ে বিশেষ প্রচেষ্টা করেন। আমার চেষ্টায় কংগ্রেস ও মোছলেম লীগ অন্ততঃপক্ষে একটি শহরে সমবেত হয়। এই ঘটনা ঘটে ১৯১৫ সনে। অক্লান্ত চেষ্টার পর আমি এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে বোম্বাইয়ে সমবেত করিতে সক্ষম হই। ঐ সময় যুদ্ধ চলিতেছিল। কাজেই আশা করা গিয়েছিল যে এই দেশে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট নীতি ঘোষণা করিবেন। ঐ সময় আমাদের বন্ধু বৃটিশের ইচ্ছা ছিল না যে, এই দুইটি প্রতিষ্ঠান একই শহরে, একই গৃহে সমবেত হয়। এখনও তাঁহাদের এ নীতির পরিবর্তন হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। আপনারা জানেন, পুলিশের সম্মুখেই নিখিল ভারত মোছলেম লীগের প্রথম অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যায়। আমরা গভর্ণমেন কে এ বিষয়ে তদন্ত

www.icsbook.info

করিতে অনুরোধ করি। কারণ আমাদের ধারণা ছিল যে, পুলিশের মৌন সম্মতি এবং আমলাতন্ত্রের সমর্থন ক্রমেই মোছলেম লীগ অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। আমি বিস্তৃত বিবরণী দিতে চাই না। ইহা ইতিহাসের বস্তু। পরবর্তী বৎসরের শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় কংগ্রেস ও লীগ লাখনৌ এ সমবেত হয়। তথায় আমরা লাখনৌ চুক্তি সম্পাদন করি। ইহা হিন্দু মোছলেম লাখনৌ চুক্তি নামে অভিহিত হয় কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নানা উপায়ে ঐ প্যাক্টের অঙ্গহানি করেন। ইহার পর আসে মটেগু-চেমসফোর্ড ঘোষণা।

মিঃ গান্ধীর স্বরূপ

১৯১৬-১৭ সালের কথা। যখন এই সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল তখন ভারতাকাশে উদিত হইলেন মিঃ গান্ধী। ১৯২০ সালের ১২ই মে তারিখের "ইয়ং ইন্ডিয়া" পত্রে মিঃ গান্ধী ঘোষণা করেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ৭ বৎসর পূর্বে এই মাসেই মিঃ বি, পি, পাল তাঁহার ঘোষণা প্রচার করেন। মিঃ গান্ধী কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন -"এইগুলিকে আমি রাজনীতি বলিয়া মনে করি না- ধর্ম বলিয়া মনে করি। এইগুলি ধর্মকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে।" আপনারা পরে দেখিতে পাইবেন, তিনি তাঁহার ঘোষণা মোতাবেক কি করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, "আমার রাজনৈতিক সত্তা আমার কোন সিদ্ধান্তের উপরই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আজকাল রাজনীতি আমাদিগকে সাপের ন্যায় কুন্ডলী পাকাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করি। যে যত চেষ্টাই করুক না কেন ইহা হইতে বাহির হইয়া আসা কাহারো পক্ষে সম্ভব নহে। এই সর্পের সহিত লড়িবার জন্য আমি এবং আমার সহকর্মীগণ, রাজনীতিতে ধর্মের আমদানী করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে পরীক্ষা কার্য চালাইতেছি।"

পরে বুঝিতে পারিবেন; মিঃ গান্ধী এই পরীক্ষা কার্য চালাইয়াছেন প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থতার মধ্য দিয়া। ১৯২১ সনে নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের উপর মাতব্বরী প্রতিষ্ঠার পর ঐ সনের ১২ই অক্টোবর তারিখে "ইয়ং ইন্ডিয়া" পত্রে মিঃ গান্ধী লিখিয়াছিলেন "আমি নিজেকে একজন সনাতনী (গোঁড়া) হিন্দু বলিয়া মনে করি, কারণ প্রথমতঃ আমি বেদ, পুরাণ এবং হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাসী, আর সঙ্গে সঙ্গে অবতারবাদ এবং পুনর্জ্জন্মেও বিশ্বাসী" অবশেষে তিনি নিজেই একজন অবতার হইয়া পড়েন (হাস্য)।

"দ্বিতীয়তঃ আমি বর্ণাশ্রম ধর্ম (জাতিভেদ প্রথা) ও ইহার বৈদিক নীতিতে বিশ্বাসী। তৃতীয়ত ঃ আমি গো-রক্ষা কার্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাকে আমি বিশ্বাসের বস্তু বলিয়াই মানি। চতুর্থতঃ মুর্ত্তি পূজায় আমি অবিশ্বাসী নই।"

কেমন মোলায়েম করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মূর্ত্তি পূজায়ও অবিশ্বাসী নই।"

www.icsbook.info

মিঃ গান্ধীর এই সমস্ত পরিস্কার ও অদ্ব্যর্থক ঘোষণা সত্ত্বেও হিন্দু জাতীয়তাবাদীগণ কিছুটা বিচলিত হইয়া পড়েন। তাঁহারা জানিতেন না এই লোকটা কত চালাক ও চতুর। কাজেই তাঁহাদের মধ্যে কিচুটা আশঙ্কার সৃষ্টি হয়। তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করার জন্য তিনি পুনরায় ১৯২৪ সনে ঘোষনা করেনঃ "এইরূপ কানাঘুষা হইতেছে যে, মুছলমান বন্ধুদের সহিত এত মেলামেশা করিয়া আমি হিন্দু মনোবৃত্তির উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু আমি হিন্দু-মনোবৃত্তির প্রতীক এবং আমার দেহের প্রত্যেক অণুপরামাণুই হিন্দু। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে যদি আমি আমার হিন্দুত্বের উৎকণ্ঠা সাধন করিতে না পারি তবে হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার আস্থা যে শিথিল তাহাই প্রমাণিত হইবে।" তথাপি আমি যখন তাঁহাকে একজন হিন্দু হিসাবে আমার সহিত মোলাকাত করিতে বলি তখন তিনি তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবুও তিনি বলেন, তাঁহার দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুই হিন্দু (হাস্য)। ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার হিন্দু মনোবৃত্তি অভেদ্য। এই তো গেল ১৯২৪ সনের কথা।

মিঃ গান্ধীর একগুঁয়েমী

আপনারা জানেন, ১৯২৫ সন হইতে হিন্দু মোছলেম বিভেদ দূরীভূত করার জন্য বহু প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। প্রত্যেকবার আমরা মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেসের দুয়ারে আমাদের প্রস্তাব লইয়া ধর্ণা দিয়াছি। তাঁহাদের হুজুরে আর্জ্জি পেশ করিয়াছি। যে কোন কারণেই হোক, প্রত্যেকবারই 'না' উত্তর আসিয়াছে। তাঁহারা কখনও কোন বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন নাই। আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে, ১৯২৭ সনে দিল্লীতে আমরা কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করি। সৌভাগ্য বশতঃই হউক, আর দুর্ভাগ্য বশতঃই হউক, ঐ উক্ত সনের শেষ ভাগে কংগ্রেসের মাদ্রাজ বৈঠকে ঐগুলি কার্যতঃ গ্রহীত হয়। একরূপ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইয়া যায় এবং যুক্তভাবে রাজনৈতিক দাবী উত্থাপনের জন্য মোছলেম লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃক দুইটি কমিটি গঠিত হয়। আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে এই দুইটি কমিটির বৈঠক বসিলে মিঃ গান্ধীই সব পন্ড করিয়া দেন। (ধিক্কার ধ্বনি) সুতরাং আমরা আমাদের প্রস্তাবাবলী প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলাম। তারপর কি ঘটিল? তারপর আসিল নেহেরুর রিপোর্ট, আপনারা ইহার ইতিহাস জানেন। মরহুম মওলানা মহম্মদ আলি নেহরু রিপোর্ট সম্পর্কে কি অভিমত প্রকাশ করেন, আমি আপনাদিগকে তাহা বলিব। তিনি বলেনঃ বৃটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন আমলে সরকারী ফেরিওয়ালারা গভর্ণমেন্টের কোন বিজ্ঞপ্তি প্রচার না করার পূর্বেই চিৎকার করিয়া ভারতে দ্বৈতশাসনের কথা ঘোষণা করিত। তাহাদের ফরমুলা ছিল-খালক্ খোদাকী-মুল্‌ক মালেকা কা-হুক্‌ম কোম্পানী বাহাদুর কা (মানুষের মালিক খোদা; দেশের মালিক মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং শাসন কর্তৃত্ব কোম্পানী বাহাদুরের)।

www.icsbook.info

নেহেরু রিপোর্ট

মিঃ গান্ধীর নেহরু পরিকল্পনায় যে শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার অধীনে সরকারী ফেরিওয়ালা হাঁক ডাক করিয়া ভারতে নূতন দ্বৈত-শাসনের বার্তা ঘোষণা করিবে। তাহাদের ফরমূলা হইবে-খাল্‌ক খোদা কী; মুল্‌ক ব্রিটিশ কা; হুকুম মহাসভা বাহাদুরকা; (মানুষের মালিক খোদা, দেশের মালিক ব্রিটিশ এবং শাসন কর্ত্তৃত্ব হিন্দু মহাসভা বাহাদুরের)। (উচ্চ হাস্য)।

মওলানা মোহাম্মদ আলীর উক্তি

কংগ্রেসের জন্য মওলানা মোহাম্মদ আলী যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করেন, দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন এবং স্বার্থ ত্যাগ স্বীকার করেন। ১৯৩০ সনে বোম্বাইয়ে এক সভার সভাপতি রূপে তিনি বলেনঃ

"মিঃ গান্ধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু মহাসভার প্রভাবাধীনে কাজ করিতেছেন। তিনি হিন্দু ধর্মের প্রাধান্যের জন্য এবং মোছলেম জাতির স্বাতন্ত্র মুছিয়া ফেলার নিমিত্ত সংগ্রাম করিতেছেন। আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপারে তিনি কখনও মোছলেম জাতির সহিত পরামর্শ করেন নাই। তিনি চান, ভারতীয় মোছলেম জাতির মাথার উপর দিয়া বিজয় রথ চালনা করিতে। আমরা কোন প্রতিশ্রুতি, চুক্তি বা সন্ধি ভঙ্গ করি নাই। আমরা ভারতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই। গত ১০ বৎসর মুছলমানগণ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দ্বারা নির্যাতিত ও নিপীড়িত হইয়াছে। মিঃ গান্ধী অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা বা মুছলমানদের প্রতি হিন্দুদের স্বৈরাচারের প্রতিবাদে টু শব্দটি পর্যন্ত করেন নাই। তিনি শুদ্ধি এবং সংগঠন আন্দোলনের প্রতিবাদ করেন নাই। এ সমস্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতের বুক হইতে এছলাম ও মুছলমানের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলা। তিনি মাদ্রাজ হিন্দু মোছলেম চুক্তি স্বীকার এবং ভঙ্গ করেন। 'কোন সম্প্রদায় বিশ্বাসঘাতকতা করিবে বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিবে বলিয়া যদি আশঙ্কা কর, তবে সেই সন্ধিপত্র তাহার মুখের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও। আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীদের কার্য অনুমোদন করে না।' এক্ষণে কোরআনের এই নীতি অনুসরণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই (হর্ষধ্বনি)।"

মিঃ গান্ধীর কারসাজী

এখন দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের কথা উল্লেখ করা যাক। মিঃ গান্ধী এই প্রথম কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ইহাতে যোগদান করেন। সেখানে কি ঘটিয়াছিল? তিনি পুণরায় কোন না কোন ছুঁতো ধরিয়া আপোষ মীমাংসার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। ডাঃ আম্বেদকরের গ্রন্থে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, লন্ডনে মোছলেম প্রতিনিধিগণের নিকট তিনি যে সমস্ত শর্ত পেশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি হইতেছে এই যে, আমরা মুছলমানেরা যদি তফছিলী সম্প্রদায়ের

www.icsbook.info

পৃথক নির্বাচন বা বিশেষ রক্ষা কবচের দাবীর বিরোধিতা করার প্রতিশ্রুতি দিই তবে তিনি আমাদের প্রস্তাব মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। অন্য কথায় তফছিলী সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হউক মিঃ গান্ধী তাহা চাহেন না। আমি এখন আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে ব্যক্তির আত্মসম্মান ও ন্যায়-নীতির প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও আছে, সেই ব্যক্তি কি করিয়া এই প্রস্তাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবেন? তিনি কি করিয়া স্বীকার করিয়া লইবেন যে এই ছয়কোটি লোক অস্পৃশ্য এবং সনাতনীদের কৃপার পাত্র হইয়া থাকিবে? মিঃ গান্ধীও একজন সনাতনী। ভারতের সুনামে ইহা কলঙ্ক স্বরুপ। মানবতার নামে আমি আপনাগিদকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছি, মুছলমানদের চেয়ে তাহাদের প্রতিই আমার খেয়াল অধিক (শুনুন, শুনুন ও হর্ষধ্বনি) মোটের উপর আমরা মুছলমানেরা এইরূপ অন্যায় ও অযৌক্তিক শর্ত মানিয়া লইতে পারি না। দ্বিতীয় শর্ত হইতেছে যে তোমরা মুছলমানেরা স্বীকার কর যে, তোমরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিবে। আমাদের কি এতই অধঃপতন হইয়াছে যে, এইরূপ একটি প্রস্তাব মানিয়া লইব? যে কোন লোকের চেয়ে আমরা দেশের স্বাধীনতা অধিক ভালবাসি (উল্লাসধ্বনি)। এই প্রস্তাব দ্বারা মনে হয়, দেশের স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসা যেন মিঃ গান্ধীর একচেটিয়া। (তিনি স্বাধীনতা চান না'-রব)। কাজেই আপোষ আলোচনা ভাঙ্গিয়া যায়। তাঁহার মনের গহন কোণে সর্বদাই যে জিনিসটি লুক্কায়িত থাকে সংকট সময়ে তাহাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়া ফেলেন। গোলটেবিল বৈঠকের মাইনরিটিজ কমিটির সভায় মিঃ গান্ধী মন্তব্য করেনঃ

"মাইনরিটিজ কমিটি আহবানের সময় ইহা নহে। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান স্বরাজ-শাসনতন্ত্রের মুকুট স্বরুপ হইতে পারে, ভিত্তি নহে। বৈদেশিক শাসনের ফলে আমাদের মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে, যদি তাহার ফলে উদ্ভব নাও হইয়া থাকে। আমার মনে একটুও সন্দেহ নাই যে, স্বাধীনতা সূর্য্যের তাপে সাম্প্রদায়িক বিভেদরূপ তুষারস্তুপ গলিয়া যাইবে।"

ম্যাকডোনাল্ডোর দাঁতভাঙ্গা জওয়াব

প্রধানমন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মাইনরিটিজ কমিটির উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। মিষ্টার গান্ধীর এইরূপ মন্তব্যে তিনি পর্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়েন। মিঃ ম্যাককডোনাল্ড সম্পর্কে যাহাই বলা হউক না কেন ভারতে আশা-আকাঙ্খার প্রতি তাঁহার মনে গহন কোণে একটা দরদ ছিল। মিঃ গান্ধীর মন্তব্যের জওয়াবে মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড বলেনঃ

"সততা অবলম্বন করুন এবং বাস্তবতার সম্মুখীন হউন। সাম্প্রদায়িক সমস্যা একটি বাস্তব সমস্যা। ভারতে এই সমস্যার অস্তিত্ব আছে কি, না নাই? আমি ইহার জওয়াব দিতে চাই না। আমি আপনার উপরই ইহার উত্তরের ভার

www.icsbook.info

দিলাম। আপনি সততার সহিত ইহার জওয়াব দিন।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার যদি অস্তিত্ব থাকেই, তবে ইহার সমাধানের জন্য ভারতে বা এখানে কেমন করিয়া আলোচনা চালানো যাইতে পারে? ভারতে একটি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূলেই রহিয়াছে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব, সাম্প্রদায়িক অধিকার, সাম্প্রদায়িক রক্ষা কবচ ইত্যাদি সমস্যা।" গোলটেবিলের পালা শেষ হইল। তারপর কি ঘটিল? আমি অতি সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত করিতেছি। মিঃ গান্ধী নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি গঠন করিয়াছেনঃ

(১) গান্ধী আশ্রম-সেবাগাঁ, ওয়ার্দ্ধা (গান্ধী নীতির ভ্যাটিকান ও কংগ্রেসের রাজধানী স্বরূপ)।

(২) গান্ধী সেবাসঙ্ঘ (৯ জন সদস্য লইয়া গঠিত গান্ধীজীর স্থায়ী সর্বোচ্চ মন্ত্রণা পরিষদ)।

(৩) গান্ধী হরিজন সেবা সঙ্ঘ (অনুন্নত শ্রেণীর লোকদিগকে হিন্দু ধর্মের আওতায় আনয়ন ও এছলাম বা খৃষ্টধর্ম গ্রহণে তাহাদের বাধাদানের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত)।

(৪) গান্ধী হিন্দী প্রচার সঙ্ঘ (সংস্কৃত মার্কা হিন্দীকে ভারতে রাষ্ট্র ও জাতীয় ভাষা বলিয়া প্রচার এবং উর্দু ভাষার গুরুত্ব হ্রাস ও জনপ্রিয়তা নাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত)।

(৫) গান্ধী নাগরী প্রচার সভা (হিন্দী দেবনাগরী বর্ণমালায় ভারতে সমস্ত ভাষা লিখিত হওয়া উচিত এইরূপ ধারণা সৃষ্টির জন্য এবং উর্দু বর্ণমালা প্রচলন রদ করণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত)।

(৬) গান্ধী গ্রাম সুধার সভা (পল্লীগ্রামসমূহে গান্ধী নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। খাদি বা হস্ত নির্মিত বস্ত্রকে উপাস্য বলিয়া মনে করা হয়)।

(৭) গান্ধী ওয়ার্দ্ধা তালিমী সঙ্ঘ - রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রথার মাধ্যমে ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, জাতীয়তা, অর্থনীতি সম্পর্কে গান্ধী-নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে ইহা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা অনুসারে দেশের সমগ্র শিক্ষা পরিকল্পনাকে গান্ধী নীতি প্রচারের মাধ্যম করা হইয়াছে। এই গান্ধী-নীতি হইতেছে হিন্দু ধর্মের নয়া রূপ।

(৮) গান্ধী গো রক্ষা সভা (গো অর্চনা সমিতি)।

মিঃ গান্ধী দেবী গো পূজায় অকপট বিশ্বাসী। কাজেই তিনি গো রক্ষা সভা ও গো প্রদর্শনী কংগ্রেসের অঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছেন। গান্ধী সেবা সঙ্ঘই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মূল (হাস্য)। গান্ধী সেবা সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে মিঃ গান্ধী বলেন;
" এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য্য ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। কিন্তু আপনাদের কার্যক্ষেত্র সীমাহীন। আপনাদের প্রতিষ্ঠান হইতেছে মহামহীরূহ বিশেষ। আর অন্যান্য

www.icsbook.info

প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইহার শাখা বলা যাইতে পারে।”

উপ-মহাত্মার দল

মিঃ গান্ধী সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশকে তিনটি সুনির্দিষ্ট পার্লামেন্টারী অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া তিনজন আঞ্চলিক পার্লামেন্টারী ডিক্টেটর নিযুক্ত করিয়াছেন। এছাড়া প্রায় সবগুলি প্রদেশ এবং অঞ্চলে স্থায়ী ডেপুটি মহাত্মার উদ্ভবেও ক্রমাগত সহায়তা করিয়াছেন। এই সমস্ত ডেপুটি মহাত্মা গান্ধী-নীতি গান্ধীবাদ ও গান্ধী ডিক্টেটরশিপে অকৃত্রিম বিশ্বাসী। ইহারা বার্তা বাহক এবং আদেশ প্রতিপালনকারী। উদাহরণ স্বরুপ ভারত কংগ্রেস কমিটি অফিসের স্থায়ী সেক্রেটারী 'আচার্য্য' কৃপালনীর কথা বলা যাইতে পারে। তিনি গান্ধীবাদের একজন শ্রেষ্ঠ বাহক ও ব্যাখ্যাকারী। তিনি “গান্ধীয়ান ওয়ে” শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক। 'কাকা' কালেকারের উপর হিন্দি ও নাগরীর প্রচার সম্পর্কিত গান্ধী কার্যক্রমের ভার অর্পিত হইয়াছে। মিঃ মাশরু ওয়ালার উপর গান্ধী সেবা সঙ্ঘের ভার অর্পিত। মিঃ আর্যনায়কম ও মিঃ কুমারাপ্পা ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাঙলার ডেপুটি গান্ধী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের উপর বাংলার খাদি প্রতিষ্ঠান ও গান্ধী আশ্রমের পরিচালনা ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। বিহারে ডেপুটি গান্ধী হইতেছেন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। তাঁহারা উপর ছাদাকত আশ্রমের পরিচালনা ভার অর্পিত হইয়াছে। সীমান্তে হিন্দু প্রভাব বিস্তার ও পাঠানদের সামরিক প্রতিষ্ঠা নষ্ট করার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গাফফার খান। হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে যাহারা বিভোর পাঠানেরা তাহাদের ভীতি স্বরুপ (উল্লাস)। তাঁহার উপর সীমান্ত প্রদেশে গান্ধী আশ্রমের পরিচালনা ভারও অর্পিত হইয়াছে। সর্দ্দার প্যাটেল হইতেছেন গুজরাট ও বোম্বাইয়ের ডেপুটি গান্ধী। শঙ্কর রাও দেও হইতেছেন মহারাষ্ট্রের উপগান্ধী, ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া হইতেছেন অন্ধ্র প্রদেশের ডেপুটি গান্ধী ইত্যাদি।

হিন্দু কংগ্রেসের ফ্যাসিষ্ট নীতি

ইহা আমার নিজের কথা নহে। কংগ্রেসের ত্রিপুরা অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি আপনাদের সমক্ষে প্রমাণ স্বরুপ উপস্থিত করিতেছি। আমি চাই জনসাধারণ ব্যাপারগুলি অনুধাবন করিয়া নিজে নিজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হউক। অভ্যর্থণা সমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দ দাস ঘোষণা করেনঃ

“আমাদের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ইতালীর ফ্যাসিষ্ট পার্টির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যদিও তাহারা হিংসানীতি অবলম্বন করিয়াছে আর আমরা অহিংসনীতি অবলম্বন করিয়াছি। ইতালীর সকল অধিবাসীই ফ্যাসিষ্ট নহে, জার্মান

www.icsbook.info

জনসাধারণের সকলেই নাৎসী নহে, কিম্বা সকল রাশিয়ানই কম্যুনিষ্ট নহে। রুশদের স্ব স্ব পার্টির প্রতি আস্থা আছে। প্রত্যেক ভারতবাসীই কংগ্রেসের চারি আনার সদস্য নহে, তথাপি সকল ভারতবাসীই কংগ্রেসের সমর্থক। ফ্যাসিষ্টদের নিকট মুসোলিনী, নাৎসীদের নিকট হিটলার এবং কম্যুনিষ্টদের নিকট স্ট্যালিনের যেরূপ মর্যাদা কংগ্রেসীদের নিকট মহাত্মা গান্ধীরও সেইরূপ মর্যাদা। বর্তমান কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীরই সৃষ্টি।"

হিন্দু কংগ্রেসের চালবাজী

ভারতের এই প্রতিষ্ঠানটি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ শুনাইয়া আসিতেছি যে মোছলেম লীগ একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। সুপরিকল্পিত পন্থায়-সঙ্ঘবদ্ধভাবে হিন্দু নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছায় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া দুইটি জাতির মধ্যে মীমাংসার সমস্ত আশা ভরসা নির্মুল করিয়া দিয়াছেন। আর এক্ষণে তাঁহারা নিজদিগকে জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রবাদী বলিয়া জাহির করিতেছেন। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, ইহাকেই কি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বলা হয়? (না না ধ্বনি)। গত ২৫ বৎসরে আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহার ফলে এবং সুদৃঢ় প্রমাণকে ভিত্তি করিয়া আজ আমরা এই "না" ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারিতেছি। তাঁহারা জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের বড়াই করেন। হয় তাঁহারা ইহা বুঝিতে পারেন না, না হয়, তাঁহারা কপট। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র এদেশে মানাইবে না-ইহার অর্থ কি তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না? আমরা তাহাদের বলিঃ গণতন্ত্রের বুলি কপচাইয়া আপনারা শুধু কপটতাই প্রদর্শন করিতেছেন। আপনাদের গণতন্ত্রের অর্থ হিন্দুরাজ। আপনারা চান সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য সকল দিক দিয়া অন্য একটা জাতির উপর আধিপত্য করিতে। আপনারা হিন্দু জাতীয়তা ও হিন্দুরাজ কায়েম করার জন্য অপচেষ্টা করিতেছেন।

গণতান্ত্রিক মুছলমান

আমরা ১৩ শত বৎসর পূর্বে গণতন্ত্রের ছবক গ্রহণ করিয়াছি (হর্ষধ্বনি)। ইহা আমাদের রক্তের সহিত বিজড়িত হইয়া আছে। ইহা মরু প্রদেশের ন্যায় হিন্দু সমাজ হইতে বহু দূরে রহিয়াছে। হিন্দুরা বলেন আমরা গণতান্ত্রিক নই। কিন্তু আমরাই সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা করিয়াছি। এক শ্রেণীর হিন্দু অন্য শ্রেণীর স্পর্শ করা পানি পান করে না। ইহারই নাম কি গণতন্ত্র? ইহাই কি সাধুতা? আমরা গণতন্ত্র চাই। কিন্তু যে গণতন্ত্রের ফলে সমগ্র ভারত-গান্ধী আশ্রমে পরিণত হইবে সেই রূপ গণতন্ত্র আমরা চাই না (উচ্চ হর্ষধ্বনি)। এইরূপ গণতন্ত্রে একটি সমাজ বা জাতি স্থায়ী সংখ্যাগুরুত্বের জোরে অন্য একটি স্থায়ী সংখ্যালঘু সমাজ বা জাতিকে এবং উহার নিকট যাহা প্রিয় তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। আমি হিন্দুদিগকে বলি এইরূপ ভাবগতি পরিহার করুন। আপনারা আপনাদের শয্যা

www.icsbook.info

রচনা করিয়াছেন। আপনারা ইহাতে শয়ন করিতে পারেন। আপনারা আপনাদের হিন্দু জাতীয়তাবাদ লইয়া থাকুন। আমাদের গণতন্ত্র আপনারা প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করুন। যদি পারেন, আপনারা আপনাদের হিন্দুস্তান গঠন করুন। আমি আপনাদরে সাফল্য কামনা করি। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত একজন মুছলমানের দেহেও প্রাণ থাকিবে ততদিন পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এই হিন্দুরাজ কায়েম হইতে দিব না। আইরিশ জাতীয়তাবাদী নেতা রেডম্যান আলস্টার নেতা কার্সনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, "দেখুন, আমরা কি কোন রকম মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি না? আপনারা আয়ারল্যান্ড হইতে পৃথক হইতে চান কেন? ভাবিয়া দেখুন, আলস্টার এবং আয়ারল্যান্ডবাসীদের মধ্যে ১০ লক্ষ ভাগের একভাগ বিভিন্নতাও নাই।" কিন্তু কার্সন কি উত্তর দিয়াছিলেন? "আমি আপনার শাসনাধীনে থাকিতে চাই না।" মিঃ গান্ধীর নিকটও আমার জওয়াব এই-"আমি আপনার শাসনাধীনে থাকিতে চাই না।" (উল্লাসধ্বনি)।

মীমাংসার জন্য আন্তরিকতা

এই তো হইল অবস্থা। আমি আবেদন জানাইতেছি, আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর হিন্দু ভারতের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিবে কিনা জানি না। তবুও আমি তাঁহাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি- 'এই ভাবগতি পরিহার করুণ।" আপনারা এই দেশের লোকের স্বাধীনতা কামনা করেন। কিন্তু আপনারা ব্যর্থ হইয়াছেন। আল্লাহ্কে ধন্যবাদ যে, আপনারা ব্যর্থ হইয়াছেন। চলুন আমরা ঐ অধ্যায়ের উপর যবনিকাপাত করি। যে সকল সৈন্যবাহিনী পরস্পরের লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিহত করিয়া থাকে, তাহারাও বন্ধুভাবে পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হয়। আমরা এখনও ঐরুপ করি নাই। ইহাই রাজনীতি। আমি হিন্দু জনগণের নিকট এই আবেদন জানাইতেছি, আপনাদের নেতৃবৃন্দ যদি ভুল পথে গিয়া থাকেন- আমি বলি তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন- আর আপনারা যদি তাহা অনুমোদন না করেন, তবে আপনাদের কর্তব্য আগাইয়া আসা এবং নেতৃবৃন্দের নিকট এই দাবী জানানো- 'এই পরস্পর বিধ্বংসী সংগ্রামে ক্ষান্ত হউন এবং সন্ধি স্থাপন করুন। চলুন, পরস্পরকে সমান জ্ঞানে একত্রে সম্মিলিত একটা মীমাংসায় উপনীত হই।' ইহাই হইতেছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি করিয়া এই কথা বলেন যে, ব্রিটিশই আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। অবশ্য আমিও ব্রিটিশের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতেছি না (হর্ষধ্বনি)। আমি পরে তাহাদের সম্পর্কে কিছু বলিব। আমি আমার দেশবাসীকেও বুঝাইতে চাই যে, আমাদের মধ্যে মিটমাট হইয়া যাক ব্রিটিশ তাহা চাহে না এইরূপ অভিযোগ করিয়া লাভ কি? অবশ্য একথা আমি স্বীকার করি যে, ব্রিটিশ আমাদের নির্বুদ্ধিতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখার জন্য ব্রিটিশ যে ফন্দী ফিকির

www.icsbook.info

করিতে পারে তাহার চেয়ে আমাদের ফন্দী ফিকিরই শ্রেয়ঃতর (উল্লাস)। ভেদনীতিই ভারতের ব্রিটিশ শাসনের মূলমন্ত্র এই তথ্যের সহিত পরিচিত থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন ঐক্যবদ্ধ হইয়া ব্রিটিশকে তাড়াইয়া দিই না? আমি বলি, বিশ্বের অন্যান্য জাতির নিকট আবেদন জানাইয়া কোন ফল হইবে না (উল্লাস)। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি - আমাদের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ব শাসনধিকারের দাবীর প্রতি সহানুভূতিই মাত্র প্রদর্শন করিতে পারে। কাজেই আমাদের নিজেদের সমস্যা মিটাইবার জন্য অন্যান্য জাতির নিকট আবেদন জানাইয়া লাভ কি? অন্যেরা কি করিয়া ইহা করিবে? তাহারা এদেশে আসিয়া শাসন কার্য চালাইয়া যাইবে? আপনাদের পার্লামেন্টের কাজ যথাযথভাবে চলিতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য আপনাদের পার্লামেন্টে আমেরিকার প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে কি? আপনাদের আইন সভাগুলি সঠিকভাবে কার্য চালাইয়া যাইতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করার জন্য অন্য কোন দেশ হইতে সদস্য প্রেরণ করা হইবে কি? যদি তাই তাহারা করে তবে আমরা যেই তিমিরে আছি, সেই তিমিরেই থাকিব। আপনাদের প্রতিনিধিগণ এবং আপনাদের মন্ত্রীসভাই কাজ চালাইবে। কাজেই আমি বলি, আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার আমাদেরই উপর।

ক্রীপস্ প্রস্তাব ও পন্ডিত নেহেরুর কেরামতি

এইবার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করিতেছি। সম্রাটের গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস ভারতে যে প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন তৎসম্পর্কে আমাদের প্রস্তাবের অধিক আমি আর কিছু বলিব না। এলাহাবাদ অধিবেশনের পর লীগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আপনারা তাহার কারণ অবগত আছেন। ঐগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া আমি আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাই না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে ক্রীপস প্রস্তাব আমাদের এবং কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য হয় নাই। মিঃ গান্ধীর সর্বশেষ বক্তৃতা হইতেও পরিস্কার বোঝা যায় যে তিনি শুধু পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরোধীই নহেন, পরন্তু ইহাকে 'পাপ' বলিয়াও গণ্য করিয়াছেন। ইহার চেয়ে কঠোর শব্দ আর কি হইতে পারে? লক্ষ্য করুন - 'অপরাধ নহে 'পাপ'। অর্থাৎ আপনারা যদি পাকিস্তানের নাম মুখে আনেন, তবে আপনাদের ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে। এইরূপ প্রকাশ করা যায় যে ক্রীপস প্রস্তাব কংগ্রেসের গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ক্রীপস এবং কংগ্রেসের মধ্যে কি ঘটিয়াছিল তাহা আমি অবগত নহি। তবে জনসাধারণ্যে এইরূপ প্রকাশ করা হয় যে, প্রথমতঃ প্রতিষেধাধিকার এবং দ্বিতীয়তঃ দেশরক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে মতানৈক্যের জন্যই ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। যাত্রা হউক, ক্রীপস এবং কংগ্রেসের মধ্যে যখন এ বিষয়ে বিতর্ক চলিতেছিল, তখন পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহেরু লিখিত একটি প্রবন্ধ বেতারযোগে আমেরিকায় প্রেরিত

www.icsbook.info

হয়। ১৯৪২ সনের ১৯ তারিখের "নিউ ইয়র্ক টাইমস" - এ উহা প্রকাশিত হয়। উহাতে তিনি বলিয়াছেনঃ

"৩০ বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতে ধর্মীয় ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করেন। ইহা একটি মারাত্মক জিনিস। এক্ষণে পুনরায় ভারতকে শুধু দুই ভাগেই বিভক্ত করা নহে, সম্ভবত বহু অংশে বিভক্ত করার পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছে। এই কারণেই ক্রীপস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এমন বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ইহা মানিয়া লইতে পারে না।' প্রতিষেধাধিকার অথবা দেশরক্ষার প্রশ্ন - না, পাকিস্তান পরিকল্পনাই কংগ্রেস রাজি হইতে পারে নাই বলিয়া- ইহা ক্রীপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে? এই দেশে এক রকম ব্যাখ্যা করা হয় এবং আমেরিকায় অন্য রকম ব্যাখ্যা করা হয় (উল্লাস) আমেরিকানরা নিজেরাও প্রচারবাগীশ। কিন্তু তাঁহাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, প্রচারণায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চেয়ে আর কেহই অধিক কেরামতি দেখাইতে পারিবে না।

আইন অমান্য আন্দোলন

এইবার "ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের প্রসঙ্গ তোলা যাক। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নহে, মাত্র বাক্যের স্বাধীনতার জন্য ইহা আরম্ভ করা হয়। কিন্তু কোন রকমের বাক্যের স্বাধীনতা? যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রচারণা চালাইবার জন্য বাক্যের স্বাধীনতা?" আমার মনে হয় এখানে যদি আমাদের নিজস্ব গভর্ণমেন্টও প্রতিষ্ঠিত থাকিত; তাহা হইলে দেশের সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানও যদি ইহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইবার চেষ্টা করিত, তবে আমি ঐ সকল ব্যক্তিকে জেলে প্রেরণ করিতাম। বৈদেশিক গভর্ণমেন্ট তো দূরের কথা যে কোন গভর্ণমেন্ট এই সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনে অনুমতি দিবেন কি করিয়া এইরূপ আশা করা যাইতে পারে? (হর্ষধ্বনি) এখন এই আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা যাক। প্রকৃতই বাক্যের স্বাধীনতার জন্য কি ইহা আরম্ভ করা হয়, না যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি এবং তাঁহাদের দাবী স্বীকারে বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে বাধ্য করার জন্য ইহা আরম্ভ করা হয়? ইতিমধ্যে মিঃ গান্ধী বলিতেছিলেন যে, 'তিনি কখনো আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবেন না। কারণ, তাহা মারাত্মক হইবে। লক্ষ্য করুন মিঃ গান্ধী বলেন যে, মোছলেম লীগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কখনো আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিবেন না। গত ২২ বৎসর যাবৎ তিনি বলিয়া আসিতেছিলেন যে হিন্দু মোছলেম ঐক্যই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য এবং হিন্দু মোছলেম ঐক্য ছাড়া দেশের স্বাধীনতাও আসিবে না। কিন্তু গত বৎসর জুলাই মাসে তিনি যখন একটা সম্পূর্ণ নতুন পন্থা নির্ধারণ করেন, তখন মোছলেম লীগকে উপেক্ষা করা

www.icsbook.info

মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। হিন্দু মোছলেম ঐক্য ছাড়া কোন স্বরাজ, কোন স্বাধীনতা আসিবে না।

গত ২২ বৎসরের এই মত তিনি বদলাইয়া ফেলেন। ৮ই আগস্ট তারিখের প্রস্তাবে মিঃ গান্ধী যখন তাঁহার নীতি ও কার্যক্রম সন্নিবেশিত করেন, যখন সহসা গত ২২ বৎসরের মত হাওয়ায় উড়িয়া যায়। ইহা কি? ইহা হইল - "ভারত ত্যাগ কর" বুলি। বাড়াবাড়িটা লক্ষ্য করুন। মিঃ গান্ধীর ভাবখানা এই - "এই দেশের ১০ কোটি মুসলমান কি বলে তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ করিও না। আমার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণে এই গভর্ণমেন্টকে আমি বাধ্য করিতেছি।" আর এদিকে ব্রিটিশ বলেন, "কংগ্রেসকে প্রতিরোধ করিয়া আমরা তোমাদিগকে রক্ষা করিতেছি। কারণ আমরা যদি কংগ্রেসের দাবীতে আত্মসমর্পণ করি তবে তোমাদেরই বিপদ ঘটিবে এবং স্বার্থহানি হইবে।" কিন্তু মুছলমানেরা বলেনঃ "তোমরা আমাদিগকে এত ভালবাস বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।" আমরা জানি এইরূপ বলিলে তাঁহাদের সুবিধা হয়। তাঁহারা পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন। কারণ তাঁহারা জানেন যে হিন্দু ও মুছলমানের মধ্যে যদি আপোষ মীমাংসা হইয়া যায় তবে তাঁহারা ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হইবেন। তাঁহারাও ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজি আছে, কিন্তু আমরা ঐক্যবদ্ধ হইতে চাহিতেছি না। ভারতের ঐক্য রক্ষা করিয়া যদি ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব। হয় ভারতকে বিভক্ত করিয়া লইলেও ইহা লাভ করিতে হইবে। (হর্ষধ্বনি)

গভর্ণমেন্টের সুবিধাবাদ নীতি

আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর 'যদি হিন্দু' জনগণের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তবে তাহারা সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া দেখুক আমি সত্য বলিতেছি না, অসত্য বলিতেছি। আমি যথার্থ আন্তরিকতার সহিতই বলিতেছি। ব্রিটিশের বিশ্বাস এই যে হিন্দু ও মুছলমানের মধ্যে কখনও মিলন হইবে না। কোনক্রমে যদি মীমাংসা হয়ও তবে যুক্ত ভারতের ছত্রতলে কোন্দলেরই ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে। আর ইহার চূড়ায় অবস্থান করিবেন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, প্রায় একশত বৎসর যাবৎ এই বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়াই এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ নীতি পরিচালিত হইতেছে। কাজেই সূক্ষ্মদর্শী, ব্রিটিশ, যুক্ত গণতান্ত্রিক ভারতকে ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের নীতি পরিচালিত করিয়াছেন। আমি মনে করি, এখনও তাঁহারা এই নীতি বর্জন করেন নাই। ব্রিটিশেরা জানেন যে, তাঁদের মধ্যস্থতা ব্যতীত আমরা কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারিব না। আপনারা যখন বিবাদ করিয়া একে অন্যের মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন তখন বানর আসিবে দুই বিড়ালের বিবাদ মীমাংসা করিতে (হাস্য)। এই কারণেই আজ যাঁহারা দৈবক্রমে ভারত গভর্ণমেন্টের শীর্ষদেশে অবস্থান করিতেছেন সেই বিরাট পুরুষ লর্ড লিনলিথগো এবং তার সচিব মিঃ আমেরী

www.icsbook.info

ভৌগলিক হিসাবে ভারত এক- এইরূপ বলিয়া গর্দভের সম্মুখে গাজার দোলাইতেছেন। লন্ডনের সেই মহাপুরুষ সহসা আবিস্কার করিয়া বসিলেন যে আকবরের আমলেও ভারত ঐক্যবদ্ধ ছিল (হাস্য)। বাস্তবিক তাঁহারা উভয়েই ছিলেন খেলোয়াড়।

বন্ধুগণ! হিন্দুদের বিরুদ্ধে আমার কোন দুরভিসন্ধি নাই। আপনারা জানিয়া রাখুন কোন অলৌকিক উপায়ে ঐক্যবদ্ধ ভারতের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুছলমান যদি কোন শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হয়ও তবে ব্রিটিশ ভারতেই তাহা হইবে কিন্তু এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইবে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ, এইরূপ আরো বহু বাধা রহিয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা

প্রায় একশত বৎসর যাবৎ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই নীতির অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা আমাদিগকে কেবল প্রগতি হইতেই দূরে রাখেন নাই পরন্তু বিপথেও চালিত করিয়াছেন। আর বিভ্রান্ত হইবেন না। আমি হিন্দুদিগকে বলি- ব্রিটিশ অন্যের চেয়ে ভাল করিয়াই জানেন - পাকিস্তান আমার জীবদ্দশাতেই আসুক বা উহার পরেই আসুক (আসিবেই-ধ্বনি), ইহাই ভারতেই হিন্দু ও মুছলমানদের স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা।

কোন কোন জাতি পরস্পরের লক্ষ লোক হত্যা করিয়াছে। কিন্তু ইহা স্থায়ী নহে। আজ যে দুশমন, কাল সে বন্ধু হইতে পারে। ইহাই তো জীবন, ইহাই তো ইতিহাস।

দায়ী কে?

অতীব দুঃখের বিষয়, কংগ্রেস ও হিন্দু নেতৃবৃন্দই হিন্দু ও মুছলমান উভয়ের স্বাধীনতার পথে বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের মনোভাব সুস্পষ্ট- আমি হিন্দু জনসাধারণ ও হিন্দু নেতৃত্বের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। আপনাদের নীতি সংশোধন করুন। কংগ্রেস জোর মিথ্যা প্রচারণা চালাইতেছে বর্তমানে কংগ্রেসের পক্ষে অধিকাংশ প্রচারণাই চালাইতেছে কম্যুনিষ্ট পার্টি। তাহারা যে সকল আবেদন ও বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহা একান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ।

গান্ধী-প্রস্তাবের অসারতা

সূচনা হইতে ৮ই আগস্ট পর্যন্ত কংগ্রেস-নীতি হইতেছে এই যে, পাকিস্তান দাবীর মূলে কোন যৌক্তিকতা নাই। বড় লাটের সহিত পত্রালাপকালে এই কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি লিখিয়াছেন- "গভর্ণমেন্ট স্পষ্টতঃই এই সত্যটি উপেক্ষা করিয়াছেন যে, আগস্ট প্রস্তাবে কংগ্রেস নিজের জন্য কিছু চায় নাই সমগ্র জাতির জন্যই তাঁহারা দাবী জানাইয়াছে। আপনারা অবগত আছেন যে যুদ্ধকালের জন্য নির্বাচিত পরিষদ সদস্যের নিকট একটি জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠনের ভার কায়েদে

www.icsbook.info

আযম জিন্নার উপর দিতে কংগ্রেস রাজি আছে।" এই হইল মিঃ গান্ধীর ভাষা। এই প্রস্তাবের মোদ্দা কথা হইল এই যে, তিনি চান যথারীতি নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের নিকট দায়ী একটি জাতীয় গভর্নমেন্ট। আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রস্তাব যদি কার্যকরী হয় তবে বাকী থাকিবে কি? লর্ড লিনলিথগো অবিলম্বে নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণর জেনারেল হইয়া পড়িবেন- যদি তাঁহাকে বিস্তারিত নাও করা হয় (হাস্য), ইন্ডিয়া অফিস ও ভারত সচিবের পদ বিলুপ্ত হইবে এবং ভারতের শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনও হাত থাকিবে না। বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া এবং তৎপরিবর্তে অন্য একটি প্রবর্তন করিয়াই মাত্র কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র চালু করা যাইতে পারে, অন্য কোন উপায়ে নহে। আমার যদি ভুল হইয়া থাকে, তবে সংশোধিত হইতে চাই। একবার যদি কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের কাঠামো ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তবে প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের কাঠামো টিকিতে পারে না। তেমন অবস্থায় প্রদেশগুলি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে? এইগুলি কি গভর্নরের শাসনাধীনেই থাকিবে? এই গুলিতে কি বর্তমান শাসনতন্ত্রই চালু থাকিবে? প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট সমূহের পুরোপুরি সংস্কার সাধন করিতে হইব এবং দেশীয় রাজ্যগুলিসহ সমগ্র ভারতের জন্য সম্পূর্ণ নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে হইবে। আমাদিগকে প্রশ্ন করা হয়ঃ তাহাতে দোষ কি? পাকিস্তান পরিকল্পনা স্থগিত থাকিবে মাত্র। ইহার জওয়াব এই যে যেই মুহূর্তে মিঃ গান্ধীর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এই অবস্থা মানিয়া লওয়া হইবে সেই মুহূর্তে পাকিস্তানের দাবী বিনষ্ট হইবে। তারপর মিঃ গান্ধীর প্রস্তাবকে ভিত্তি করিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিতে গেলে যে তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হইবে-এই শাসনতন্ত্র রচনার ভার কাহার উপর অর্পিত তাহা না হয় উল্লেখ নাই করিলাম। এইরূপ শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইলে সন্দেহাতীতরূপে ভারতে হিন্দুরাজ কায়েম হইবে। এই অবস্থা আমরা কখনও মানিয়া লইতে পারি না।

আপোষের জন্য আহ্বান

পাকিস্তানের ভিত্তিতে মিঃ গান্ধী যদি প্রকৃতই এখনও লীগের সহিত আপোষ মীমাংসার জন্য অগ্রনী হন তাহা হইলে আমার অপেক্ষা আর কেহই উহাকে বেশি অভিনন্দিত করিবে না। আমি বলিতেছি সেই দিনটা হিন্দু ও মুছলমান উভয়ের পক্ষেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইবে। আমার নিকট সরাসরি পত্র লিখিতে বাধা কিসের? (হর্ষ)। তিনি বড়লাটের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন, কিন্তু আমার নিকট সরাসরি পত্র লেখেন না কেন? এই কাজে কে বাধা দিতে পারে? বড় লাটের নিকট গিয়া বা ডেপুটেশন পাঠাইয়া কিম্বা তাঁহার সহিত পত্রালাপ করিয়া লাভ কি? আমি এ কথা বলার সাহস রাখি যে এ দেশের গভর্নমেন্ট যত শক্তিশালী হউক না কেন তাঁহার চিঠি আমার নিকট পৌছানোয় তাঁহারা বাধা দিতে

www.icsbook.info

পারিবেন না (উচ্চ হর্ষধ্বনি)।

গভর্ণমেন্ট যদি এইরূপ কিছু করেন তবে ব্যাপার গুরুতর হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মিঃ গান্ধী অথবা কংগ্রেস নীতিতে আমি কোন পরিবর্তনের লক্ষণ দেখিতেছি না।

এতিম রাজনীতিকগণ

আমাদিগকে বলা হয় যে, একটা কিছু করা উচিৎ। কিন্তু আমরা কি করিব? অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। তথাকথিত অদলীয় সম্মেলনে যোগদান করিতে আমাকে অনুরোধ করা হইলে আমি মিঃ রাজগোপালাচারীকে বলিয়াছিলাম যে, আমি উহাতে যোগ দিতে চাই না। তাহার কারণও আমি প্রদর্শন করিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু জীবনে তাঁহাদের কিছুটা প্রতিষ্ঠা আছে, কিছুটা অভিজ্ঞতাও আছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহারা আমাদের বিরুদ্ধবাদী হইতে পারেন। কিন্তু একবার তাঁহারা এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। এই ভদ্রলোকগণ যে প্রস্তাব ও পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন এই সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁহারা তাহা অপেক্ষা অধিক কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু মহান ব্যক্তিরাও ভুল করিয়া থাকেন। মিঃ গান্ধী সব খবরই রাখেন, সংবাদপত্র পাঠ এবং দেশে কি ঘটিতেছে তাহাও জানেন ও বুঝেন। তাঁহার হৃদয়ের যদি পরিবর্তন হইয়া থাকে, তবে তিনি আমার নিকট মাত্র কয়েক ছত্র লিখুন। আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি, অতীতে আমাদের মধ্যে যত রকম বাদানুবাদই হইয়া থাকুক না কেন মোছলেম লীগ এ ব্যাপারে সাড়া দিতে কসুর করিবে না (তুমুল উল্লাস ধ্বনি)।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মনোভাব

এইবার ব্রিটিশের কথা বলিতেছি। তাঁহাদের বুঝা দায়। তাঁহাদের মনোভাব কি? তাঁহাদের মনোভাব এইঃ কংগ্রেস একটি বিদ্রোহী প্রতিষ্ঠান। ইহা রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত। তাঁহারা গভর্নমেন্ট ও সম্রাটের দুশমন। কাজেই তাঁহাদের সহিত কোন কারবার দরবার চলিতে পারে না। কংগ্রেস একটি দল মাত্র। ভারতের অধিকাংশ লোকের সমর্থন কংগ্রেসের পেছনে নাই, তাহারা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক বিবৃতিতে কি বলা হইয়াছে? লন্ডনের সংবাদপত্রসমূহ কি বলেন? "সান্ডে ক্রনিকেল" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছেনঃ "ভারতের সৈন্যদের বীরত্বের প্রশংসা করিয়া প্রধানমন্ত্রী চার্চ্চিল যে বাণী প্রদান করিয়াছেন তাহাতে ব্রিটিশ জাতির মনে সুস্থ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে।" কোথায় সেই সুস্থ প্রতিক্রিয়া? মিঃ চার্চ্চিল অঙ্ক করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভারতের অধিকাংশ লোক কংগ্রেসকে সমর্থন করে না। মোছলেম লীগ প্রসঙ্গে এই বলা যাইতে পারে যে ইহাতে মোটেই সন্দেহ নাই যে আমরা দূরে সরিয়া

www.icsbook.info

রহিয়াছি। খোদাকে ধন্যবাদ আমরা দূরে সরিয়া রহিয়াছি, কারণ আমাদের অবস্থা হইতছে 'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘে'র মত। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি ব্রিটিশের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট নই। তাঁহার বলেন যে, আমাদিগকে এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করিতে তাঁহারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়িতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরে তাঁহারা প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক, এমন কি; ইহার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। খৃস্টমাস সপ্তাহে বড়লাট কলিকাতায় এ ধরনের উক্তি করিয়াছেন। কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া অন্যান্যদের সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কি করিয়াছেন? তাঁহারা বলেনঃ "কংগ্রেসকে কি করিয়া অগ্রাহ্য করা যায়?" এই অবস্থায় তাঁহারা কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, কেহই তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করে না? তাঁহাদের নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারেই তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন যে, কংগ্রেস, সাময়িকভাবে তাঁহাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ও আগ্রহ সাফল্যের সহিত ব্যর্থ করিয়াছে। অথচ কংগ্রেস একটা বিদ্রোহ প্রতিষ্ঠান। এটা তাঁহাদের ব্যর্থতার স্বীকারোক্তি। ভারতের জনসাধারণ হয়তো কংগ্রেসের পশ্চাতে আছে, অথবা নাই। যদি অধিকাংশ লোক না থাকে, দশ কোটি মুছলমান তো নিশ্চয়ই নাই। তখন ভারতকে কি উত্তর দেয়া যায়? তাঁহারা বলেন ঃ "আমরা কিছু করতে পারি না। কারণ এই বিদ্রোহী প্রতিষ্ঠানটি আমাদিগকে অচল করিয়া ফেলিয়াছে। তোমরা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দাও তখন আমরা কেবল তোমাদের প্রশংসা করিতে পারি, আর কিছুই নয়।" ইহা কি সুস্থ মনোবৃত্তির পরিচায়ক? এই মনোবৃত্তি প্রদর্শনের পর কেহ কি এই কথা বিশ্বাস করিতে পারে যে, ক্ষমতা হস্তান্তরে তাঁহার প্রকৃতই ইচ্ছা আছে? আমরা অসংখ্য বার আমাদের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগকে উপেক্ষা করা হয়, আমাদের বলকে উপেক্ষা করা হয়; কারণ ইহাতে তাঁহাদের সুবিধা হয়। পক্ষান্তরে আমাদিগকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করার অপবাদ দেওয়া হয় এবং গভর্নমেন্ট প্রায়ই আমাদিগকে হুমকী দিয়া থাকেনঃ" যাহারা আমাদের পক্ষে নহে, তাঁহারা আমাদের বিপক্ষে।" আমি বলিব, ভারতীয় মুছলমানদের মন তিক্ততায় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিতেছে। আমি পুনরায় ইহার প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পরিস্থিতি বাস্তবিকই খুবই গুরুতর। ভারতের মুছলমানদের প্রতি দুর্ব্যবহার জনিত তিক্ততা ও নৈরাশ্য যে তাঁহাদের পক্ষে বিপজ্জনক (উল্লাস) এই কথা আমি এই মঞ্চ হইতে তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিতেছি। সুতরাং তাঁহরা নিজেদের অবস্থার পুনর্বিবেচনা করুন। আমাদের দাবী কি? তাঁহারা ঘোষণা প্রচার করুন। সুস্পষ্ট ভাষায় মোছলেম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়া এবং ১৯৪০ সনে মোছলেম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবের পন্থানুসারে মোছলেম গণ-ভোটের সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়ার ওয়াদা দিয়া অবিলম্বে

www.icsbook.info

একটি ঘোষণা বাণী প্রচারের জন্য মোছলেম লীগ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছে।

যুদ্ধ প্রচেষ্ট ও মোছলেম লীগ

ভারত রক্ষাকল্পে এবং সাফল্যের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার উদ্দেশ্যে দেশের সমস্ত শক্তি নিয়োগের নিমিত্ত সমানাধিকারের ভিত্তিতে মোছলেম লীগ যে কোন প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে রাজি ছিল, এখনও আছে এবং যে কোন দলের সহিত আলোচনা চালাইতে ইচ্ছুক আছে। ১৯৪২ সনের ২০শে আগস্ট তারিখে বোম্বাইয়ে এই প্রস্তাব গ্রহীত হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত ইহাকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এই যুদ্ধে আমাদিগকে দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি; এবং এখনো বলি; আমাদের মতামত যাহাই হউক না কেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, ভারতবর্ষ যুদ্ধের সম্মুখীন। কোন না কোন ছল-চাতুরীতে, কায়দা কৌশলে ও ছুঁতো-নাতায় আমাদিগকে শুধু নিঃসহায় দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে বাধ্য না করার ব্যাপারে কাহার বেশী স্বার্থ আছে? ব্রিটিশের, না আমেরিকা এবং অন্যান্য সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের কিম্বা আমাদের? তাঁহারা মস্তবড় ভূল করিতেছেন। তাঁহারা এখনও বিপদমুক্ত হন নাই। আমি পূর্বেই বলিয়াছি এখনও বলি যুদ্ধে হার হইলে আমাদের মার্কিন বন্ধুরা নিউইয়র্ক কিম্বা শিকাগো এবং ব্রিটিশেরা লন্ডনে যাইতে পারিবেন। আমি আরো বলিতে পারি যে, তাঁহাদের দেশ হিটলার, মুসোলিনী বা মিকাডোর পদানত হইবে না। ঐ কথা আমি চিন্তা করিতে পারি না। যুদ্ধের পরে আমেরিকা দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইতে পারে। ইহা একটা বিপদ বটে। কিন্তু তাঁহাদের বিপদ এইরূপ নহে যে, তাঁহাদের দেশ বৈদেশিক শক্তির পদানত হইয়া পড়িবে। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি' তাহা এইঃ আমরা যদি পরাজিত হই তবে জাপান অথবা হিটলার আসিবে এবং আমরা হিটলার বা তোজোর পদানত হইব। আমাদের শিকাগোও নাই। আমাদের কি হইবে? দেশরক্ষা ও যুদ্ধ পরিচালনের ব্যাপারে কাহার আগ্রহ ও স্বার্থ বেশি? আমরা অসহযোগিতা করিতেছি, একথা বলা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্পূর্ণ অন্যায় এবং আমরা সহযোগিতা করিতেছি না- একথা বলা আরো অন্যায়। মোছলেম লীগ বলিতেছেঃ আমরা তোমাদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারি না, কারণ তোমরা আমাদিগকে অন্ধ অনুসারী হইতে বলিতেছ। তদ্বারা আমরা কি লাভ করার আশা করিতে পারি? আমাদের অর্থ, শোণিত ও অন্যান্য সব কিছুর পরিবর্তে যুদ্ধ জয়ের পরে আমরা কি ফল লাভ করিব? আমরা যদি পরাজিত হই তবে জাপান বা জার্মানী আসিবে। যদি আমরা জয়ী হই তবে অন্ধ অনুসারী হইতে হইবে এবং তাহার পরিবর্তে কিছু বখশিশ পাইব। ইহা দ্বারা কি সহযোগিতা করার উৎসাহ পাওয়া যায়? আত্মসম্মান জ্ঞান

www.icsbook.info

সম্পন্ন বা সংঘবদ্ধ কোনও জাতি কি এইরূপ অবস্থা স্বীকার করিয়া লইতে পারে? (না, না, ধ্বনি) ইহাই দৃশ্যপট। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ভুল করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, কিম্বা ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে চান না এবং জুয়া খেলোয়াড়ের ন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেনঃ "যদি আমরা জয়ী হই, তবে তাহারা এখন যেখানে আছে তাহাদিগকে সেখানেই রাখিব; আর যদি আমরা পরাজিত হই, তবে আমাদের পরে সর্বনাশ আসিবে।"

পাকিস্তান ও ইয়েটস ব্রাউন

আমি পাকিস্তান সম্পর্কে আর অধিক কিছু বলিতে চাই না। পাকিস্তান কি তাহা বুঝিতে কষ্ট হওয়ার কারণ নাই। বহির্ভারতের লোকেরাও ইহা বুঝিয়াছে। মেজর ইয়েটস ব্রাউন তাঁহার নতুন গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

"মুছলমানের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমাদিগকে সমস্যা অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে।"

নিম্নে তাঁহার গ্রন্থ হইতে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা হইলঃ

"মুছলমানের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আমাদিগকে সমস্যাটা অনুধাবন করিয়া দেখিতে হইবে। কোন বিশ্বকল্যাণকামী অতিমানব অথবা কোন সর্বোচ্চ গভর্নমেন্ট যদি নির্দেশ জারি করেন যে, কোন নিখিল ইউরোপীয় গভর্ণমেন্টের শাসন কর্তৃত্বে আমাদিগকে চলিতে হইবে (অবশ্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থাসহ) এবং এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে নিউটন জাতি কিম্বা শ্লাভরাই হইবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জাতি, কারণ আমরা ইউরোপে সংখ্যালঘু-তাহা হইলে আমরা ব্রিটিশরা নিশ্চয়ই বেদনাবোধ করিব। তিনি আরো বলেনঃ এই সর্বোচ্চ গভর্ণমেন্ট যদি অসীম ক্ষমতার অধিকারী অতিমানবদের সমবায়ে গঠিত হয়, তবুও দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করার মত ক্ষমতা অর্জন না করা পর্যন্তই মাত্র আমরা ইহার আণুগত্য স্বীকার করিয়া চলিব। অতিমানবগণ নিজেদের সিদ্ধান্তেই সন্দেহ পোষণ করিতেছেন-এমন লক্ষণ যদি পরিস্ফুট হইয়া উঠে তবুও যদি তাঁহারা দুনিয়ায় এইরূপ প্রচার করিতে থাকেন যে, তাঁহারা সমগ্র ইউরোপের স্বাধীনতা দিয়াছেন এবং সেই জন্য আমাদিগকে আমাজের নিজস্ব সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে তবে মোছলেম লীগের ন্যায় আমরাও ঘোষণা করিব যে, এইরূপ স্বাধীনতা একটা প্রহসন মাত্র।"

"অতিমানব" মিঃ গান্ধী চান অখন্ড হিন্দুস্তান। কিন্তু মোছলেম ভারত এই দাবী মানিয়া লইতে পারে না, লইবেও না ইংরেজগণ তখন কি বলিবে? তখন কি তাহারা বলিবেঃ "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের অস্তিত্ব থাকিবে না। আমরা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করি, আমাদের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি মাত্র। নিউটনরা আমাদের ভাই! জার্মানদের সংখ্যা ৮ কোটি। যদি প্রস্তাব করা হয়, তাহাদের সকলের জন্য

www.icsbook.info

মাত্র একটি গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, তবে ইউরোপীয়গণ কি রাজি হইবে। একজন ইংরেজ এবং একজন জার্মানের মধ্যে পার্থক্য কি? তাহারা সকলেই খৃষ্টান। তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদেও পার্থক্য নাই। তাহাদের ক্যালেন্ডারও একই। তাহাদের ভাষা, ব্যবস্থা বিজ্ঞান ও কৃষ্টির মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তাহাদের স্থাপত্য, শিল্প, সঙ্গীত, শাস্ত্র ও সভ্যতার মধ্যেও পার্থক্য নাই। যদি প্রস্তাব করা হয় যে, কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই ফেডারেল গভর্নমেন্টের শাসনাধীনে থাকিবে এবং কানাডা ইহার একটি ইউনিটে পরিণত হইবে তবে ইংরেজরাই বা কি বলিবে, আর কানাডিয়ানরাই বা কি বলিবে? তারপর উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা কি হইবেঃ ভৌগলিক হিসাবে আমেরিকা একক, অনুরূপভাবে ইউরোপ ও এশিয়া। এইরূপ পরিকল্পনা যদি স্থির করা হয় তবে তাহারা কি বলিবে? কাজেই মেজর ব্রাউন ঠিকই
বলিয়াছেন, মুছলমানের দৃষ্টিকোণ লইয়া সমস্যাটা তলাইয়া দেখিতে হইবে। গভর্নমেন্ট যদি অসীম ক্ষসতা ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী অতিমানবদের সমবায়েও গঠিত হয় তবুও দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করার মত শক্তি অর্জন না করা পর্যন্তও আমরা ইহার আনুগত্য স্বীকার করিব না। মোছলেম লীগ এইরূপ স্বাধীনতাকে একট প্রহসন বলিয়া মনে করিবে (হর্ষ ও উল্লাস)।

হিন্দু পরিকল্পিত স্বাধীনতা

হিন্দু নেতৃবৃন্দের ইহা বুঝা উচিৎ; তাঁহারা আমাদিগকে যে স্বাধীনতা দিতে চান তাহা তাঁহাদেরই পরিকল্পিত। ইহার কাঠামো ঠিক করিবেন তাঁহারাই, আর শাসন কর্তৃত্ব থাকিবে তাঁহাদেরই হাতে। এইরূপ স্বাধীনতা একট প্রহসন মাত্র (হর্ষ)। প্রথমতঃ আমাদিগকে ভিত্তি ঠিক করিতে হইবে। আমার মনে মোটেই সন্দেহ নাই যে, পাকিস্তানে জনগণের গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন। শক্তি প্রয়োগ করিয়াই হউক, বা আপোষ-মীমাংসার সাহায্যেই হউক, বৈদেশিক জাতির নিকট হইতেই হউক; বা আমাদের নিজেদের গভর্নমেন্টের নিকট হইতেই হউক; আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা লাভ করিতে না পারিয়াছেন ততক্ষণ পর্যন্ত শাসনতন্ত্র এবং গভর্নমেন্টের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠে না। ফরাসী বিপ্লবের দৃষ্টান্তই উল্লেখ করা যাক। যে পার্টি তদানীন্তন গভর্নমেন্টকে ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল, প্রথম সে পার্টিকে দেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া পরে গণপরিষদ গঠন করিতে হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার কথা ধরা যাক। সেখানে আপোষ মীমাংসার দ্বারাই কার্যসিদ্ধি করা হয়। ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইব-প্রথমত এই ব্যাপারে আমাদিগকে একমত হইতে হইবে। ইহার পর শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। জনগণই শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবে।

www.icsbook.info

সুতরাং আমি মনে করি, অতি সাধারণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। পাকিস্তানে দুই আনা যাহারা ট্যাক্স দিবেন তাঁহাদের কিম্বা প্রাপ্ত বয়স্ক সকলেরই ভোটাধিকার থাকিবে। শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানে আপনারাই আপনাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করিবেন। আপনারা আপনাদের ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ না থাকিতে পারেন; এই ক্ষমতার ব্যবহার কি করিয়া করিতে হয় তাহাও আপনারা জ্ঞাত না থাকিতে পারেন। ইহার জন্য দায়ী হইবেন আপনারাই। তবে আমি নিশ্চিত যে, গণতন্ত্র আমাদের দেহ শোণিতের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। ইহা আমাদের অস্থিমজ্জায় বিজড়িত রহিয়াছে। কয়েক শতাব্দীর প্রতিকূল অবস্থার ফলে আমাদের সেই রক্ত চলাচলের গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। ইহা জমিয়া গিয়াছে এবং আমাদের ধমনীও স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আল্লাহকে ধন্যবাদ, মোছলেম লীগের প্রচেষ্টায় পুনরায় সেই রক্ত আমাদের ধমনীতে রহিতেছে। পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হইবে জনগণের গভর্নমেন্ট।

ধনতন্ত্রবাদের নিন্দা

একটা অতি জঘন্য ও কুৎসিৎ প্রথা অবলম্বনে আমাদের সর্বনাশ করিয়া যেসব জমিদার ও পুঁজিবাদী লোক ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি। তাঁহারা এত স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের নিকট যুক্তি তর্ক উত্থাপন করাও কঠিন (তুমুল হর্ষধ্বনি)। জনগণকে শোষন করার প্রবৃত্তি তাঁহাদের রক্তের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা এছলামের শিক্ষা ভুলিয়া গিয়াছেন।

পরের ধনে নিজেদের ভূঁড়িকে ফাঁপাইয়া তোলার উদ্দেশ্যে, লোভ ও স্বার্থপরতা বশতঃ এই সমস্ত লোক অন্যের স্বার্থকে গৌণ বলিয়া মনে করেন। ইহা সত্য যে, আমাদের হাতে ক্ষমতা নাই। আপনারা পল্লী অঞ্চলে যাইয়া দেখুন। আমি কতকগুলি গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছি। আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক দৈনিক একবেলাও আহার করিতে পায় না। এই কি সভ্যতা? ইহাই কি পাকিস্তানের লক্ষ্য? (না, না ধ্বনি)। আপনারা কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমাদের লক্ষ লক্ষ লোককে শোষণ করা হইয়াছে? তাহারা দৈনিক একবেলাও খাইতে পায় না।

পাকিস্তানের পরিণতি যদি তাহাই হয় তবে সে পাকিস্তান নিশ্চয়ই আমার কাম্য নয় (হর্ষধ্বনি)। এই সব জমিদার ও পুঁজিবাদী লোক যদি বুদ্ধিমান হন, তবে আধুনিক জীবন ধারার সাথে তাঁহাদিগকে

নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। যদি তাঁহারা তাহা না করেন, তবে খোদা তাঁহাদের সহায় হন-আমরা কিছুতেই তাঁহাদিগকে সহায়তা করিব না

www.icsbook.info

(শুনুন, শুনুন, পুনঃ পুনঃ পুনঃ হর্ষ ও উল্লাসধ্বনি)। আমাদিগকে আমাদের নিজেদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। আমাদিগকে ইসস্ততঃ ও দ্বিধাবোধ করিলে চলিবে না। পাকিস্তানই আমাদের আদর্শ আমরা ইহা লাভ করিতে যাইতেছি (হর্ষধ্বনি)। মিল্লাত ও জনসাধারণই ইহার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে। আপনারা নিজেদেরকে প্রস্তুত করিয়া তুলুন এবং মনের মত করিয়া একটি শাসনতন্ত্র রচনা করুন। বহু ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। পাকিস্তানে কি এছলামিক গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে? জনগণের সিদ্ধান্ত অনুসারেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইবে। একমাত্র সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে।

সংখ্যালঘু সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়ার অধিকারী। অন্যথায় তাহারা প্রশ্ন করিতে পারেঃ "আপনাদের পরিকল্পিত পাকিস্তানে আমাদের অবস্থা কি হইবে? কাজেই তাহাদিগকে সুস্পষ্টভাবে একটা সুনির্দিষ্ট আশ্বাস দিতে হইবে। আমরা তাহা দিয়াছিও। আমরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি। উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে, সংখ্যালঘুদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, তাহাদের জন্য পুরোপুরিভঅবে রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলি, যে কোন সভ্য গভর্নমেন্ট তাহা করিবে এবং করাও উচিত। ইছলামের ইতিহাসে সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে যে, অমুছলমানদের সহিত কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ ব্যবহারই করা হয় নাই তদুপরি তাহারা উদার ব্যবহারও লাভ করিয়াছে (হর্ষ ও উল্লাস ধ্বনি)।

মিথ্যা প্রচারণা

আমি পাকিস্তান সম্পর্কে আর একটি কথা বলিতে চাই। তাহা হইতেছে এইঃ একটা নতুন ধরণের প্রচারণা চলিতেছে। গো-মাতাকে দ্বিখন্ডিত করা, ভারত মাতাকে দুইভাগ করা ইত্যাকার দুষ্ট প্রচারণা চলিতেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। কিন্তু সর্বশেষ প্রচারণাই হইতেছে সর্বাপেক্ষা কুৎসিৎ ও জঘন্য। তাহা হইতেছে এইঃ মিঃ জিন্নাহ উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে অংশের নিজস্ব সর্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা করিতেছেন তাহা হইতেছে পাক আর বাকীগুলি 'না-পাক'। বহু মহলে এইরূপ মন্তব্য শুনিয়াই আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। মিথ্যা প্রচারণার ফল কি তাহা আপনারা জানেন। আমরা যখন লাহোর প্রস্তাব গ্রহণ করি তখন 'পাকিস্তান' শব্দটি ব্যবহার করি নাই। কাহার নিকট হইতে আমরা এই শব্দটি পাইয়াছি? ('হিন্দু,' 'হিন্দু' ধ্বনি)। আমি বলিতেছি ইহার জন্য দায়ী তাহারাই। পাকিস্তান নামে অভিহিত করিয়া তাহারা এই প্রস্তাবের মুন্ডপাত করিতে থাকে। তাঁহারা প্রকৃতই মোছলেম আন্দোলন সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁহারা এই শব্দের জন্য আমাদের উপর দায়িত্ব আরোপ করে। তাঁহারা 'প্যান-এছলামিজম' বলিয়া চিৎকার আরম্ভ করে। ইহার পালা শেষ হইলে আসে 'পাকিস্তান'। তাঁহারা এইরূপ

www.icsbook.info

খেলাই খেলিতেছে। আপনারা উত্তমরূপেই জানেন যে, কোন কোন শ্রেণীর হিন্দু সংবাদপত্র এবং ব্রিটিশ সংবাদপত্র এই শব্দটির দায়িত্ব আরোপ করে আমাদের উপর। বহুদিন পর্যন্ত আমাদের প্রস্তাবটি লাহোর প্রস্তাব নামে অভিহিত হইতেছিল। এখন ইহা জনসাধারণ্যে পাকিস্তান নামে পরিচিত। আর কতকাল আমরা দীর্ঘ Phraseka ব্যবহার করিব? আমি এখন আমার হিন্দু ও ব্রিটিশ বন্ধুগণকে বলিঃ আমাদিগকে এই শব্দটি দিবার জন্য আমরা আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি (হর্ষ ও শুনুন, শুনুন ধ্বনি)।

পাকিস্তান শব্দের গোড়ার কথা

'পাকিস্তান' শব্দের গোড়ার কথা কি? মোছলেম লীগ বা কায়েদে আযম ইহা সৃষ্টি করেন নাই। যাহারা উত্তর পশ্চিমের একটা বিশেষ অংশকে অবশিষ্ট ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন লন্ডনের একমন কয়েকজন যুবক ১৯২৯-৩০ সালে একটি অঞ্চলকে 'পাকিস্তান' নামে অভিহিত করেন। তাহারা পাঞ্জাবের P আফগানের A (ক্রমাগত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এই নামে পরিচিত) কাশ্মীরের K সিন্ধুর S এবং বেলুচিস্তানের, Tan এইরূপে Pakinstan নামের উদ্ভব হইল। ঐ সময় এই শব্দের অর্থ যাহাই থাকুক না কেন, প্রত্যেক সভ্য দেশের ভাষাতেই নূতন নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে পাকিস্তান শব্দের দ্বারা লীগের লাহোর প্রস্তাবকে বুঝায়। আমাদের এমনই একটা শব্দের প্রয়োজন ছিল এবং এই শব্দটার দায়িত্বও আমাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল। যাহা হউক ইহাতে আমাদে সুবিধাই হইয়াছে। এই পাকিস্তান শব্দের মানে লাহোর-প্রস্তাব।

ফেডারেশনের অসারতা

কোন কোন শাসনতান্ত্রিক পন্ডিত বলিয়া থাকেনঃ একটা শিথিল ফেডারেশন বা কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে না কেন? এই সম্পর্কে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা আপনাদের সমক্ষে পাঠ করিতেছি। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ-কেহ কেহ একটা শিথিল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিতেছেন এবং ইহার অন্তর্ভূক্ত ইউনিটগুলিকে ব্যাপকতম স্বাধীনতা ও অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতা দিবার কথাও বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। যে রকমের ফেডারেশনই হউক না কেন; পরিণামে ইহা ইহার অন্তর্ভূক্ত ইউনিটগুলিকে সকল রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইউনিটসমূহ কেন্দ্রীয় শক্তির হস্তে অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইউনিটসমূহ কেন্দ্রীয় শক্তির হস্তে অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে ক্ষমতা অর্পণে বাধ্য হইবে। অবশেষে ইউনিটগুলি নিজেই একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট স্থাপন

www.icsbook.info

করিবে। প্রয়োজনের তাগিদেই ইউনিটগুলি তাহা করিতে বাধ্য হইবে। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইহার ইতিহাস এবং কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, জার্মানী ও অন্যান্য দেশ যেখানে ফেডারেল বা কনফেডারেল প্রথা বিদ্যমান আছে; তাহার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হইয়া ফেডারেশন বা কনফেডারেশনের অন্তর্ভূক্ত ইউনিটগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অধিকতর পরিমাণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে।

ফেডারেশনের অর্থ কি এবং উদ্দেশ্যই বা কি, তৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব বশতঃই ফেডারেশনের এই সমস্ত পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। অবশিষ্ট্যত্মক ক্ষমতা প্রস্তাবিত ইউনিটসমূহেরই থাকুক কিংবা কেন্দ্রীয় শক্তিরই থাকুক, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। আসল কথা হইতছে এই যে, একবার যদি ইউনিটগুলি কেন্দ্রীয় ফেডারেল গভর্নমেন্ট মানিয়া লয় তবে অপরিহার্য্যরূপে ও একান্ত প্রয়োজনের খাতিরে এইগুলি একটি সর্বশক্তিমান কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে পর্যবসিত হইবে। আমরা এইরূপ পরিকল্পনার বিরোধী। শুধু তাই নয় যে প্রস্তাবে ফেডারেল বা কনফেডারেল যে কোন কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের আভাস ইঙ্গিত থাকিবে তাহা গ্রহণেও আমরা রাজী হইতে পারি না। কারণ ইহার ফলে পরিণামে মোছলেম জাতি শিক্ষা, কৃষ্টি ও রাজনীতির দিক দিয়া এবং সামাজিকভাবে ও আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া পঙ্গু হইয়া পড়িবে এবং এই উপ-মহাদেশের সংখ্যাগুরু হিন্দুরাও প্রতিষ্ঠিত হইবে। কাজেই এইরূপ কোন চিন্তাও আপনাদের মনে স্থান দিবেন না। শিথিল ফেডারেশন বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নাই।

ভারতীয় বিরোধী বিলের নিন্দা

বোধহয় অধিকাংশ বিষয় সম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকার সাম্প্রতিক ভারতীয় বিরোধী আইন নিঃসন্দেহে নিকৃষ্টতম আইন। বর্তমান সময়ে এইরূপ বিল পাশ করার চেষ্টা অত্যন্ত বিস্ময়কর। একদিকে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশকে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে বলা হইতেছে এবং ভারতীয়গণকে রণক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গদের পাশাপাশি যুদ্ধ করিতে সম্পূর্ণ সমকক্ষ বলিয়া বলা হইতেছে, পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যের অন্যতম সদস্যকে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সহায়তার পরিবর্তে তাহাকে এইরূপ বৈষম্যমূলক আইন উপঢৌকন দেওয়া হইতেছে। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এজেন্ট ভারত সরকারসহ; সমগ্র ভারতবর্ষ এই আইনের নিন্দা করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও ভারত-সচিব তাঁহার বিবৃতিতে এ বিষয়ে তাঁহার কিছু বলার নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে আমি বিস্ময়বোধ করিতেছি। আমাদের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিতর্ক সম্পর্কে ইহাতে কি আমরা কোনও শিক্ষালাভ করিতে পারি না?

www.icsbook.info

আর একটি বিষয় বলার আছে। সম্প্রতি আর একটি বেদনাদায়ক বিষয়ের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপার মোটেই সুবিধাজনক নহে। আমি কয়েকটি রাজ্য, যথা-কাশ্মীর, গোয়ালিয়র ও কোটাহঁর কথা উল্লেখ করিব। এ ব্যাপারটা খুবই দুঃখজনক। এই সমস্ত রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু এবং হিন্দুদের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা রহিয়াছে। উৎকৃষ্টতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য ঐ সমস্ত রাজ্যের শাসকদের প্রতি আবেদন জানাইতেছি। সেই রকম যে মুসলমান শাসকের রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য রহিয়াছে, সেখানে তাঁহাদেরও উচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবহার করা এবং তাঁহাদের আইনসঙ্গত অভাব অভিযোগের প্রতিকার করা। যে জাতি যেখানে সংখ্যাগুরু হইবে সে জাতি সেখানে সংখ্যালঘু জাতির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের পন্থা ইহা নহে। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করিলে সমস্যার পথ পরিস্কার হইয়া আসিবে আমি আশা করি, কোন সন্তোষজনক মীমাংসা সম্ভব হইবে। যদি কোন মুসলমান শাসক বা সংখ্যাগুরু মুসলমান হিন্দুদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন তবে আমি একই রকম দুঃখিত হইব।

উদাত্ত আহবান

পরিশেষে আমি আর একটি বিষয় বলিতে চাই। আমি মুছলমানদিগকে বলিঃ গত ৭ বৎসর আমরা বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। বর্তমানে আমরা এমন এক স্তরে পৌঁছায়াছি যেখানে আমাদের মনে সন্দেহের লেশ মাত্রও নাই যে, ভারতের দশ কোটি মুসলমান এক্ষণে আমাদের পেছনে রহিয়াছে। দশ কোটি মুসলমান অর্থে আমি এই বুঝাইতে চাই যে কয়েকজন বিশ্বাসঘাতক, দুর্বলচিত্ত, অতিমানব কিংবা উন্মাদ ব্যক্তি ছাড়া তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই আমাদের সমর্থক। প্রত্যেক জাতি বা সমাজেই কিছু সংখ্যক কলঙ্কিত লোক রহিয়াছে। কোন জাতি বা সমাজই এই পাপ হইতে একবারে মুক্ত নহে। অষ্টাদশ শতাব্দী ও উনবিংশ শতাব্দীর ধ্বংসস্তুপের মধ্য হইতে আধুনিক ভারতে মোছলেম জাতির অভ্যুদয় একটি অলৌকিক ব্যাপার (উল্লাস)। যে জাতি সবই হারাইয়াছিল এবং অদৃষ্টদোষে যাঁতাকলের চাপায় পড়িয়াছিল তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শুধু জাগে নাই, পরন্তু আধুনিক ভারতে ব্রিটিশের পরেই সামাজিকভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক, সামরিকভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক পৌরুষসম্পন্ন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে (উচ্চ হর্ষ ধ্বনি)। আপনাদিগকে নিজেদের বিশিষ্ট অংশ অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। যাহাতে আমরা পাকিস্তানের পথে জয়যাত্রা করিতে পারি, তজ্জন্য গঠনমূলক কার্য্যক্রম গ্রহণ করিবার পক্ষে ইহাই উপযুক্ত সময়।

জাতির শিক্ষক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি

www.icsbook.info

বিধানকল্পে আপনাদের সকলের একযোগে পরামর্শ করিয়া যথোপযুক্ত ও শৃংখলাবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। আমি পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছি যে, আমাগিদকে গঠনমূলক কার্য্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে, আমি আশা করি আপনারা ইহা পারিবেন। আমি উপসংহারে বলিতে চাইঃ আমাদের গন্তব্যস্থল নিকটবর্তী। ঐক্যবদ্ধ হইয়া অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হউন। (উচ্চ হর্ষ ও বহুক্ষণ ব্যাপি উল্লাসধ্বনি এবং তুমুল 'কায়েদে আযম জিন্দাবাদ, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, মোছলেম লীগ জিন্দাবাদ', ধ্বনি)।

[এই বক্তৃতাটি 'কায়েদে আযমের পত্র ও বক্তৃতাবলী' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে গ্রহীত। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে। এর সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন এম, জহুর হোসেন চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক, জিয়া মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম এবং মওলানা মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট, মুসলিম ছাত্রলীগ, চট্টগ্রাম।

উল্লেখ্য, এম, জহুর হোসেন চৌধুরী পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগে যোগ দেন এবং স্বাধীনতার পর মুজিব সরকারের মন্ত্রী হন।]

www.icsbook.info

পরিশিষ্ট-৩

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে জিন্নাহ-গান্ধীর মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা ব্যর্থ হবার পর উভয় পক্ষের সাংবাদিক সাক্ষাৎকারঃ

১৯৪৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিউজ ক্রণিকল-এর প্রতিনিধির সঙ্গে মিঃ গান্ধীর সাক্ষাৎকারঃ

মিষ্টার গান্ধী আমাকে মিঃ জিন্নার সঙ্গে তার হিন্দু-মুসলমান বিরোধের আপোষ আলোচনা কেন ব্যর্থ হয়েছিলো সে সম্পর্কে বলেছেনঃ

"আমি দ্বি-জাতিতত্ত্ব মেনে নিতে পারিনা। এটাই ছিল মিঃ জিন্নার দাবী। তিনি অবিলম্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু, সমগ্র পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান এবং আসাম ইত্যাদি প্রদেশ নিয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম করতে চান। তিনি গণভোটের মাধ্যমে এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের মত যাচাই না করে বাকী ভারত থেকে এ সকল এলাকা বিভাগ করার জন্য মিঃ গান্ধীর সমর্থন আদায় করতে চান। তিনি রাজা গোপালাচারীর ফর্মূলাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।"

পাকিস্তান প্রস্তাব স্বীকার করা এবং আপোষ মীমাংসার কোন সম্ভাবনা আছে কি না, এ সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলাম। তাঁর মতামত ছিল সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন, "এটা আমি প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি মিঃ জিন্নার অকপটতায় বিশ্বাস করি; কিন্তু আমার মনে হয় যে, ভারতকে অস্বাভাবিকভাবে বিভক্ত করা হলে জনসাধারণের সুখ এবং উন্নতি হবে, তিনি এই ধরণের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছেন। গণভোটের মাধ্যমে মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলোকে নিয়ে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাব আমি দিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তানকে উভয়ের পক্ষে কতকগুলো সাধারণ কতক বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। বৈদেশিক ব্যাপার, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এ রকম অন্যান্য দফতরের নিয়ন্ত্রণ দু' রাষ্ট্রকে যুগ্মভাবেই সম্পাদন করতে হবে। ভারতের উভয় অঞ্চলের জন্য এ ব্যবস্থা কল্যাণজনক হবে তা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান। এই ব্যবস্থা মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ জীবনে কোন রকম হস্তক্ষেপ করবে না এবং তারাও কোন দিক দিয়ে হিন্দুর কর্তৃত্বাধীন থাকবে না। এই বিভাগ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে জনসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম বাধার প্রাচীর সৃষ্টি হবে না। ধর্ম যাই হোক না কেন, সকলে একই পূর্বপুরুষের বংশধর এবং সকলেই ভারতীয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ মিঃ জিন্নাহ সে ধরনের কোন প্রস্তাবে রাজী হলেন না। আমাকে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক কথা মেনে নিতে বলেন।"

আমি মিঃ গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এ রকমের কোন বিভাগ দেশবাসীকে দিয়ে গ্রহণ করাতে পারবেন না বলে, নাকি নীতি হিসেবে ভ্রান্ত বলেই গ্রহণ করতে পারেন না।' তিনি জবাবে বললেন, "মূলতঃ নীতি হিসেবেই তা ভ্রান্ত। যদি আমি মিঃ

www.icsbook.info

জিন্নার মতামত অভ্রান্ত মনে করতাম সমগ্র পৃথিবী বিপক্ষে গেলেও আমি তা গ্রহণ করতাম এবং সমর্থন জানাতাম নির্দ্বিধায়।"

আমি তার পরে মিঃ গান্ধীর কাছে জানতে চাইলাম, 'মিঃ জিন্নাহ গণভোট ছাড়া অথবা শুধু মুসলমানের গণভোট মেনে নিয়ে আপনার সঙ্গে একমত হলে আপনি কি রাজী হবেন? তিনি বললেন, "কখনো না। আমি ব্যক্তিগতভাবে কিংবা অন্য কোন উপায়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভবিষ্যত নির্ধারণে তাদের মতামত ছাড়া কেমন করে সায় দেবো।"

আমি জানতে চাইলাম, 'জুলাই মাসে স্বল্পস্থায়ী অন্তর্বর্তীকালীন যে জাতীয় সরকারের রূপরেখা আপনি ব্যক্ত করেছেন, সে সম্পর্কে মিঃ জিন্নার কি মনোভাব? মিঃ গান্ধী জবাব দিলেন, "মিঃ জিন্নাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি স্বাধীনতার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসুক। তবে আমার মনে হয়, পাকিস্তান দাবীর প্রতি তিনি যতটা গুরুত্ব আরোপ করেন, স্বাধীনতার দাবীকে অতটা করেন না। অপর দিকে আমার মতামত দেখুন, আমি সব সময়ে বলে আসছি, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা স্বাধীন হতে পারব না। আমরা বন্ধুভাবেই বিদায় গ্রহণ করেছি। আমার ধারণা মিঃ

জিন্নাহ একজন ভাল মানুষ। আশা করি আমাদের দু'জনের মধ্যে আবার দেখা হবে। আমি একজন উপাসনা-নির্ভর মানুষ। এই সময়ে জনসাধারণের কর্তব্য হলো পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করে তাদের মতামতের চাপ আমাদের উপর প্রয়োগ করা।"

সাংবাদিক সম্মেলনে কায়েদে আযম

১৯৪৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর মিঃ জিন্নাহ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেনঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত মিঃ গান্ধীর সংবাদপত্রের মতামতের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। তিনি মনে করেন, 'তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিই আমাদের আপোষ প্রচেষ্টার প্রতিবন্ধক; এটা খুবই দুঃখের বিষয়। দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ মন আচরণে স্বাধীন মনের পরিচয় দিতে পারে না' তাঁর এ উক্তি আমাকে খুবই ব্যথা দিয়েছে। কোন শক্তিই মানুষের মন কিংবা আত্মাকে বেঁধে রাখতে পারে না। আমি নিশ্চিত যে, মিঃ গান্ধীও তাঁর মনকে শৃংখল পরাতে রাজী হবেন না। আমি আশা করি তিনি সর্বদা যে তাড়নায় ভুগছেন তা অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন। তৃতীয় পক্ষের বদলে আমাদেরকেই আপোষ মীমাংসায় আসতে হবে। অন্যান্য বিষয়ে মিঃ গান্ধী সুনিপুণ ভাষায় যুক্ত এশতেহারের প্রতিকূলে নিজের প্রোপাগান্ডা করেছেন। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্ব করার আমার উপর যে ভার অর্পিত হয়েছে তার চ্যালেঞ্জ করার বদলে তিনি আমার বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত

www.icsbook.info

করেছেন। তিনি সব সময়েই বলেছেন যে, তাঁর প্রস্তাব অথবা গান্ধী-রাজাজী ফর্মূলা কিংবা তাঁর শেষ মুহূর্তের প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাবের সারাংশ সংযোজিত করেছেন। গান্ধী ও রাজাজীর মধ্যে যে কোন প্রভেদ নেই একথা বুদ্ধিমান মানুষের চোখ এড়াবে না। লাহোর প্রস্তাবের যাবতীয় মূল উপাদানকে অস্বীকার করার পরেই যাকে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রস্তাব বলছেন, তা এসেছিলো। শুরুতেই গান্ধী-রাজাজী ফর্মূলাকে এক পাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। এখন বিষয়টি সাধারণের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। মিঃ গান্ধী মন্তব্যের পর মন্তব্যে এবং সাংবাদিক সম্মেলনে এমন সব বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে যাচ্ছেন, যার ফলে তাঁর প্রস্তাবটির প্রধান দিকগুলো সম্পর্কে আমি বাধ্য হয়েই আলোচনা করছি।

(১) একটি জাতীয় ইউনিট হিসেবে অবিলম্বে ভারতে স্বাধীনতা দান।

(২) তাঁর ধারণা অনুসারে অবিলম্বে স্বল্প সময়ের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের কথা তাঁরই লেখা ১৫ই সেপ্টেম্বরের পত্রে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

"স্বল্প সময়ের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারটি বর্তমান পরিষদের নির্বাচিত সদস্য অথবা নূতনভাবে নির্বাচিত পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন। যুদ্ধপূর্ব সময়ে প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতা এবং যুদ্ধের পরে এই সরকারই সম্পূর্ণ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করবেন। কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে যে চুক্তি হবে তা এ সরকার কার্যকরী করে তুলবে। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও উল্লেখ্য যে, তার প্রভাবে একটি তৃতীয় পক্ষকে স্বীকার করা হয়নি; শুধু যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রতিরক্ষার মতো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সরকারী ক্ষমতাকে প্রধান সেনাপতির হাতে তুলে দিয়েছেন। এ থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় যে সরকারটি অথবা কেন্দ্রীয় যে সরকারটি গঠিত হবে এবং যার উপর সম্পূর্ণ প্রশাসন কার্যের ভার থাকবে তা কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে অবিসংবাদিতভাবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যাদের সংখ্যা শতকরা ৭৫ জনের কম হবে না তাঁদের কাছেই দায়ী থাকতে হবে।

(৩) এ রকম একটি সরকার গঠিত হওয়ার পরে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব এ সরকারের উপরই থাকবে। অথবা এ উদ্দেশ্য একটি সংস্থা নিয়োগ করে সেই সংস্থার উপরই বৃটিশ শাসনের অবসানের পর স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

(৪) যাকে তিনি নিজের প্রস্তাব বলেছেন, তাতে বিশদভাবে যুগ্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হলো বৈদেশিক বিষয়, প্রতিরক্ষা, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা, শুল্ক, বাণিজ্য এবং এ জাতীয় অন্যান্য যুগ্ন স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে চুক্তির খসড়া করবেন এ সরকার এবং তা অবশ্যই

www.icsbook.info

একটি সন্তোষজনক এবং কার্যকরী কেন্দ্রীয় সংস্থা অথবা সরকারের অধীনে সকল সময়ের জন্য কার্যকরী থাকবে। তাঁর এ প্রস্তাবের একমাত্র অর্থ হতে পারে যে, যে সব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় একটি রাষ্ট্রের রক্ত-মাংস
বলে ধরা হয় সে সকল বিষয়কে ভারত সরকারের হাতে বৃটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাঁর প্রস্তাবিত যে ভারত সরকারের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করা হবে তেমনি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত দায়িত্ব এবং কর্তব্য তুলে দেয়া হবে। এ সকল প্রস্তাবে এ কথাই স্পষ্ট, যে সরকার গঠিত হবে, তার পুরোপুরি রক্ষা নিরংকুশভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের হাতেই থাকবে। আদতে তা হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠার নামান্তর।

(৫) তার পরে জেলাভিত্তিক সীমানা নির্ধারণের নীতি মেনে নেয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর শর্ত হয়ে দাঁড়াবে। মিঃ গান্ধীর মতে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে যে জেলায় মুসলমানেরা সংখ্যায় শতকরা ৭৫ জন, সে জেলাকেই চিহ্নিত করা হবে। নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ বলতে তিনি সিন্ধু, বেলুচিস্তান অথবা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশকেই বোঝেন; আর মিঃ রাজা গোপালাচারীর মতে সাধারণতঃ আইনের ভাষায় যা, তাইই হলো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আমি অভিধান হতে জানতে পেরেছি যে, এর অর্থ হলো (ভোটে অংশ গ্রহণ করবে যারা এবং যারা করবে না) সমস্ত জনসাধারণের মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। পাঁচমিশেলীভাবে গণভোট অথবা অনুরূপ অন্য কোন পদ্ধতির মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের চিহ্নিত করা হবে। গণভোট অনুষ্ঠানের ধরণটা কি ধরনের হবে পূর্বাহ্নে মেনে নিতে পারি কি না বিবেচানার সুযোগ আমাদেরকে না দিয়ে তা স্থির করবেন উপরোক্ত জাতীয় সরকার।

আমরা এ সকল শর্ত মেনে নিলেও আমাদেরকে নিম্নলিখিত শর্তাবলীর অধীন থাকতে হবে। (১) যুদ্ধের পরেই এ বিষয়ে বিবেচনা করা হবে (২) জাতীয় সরকারের হাতে ভারত সরকারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব হস্তান্তরের পরই জাতীয় সরকার উপরে বর্ণিত পরস্পর সংলগ্ন জেলাসমূহের সীমানা চিহ্নিত করবার জন্য একটা কমিশন নিয়োগ করবেন। তখন কমিশনটি বাংলা, আসাম এবং পাঞ্জাবে চূড়ান্তভাবে দায়িত্ব পালন করবে এবং জাতীয় সরকার কমিশনের রায়কেই কাজে রূপ দিবেন। এলাকাসমূহ আলাদা হতে চাইলেও সামগ্রিকভাবে মতামত যাচাইয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারের রায়কেই শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হবে। মেনে নেয়ার পরও যদি রায় মুসলমানদের স্বপক্ষে আসে তাহলে অপরিহার্য বিষয়সমূহ, যেমন বৈদেশিক বিষয়, প্রতিরক্ষা, আভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা, শুল্ক, বাণিজ্য এবং এ রকম অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের ভার একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা বা সরকারের উপর অর্পণ করা হবে এবং তা সকল সময়ের জন্য বলবৎ

www.icsbook.info

থাকবে।

এটাই হলো মিঃ গান্ধীর মতে দু'ভাইয়ের ভ্রাতৃভাবে পৃথক করা হওয়া। মিঃ গান্ধী যখন বিরক্তিকরভাবে বারবার বলেন, তাঁর প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাবের মূল দাবী পূরণ করা হয়েছে, তখনই সবচেয়ে আশ্চর্য ঠেকে। তিনি যেভাবে বারবার অত্যন্ত অসরলভাবে বাঁকাচোরা প্রস্তাবের কথা বলে বেড়ান, বাস্তবিকই তা উপলব্ধি করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত এবং সবকিছু একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলে সন্দেহের গহ্বরে ফেলার অর্থ কি? তাঁদের প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমরা মরণ-ফাঁদে পা বাড়াবো এবং পাকিস্তানেরও কবর রচিত হবে। কিন্তু তার পরেও তিনি যখন বলেন, "আমি এবং রাজাজী যদি লাহোর প্রস্তাবের মর্ম সঠিক অনুধাবন করতে না পারি, তাহলে আমাদেরকে ওয়াকেফহাল করে তোলা উচিত, তখন কিঞ্চিৎ আশার আলো আমরা দেখতে পাই।

তিন সপ্তাহ ধরে মিঃ গান্ধীর সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় আসার জন্য আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাঁর রোগ এতো জটিল এবং পুরনো যে, আরোগ্য করে তোলা যে কোনো চিকিৎসকেরই সাধ্যের বাইরে। আমি আশা করি তাঁকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য জনসাধারণ এবং সংবাদপত্র সমূহের কাছে যে আবেদন করেছেন, তা বিফলে যাবে না। কিন্তু তারপরেই তিনি বলেছেন, "আমি আমার অন্তরের বাণীই মেনে চলবো।" আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ তাঁর অন্ত' রের পাত্তা পাবে না।

মিঃ গান্ধী হয়তো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতে পারেন যে, তাঁর নিজের প্রস্তাব অথবা গান্ধী-রাজাজী ফর্মূলায় লাহোর প্রস্তাবের সারাংশ সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু তা তার অলীক কল্পনা মাত্র। দুই প্রস্তাবের ভাষা এবং শর্ত মিঃ গান্ধী যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, শুনলে শ্যাম দেশীয় যমজের কথা মনে পড়ে। দুটোর একটাতেও যে লাহোর প্রস্তাবের কোন একটি মুখ্য বিষয় স্থান পেয়েছে, তা বিশ্বাস করা অসম্ভব। তাঁর যে কোন একটি চিঠি, তা যতোই সংক্ষিপ্ত হোক না কেন, স্ববিরোধিতা এবং অসামঞ্জস্যের পরিমাণ এতো বেশি যে, হিসেব করা যায় না। গত তিন সপ্তাহ ধরে এত অসঙ্গতিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যে, তার সবগুলোর সংকলন করলে চীন দেশীয় ধাঁধার মতো রূপ নেবে। অনেক অসঙ্গতির মধ্যে শুধু আমি একটার উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি বলেছেন, " মুসলমানেরা যেখানে স্পষ্টতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাদের আলাদা একটি রাষ্ট্র গঠন করার অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু তার অর্থ যদি হয়, দুটি আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং দু'য়ের মধ্যে যুগ্ন স্বার্থ সংরক্ষণের কিছু থাকবে না, তাহলে এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া অসম্ভব এবং এটাকে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করার শামিল মনে করি। "একজন অহিংসার প্রবর্তক মহাপুরুষ আমাদেরকে তলোয়ার যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শন করেছেন এবং তার মতে

www.icsbook.info

আলাপ-আলোচনার পালা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। তার বাদেও তিনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে কি ধরনের আলাদা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করতে চান?

মিঃ গান্ধী আবার হয়তো উত্তেজনার মুহূর্তে বলে ফেলেছেন যে, মুসলিম লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারার মতো উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নয়। অসন্তুষ্ট ভাবে এমন সব মুসলিম প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিতও দিয়েছেন, যেগুলোর পেছনে (গান্ধীর ধারণা) প্রচুর মুসলমানদের সমর্থন বর্তমান। তাদের সঙ্গে লীগের অহি-নকুল সম্পর্ক এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বেও তারা বিশ্বাসী নয়। এ বলে তিনি মুসলিম লীগের মর্যাদাকে খাটো করেছেন এবং মুসলমানদের সংহতি বিনাশ করতে চেয়েছেন। কারণ তিনি নিজেই জানেন, এ কথা সত্য নয়। অবশ্য কোন জাতিই শতকরা একশো ভাগ সংহতি অর্জন করতে পারে না।

এক নিঃশ্বাসে মিঃ গান্ধী বিভাগ নীতি মেনে নেন, কিন্তু পর মুহূর্তে এমন সব প্রস্তাব করে বসেন, যার ফলে মুসলিম ভারতের দাবীর মূল ভিত্তিপ্রস্তর পর্যন্ত তলিয়ে যায়। একদিকে তিনি লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ করতে চান, কিন্তু অন্যদিকে লীগের মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবী অস্বীকার করেন। মিঃ গান্ধী হচ্ছেন একজন মূর্তিমান ধাঁ ধাঁ বিশেষ।

সাংবাদিকতা মিঃ জিন্নার কাছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সীমানা সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করলে তিনি পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দেন। পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অমুসলমান প্রধান এলাকাসমূহ পাকিস্তানে যোগ দেবে না হিন্দুস্তানে যোগ দেবে, তা স্থির করর জন্য কোন কমিশন গঠন করা হবে কি না তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো। মিঃ জিন্নাহ প্রশ্নকারীর দৃষ্টি লাহোর প্রস্তাবের প্রতি আকর্ষণ করে বললেন, "প্রস্তাবানুসারে ছ'টি প্রদেশ, যথা পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, বাঙলা এবং আসামের বর্তমান সীমানা অনুসারেই বিভাগ করা করা হবে, কিন্তু তা আঞ্চলিক সমতা বিধানের অধীন থাকবে।" "অধীন থাকবে" কথাটি তিনি জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন। পরে বুঝিয়ে বললেন, "এক দেশের ক্ষেত্রে নয়, উভয় দেশের জন্যই আঞ্চলিক সমতা বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য।" তিনি বললেন, "আমি পরিস্কার বলেছি, যদি আমরা লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতি মেনে নেই, তার পরে পরেই দু'জাতির মধ্যে উদ্ভূত সীমানা চিহ্নিত করণের কাজে হাত দিতে পারি। এক সরকার যেভাবে অন্য সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আপোষে আসে, এও হবে অনেকটা সে রকম।"

একজন সাংবাদিক হঠাৎ করে বসলেন, এখন তো কোন সরকার নেই। মিঃ জিন্নাহ জবাবে বললেন, "উভয় দলই সংবিধান সংস্থা নিয়োগ করবেন। এমনকি কোনো আপোষে আসার আগেও বিষয়টি সংবিধান রচনা সংস্থার এখতিয়ারে থাকবে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "অদূর ভবিষ্যতে মিঃ গান্ধীর

www.icsbook.info

সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা আছে কি?" মিঃ জিন্নাহ জবাব দিলেন, "মিঃ গান্ধী এ ব্যাপারে তাঁর অন্তরের বাণীর উপর নির্ভর করেন; আমার সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। তাই বলতে পারি না।"

মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্টকে পাকিস্তানের সংবিধান সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা আছে কি না জিজ্ঞেস করা হলো। মিঃ জিন্নাহ জবাব দিলেন, "পাকিস্তানের দাবী পয়লা স্বীকৃত হোক, পরে পরিকল্পনা করা হবে।" বিষয়টি আরো খোলাসা করার জন্য মিঃ জিন্নাহ পূর্ববর্তী একটি প্রশ্নের প্রতি সাংবাদিকটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "বাস্তবিকই কোন সরকার নাই। যদি বিভাগের নীতি গৃহীত হয়, পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তান উভয়কেই তাদের সংবিধানিক সংস্থা নিয়োগ করতে হবে। ঐ সংস্থাদ্বয়ই দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসেবে ভৌগোলিকভাবে পাশাপাশি দুটো রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি রকম হবে তা আলোচনা করে ঠিক করবে। তার পরে দু'টি আলাদা সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অন্যান্য বিরোধের মীমাংসা করবে। আমেরিকা মহাদেশের কথাই ধরুন না। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ২৫টি স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র রয়েছে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি এবং আপোষও রয়েছে। এমনকি ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যেও পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ব্যাপারে জোট পর্যন্ত রয়েছে। এসবই হচ্ছে আঞ্চলিক সমতা বিধান করার বিষয়। ভৌগলিকভাবে এক লগ্ন না হলেও দুটি দেশের মধ্যে চুক্তি এবং আপোষ থাকতে পারে। কিন্তু এখানে দুটি দেশ প্রতিবেশী এবং ভৌগলিকভাবে পরস্পর সংলগ্ন।

প্রথম দিকে মিঃ গান্ধীর প্রস্তাব অথবা অন্যান্য প্রস্তাবসমূহে লাহোর প্রস্তাবের মূল নীতিকে স্বীকার করা হয়েছে কি না, এ প্রশ্নের জবাবে মিঃ জিন্নাহ পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে বললেন, "মিঃ গান্ধী বলেন তার প্রস্তাব অথবা রাজা গোপালাচারীর ফর্মূলাতে লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতিকে কিভাবে অস্বীকার করা হয়েছে বুঝিয়ে দিতে বলেন। এর জবাবে আমি বলেছি, সে কথা গত ২১ দিন ধরে বুঝিতেছি এবং এখনো বুঝাচ্ছি। জনসাধারণ সম্বন্ধে অন্ততঃ এটুকু বলতে পারি যে, তারা বধির নয়। মিঃ গান্ধী তাঁর মন্তব্য এবং সাক্ষাৎকার সমূহে লীগের মর্যাদাকে খাটো করেছেন এবং মুসলমানদের সংহতি বিনাশ করবার চেষ্টা করেছেন। স্বভাবতঃই আমি তা পছন্দ করি না এবং তিনি নিজেই এর জবাব পাবেন।"

১৯৪৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর লন্ডনের নিউজ ক্রনিকলের প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে কায়েদে আযম বলেনঃ

"হিন্দু মুসলমানের সমস্ত বিভেদ নিস্পত্তির জন্য শুধু একটি বাস্তব এবং সঙ্গত পন্থা খোলা রয়েছে। সে জন্য ভারতকে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান দুটো ভাগ

www.icsbook.info

করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বাঙলা এবং আসাম প্রভৃতি মুসলিম প্রধান অঞ্চলে হালের সীমানা অনুসারে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি দিতে হবে। পরস্পরের বিশ্বাস মতো পাকিস্তানে হিন্দু সংখ্যালঘু এবং হিন্দুস্তানে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে সমান ব্যবহার করতে হবে। ওরা যদি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে পারে, আমরাও তাদের উপর আড়াই কোটি মুসলমানের ভার ছেড়ে দিতে রাজী আছি।" মিঃ গান্ধীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা সম্বন্ধে আড়াই ঘন্টা কাল সময়ের সাক্ষাতকারের মিঃ জিন্নাহ আমাদের কাছে উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন। মিঃ জিন্নাহ বলেন, "যে প্রস্তাব আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাতে বুদ্ধির অবমাননা ছাড়া আর কিছু নাই। মুসলমানেরা যেখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ নয়, সেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠানে আমাকে রাজী হতে বলা হয়েছিল। আমি মিঃ গান্ধীর কাছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অর্থ কি জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি জবাব দিয়েছিলেন যেখানে মুসলমানের সংখ্যা সম্পূর্ণ জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জনেরও বেশি সেখানে আমাদেরকে বিনা ভোটে নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয় হবে। এ ব্যাপারে মিঃ রাজা গোপালচারীর সঙ্গে তার মতামতের পার্থক্য রয়েছে। তার (রাজাজীর) মতামত অনুসারে নিরংকুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতার আইনগত অর্থ হলো মোট জনসংখ্যার শতকরা একান্ন অংশ। তা হবে শুধু ভোটদানকারীদের নয় সমস্ত জনসংখ্যাই শতকরা একান্ন অংশ। কোন পার্টি যে তাতে রাজি হবে না একটা বাচ্চা ছেলেও সে কথা বুঝতে পারে। অতএব আমাকে এমন এক নির্বাচনের প্রস্তাবে রাজি হতে বলা হয়েছে, যা মেনে নিলে পাকিস্তান অঙ্গহীন এবং অচল হয়ে পড়বে। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যুদ্ধের পরে। তার আগে আমাদেরকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যার শতকরা ৭৫ জন সদস্য হিন্দু, তার সহযোগিতা করতে হবে। সুতরাং এটা হবে একটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হিসেবে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর, যুদ্ধের শেষেই নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং কমিশন নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করবে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা পাকিস্তানের হাতে না রেখে শতকরা ৭৫ জন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দিলে পাকিস্তানের কি দশা হবে? তেমনি একটি সরকারের সঙ্গে আমাদেরকে সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে। তাহলে আমাদের হাতে কি থাকবে? তারপরে শুধু সীমানার দিক দিয়ে নয়, পাকিস্তানের অস্তিত্ব হিন্দুস্তানের মধ্যে প্রোথিত একটা দ্বীপের মতো হয়ে দাঁড়াবে। তদুপরি এ সকল অপরিহার্য বিষয় চলে যাবে জাতীয় সরকারের অধীনে।"

"এটা হবে এক ধরনের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনেই থাকবে। কিভাবে এ

www.icsbook.info

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাজ করবে আমি মিঃ গান্ধীকে তার একটা সংজ্ঞা দিতে বলেছিলাম। কারণ এগুলো হলো মৌলিক বিষয়। সুতরাং কেমন করে আমি বর্তমান সংবিধান নাকচের প্রস্তাবে রাজী হয়ে তার বদলে মিঃ গান্ধীর সংযুক্ত ভারতের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী সরকার হঠাৎ কার্যকরী করার প্রস্তাবে রাজী হতে পারি? এ রকম প্রস্তাবে রাজী হলে পাকিস্তান প্রশ্ন চিরদিনের জন্য চাপা পড়ে যাবে এবং তার অপমৃত্যু ঘটবে। অথচ মিঃ গান্ধী আমাকে দিয়ে তাই-ই করাতে চান। মিঃ গান্ধী বলেন, "আমি যা চাই তাতে আপনি রাজী না হলে ব্যাপক গণবিক্ষোভের সাহায্যে দাবীর প্রতিষ্ঠা করবো।" আপনি দেখতেই পাচ্ছেন এ ভীতির সামনে নত হওয়া আর কংগ্রেস প্রস্তাব মেনে নেয়া একই কথা; অথচ দুটোই পাকিস্তানের পরিপন্থী। বৃটিশ রাজত্বের অবসানে মুসলিম ভারত শুধু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের সম্মুখীন হবে না, পরন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে বৃটিশও হাত মিলাবে। মিঃ গান্ধী যদি 'গণ-বিক্ষোভে'র সাহায্য গ্রহণ না করেন, তাহলে তিনি আগষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাহার করতেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাহার তো করেননি, বরঞ্চ তাতে অধিক জোর দিচ্ছেন। আসল কথা হলো, হিন্দুরা মুসলমানদের উপর শাসন চালাতে পারে, তাঁরা সেই ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চান। আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে তারা কখনো মেনে নেবে না। আমাদের পথে আরো একটি মৌলিক বাধা রয়েছে। মিঃ গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে আর আমি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট হিসেবেই আলাপ-আলোচনা করেছি। আমি তাঁকে বলেছি যে, যদি আমি আর তিনি কোন মীমাংসার আসি এবং আমার কমিটি সে মীমাংসা নাকচ করে দেয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানকে মিথ্যাচারের দায়ে দায়ী হতে হবে। আপনার কমিটি নাকচ করে দিলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করেছেন এ অজুহাত দেখাতে পারেন। মিঃ গান্ধী আরো বলেছেন যে, বৃটিশের উপস্থিতির ফলেই আমাদের আপোষ ব্যহত হচ্ছে। সত্যই কিছু সংখ্যক বৃটিশ আছেন, যারা আমাদের মধ্যে আপোষ হোক এটা চান না। কিন্তু কিছুই আমাদের ঐক্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আমাদের মন এবং আত্মা স্বাধীন। মুসলমানদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করে নেয়ার পর দশ মিনিটের মধ্যে আপোষে আসা সম্ভব। কোনো শক্তিই তার পথ রোধ করতে পারবে না। তার পরেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতার ভাব আসতে পারে। একে অন্যের প্রতি প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াসে নয়, আপনাপন গ্রহের কর্তা হিসেবে একে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।"

[আকবর উদ্দিনের 'কায়েদে আযম' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।]

www.icsbook.info

পরিশিষ্ট-৪
ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান

বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অনুমোদনক্রমে বৃটিশ মন্ত্রীসভা-মিশন ও বড়লাট ১৬ই মে রাত্রে দিল্লী হইতে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেনঃ-

১। মন্ত্রী মিশনের ভারতাগমনের অব্যবহৃতি পূর্বে গত ১৭ই মার্চ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলি বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষকে সত্ত্বর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করার আন্তরিক উদ্দেশ্য লইয়াই আমার সহকর্মীগণ ভারত যাইতেছেন। কি ধরনের শাসনতন্ত্র বর্তমান সরকারের স্থলাভিষিক্ত হইবে তাহা ভারতীয়গণই স্থির করিবেন। সত্ত্বর সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহায্য করাই আমাদের আকাংখা।

আমি আশা করি, ভারত ও ভারতীয় বৃটিশ সাধারণতন্ত্রের সহিত যুক্ত থাকতে ইচ্ছুক। আমি বিশ্বাস করি, ইহাতে তাঁহাদের প্রচুর সুবিধাই হইবে।

বৃটিশ সাধারণতন্ত্রের সহিত সংযোগ রাখা বা না রাখা ভারতীয় জনগণের স্বাধীন মতামত সাপেক্ষে। বৃটিশ সাধারণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সংযোগ তাহা আন্তরিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা স্বাধীন জনগণের স্বাধীন মিলন। আমি মনে করি, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করার অধিকারও ভারতের আছে। যথা সম্ভব সত্ত্বর ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য।

২। এই ঐতিহাসিক ঘোষণার দায়িত্বভার বহন করিয়া আমরা, মন্ত্রী সভার সদস্যত্রয় ও বড়লাট, দুই প্রধান রাজনৈতিকদলকে সর্বভারতীয় ঐক্য বা বিভাগের মূলসূত্রে একমত হইতে সাহায্য করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। নয়াদিল্লীতে সুদীর্ঘ আলোচনার পরে আমরা সিমলা কনফারেন্সে কংগ্রেস ও মোছলেম লীগকে সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সম্পূর্ণ মত বিনিময়ের পরে উভয় পক্ষই অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ব্যবধান দূর করা এবং কোন মীমাংসায় পৌছান সম্ভবপর হয় নাই। সুতরা উভয় পক্ষের অনুমোদিত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় আমরা সত্ত্বর নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে পরিকল্পনা শ্রেষ্ঠ মনে করি, তাহা উপস্থিত করা আমাদের কর্তব্য।

৩। ভারতীয় জনগণ যাহাতে তাহাদের ইচ্ছামত ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র গঠন করিতে পারেন, তাহার আশু ব্যবস্থা করা সাব্যস্ত হইয়াছে। এই শাসনতন্ত্র গঠনের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করাও স্থিরীকৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎই হউক, আমরা সকল শ্রেণীর প্রতি সুবিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা মনে করি, ভবিষ্যত ভারত শাসনের কার্যকরী পরিকল্পনা আমাদের এই সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত আছে এবং ইহা দ্বারা ভারতের আত্নরক্ষার সুব্যবস্থা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করা হইয়াছে।

৪। মিশনের সমক্ষে যে রাশীকৃত সাক্ষ্য উপস্থিত করা হইয়াছে তাহার পর্যালোচনা এই বিবৃতির উদ্দেশ্য নহে। এই স্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মোছলেম

www.icsbook.info

লীগ সমর্থকগণ ব্যতীত অন্য সকলেই সর্বভারতীয় ঐক্য সমর্থন করিয়াছেন।

৫। ইহা সত্ত্বেও আমরা পক্ষপাতহীন ও নিবিষ্ট মনে ভারত বিভাগের সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করিয়াছি। পাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ চিরকাল তাঁহাদের উপর শাসন চালান, মুছলমানগণের এই ভয় ও ভাবনা আমাদের নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই ধারণা মোছলেম জনগণের মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কোন রক্ষকবচ লিপিবদ্ধ করিয়া তাহা দূর করা সম্ভব নহে। ধর্ম, সংস্কৃতি, বৈষয়িক ও অন্যান্য মোছলেম স্বার্থসংশ্লিষ্ট লিপিবদ্ধ বিষয়ের ভার মোছলেম জনগণের হাতে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা দ্বারাই ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করা যাইতে পারে।

৬। আমরা সর্ব প্রথমেই মোছলেম লীগ উপস্থাপিত সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিষয় চিন্তা করিয়াছি। এই পাকিস্তানের জন্য দুইটা অংশঃ - একটি উত্তর-পশ্চিম, বেলুচিস্তান, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব লইয়া এবং অপরটি উত্তর-পূর্বে বাংলা এবং আসাম লইয়া দাবী করা হইয়াছিল।
মোছলেম লীগ প্রথমে পাকিস্তানের নীতি স্বীকৃত হইলে পরে সীমা নির্ধারণ ও আবশ্যক মত পরিবর্তনের প্রস্তাব মানিয়া লইত প্রস্তুত ছিলেন। প্রথমতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুছলমানগণের নিজেদের শাসনতন্ত্র নির্ধারণের অধিকার ও দ্বিতীয়তঃ সংখ্যালঘিষ্ঠ মোছলেম অধ্যুষিত কোন কোন স্থান শাসন ও অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য পাকিস্তানের অংশীভূত করার প্রয়োজনীয়তার নীতির উপরেই প্রথক ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবী করা হইয়াছিল।

১৯৪১ সালের লোক গণনার সংখ্যাণুপাতে উল্লিখিত ছয়টি প্রদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ অমুছলমানগণের আয়তন সামান্য নহে।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল	মুছলমান	অমুছলমান
পাঞ্জাব	১,৬২,১৭,২৪২	১,২২,০১,৫৭৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৭,৮৮,৭৯৭	২৪,৯২৭
সিন্ধু	৩২,০৮,৩২৫	১৩,২৬,৬৮৩
বৃটিশ বেলুচিস্তান	৪,৩৮,৯৩০	৬২.৭০১২
মোট	২,২৬,৫৩,২৯৪	১,৩৮,৪০,২৩১
শতকরা	৬২.০৭	৩৭.৯৩

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল	মুছলমান	অমুছলমান
বাঙ্গালা	৩,৩০,০৫,৪৩৪	২,৭৩,০১,০৯১
আসাম	৩৪,৪২,৪৭৯	৬৭,৬২,২৫৪
মোট	৩,৬৪,৪৭,৯১৩	৩,৪০,৬৩,৩৪৫
শতকরা	৫১.৬৯	৪৮.৩১

www.icsbook.info

বৃটিশ ভারতের অন্যত্র প্রায় ২ কোটি সংখ্যা-লঘিষ্ঠ মুছলমান ১৮কোটি ৮ লক্ষ অমুছলমানদের মধ্যে বাস করেন।

এই সংখ্যা হইতে দেখা যাইবে যে, মোছলেম লীগের দাবী মত পৃথক ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন দ্বারা সাম্প্রদায়িক সংখ্যা-লঘিষ্ঠতার সমস্যার সমাধান হইবে না। আমরাও পাঞ্জাব, বাঙ্গালা এবং আসামের অমুছলমান সংখ্যা গরিষ্ঠ জেলাগুলি সার্বভৌম পাকিস্তানের অন্তর্গত করার কোন যৌক্তিকতা দেখি না। পাকিস্তানের পক্ষে যে সকল যুক্তি উপস্থিতিতে করা যায়, মোছলেম সংখ্যা-গরিষ্ঠ জেলাগুলিকে পাকিস্তানের বাহিরে রাখার স্বপক্ষেও সেই সমস্ত যুক্তি উপস্থিত করা চলে বলিয়া আমরা মনে করি। এই প্রশ্ন শিখদের অবস্থার উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

৭। কেবলমাত্র মোছলেম সাংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানগুলি লইয়া ক্ষুদ্রতর সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করিয়া কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারা সম্ভব কিনা তাহাও আমরা চিন্তা করিয়াছি। মোছলেম লীগের মতে এই ধরনের পাকিস্তান সম্পূর্ণ অকার্য্যকরী হইবে। কারণ (ক) পাঞ্জাবের সমগ্র আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগ (খ) শ্রীহট্ট জেলা ব্যতীত সমগ্র আসাম এবং (গ) কলিকাতা নগরী (যেখানে মুছলমান জনসংখ্যা শতকরা ২৩.৬ মাত্র) সমেত সমগ্র পশ্চিম বাঙ্গালা পাকিস্তানের বাহিরে থাকিয়া যাইবে। আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস যে, পাঞ্জাব ও বাঙ্গালায় এই প্রকার বিভাগ করিয়া কোন মীমাংসা করা তথাকার অধীকাংশ অধিবাসীদের ইচ্ছা ও স্বার্থের পরিপন্থী। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের নিজস্ব সাধারণ ভাষা, সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য বর্তমান। বিশেষতঃ পাঞ্জাবকে বিভক্ত করা হইলে যথেষ্ট সংখ্যক শিখ সীমারেখার উভয় দিকে পড়িয়া যাইবে। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন পাকিস্তান সাম্প্রদায়িক সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান নহে।

৮। উপরোক্ত জোরাল যুক্তি ছাড়া আরও অনেক শাসনতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুতর যুক্তিও বিবেচ্য। ভারতের যানবাহন, ডাক ও তার বিভাগ একীভূত ভারতের ভিত্তিতে স্থাপিত। এই সমস্ত বিভাগ বিচ্ছিন্ন করিলে ভারতের উভয় অংশই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ঐক্যবদ্ধ ভারতের রক্ষাব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি আরও প্রবল। ভারতের সামরিক বাহিনীতে সমগ্র ভারতকে রক্ষা করার জন্যই একীভূত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। দ্বিধা বিভক্ত ভারতীয় বাহিনী শুধু তাহার সুপ্রাচীন সুনাম ও সুউচ্চ কর্ম শক্তিই হারাইবে না বরং ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইবে। ভারতীয় নৌ ও বিমান বহরের কর্মক্ষমতা কমিয়া যাইবে। প্রস্তাবিত পাকিস্তানের উভয় অংশ ভারতের দুই সুভেদ্য সীমারেখায় অবস্থিত। রক্ষা ব্যবস্থার গভীরতায় বিবেচনায় পাকিস্তান ভূখন্ড অত্যন্ত অপ্রচুর।

www.icsbook.info

৯। বিভক্ত বৃটিশ ভারতের সহিত ভারতীয় রাজন্যবর্গের সম্বন্ধ স্থাপনে গুরুতর অসুবিধার কথাও আমরা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছি।

১০। সর্বশেষ প্রস্তাবিত পাকিস্তানের ভৌগোলিক সংস্থাপন ও উভয় পাকিস্তানের মধ্যবর্তী ন্যূনাধিক সাত শত মাইল দূরত্বের কথাও বিবেচ্য। উভয়ের মধ্যে সমরকালীন বা শান্তিকালীন যানবাহন ব্যবস্থা হিন্দুস্তানের শুভেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

১১। অতএব বর্তমানে বৃটিশের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের হস্তে সমর্পণ করার পরামর্শ আমরা বৃটিশ গভর্ণমেন্টকে দিতে অক্ষম।

১২। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, আমরা অত্যধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণ নিয়ন্ত্রিত একীভূত ভারতে মুছলমান জনগণের সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন প্লাবিত হইয়া যাইবার সত্যিকার আশঙ্কা ভুলিয়া গিয়াছি। ঈদৃশ আশঙ্কার প্রতিকারার্থে কংগ্রেস এক পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে কেন্দ্রে বৈদেশিক সম্বন্ধ, দেশরক্ষা ও যানবাহন ব্যবস্থাদি যথাসম্ভব কমসংখ্যক বিষয় সংরক্ষিত থাকিবে এবং ইহা ছাড়া প্রদেশগুলিকে সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্ব দেওয়া হইবে। এই পরিকল্পনানুসারে যদি কোন কোন প্রদেশ বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও শাসন সংক্রান্ত পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক হন, তাঁহারা উল্লিখিত বাধ্যতামূলক বিষয়সমূহ ছাড়া তাঁহাদের ইচ্ছামত অন্যান্য বিষয়ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

১৩। আমাদের হাতে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে বহুবিধ শাসনতান্ত্রিক অসুবিধা ও বিশৃংখলা দেখা দিবে। যাহার ফলে কয়েকজন মন্ত্রী বাধ্যতামূলক বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতের নিকট দায়ী থাকিবেন ও অপর কয়েকজন মন্ত্রী ইচ্ছাধীন কেন্দ্রে ন্যস্ত বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়া কেবল মাত্র সেই কয়েকটি প্রদেশের নিকট দায়ী থাকিবেন, এমন একটি শাসন পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা কার্য্যকরী করা অত্যন্ত কঠিন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদের প্রদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নাই এমন বিষয়ে বক্তৃতা করা ও ভোট দান হইতে কোন সভাকে বঞ্চিত করা আবশ্যক হইবে।

এই প্রকার কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার অসুবিধা ছাড়াও আমরা মনে করি যে, যে সমস্ত প্রদেশ কেন্দ্রে কোন ইচ্ছাধীন বিষয় গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের এই প্রকার উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে একত্রীভুত হইবার অধিকার অস্বীকার করা সঙ্গত হইবে না।

১৪। আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করার পূর্বেই আমরা ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও বৃটিশ ভখারতের সম্পর্ক আলোচনা করিব।

www.icsbook.info

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ সাধারণতন্ত্রের মধ্যেই হউক বা বাহিরেই হউক, বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সহিত ইংলন্ডেশ্বরের যে সম্পর্ক এযাবৎকাল বর্তমান আছে, তাহা থাকা সম্ভবপর হইবে না। ইংলন্ডেশ্বর তখন আর তাঁহার সার্বভৌমত্ব রাখিতেও পারেন না, অথবা নূতন ভারত সরকারের হাতে তাহা ন্যস্তও করিতে পারেন না। দেশীয় রাজ্যের যাঁহাদের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহারাও ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন। তাঁহারা আমাদের জানাইয়াছেন যে, ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ ভারতের নবজাগরণ ও অগ্রগতির সঙ্গে জড়িত থাকিতে ইচ্ছুক। নূতন শাসনতন্ত্র গঠনের কালেই কিভাবে তাঁহাদের এই শুভেচ্ছা কার্য্যকরী করা হইবে তাহা সঠিক স্থিরীকৃত হইবে। সমস্ত রাজ্য সম্পর্কে একই ব্যবস্থা করা হইবে তাহা মনে করার কোন কারণ নাই। এই জন্যই পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বৃটিশ ভারতের প্রদেশসমূহ সম্বন্ধে যেমন বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, ভারতীয় দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে তেমন করি নাই।

১৫। আমাদের মতে যে ব্যবস্থা বিভিন্ন দলের মূল দাবীর পক্ষে ন্যায্য এবং যে ব্যবস্থা সমগ্র ভারতের স্থায়ী ও কার্য্যকরী শাসন প্রণালী প্রণয়নের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, আমরা এখন তাহাই উপস্থিত করিতেছি।

আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, ভারতীয় শসনব্যবস্থা নিম্নোক্ত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হউকঃ-

(১) বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া এক ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হউক। বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও যানবাহন বিষয়ে সর্বাধিক কর্তৃত্ব এই ইউনিয়নের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে ও এই সকল বিষয়ে অর্থ সংগ্রহ করার আবশ্যক কর্তৃত্বও ইহার থাকিবে।

(২) এই ইউনিয়নের বৃটিশ ভারত ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত শাসন ও ব্যবস্থা পরিষদ থাকিবে। ব্যবস্থা পরিষদে কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা প্রতিনিধি এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক ভাবে অধিকাংশ ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) ইউনিয়নের হস্তে ন্যস্ত বিষয়সমূহ ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকিবে।

(৪) দেশীয় রাজ্যসমূহ ইউনিয়নের হস্তে ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যতীত সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী রহিবেন।

(৫) প্রদেশসমূহ শাসন ও ব্যবস্থা পরিষদ সম্বন্ধে দলবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং এই প্রকার যৌথ প্রদেশসমূহ নিজেদের সাধারণ প্রাদেশিক বিষয় স্থির করিতে পারিবেন।

www.icsbook.info

(৬) ইউনিয়ন ও প্রাদেশিক যৌথ সরকারের শাসন ব্যবস্থায় এই বিধান থাকিবে যে, ব্যবস্থা পরিষদের অধিকাংশ ভোটের দ্বারা প্রথমে দশ বৎসর পরে এবং প্রতি দশ বৎসর অন্তর শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা দাবী করিতে পারিবে।

১৬। উপরোক্ত ধারায় কোন বিস্তারিত শাসন প্রণালী লিপিবদ্ধ করা আমাদের ইচ্ছা নহে। আমরা এমন করিতে চাই, যাহাতে ভারতীয়গণই তাঁহাদের নিজেদের জন্য শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন।

১৭। অচিরেই নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান কার্য্যকরী করিবার জন্য আমাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি।

১৮। নূতন শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রধানতম সমস্যা ইহাকে সঠিকভাবে সমগ্র জনগণের প্রতিনিধি স্থানীয় করা। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন দ্বারা প্রতিনিধি পরিষদ গঠনই সর্বোত্তম পন্থা। কিন্তু ইহাতে নূতন শাসনতন্ত্র রচনায় অনভিপ্রেত বিলম্ব ঘটিবে। অল্পদিন পূর্বে নির্বাচিত ব্যবস্থা পরিষদগুলিকে নির্বাচক হিসাবে ব্যবহার করাই একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা। ব্যবস্থা পরিষদের গঠন প্রণালীর দুইটি ব্যাপারে ইহাও একটু শক্ত বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলির সভ্য সংখ্যা সর্বত্র প্রদেশের সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে ধার্য্য করা হয় নাই। আসামে এক কোটি অধিবাসীর ব্যবস্থা পরিষদে ১০৮ জন সভ্য আর বাঙ্গালায় লোকসংখ্যা ইহার ছয় গুণ অথচ বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য সংখ্যা ২৫০। দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়ায়, কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সংখ্যা প্রদেশে তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে ধরা হয় নাই। বাংলায় মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা শতকরা মাত্র ৪৮ কিন্তু লোকসংখ্যায় তাঁহারা শতকরা ৫৫। কিভাবে এই অসামঞ্জস্য দূর করা যায় তাহা আমরা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছি। আমাদের মতে খুব ন্যায্য ও কার্যকরী উপায় হইতেছেঃ-

(ক) প্রত্যেক প্রদেশে জনসংখ্যার অনুপাতে বন্টন করা। প্রতি দশ লক্ষে একজন প্রতিনিধি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের কাছাকাছি দাঁড়াইবে।

(খ) প্রাদেশিক আসনগুলি জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্টন করিয়া দিতে হইবে।

(গ) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নির্বাচিত ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যেরা সেই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

আমরা মনে করি, এই উদ্দেশ্য সাধারণ, মোছলেম ও শিখ এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ের বিষয় বিবেচনা করিলেই চলে। মোছলেম ও শিখ ছাড়া অন্যান্য

www.icsbook.info

সকলেই সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করা হইবে। অন্যান্য ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় জনসংখ্যার অনুপাতে অতি সামান্য প্রতিনিধিত্বই পাইতে পারেন। পরন্তু ইহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহাদের যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও নষ্ট হইবার আশংকা আছে। সে জন্য বিংশ অধ্যায়ে সংখ্যালঘিষ্ঠদের বিশেষ বিষয়ে আমরা তাঁহাদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিয়াছি।

১৯। (১) আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ, মোছলেম ও শিখ সদস্যরা একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের দ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিম্নোক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

প্রতিনিধির তালিকা

ক অনুচ্ছেদ

প্রদেশ	সাধারণ	মোছলেম	মোট
মাদ্রাজ	৪৫	৪	৪৯
বোম্বাই	১৯	২	২১
যুক্ত প্রদেশ	৪৭	৮	৫৫
বিহার	৩১	৫	৩৬
মধ্য প্রদেশ	১৬	১	১৭
উড়িষ্যা	৯	০	৯
মোট	১৬৭	২০	১৮৭

খ অনুচ্ছেদ

প্রদেশ	সাধারণ	মোছলেম	শিখ	মোট
পাঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	০	৩	০	৩
সিন্ধু	১	৩	০	৪
মোট	৯	২২	৪	৩৫

গ অনুচ্ছেদ

প্রদেশ	সাধারণ	মোছলেম	শিখ	মোট
বাংলা	২৭	৩৩	০	৬০
আসাম	৭	৩	০	১০
মোট	৩৪	৩৬	০	৭০

সর্বমোট বৃটিশ ভারত ২৯২
দেশীয় রাজ্যের সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রতিনিধি ৯৩
মোট ৩৮৫

www.icsbook.info

মন্তব্যঃ

চীফ্ কমিশনারের প্রদেশের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের দিল্লী ও আজমীর মাড়ওয়ারের প্রতিনিধিদ্বয় এবং কূর্গ ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক নির্বাচিত একজন সদস্য ক অনুচ্ছেদে যুক্ত হইবেন। বৃটিশ বেলুচিস্তানের একজন প্রতিনিধি খ অনুচ্ছেদে যুক্ত হইলেন।

(২) গণ-পরিষদের জনসংখ্যানুপাতে অনধিক ৯৩ জন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি থাকিবেন। ইহাদের নির্বাচন প্রণালী আলোচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। প্রারম্ভে একটি শালিসী কমিটি দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

(৩) নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ যথাসম্ভব শীঘ্র দিল্লীতে সমবেত হইবেন।

(৪) প্রারম্ভিক সভায় কার্য্যসূচী স্থির হইবে। সভাপতি ও অন্যান্য কর্মচারী নির্বাচিত হইবেন এবং বিংশ সংখ্যক অনুচ্ছেদে বর্ণিত নাগরিকগণের সংখ্যাল্পদের, উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চলের অধিকার রক্ষার্থে এক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হইবে। ইহার পরে প্রতিনিধিগণ পূর্বে ক, খ,গ অনুচ্ছেদে বর্ণিত তিন দলে বিভক্ত হইবেন।

(৫) প্রত্যেক দল তাঁহাদের অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রদেশসমূহের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। সেই সকল প্রদেশ লইয়া কোন মন্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা এবং হইলে সেই মন্ডলী কোন্ কোন্ বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবেন তাহা স্থির করিবেন। নিম্নে আট নম্বর উপধারায় বর্ণিত ব্যবস্থানুসারে কোন প্রদেশ মন্ডলীর বাহিরে থাকিতেও পারেন।

(৬) প্রতি অনুচ্ছেদের ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ইউনিয়নের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পুনরায় সমবেত হইবেন।

(৭) ইউনিয়নের গণ-পরিষদে যদি পনর নম্বর অনুচ্ছেদের ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন অথবা কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, উপস্থিত প্রতিনিধিগনের অধিকাংশের ও দুই প্রধান সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক ভাবে গৃহীত অধিকাংশ ভোটের দ্বারা তাহা স্থিরীকৃত হইবে। গণ-পরিষদের সভাপতি কোন প্রস্তাবে গুরুতর সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন জড়িত কিনা তাহা স্থির করিবেন এবং যদি দুই প্রধান সম্প্রদায়ের যে কোন এক সম্প্রদায় অধিকাংশ প্রতিনিধি দাবী করেন, তাহা হইলে ফেডারেল কোর্টের পরামর্শ নিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন।

(৮) নতুন শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবার পর যে কোনও প্রদেশ পূর্বে যে দল বা গোষ্ঠীর সহিত তাহাকে সংযুক্ত করা হইয়াছিল তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারেন। নূতন শাসনতন্ত্রের বিধানমত সাধারণ নির্বাচনের পরেই মাত্র ব্যবস্থা পরিষদ এই সিদ্ধান্ত করিতে পারেন।

২০। নাবিকগণ, সংখ্যাল্প সম্প্রদায় এবং উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চরের অধিকার সংরক্ষনার্থে যে উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইবে, তাহাতে সংশ্লিষ্ট স্বার্থবিশিষ্ট সকলের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। মৌলিক অধিকার, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের রক্ষা ব্যবস্থা এবং উপজাতীয় ও সংরক্ষিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা বিষয়ক প্রস্তাব উপদেষ্টা কমিটি গণ-পরিষদে উপস্থিত করিবেন এবং এই সকল অধিকার কোন প্রাদেশিক গোষ্ঠি অথবা ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইবে তাহাও বলিবেন।

২১। মাননীয় বড়লাট বাহাদুর অবিলম্বে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গকে শালিসী কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করিবেন। আমরা আশা করি বিষয়বস্তুর জটিলতা সত্ত্বেও যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত শাসনতন্ত্র রচনার কার্য্য অগ্রসর হইবে এবং মধ্যবর্তী সময় অতি সংক্ষিপ্তই হইবে।

২২। ভারতীয় ইউনিয়নের গণ-পরিষদ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে সন্ধিপত্র রচিত হওয়া আবশ্যক হইবে।

২৩। শাসনতন্ত্র রচনাকার্য্য চলিতে থাকাকালীন ভারতের শাসনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে চলা অত্যাবশ্যক।

www.icsbook.info

প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমর্থিত এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সত্বর প্রতিষ্ঠা করা আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। বর্তমান সন্ধিক্ষণে ভারত সরকারের এই গুরুকর্তব্য পালনে সর্বাধিক সহযোগিতার প্রয়োজন। দৈনন্দিন শাসনকার্য্য চালনা ছাড়াও আমাদিগকে দারুণ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে দেশবাসীকে রক্ষ করিতে হইবে। মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতের পুনর্গঠন পরিকল্পনার সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে। এই সকলের জন্য জনগণের সমর্থনপুষ্ট সরকার আবশ্যক।

মাননীয় রাজ্যপ্রতিনিধি মহোদয় এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আশা করেন, শীঘ্রই জনগণের আস্থাভাজন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্য হতে সমর-সদস্য ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় সদস্য লইয়া এক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন। বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের এই পরিবর্তনের গুরুত্ব অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন এবং শাসন কার্য্যের দায়িত্ব পালনে শীঘ্র ও সহজে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ করার কার্য্যে পূর্ণ সহযোগিতা করিবেন।

২৪। ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এবং জনসাধারণের এখন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের নিকট আমাদের শেষ বক্তব্য এই। আমাদের গভর্ণমেন্ট এবং আমাদের দেশবাসীদের আশা ছিল যে, ভারতবাসীরা যেরূপ নূতন রাষ্ট্রের অধীনে বাস করিতে চায় তাহার গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের এবং আমাদের পরিশ্রম ও অশেষ ধৈর্য্য ও সদিচ্ছা ইহা সম্ভবপর হয় নাই। আমরা আশা করি যে, সর্ববিধ মত গ্রহণ করিয়া এবং অশেষ বিবেচনা পূর্বক আমরা আপনাদের নিকট এখন যে প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি তাহা অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে এবং অন্তরবিপ্লব ও অন্তরকলহ ব্যতীতই আপনাদের স্বাধীনতা অর্জন করিতে সক্ষম করিবে। আমাদের প্রস্তাব হয়ত আপনাদের সকল দলকে পরিপূর্ণ সুখী করিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের সহিত আপনারাও ইহা উপলব্ধি করিবেন যে, ভারতের ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে রাজনীতির দিক হইতে পরস্পর সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। আমাদের প্রস্তাব যদি আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তবে অন্য কোন বিকল্প প্রস্তাব বিবেচনা করিতে আমরা আপনাদের অনুরোধ করিতেছি। ভারতীয় দলসমূহের সহিত একযোগে ঐক্যের জন্য চেষ্টা করিয়া আমরা এই মত পোষন করিতেছি যে, কেবল উক্ত দলসমূহের ঐক্যদ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার আশা অতি অল্প। সুতরাং মারামারি, অরাজকতা এবং গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। এই শান্তিভঙ্গের ফলাফল এবং স্থিতিকাল অনুমান করা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, ইহাতে লক্ষ লক্ষ পুরুষ, নারী ও শিশু অত্যন্ত বিপন্ন হইবে। এই অবস্থাকে ভারতীয় জনসাধারণ আমাদের দেশবাসী এবং বিশ্বের জনসাধারণ সমভাবে ঘৃণা করিবে।

সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে সহযোগিতা এবং সদিচ্ছার ভাব লইয়া আমরা আমাদের প্রস্তাব আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি আপনারাও সেই ভাব নিয়াই তাহা গ্রহণ করিবেন এবং কার্য্যকরী করিয়া তুলিবেন। যাহারা ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, তাহারা যেন তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী নিজেদের সম্প্রদায় এবং স্বার্থের প্রতি নিবদ্ধ না রাখিয়া চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

আমরা আশা করি, নতুন স্বাধীন-ভারত বৃটিশ সাধারণতন্ত্রের জন্য হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিবে। আমরা আশা করি, যে কোন অবস্থায়ই আপনারা আমাদের সহিত নিবিড় বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিবেন। অবশ্য ইহা আপনাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। এই বিষয়ে আপনাদের ইচ্ছা যাহাই হউক, বিশ্বের মহান জাতিপুঞ্জের মধ্যে আপনাদের ক্রমবর্ধমান উন্নতি হউক এবং আপনাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতার হউক, ইহাই আমাদের কাম্য।

['ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান'টি চট্টগ্রামের এম, জহুর হোসেন চৌধুরী ও মওলানা মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত 'কায়েদে আযমের পত্র ও বক্তৃতাবলী' থেকে গৃহীত।]

www.icsbook.info

www.icsbook.info

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা